শ্রেষ্ঠ গল্প

সমরেশ মজুমদার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

প্রকাশক ঃ
মনীষী বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর ঃ
ভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

মা ও বাবাকে

সূচীপত্র

অন্তর আত্মা

বেশ কিছুক্ষণ হল আমার ঘুম ভেঙেছে এবং আমি এই সময়টুকু সমস্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে, অনেকটা তে-মাথা বুড়ির মত, ঘুমের আমেজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিলাম। আচার খাওয়ার পর জিভটাকে চকচক শব্দে নাড়াচাড়া করতে যেমনটি লাগে।

এখন এই সকালে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে আমি সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ, একটা মাটির ভাঁড়ে উপচে-পড়া সিগারেটের টুকরো ও আমার বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা হওয়া একপাটি জুতো আবিষ্কার করে ঈষৎ বিরক্ত হলাম। এবার আমি উঠবো। রাত্রে নগ্ন হয়ে শোয়া স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করায় এখন লেপের আড়ালে প্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে থার্মোমিটারের মত টুথব্রাশ মুখে পুরে একতলায় নামবো। দরজা খোলার আগে আমার দশ ইঞ্চি এবং প্রায় অস্বচ্ছ আয়নায় মুখটা একবার বুলিয়ে চোখের শ্রী ফিরিয়ে নেব। কারণ, আমি জানি, এ সময়ে নীচের কলতলায় কয়েকটি মেয়ে ব্যস্ত থাকবেই। এ বাড়ির বাসিন্দে মেয়েরা সুন্দরী কি' হলেও তাদের প্রতি কোন দুর্বলতা আমার নেই, তথাপি পিচুটি চোখে কোন মহিলার মুখোমুখি হওয়া আমি 'ক্রাইম' মনে করি। কলতলায় নামলেই চাক ঘিরে থাকা মৌমাছির মত কল আকড়ে থাকা মেয়েগুলো আলগা হবে এবং ইত্যবসরে আমি সুড়ুৎ করে কর্মটি সেরে নিই। এই সময় নিয়মিত দুটি বাক্য শ্রবণ করি—'আজ বড় তাড়াতাড়ি উঠলেন যে।' অথবা 'আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে কিন্তু।' এক টুকরো প্রণামী হাসি চটকাতে চটকাতে যখন ওপরে উঠে আসি তখন তলপেটে ঈষৎ চাপ অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও কোন বাথরুম খালি না থাকায় আমাকে জামা গলিয়ে 'ভালো আছেন মাসীমা' গোছের মুখ করে পাড়ার চায়ের দোকানে ছুটতে হয়। আমার প্রাত্যহিক খরচের একটা বাজেট থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সেটি মেনে চললেও প্রায়শই তা অতিক্রম করে যাই। কারণ যে কোন সময় যে কোন মহিলার সঙ্গে আলাপ হলে ইত্যাদির জন্যে কিছু খরচ আমার হয়ই। আমি, একটি সরকারি অফিসে মাঝারি চাকরি করলেও কর্তৃপক্ষ আমার ইতিহাসে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত। যদিচ তারা সন্দেহের কাঁটাকে লালন করতে বদ্ধপরিকর এবং আমি নিশ্চিন্ত আনন্দে নিয়মিত মাইনে নিয়ে যাচ্ছি।

সম্পূর্ণ টিপটপ না হয়ে পথে বের হই না আমি। মাথার টেরি থেকে জুতোর টো আমার ঝকঝকে থাকবেই। ঘণ্টা খানেকের ব্যবধানে সিগারেট কেনার সময় পানের দোকানের আয়নায় কোদাল চালানোর মত চুলে কয়েকটা কোপ মারি চিরুনি দিয়ে। দ্বিতীয়টির জন্য আমাকে ট্রামে-বাসে উঠতে হয়। কারণ, প্রকাশ্যে পকেটের রুমালে জুতোর টো মোছা— সে একটা বিশ্রী ব্যাপার। ট্রামে উঠে ইচ্ছে করে রুমালটাকে পায়ের কাছে ফেলে দিই। এবং সেটাকে ওঠাবার ভঙ্গী করে নিপুণ হাতে টো পালিশ করে নিই। রুমালটির দুটো ভাঁজ আছে। একটিতে মুখ মুছি অন্যটিতে জুতো।

যেদিন প্রথম ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছিলাম সেদিন খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলেছিলাম। কারণ, জেনেছিলাম যে, আমার অফিসাররাও আমার ডিগ্রির কাছাকাছি যান নি। বস্তুত 'এম এ পাস' শব্দ দুটো কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি নেবার মত আমার কাছে আরামদায়ক ছিল। আমার পাশের সহকর্মী আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল আমার ডিগ্রির খবর পেয়ে। 'দাদা এখানে আর ক-দিন থাকবেন।' ইত্যাদি স্তুতি সে করেছে প্রচুর। কিন্তু যেদিন শুনলো আমার এম-এ'র সাবজেক্ট কি ছিল। সেদিন থেকেই লোকটা ইয়ার-দোস্তের মত 'আরে শালা' বলতে

শুরু করলো। আমার খুব সন্দেহ, লোকটা কলেজেই ঢোকেনি। ফলত, এখন আমি নিজেকে গ্র্যাজুয়েট বলি পরিচয়-প্রসঙ্গে। বাংলায় এম-এ বলা মানে দেশী আয়নায় নিজের তিনরকম মুখ দেখা এ সত্য জেনেছি মজ্জায় মজ্জায়।

অত্যন্ত দ্রুত আমি স্নান সেরে নিই। কারণ, এই বারোয়ারি স্নানঘরটা যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। মেয়েদের মাথার চুল থেকে সাবানের ফেনা সর্বদা জলে ভাসে। বেশিক্ষণ গায়ে জল না ঢাললে আরশোলার আদর খেতে হবে সর্বাঙ্গে। এই গা ঘিনঘিন ভাবটা এড়াবার জন্য আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে স্নান শুরু করি। শুকনো গামছা দিয়ে ধরে মাঝে মাঝে কয়েকটা টান দিয়ে নিই। অনেকটা ট্রলি গাড়ির বেগ কমে এলে পেছন থেকে ঠেলার মতন।

সকাল বেলায়ই আমি খুব অসহায় বোধ করি। কারণ এখন কোন বন্ধুকে পাওয়া যাবে না। যে যার বস-এর কাছে বশংবদ। তবু চৌরাস্তায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম প্রাত্যহিক অভ্যাসে। এখন মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়েছে। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বত্রিশ দাঁতে পান চিবুনোর মত ঠাটোগুলোকে দেখি। কতক মুখ আমার চেনা হয়ে গেছে' এবং এক সময় হঠাৎই বাসে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মেয়েদের পেছনে হাঁটার উত্তাপ সর্বাঙ্গে নিয়ে আমি এক বন্ধুর দোকানে ঢুকে পড়লাম। সুহৃদ টেবিল বাজাচ্ছিলো। ওর বাবার দোকান এটা। রেডিওর। ভদ্রলোক বারোটার পর নামেন। এ সময়টা সুহৃদ সম্রাট। টালিগঞ্জ পাড়ায় একদা ঘোরাঘুরি করেছিল, বাবার হুকুমে সেটা স্থগিত থাকলেও বর্তমানে নবনাট্য করছে। নাটক মঞ্চস্থ হবে কি না ঠিক নেই, কিন্তু রিহার্সাল দিয়ে চলেছে। ফলত সদস্যরা অনিয়মিত হচ্ছে নিয়মিত। আমাকে দেখেই সুহৃদ ওদের কানা দারোয়ানটাকে এক ভাঁড় চায়ের হুকুম দিয়েই পাশ থেকে এক দিস্তে কাগজ টেনে আনলো। 'বুঝলি অনিমেষ, এখানটায় যা ট্রিটমেন্ট করেছি না—অনেকটা পিকচারাইজড। জাম্প শট বুঝিস? ফিল্মে আছে—নাটকেও তাই আনছি। আই অ্যাম দ্য ফার্স্ট ম্যান, ফার্স্ট অ্যাক্টিং-এর সঙ্গে—'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা বিরাট হাই তুলে বললাম, 'ওটা গর্ডন ক্রেগ করেছে।' চোয়াল ঝুলিয়ে ঘসঘসে গলায় সুহৃদ বলল, 'গর্ডন করেছে?' যেন গর্ডন আমাদেরই আর এক বন্ধু। ওর হাতটা যেভাবে মুঠো হলো তাতে গর্ডন ক্রেগ সামনে থাকলে একটা কিছু হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম—'রবার্ট লুইস তো সেইরকমই লিখেছেন। বুঝলি সুহৃদ, এই নাটক-ফাটক করে কিস্যু হবে না। তার চেয়ে ফিল্মের দিকে--।' আসলে সুহৃদকে বধ করতে হলে এইসব নাম বলতে হবে এটা আমি জানতাম। এসব নিয়ে ও পড়াশুনা করে তা আমি জানি। নাম দুটো আমার মুখে শোনার পর ও একটা ফিল্টার টিপ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে এগিয়ে দিয়ে বললো, নাঃ, ডকুমেন্টারি করবো। হাজার দুয়েক মামলা তো। সোলো মিনিটে ট্যালেন্ট দেখিয়ে দেব। বিন্দুতে সিন্ধু।'

ডকুমেন্টারির চেয়ে ফিচার ফিলম বেটার। তবে নেহাতই যদি করিস তবে ইন্দিরা গান্ধীর ওপর কর। 'প্রিয়দর্শিনী' নাম দে। গভর্নমেন্ট কিনে নেবে।'

এবং আমরা এই সব কথাবার্তা বলে গেলাম বারোটা অবধি। এবং গত দু বছরের মত আমাদের আলোচনার কোন সিদ্ধান্ত হবে না। আমরা যখন কথা বলি, সুহৃদ ও আমি একটা ছবি করবো, সিরিয়াস হয়েই বলি। সেই মুহূর্তে আমরা কেউ স্মরণে আনি না যে নাটকের জন্য একজন অভিনেত্রী পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন এবং তা সাধ্যাতীত ছিল বলে আমরা রিহার্সাল বন্ধ রেখেছি। এই সময় চলচ্চিত্রের যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। এক সময় আমি উঠে পড়লাম। আমি ও সুহৃদ কেউই আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

এই সময় আমি দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে সাধারণ পাঞ্জাবী দোকানই আমার

পছন্দ। কারণ, বাঙালী পাইস হোটেলের অপরিচ্ছন্নতা এবং ভাত ছ' আনা ডাল দু' আনা ইত্যাদি দ্রুত নামতার মত কানের কাছে চেঁচানো হয় বলে আহার গ্রহণে বিঘ্ন ঘটে।

এসব ব্যাপারের বাইরে আমি নিভৃতে পকেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করি। অল্প পয়সায় রুটি সহযোগে তড়কা অত্যন্ত উপাদেয়—পাঞ্জাবী হোটেলে ঢোকার পেছনে এ আমার অন্যতম যুক্তি। বস্তুত পেঁয়াজ ও লেবু সহযোগে তড়কা খেতে খেতে আমি মাংসের আঘ্রাণ পাই। অবশ্যই স্বীকার করবো দিনের মধ্যে দু'বার খাবার সময় বহু যোজন দূরে অবস্থানকারী আমার পিতামাতার মুখ স্মরণ হয়। অন্যথায় আমি নিজেকে ভালবাসি বা আত্মকেন্দ্রিক' এই বিশেষণ অস্বীকার করি না। তা ছাড়া বিচিত্র হিন্দি ভাষা শেখার অন্যতম জায়গা পাঞ্জাবী হোটেল এবং স্বীকারে লজ্জা নেই, আমি শিক্ষানবিস।

বেশ কয়েকটা পারিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে আমি ট্রামে উঠলাম। সাধারণতঃ যে সব ট্রামের পেছন দিকে দরজা থাকে সেগুলো আমি পরিহার করি। স্বচ্ছন্দ হয়ে থাকা যায় না। বরং পেট [illegible] ট্রামের দরজায় দাড়ানো বেশ আরামদায়ক। [illegible] আমার এক [illegible] বন্ধু পেশ করেছেন প্রথমটি পুরুষ ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী ট্রাম। এবং আমার পক্ষে স্ত্রী জাতির প্রতি অনুরাগ দেখানো স্বাভাবিক। ট্রামে উঠেই আমার চোখ উজ্জ্বল হল। [illegible] দ্বিধামুক্ত হলাম। যদিও ওর চোখে কালো চশমা [illegible] সাদা ঝোলানো ব্যাগটা আমি দেখতে পেয়েছি [illegible]। এই মেয়েটির সঙ্গে আমি [illegible] কথা বলিনি কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি একেবারে নই। ক্রমশ [illegible] করবোই। এবং কিভাবে কথা বলবো তার একটা ফর্মুলা আমার আছে। [illegible] গিয়েই একটু অবাক ও চিন্তিত চোখে বলবো মাফ করবেন আপনাকে [illegible] মনে হচ্ছে—কোথায় থাকেন বলুন তো? সাধারণত এই প্রশ্নের উত্তরে [illegible] মেয়েরা বলবে 'কেন আপনার কি দরকার?' তখন কাঁধ দুটো বেশ প্রশস্ত করে [illegible] বলতে হবে [illegible] তেমন কিছু নয় কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি [illegible] ভুল হয়। এর পরে চোখ রাখতে হবে মেয়েটির চোখে। প্রশ্রয়ের আভাস পেলে তবে [illegible] কথার নৌকো ছুটবে। নইলে সেটা [illegible]

নিউ সিনেমার সামনে মেয়েটি নামতেই আমি [illegible] দিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে আমার একটা আশঙ্কা ছিল— হয় তো ওর কোন ব্যক্তিগত বন্ধু অপেক্ষা করছে কোথাও। মেয়েটি মার্কেটের রাস্তায় এগোতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সত্বর। দ্রুত মেয়েটিকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে নির্জনতম জায়গায় দাড়ালাম। মেয়েটি অনায়াসে হাঁটছে হাঁটার সময় ঊর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের আন্দোলন আমার শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল। কাছাকাছি হতেই এগিয়ে গেলাম, মাথাটা বেঁকিয়ে ঈষৎ অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে (সম্প্রতি কোন ছবিতে নায়ককে এভাবে হাসতে দেখেছিলাম)। হঠাৎই সব এলোমেলো হয়ে গেল এবং আমি সব ফর্মুলা ভুলে দু হাত জোড় করে ঈষৎ হেসে বললাম 'নমস্কার আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাড়ালো এবং দীঘ নরম ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে দেখলো তারপর আলতো করে উচ্চারণ, 'কেন বলুন তো?'

এ প্রশ্নটাই মারাত্মক আমি চোখ বুজে পরক্ষণেই হেসে ছোট্ট শ্রাগ করে বললাম আলাপ করতে ইচ্ছে হলো খুব।

'কি হবে আলাপ করে?' মেয়েটির দৃষ্টি আমাকে মাপছে। আমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বললাম, 'জানি না, তবে এক একটা ইচ্ছেকে চেপে রাখা যায় না তাই।'

'ও।'

'আমি নিখিল বায। কাস্টমসে আছি।' এখান থেকেই আমি আমাব ফবমুলায এসে গেলাম। কখনোই কাউকে আসল নাম ও অফিস আমি কাউকে বলি না। 'আপনি তো এদিকেই যাবেন?'

মেযেটি হাসলো, 'হ্যাঁ।' আমবা এগুলাম। কথা নেই কিছু। অস্বস্তি হচ্ছে। মেযেটিব পবিচিত কেউ এসে পড়লে অপ্রীতিকব হবে। গলায কৌতুক নিযে বললাম, 'কাবো সঙ্গে অ্যাপযেন্টমেন্ট আছে বুঝি?'

'আছে। টেলাবেব সঙ্গে, আমাব কযেকটা জামা ফিট কবতে দিযেছি, আজ ট্রাযাল ডেট।'

এব পব আমবা কথা বললাম, যে কেউ এ মুহূর্তে আমাদেব অন্তবঙ্গ ভাববে। অফ ডিউটিতে সিনেমা দেখবাব উদ্দেশ্যে এ পাড়ায আমাব আগমন—জানালাম। আসলে মেযেটি সিনেমায আসুক এ আমি চাইছিলাম।

'এই যে আমাব শপ।' মেযেটি বাঁ চোখে আমাকে দেখলো, তাড়াতাড়ি জোড়া দিলাম। 'আমি কি অপেক্ষা কববো?' ভেতবে ঢোকাব আগে মেযেটি বললো, 'আচ্ছা।'

এটি একটি ফবাসী দর্বজিব দোকান। বিবাট বিবাট গাড়িতে বিভিন্ন বযসেব মেযেবা আসছে অনববত। তাদেব ব্লাউজেব চেহাবা দেখে আবাব জযন্তকে মনে পড়লো। মার্কেটে ঘুবতে ঘুবতে একদা ক্রীসমাসে জযন্ত বলেছিলো, বালিসেব ঢাকনা, লেপেব ওযাড যেমন আছে, বুঝলি, এই ব্লাউজগুলো তেমনি অন্তর্বাস ঢাকনা। মাপে মাপে তৈবি।

তিনটে সিগারেট শেষ হলে মেযেটি বেবুলো। পাশাপাশি কযেক পা হেঁটে সমস্যায পড়া গেছে এমন ভঙ্গিতে বললাম, অথ গন্তব্য কোথায?'

মণিবন্ধে বাধা চৌকো বড় ঘড়িটা দেখলো সে। 'আমাকে তিনটেব মধ্যে বাড়ি ফিবতেই হবে।' অর্থাৎ এখনো ঘণ্টাখানেক সময আমি পাবো। কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলি, 'ওঃ, অনেক দেবি আছে। চলুন কোথাও জমিযে আড্ডা দেওযা যাক।' 'জমিযে আড্ডা' শব্দ দুটো, আমি ইচ্ছে কবেই বললাম। কাবণ এতে আমাব সবলতা ও নির্লোভ প্রকাশ পাবে। তা ছাড়া মেযেটি যদি কলেজ য়ুনিভার্সিটিব ছাত্রী হয, তা হলে আমাব মেজাজেব সঙ্গে একটা সাধর্ম্য খুঁজে পেযে খুশি হবে। কফিহাউসে অনেক মেযেকে শব্দ দুটো ব্যবহাব কবতে শুনেছি।

'কোথায আড্ডা দেবেন। যা বোদ্দুব।' আকাশ দেখলো। চলুন কোথাও বসা যাক।' আমি দবাজ হলাম। ক্রমশ আমি একটা কবে বেস্তোবাঁব নাম বলে গেলাম এবং সে নাকচ কবে গেল। হয তাব কোন আত্মীয নিযমিত সেখানে আসেন অথবা সে পবিচিত। শেষ পর্যন্ত যে দোকানে আমবা প্রবেশ কবলাম, সেটি সাহেবপাড়ায অত্যন্ত দামী এবং আমাব দীর্ঘকালেব বাসনায ছিল। সেই স্বল্পালোক শীততাপ নিযন্ত্রিত সজ্জিত কক্ষেব কোণায সোফায বসে মেনু হাতড়ে হাতড়ে যে পানীযেব হুকুম দিলাম, তাব বিনিমযে আমাব চাব বেলাব মিল খাওযা হযে যেত। 'বেশী কিছু খেতে পাববো না, এই মাত্র লাঞ্চ সেবেছি আমি, আপনি?' বলাব সমযে তড়কাব ঢেঁকুব উঠলো না। আম জানতাম, যে-কোন মেযেই একবাব অর্ডাব দেওযা হযে গেলে মুখ ফুটে অন্য খাবাব চাইবে না। এবং এই সময মনে মনে এই বাড়তি খবচটুকু আগামী সাত দিনেব বাজেট থেকে কিভাবে পুষিযে নেব, তাব একটা খসড়া কবে নিলাম অতি দ্রুত।

এখন পযন্ত মেযেটিব নাম আমি জানতে চাইনি, কাবণ, আমি চাইছিলাম, মেযেটি বুঝুক, আমি ঠিক লাইনেব ছেলে নই। 'লাইন' বলতে আমি লোভী কামুক এবং ইতব কিছু মানুষ যে পদ্ধতিতে আনাগোনা কবে সেই পদ্ধতিব কথা বলছি। এ ছাড়া আবও একটা কাবণ এই যে, আমি মেযেটিব বিবাট চ্যাপটা সাদা চামড়াব ঝোলানো ব্যাগটাব গাযেব খোপে বসানো সাদা কাগজে লেটাবিং কবা নাম 'দমযন্তী গুপ্ত, বি এ (অনার্স)' দেখতে পেযেছিলাম। এবং এই বিশ্ব-চবাচবে প্রথম কোন স্ত্রীলোককে হাত-ব্যাগেব শবীবে নিজেব নাম ও ডিগ্রীব খবব লিখতে দেখে পুলকিত হলাম।

সোফায মাথা এলিযে মেযেটি বসেছিল। আমি ওব স্ফীত উর্ধ্বাঙ্গে ইচ্ছে কবেই চোখ বাখছিলাম না। কাবণ, আমি জানি, মেযেবা এ বিষযে অত্যন্ত সচেতন এবং আমাকে এ ব্যাপাবে উদাসীন দেখলে সে ক্রমশ আমাব ওপব আস্থাশীল হবে।

'বেস্টুবেন্টটা খুব ডেকোবেটিভ।' মেযেটি দেযাল দেখছিল।

সাহেব পাডাব সঙ্গে আমাদেব উত্তব কলকাতাব পার্থক্য এখানেই।' সুন্দব কবে বললাম আমি।

দুটো• ভ্র এক কবে মেযেটি বললো, আপনি নর্থে থাকেন?'

'শ্যামবাজাবে।'

আচ্ছা—।' এমন আলতো স্ববে শব্দটা সে উচ্চাবণ কবলো যে, ওব ঠোঁট একটুও কাপলো না, আমি বিডন স্ট্রীটে।'

'তা হলে বেথুনে পডেছেন?' আমবা ক্রমশ সিঁডি ভাঙ্গা অঙ্কেব মত ধাপে ধাপে নামছিলাম। আমি খুব কাছাকাছি বসে আইসক্রীম খেতে খেতে মেযেটি সম্পর্কে ওযাকিবহাল হলাম। আমাব অনেক কিছু শখ হচ্ছিলো, কিন্তু আমি কোন উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম না। হঠাৎই লক্ষ্য কবলাম আমাদেব বিপবীত কোণে দুটি মাবোযাডী ছেলে মেযেটি সম্পর্কে আলোচনা কবছে বিশ্রী ভঙ্গিতে। আমি উত্তেজিত হলাম। মাথা নীচু কবে মেযেটিব কানেব কাছে মৃদু স্ববে বললাম, 'ঐ কোণেব ছোকবাগুলোকে একটু শিক্ষা দেওযা দবকাব।' স্প্রীংযেব মত মাথা ঘুবিযে কোণেব দিকে তাকালো মেযেটি। তাবপব ক্রমশ মুখেব পেশী শিথিল কবে লাফিযে উঠলো, 'হ্যালো ম্যান। হা ডু যু ডু?' লাট্টুব মত শবীব ঘুবিযে মাবোযাডী-টেবিলেব দিকে এগিযে গেলো সে। কযেক মূহূর্ত নির্বিকাব ভাবে দর্শন কবলাম। বিলটা পে কবতেই বা চোখে ঝাঁকুনি দিযে মেযেটি ডাকলো, 'ওঁকে চেনেন না? ওমপ্রকাশ—টেবল টেনিস চ্যাম্পিযন। উঃ কদ্দিন পবে তোমাব সাইট পেলাম প্রকাশ।' ওবা আমাকে লক্ষ্য কবছিল না। পাযে পাযে কখন দবজাব কাছাকাছি চলে এসেছি নিজেই টেব পাইনি। শীততাপ নিযন্ত্রিত কক্ষেব বাইবে এসে এক ঝলক আগুনেব তাপ নিলাম সর্বাঙ্গে। সেযানে সেযানে পাঞ্জা কষে পবাজিত সম্রাটেব মত প্রচণ্ড বোদ্দুবে দাঁডিযে মনে হল, লক্ষ লক্ষ সিসিফাস তো জন্মাচ্ছে, তবু সূর্যেব তেজ একটুও কমছে না। শালা।

কযেক শো টাকাব বাজী হেবে যাবাব মত মেজাজ নিযে হাটছিলাম। ভদ্রলোকেব সঙ্গে কথা বলা দবকাব। যদিও শেষ দিন কথা বলাব সময আমি ভেবেছিলাম আব আসবো না। ইনি বাংলা দেশেব তথাকথিত সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তি। একে দেখে আমাব মিশবেব প্রাক্তন বাজা ফারুকেব চেহাবা মনে পডে। আমাব কর্তৃপক্ষ যে বাজনীতিব গন্ধ আমাব ইতিহাসে পাচ্ছেন বলে শুনেছি, তাব সঙ্গে চোদ্দ পুরুষেব আমাব সম্পর্ক ছিল না। অতএব এই মিথ্যে অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ কবতে আমাকে লাট্টুব মত ঘুবতে হচ্ছে। আমাকে প্রমাণ কবতে হবে আমি সৎ। শ্রীবামচন্দ্রকে যদি বলা যায—'ওহে, বাপু, তুমি প্রমাণ কবো দেখি দশবথ তোমাব বাপ কিনা।' তবে ভদ্রলোকেব সমস্যা নিশ্চযই আমাব চাইতে নেহাত কম হতো না। ঈশ্বরেব তৃতীয নযনেব মতো সর্বদুযাবেব অদৃশ্য চাবিকাঠি এই ফারুক ভদ্রলোকেব হস্তগত। অতএব আমাকে তাব সামনে লেজ নাডতে হচ্ছে সমানে।

লালদিঘিব কাছাকাছি আসতেই শুনলাম কে যেন চেঁচিযে আমাকে ডাকছে। সেই বডিওযালা গির্জাব সামনেব ফুটপাথে দাঁডিযে মল্লিকদা হাত নাডছেন। মল্লিকদাকে দেখেই আমি তৃষ্ণার্ত হযে পডলাম। সুবাব পাত্রে মল্লিকদা আমাব গুরুদেব। পানেব পোগেও ভদ্রলোক যথাযথ। এক টেবিলে বসে একদিন বিল মেটাতে গেছিলাম চক্ষুলজ্জায। ফোঁস কবে উঠেছিলেন মল্লিকদা, 'বযেস কত? আমাকে যেদিন বযসে টপকাবে, সেদিন বিল পে কবতে

এসো। অডাসিটি! হতচ্ছাড়া, ঐ বয়গুলোকে টিপস দিতেই ফতুর হয়ে যাবে যে। মল্লিকদার অবস্থা কি রকম জানতাম না। তবে কখনো পকেট খালি দেখিনি। মল্লিকদা বিবাহিত, দুটি সন্তানের জননী তাঁর স্ত্রী। ষোলো পেগের ঝোঁকে একদিন বলে ফেলেছিলেন, 'তোমার বউদির বাচ্চা দুটো আমার নয়। ওঁর পূর্ব প্রেমিকের। প্র্যাকটিক্যালি ওকে বিয়ে করে এসব শুনে আর টাচ করবার ইচ্ছে জাগেনি।' আর তাই দার্জিলিং-এর নেপালি মেয়ে লীনার মায়ের কাছে কুশলবার্তা নিয়ে যান মল্লিকদা। ডরোথীর বুড়ো বাপকে লাঠি কিনে দিয়ে আসেন ডক্টর লেনে গিয়ে। গহন রাতে টেম্পল বা ঈশাকে বসে লক্ষ্য রাখেন দশ পেগ পেরিয়ে গিয়েও ডরোথী লীনারা খদ্দেরের চাপে হুইস্কি খাচ্ছে কিনা।

'কোথায় চললে?' মল্লিকদা নাক কোচকালেন, 'চলো! লীনার কাকা এসেছে দার্জিলিং থেকে। বেশ মজার লোক।'

'না মল্লিকদা একটু ব্যস্ত এখন। বিব্রত আমি।

অল রাইট। রাত সাড়ে নটার মধ্যে ঈশাকে এসো।' এক মুহূর্ত আর অপব্যয় করলেন না মল্লিকদা। ট্যাক্সির জন্য হাত তুলে ছুটলেন রাস্তার ওধারে।

সিংহদুয়ারে অনেক কথা খরচ করে অনুমতি যদিও মিললো ভিতরে যাবার, মধ্যদুয়ার একপ্রস্থ তদারকিতে কঠোর হলো। ক্রমশ যখন সেই আকাঙ্ক্ষিত দেবতাটির সামনে এসে দাঁড়ালাম ঠিক তখনই লাল আলো জ্বলে উঠলো। শুনলাম, এই মাত্র একজন বিখ্যাত মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। তাকিয়ে দেখলাম অপেক্ষা করবার ছোট্ট ঘরে তিনজন পুরুষ ও জন ছয়েক মহিলা কাগজ পড়ছেন। একটি অজস্র ছাপানো ভুল ও কালী চুপসানো খবরের কাগজ টেনে নিয়ে সোফায় বসতেই কানে সুড়সুড়ি দেবার মত আরামদায়ক কিছু সংলাপ ভেসে এলো আমি সাধারণত স্লিভলেস পাব না তবে যেখানে যেমন শুনেছি ইনি অত্যন্ত আপ টু ডেট। সঙ্গে সঙ্গে সোডার বোতল খোলার মত শব্দ হলো ইয় ম্যান অব সেভেনটি। আমাকে এখনও খুকি বলেন। ওর একটা লাইসেন্স আজ দেবেন বলেছেন। আফটার অল ত্রিশ বছরের সম্পর্ক নূহতে আমার মনে হল আমি দেবদর্শনে এসেছি এবং অপ্সরাবৃন্দের কাকলি শুনছি।

অনেক অপেক্ষার শেষে মুখোমুখি হলাম। দু পা টেবিলের নীচে চালান করে স্ফীত ভুঁড়ি দামী সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবিতে ঢেকে শ্রীফাকর বসে আছেন। ভদ্রলোকের গায়ের চামড়া অসম্ভব রকমের ফরসা। পেছনের দেওয়ালের সবাঙ্গ জুড়ে জাতির জনকের পাক-স্ট্রিটিয় ছবি আছে। নীল পর্দা দিয়ে ঘরের একটা দিক ঘেরা। ওখানে ইনি বিশ্রাম করেন একটা টাইপকরা চিঠি হাতে নিয়ে চশমার ফাঁকে তাকালেন তিনি 'চাকরিটা এখনও আছে?

গলায় আমার এত কফ ছিল জানতাম না। কোন মতে বললাম,'হ্যাঁ তবে ওয়ার্নিং দিয়েছে। আমাকে স্যার আপনি বাঁচান। আমি কোনদিন রাজনীতি করিনি। স্যার এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। আমার ঠাকুরদাকে তো আপনি চেনেন। মানে সেই লিয়াকত আলির আমলে, যখন উত্তর বাংলার সাঁওতাল শ্রমিকদের উনি মুসলমান বলে প্রচার করেছিলেন তখন আপনাকে আমার ঠাকুরদা ওই ব্যাপারের বিরুদ্ধে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমরা কেউ রাজনীতি করিনি স্যার।'

আমার কথায় কোন আঁচড় পড়লো না মেদগঠিত শ্রীফাকরের মুখে। বাঁ হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে অপারেটারকে বললেন হোম ডিপার্টমেন্টকে লাইনটা দিতে। আমার শিরদাঁড়ায় একটা আনন্দ ছটফট করছিল। এমন সময় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। নাকটা কুঁচকে শ্রীফাকর বললেন 'এর কেসটা নিয়ে একটা কিছু করার জন্য হোম ডিপার্টমেন্টে ফোন করছি। কি বলো?'

'কি কেস স্যার?'

'রাজনীতি করেছে বলে চাকরি যাচ্ছে। আমার ডিস্ট্রিক্টের ছেলে।'

'সে কি স্যার! আপনি ডিপার্টমেন্টে ফোন কেন করবেন? আপনার একটা স্ট্যাটাস আছে তো? আপনি বরং এর কাছ থেকে একটা দরখাস্ত নিয়ে হোম মিনিস্টারকে ফরোয়ার্ড করে দিতে পারেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটা রিসিভারটা তুলে আনলো এবং শ্রীফারুক অপারেটারকে জানিয়ে দিলেন হোম ডিপার্টমেন্টকে দরকার নেই। তারপর টেবিলে রাখা প্রতীক্ষিতদের ভিজিট কার্ডগুলো তুলে নিয়ে বাছতে বাছতে বললেন, 'তা হলে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে যেও। আমি ফরোয়ার্ড করে দেব। আচ্ছা—।' ভদ্রলোকের ঘাড় নাড়ার পর আমার দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে যুক্তি নেই। কিন্তু আমার হঠাৎ ইচ্ছে করলো ভদ্রলোককে প্রণাম করতে। ছেলেবেলায় প্রথম ঠাকুর বিসর্জন দেখে গুরুজনদের প্রণাম করার জন্যে যেমন একটা ইচ্ছের আবেগ বুকে ছটফট করতো ঠিক তেমনি। বিরাট চন্দ্রাকার টেবিলের তলায় পা দুটো খুঁজতে লাগলাম ব্যাকুল দৃষ্টিতে। শ্রীফারুক তাকাতেই বলে ফেললাম গাঢ় স্বরে, আপনাকে স্যার প্রণাম করব।

'ঠিক আছে যান।' পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক ভেটকি মাছের মতন মুখ করে আমার ইচ্ছেটাকে চুরমার করে দিলেন। পায়ে পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আঃ! কি হালকা লাগছে নিজেকে বিরাট ঐতিহাসিক বারান্দা চওড়া কাঠের সিঁড়ি, প্রেস রিপোর্টার, পুলিশ ইত্যাদিকে আদৌ লক্ষ না করে আমি জুতোর টো-তে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকটা শিস দিয়ে নিলাম। আপাতত পৃথিবীতে কোন সমস্যা নেই।

বাইরে প্রচুর আলো। দুপুর গড়িয়ে চলছে, ডালহৌসির ছুটি হতে বেশী দেরি নেই। গর্ভবতী মেয়ের নরম প্রহরের অস্বস্তিভাব চারদিকে। এবার আমার সময় কঠিনে বাঁধা। ট্রামে ঝুলে সোজা চলে এলাম কলেজ স্ট্রীট বাজারের সেই বই এর দোকানে। সুবোধদা এবং পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ কয়েকজন নানা বয়সী মানুষ রোজ দোকানটার পিছনদিকে জমা হই। দু ঘণ্টা ধরে টানা সাহিত্য চলে। আমি কনিষ্ঠতম। কথা বলার অধিকার তাই কম। সুবোধদাই বলেন। বিখ্যাত এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত উনি, বাকী সবাই এপাশে ওপাশে লেখেন।

আমাকে দেখেই সুবোধদা চোখ বন্ধ করে কিছু ভেবে নিয়েই আকর্ণ হেসে মাথা দোলালেন তোমার গল্পটা পড়লাম। সেন্টেন্স কন্সট্রাকশনে নজর দাও। কথা বলা আর লেখা এক জিনিস নয়।'

এসব কথায় আমি খুব বিব্রত বোধ করি। এবং সব চেয়ে বাচোয়া যে, কোন বিষয়ের আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এখানে সুবোধদাই সমালোচক, আমরা তাঁর কথায় ডিটো দিই। আসলে আমাদের মধ্যে একটা রেষারেষি আছে সুবোধদার করুণা পাবার। সেই বিখ্যাত কাগজে লেখা ছাপাবার রাস্তাটা আয়াসসাধ্য। সুবোধদার করুণা প্রাপ্তির লোভ আমাদের আছে।

সন্ধে ঘন হবার পর বেরিয়ে পড়লাম। এত মানুষের চলাফেরা, এই ভিড় দেখে আমার ক্রমশ বিরক্তি বাড়ছিল। এখন আমি এক জায়গায় ফোন করতে পারি। আমার সমস্ত পাপ ও পাপহীনতার একমাত্র শরিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি।

'আমি বলছি।'

'কলেজ স্ট্রীট থেকে করছো?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'ডান হাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'

'হ্যা।'

'ক'টা সিগারেট খেয়েছ?'

'জানি না।'

'তুমি আমার কথা একটু শোন না। কিছু বলছো না যে'

'কি বলবো?'

'বেশী সিগারেট খাবে না, বেশী ঘুরবে না, কেমন?'

'আচ্ছা।'

'কাল ফোন করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

পরশু?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে তোমাকে—'

'রাখছি।'

'কাল করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

একটা ফোঁপানোর শব্দ কানে আসতে না আসতেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ঠিক এই ক'টি মুহূর্তে সারাদিনের এই সময়টুকু আমি সৎ, আমার বুকের ভেতর কোন ছলনা নেই, ফরমুলা নেই। আসলে মুখোশের তলায় দগদগে ঘা ভরা মুখে ওষুধ লাগাবার সময় এটা। প্রতিদিনের ফোনের সময় আমার শান্তির সময়। একটা বাইশ বছরের যৌবন ওদিকে সর্বাঙ্গ শুকিয়ে বিছানায় লেপ্টে আছে থাকবে সারা জীবন, শুধু দুটো হাত আর মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ নিথর। ক্রমশ হয়তো ফুরিয়ে যাবে সেটুকু আর কোন হাত প্রতিদিন হয়তো অপেক্ষা করবে না রিসিভারটা তুলে নিতে এবং আমি গির্জায় স্বীকারোক্তির পরের তৃপ্তির স্বাদ আর পাবো না। আমার ভালবাসা, আমার কান্না, আমার শান্তি—এই সময়টুকুতে—কয়েকটি সংলাপের উদ্যানে।

দরজা ঠেলতেই মনে হলো আমি নরকে এলাম। বিরাট হলঘরে অগুন্তি টেবিল ঘিরে অসংখ্য নারী-পুরুষ, মদের গ্লাস, সিগারেটের ধোঁয়া। আর চিৎকারের মধ্যে পথ করে সেই ব্যালকনিতে উঠেই মল্লিকদাকে দেখতে পেলাম। সর্বাঙ্গ চেয়ারে এলিয়ে বসে রয়েছেন। টেবিলে গ্লাসের তলায় চাপা দেওয়া বিলের সংখ্যায় বুঝতে পারলাম বেশ কয়েক পেগ হয়ে গেছে। জায়গাটা বেশ নির্জন। যদিও নীচের মেয়েদের অশ্লীল হাসি আর তাদের শরীর জড়িয়ে ধরে মাতাল পুরুষদের চীৎকার এখানে আসে, সেসব দৃশ্যও স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে কিন্তু ওপরে ওদের ভিড় কম।

'এতো দেরি হলো যে' মল্লিকদার গলার স্বর বেশ জড়ানো। উত্তরে শুধু হাসলাম, 'লক্ষ্য রাখো তো, ঐ নীচের কোনার থামটার পাশে নিগ্রোটার সঙ্গে বসেছে ডরোথী। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি খাচ্ছে ও? রাম না হুইস্কী?'

এখান থেকে সাদা চোখেই বোঝা মুশকিল। তবু গ্লাসের আয়তনে বোঝা গেল বিয়ার। শুনেই মল্লিকদা লাল ছোপ ধরা দাতে হাসলেন 'গুড। জানো, ডরোথী খুব ভালো মেয়ে। ওর বাবা বললেন, ও নাকি স্কুলে ফার্স্ট হতো। কি খাবে?'

'আজ থাক।'

'না, কিছু বলি। কেন খাবে না?'

'এমনি।'

মল্লিকদা একবার একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করে হাসলেন। 'গুড। জানো, তোমার

বউদিকে আজ দেখে বুঝলাম দ্যাট ম্যান ইজ গোযিং স্ট্রং।'

'মানে?'

'শী ইজ এক্সপেক্টিং হাব থার্ড ইস্যু।'

বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পাবলাম না। মল্লিকদা গ্লাসটা শেষ কবে উঠে দাঁড়ালেন, 'লেটস গো। ব—য।'

মল্লিকদাব পিছনে পিছনে নীচে নামছিলাম। সিঁড়িব মুখটায প্রচণ্ড হইচই হচ্ছে। একটি ছাইমাখা মাগুব মাছেব মতো মেযে দুই বুকেব মধ্যে একটি টইটুম্বুব পেগ গ্লাস নিযে মাথাটা পেছনে অনেকটা বেকিযে দ্রুত তালে নাচছে। ওব সামনে একটি অ্যাংলো টেকো, প্রচণ্ড মোটা বুড়ো ছুঁচোব মত মুখ কবে গ্লাস থেকে চুমুক দেবাব চেষ্টা কবছে সমস্ত শবীব দুলিযে। কযেকটা অ্যাংলো ছোকবা বক্ত গবম কবা সুব বাজাচ্ছে উৎসাহ দিতে। ভিড়েব মধ্যে একটু দাঁড়াতেই দেখলাম টেকো ঠোঁট দিযে গ্লাসটা তুলে নিযেছে এবং মেযেটিকে একটা লম্বা গ্লাস ভর্তি বিযাব এক ছুটে এনে দিলো। সবাই চিৎকাব কবল আনন্দে। মেযেটি বিযাব দেখে কান-ফাটানো খিস্তি কবল বুড়োটাব উদ্দেশে। আমবা পাশ কাটিযে বেবিযে আসছিলাম। হঠাৎই মেযেটি খিস্তি থামিযে গ্লাস ভর্তি বিযাব ছুড়ে দিল আমাব শবীবে। এবং দোলেব দিনেব শিশু সুলভ চাপল্যে হাততালি দিতে লাগল দাঁত বেব কবে। আচমকা সমস্ত শবীব বিযাবে ভিজে যেতে আমি চিৎকাব কবে উঠলাম। সমবেত জনতাব উল্লাসেব মধ্যে মল্লিকদা আমায বাইবে টেনে এনে ফিসফিসিযে বললেন, 'ডোন্ট ওবি। এখানে এসে না খেযে বেবোনোটা অত্যন্ত অভদ্রতা। ভগবান তাই তোমাব শবীবে কিছু চালান কবিযে দিলেন। থ্যাঙ্কস।'

পাড়াব কাছাকাছি আসতেই ওদেব সঙ্গে দেখা হলো। আড্ডা শেষ কবে ফিবছে। আমি কাছে যেতেই সুহৃদ চেঁচিযে উঠল 'ক' পেগ টেনেছ গুরু! দেশী, না জাহাজী?' জযন্ত আমাব মুখ বুক শুঁকে চাপা আফসোসে যেন ফেটে পড়ল, সুখে আছিস বে! বেগুলাব মাল টানছিস!' আব আমি 'শালা তিন হপ্তা—।' এবং আমি হঠাৎ এইসব কথা শুনতে শুনতে মাতালেব মত কথা বলতে শুরু কবলাম। ওদেব সিদ্ধান্ত সঠিক বাখতে এই গভীব বাত্রে কযেকটি যুবকেব বুকে ঈর্ষা ঢুকিযে ইচ্ছে কবে বেতালে হাঁটতে শুরু কবলাম। আহা, কি আনন্দ!

সমস্ত বাড়ি অন্ধকাব। এখন গভীব বাত। চোবেব মত পা টিপে টিপে, একটুও শব্দ না কবে তালা খুললাম। ঘবে ঢুকে আলো জ্বালতে ইচ্ছে হলো না। আমি এখন এসেছি এটা এ বাড়িব কাউকে জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না আমাব। এই বাত্রে যখন এ বাড়িব সবাই গভীব ঘুমে অচেতন, যখন অন্ধকাব-চোযানো বাতাসে বেশ একটা ঠাণ্ডা আমেজ আসছে তখন আমাব জামা থেকে উপচে-পড়া বিযাবেব গন্ধে মাথা ভাব-ভাব কবতে লাগলো। জামা খুলতে গিযে মনে হলো কিছু একটা পড়ে গেল পকেট থেকে। অথচ আলো জ্বালাব ইচ্ছে হচ্ছিলো না কিছুতেই। এই অন্ধকাব মেঝেয পাতা বিছানায শবীব এলিযে এবাব ঘুম। সাবা বাতেব জন্য ঘুম।

কিন্তু বিছানায শুযেও অস্বস্তি ভাবটা কাটলো না। আমাব পাশ থেকে বিযাবেব গন্ধ আসছে। অথচ জামাটা আমি এই কোণায ছুঁড়ে ফেলেছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবে আমি আলো জ্বালালাম। পোস্টকার্ডটা কুড়িযে নিতেই আমাব সমস্ত শবীব যেন কুঁকড়ে ছোট হযে আসতে লাগলো। গতকাল থেকেই বুকপকেটে পোস্টকার্ডটা ছিল। এখন আমাব হাতে ধবা পোস্টকার্ড থেকে ভুবভুব কবে বিযাবেব গন্ধ আসছে। সম্পূর্ণ ভেজা চিঠিটাব লেখাগুলো ঝাপসা হযে গেছে—পড়া যাচ্ছে না কোন শব্দ। অথচ কোন অলৌকিকতায শেষ শব্দগুলো বেঁচে থেকে আমাব সকল ইচ্ছাকে একটা ভাঁড়েব পোশাক পবিযে দিল জানি না, কিন্তু দু'চোখ বন্ধ কবলে এই বুক কী ভবাট মনে হয, শব্দগুলো বাজে : 'ভালো থেকো। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমাব মা।'

আঁচড়

এই রকম মেঘচটকানো দিন একছর আর আসে নি। যদিও শ্রাবণের মধ্যকাল কিন্তু সূর্য তো দূরের কথা দিনদুপুরেই বুকচাপা বাতাসের মতো একটা অন্ধকার ঝুলছে, ঝুলে রয়েছে। অথচ আজ একটা জরুরী সভা ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এমন ভেবেছিল লোকাল কমিটির সদস্যরা। কিন্তু ঠিক বিকেলের পর গাঢ় জল ঝরা শুরু হলো। সন্ধে নাগাদ তো চারধার থৈ থৈ। নব্যেন্দু ছাতা মাথায় পার্টির অফিসে গিয়ে যখন পৌঁছাল তখন তার প্যান্ট ভিজেছে, পিঠেও জলের ছোঁয়া। যাওয়া মাত্রই কিশোর বলল, 'আসুন নব্যেন্দুদা', আজ মিটিং হবে না।

ঘরে তখন জনা পাঁচেক বসে। তাদের মধ্যে ললিতা নেই। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল 'কেউ আসতে পারে নি বুঝি?'

'আসবে কি করে? এই বৃষ্টিতে পাগল আর আমরা ছাড়া কেউ পথে বের হয় না। আমি সেক্রেটারির বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনিও বললেন মিটিং পিছিয়ে দিতে।' কিশোর বলল।

'আজ কেমন আছেন উনি?'

'একই রকম। তবে ঘরেই থাকতে হবে সারাজীবন।' কথাটা বলে কিশোর গলা নামাল 'ওঁর ইচ্ছে আপনিই সেক্রেটারী হন। বউদিকে উনি সমর্থন করছেন না বললেন, এই শিল্পাঞ্চলে কোনো মহিলার পক্ষে দায়িত্বটা বেশী হয়ে যাবে। আর যাদবদাকে উনি পাত্তাই দিচ্ছেন না। কিন্তু বউদিকে সমর্থন করার মানুষ কম নেই।'

ঘণ্টাখানেক পার্টি অফিসে কাটাল নব্যেন্দু। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ। আলো কমছে যে কোনো মুহূর্তেই লোডশেডিং হয়ে যেতে পারে। এলাকার কয়েকটা দাবী নিয়ে জনসাধারণের কাছে যেতে হবে। তার একটা লিফলেটের খসড়া করা দরকার। চিরকাল এই দায়িত্ব নব্যেন্দুর ওপর। সেই মকসো করতে গিয়ে সে মন পাল্টালো। বাড়িতে বসে করবে, তার নজর বারংবার দরজায় যাচ্ছিল। ললিতা এখনও এলো না অথচ একবার পার্টি অফিসে না আসার পাত্রী নয় ও। ওর স্কুলের সামনে সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যায়। ললিতা তার স্ত্রী। বাইশ বছর তাদের বিবাহিত জীবন নির্বিঘ্নে কেটেছে। বাইশ বছর ধরে তারা একই রাজনীতি করছে। পার্টি যখন দুভাগ হলো তখনও একসঙ্গে, পার্টি থেকে যখন অনেকে বেরিয়ে গেল তখনও পার্টির সঙ্গে, একসঙ্গে আন্দোলন করেছে, পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েছে। নব্যেন্দু অবশ্য পার্টিতে এসেছিল আরও আগে। তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছে, স্বাধীনতার পরেই পার্টি ব্যান্ড হয়ে গেল। আন্ডারগ্রাউন্ডে লুকিয়ে লুকিয়ে মার্কসসাহেবের কাছে শিক্ষিত হয়েছিল। তার রক্তে আমরণ একই আনুগত্য, ললিতা পরে যার সঙ্গী হয়েছে। একই আঞ্চলিক কমিটিতে কাজ করতে করতে দিন কেটেছে ওদের। পদের মোহ বা নির্বাচনে আসক্তি কোনোকালেই ছিল না নব্যেন্দুর। আজ কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই তার বন্ধু কিংবা শিষ্য। নব্যেন্দু থাকতে চেয়েছে একই জায়গায়। কিন্তু এই লোকাল কমিটি আজ বিপন্ন। সেক্রেটারি কখনও সুস্থ হবেন না। অনেকেই তাকে ধরল হাল হাতে নিতে। এমন কি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও অনুরোধ এল তার পিছিয়ে না থাকার জন্যে। নব্যেন্দু রাজী হলো। এবং বিস্ময় তারপরেই যাদবের কথা সে ধরছে না, ওর পদের ওপর মোহ চিরদিনই, ললিতাকেও রাজী হতে দেখল একই পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এখন মূলত স্বামী স্ত্রীর লড়াই, যাদব ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

নব্যেন্দু এবং ললিতার সাংসারিক জীবন সুখের। অবশ্য সুখের সংজ্ঞা নিয়ে নানান মতভেদ

থাকতে পারে। ওদের তো সন্তান হয় নি। এবং তা নিয়ে আপাত কোনো আক্ষেপ নেই কারো। ললিতার এবং নবেন্দুর মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই কোনো আড়াল নেই। তাদের তিন কামরার বাড়িতে পার্টির ছেলেমেয়েদের অবাধ যাতায়াত। মাঝে মাঝে মনে হয় পার্টির অফিসটাই যেন সেখানে উঠে গেছে। আর এত বাইরের কাজ সামলেও ললিতা সংসারের খুটিনাটি ঠিক নজরে রেখে স্কুলে যায়। ললিতার হাতের রান্না না খেলে তৃপ্তি হয় না নবেন্দুর।

যেদিন প্রথম খবরটা শুনল সেদিন বাড়িতে ফিরে ললিতাই তাকে বলেছিল, 'ওরা সবাই আমাকে চাইছে তোমাকেও কেউ কেউ কি করা যায় বুঝতে পারছি না।'

'তুমি তো শুনলাম সম্মতি দিয়েছ। বেশ তো নির্বাচন হোক। এতে পার্টির গণতান্ত্রিক চেহারাটা উজ্জ্বল হবে। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।'

বুকের কাছে চলে এসেছিল ললিতা 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ না তো?'

'মোটেই না তবে তুমি যদি চাও আমি সরে দাঁড়াতে পারি।'

'খবরদার না। তাহলে যাদববাবু বলে বেড়াবে বউএর মুখ চেয়ে তুমি কেটে পড়লে। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিন্তু সেটা বাইরে, ঘরে আমাদের সম্পর্কে যেন চিড় না ধরে।'

ললিতার চুলে হাত বুলিয়ে নবেন্দু বলেছিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর। ভোট চাওয়ার জন্যে আমরা এ ওকে আক্রমণ করব না, নিন্দা করব না।'

'বেশ তাই হোক। কোনোরকম ক্যাম্পেন ছাড়াই আমরা কনটেস্ট করব।'

বৃষ্টি কমার কোনো লক্ষণ নেই। কিশোরকে ঝাঁপ বন্ধ করতে বলে ছাতি মাথায় রাস্তায় নামল নবেন্দু। এলোপাথাড়ি ঝাপটা দিচ্ছে হাওয়া। জলের ফোঁটাগুলো বেশ ভারী। কয়েক পা হাটতে সম্পূর্ণ ভিজে গেল সে। এখন রাত আটটা। ললিতাদের স্কুল মাইল দেড়েক দূরে। সে কি এখনও স্কুলেই আটকে আছে? সেখানে যাওয়ার আগে নিজের বাড়িটা দেখে যাওয়া উচিত মনে হলো। কিছুদূর হাটতেই ওর মনে হলো একা এই দুর্যোগে বেরুনো উচিত হয় নি। রাজনীতি এখন এমন ক্লেদাক্ত যে কেউ নিশ্চিন্ত নয়। আশেপাশের জেলায় চোরাগোপ্তা খুন হচ্ছে। পার্টির উঁচু দিকের মানুষের ওপর এই আক্রমণ। তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতার কাছে হার মেনে স্বার্থলোভী শক্তিগুলো এইসব আঘাত হানছে। যদিও এই জেলায় এখন এমন খবর পাওয়া যায় নি তবু কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নবেন্দুর এই বৃষ্টিতেও হাসি পেল মানুষ এখন মানুষের কাছেই বিপন্ন। নিঃস্ব শ্রমিকের বড় শত্রু হয়ে দাড়িয়েছে আর এক নিঃস্ব শ্রমিক।

মাঝরাস্তায় আলো নিভল। ঝুপ করে গভীর কালো জাল কেউ ছুঁড়ে দিল শহরটার ওপর বৃষ্টি হলেই কেন যে লোডশেডিং হবে এই শহরে তার কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা নেই। রাস্তার আলো নিভে যাওয়ায় হাটতে অসুবিধে হচ্ছিল। এইসব সময়ে নবেন্দু অনুভব করে তার বয়স হচ্ছে আগের মতো সেই টগবগে ভাবটা আর নেই। এই যেমন, তুমুল বৃষ্টিতে ছাতা যখন কোনো কাজ করছে না তখন সেটাকে মাথার ওপর তুলে ধরা যে বাহুল্য তা মনে হলেও অভ্যাসে মেনে রাখা এমন আর কি।

বাড়ির সামনে দাড়িয়ে স্বস্তি ফিরল। ভেতরে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। তার মানে ললিতা ফিরেছে। দরজা খুলেই ললিতা চেঁচাল, 'এমা কি করেছ তুমি? এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এলে। একেই সাইনাসের ধাত তার ওপর—। তুমি একটা অসুখ না বাধিয়ে ছাড়বে না। দেখছ দিনটা এই রকম, কি দরকার ছিল বের হবার।'

'আজকে মিটিংটার কথা ছিল যে।' ছাতা বন্ধ করেও আবার মেলে দিল একপাশে নবেন্দু জল ঝরার জন্যে।

বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে খাটে বসতেই এক কাপ আদা দেওয়া চা ধরিয়ে দিল ললিতা। কৃতজ্ঞ নবেন্দু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। সন্তান হয় নি বলে শরীর ভাঙেনি কিন্তু মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, চুলে রঙ ধরেছে। কিন্তু তা সত্বেও নবেন্দুর মনে হলো ললিতা এখনও লাবণ্যময়ী। সে অন্য গলায় বলল, 'তোমারই নির্বাচিত হওয়া উচিত।'

'স্ত্রী হিসেবে আমিও এই রকম বলব। আজ যে মিটিং হবে না তুমি জানতে না?'

'না। তুমি জানতে?'

'হুঁ। স্কুলেই খবর পেয়েছি!'

একটা চিনচিনে ব্যথা উঠেই মিলিয়ে গেল। ললিতার সঙ্গে ওদের বেশী যোগ। সে নিঃশ্বাস ফেলে কাগজপত্র নিয়ে বসল চা শেষ করে। ললিতা বসল স্কুলের খাতা নিয়ে। বলল, 'খাওয়ার ইচ্ছে হলে বলো। বেশী রাত না করাই ভালো। যা ভিজেছ তাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াই ভালো।'

লিফলেটের খসড়া সবে শেষ হয়েছে এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল। প্রথমটা হুঁশ করে নি নবেন্দু, ললিতা চেয়ার ছেড়ে উঠতেই সে মুখ তুলল, 'এই বৃষ্টিতে কে এলো আবার?'

'দেখছি।'

ললিতা যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই সে বলল, 'তুমি বসো, আমি যাচ্ছি। অরুণ হতে পারে। ও বলেছিল একবার আসতে পারে।' ললিতা এগিয়ে গেল বাইরের ঘরের দিকে। অরুণ ললিতার বশংবদ ভাই। নবেন্দুর সন্দেহ অরুণের পরামর্শেই ললিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সে ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত পৌনে এগারটা। এখন আসা মানে কিছুক্ষণ ওর বকবকানি শুনতে হবে। ও-ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলল, শব্দ হলো।

'কাকে চাই?' ললিতার গলায় প্রশ্ন বাজল।

'নবেন্দু আছে?'

'আপনার নাম?'

'নাম বললে কি চিনতে পারবেন! আমি ওর বন্ধুর আত্মীয়। একটু ডেকে দিন।'

সংলাপগুলো কানে এসেছিল। গলার স্বরের মালিককে চিনতে পারল না নবেন্দু। এই সময় ললিতা একটু বিরক্ত-মুখে ঘরে ঢুকে বলল, 'একটা বুড়ো তোমায় খুঁজছে, নাম বলল না।'

'উটকো জ্বালাতন এত রাত্রে। বিদায় করে দিতে পারলে না?'

'বুড়োমানুষ, মনে হলো সুস্থ নন। তারপর তোমার বন্ধুর আত্মীয়।' ললিতা আবার ছাত্রীদের খাতা নিয়ে বসল।

বাইরের ঘরের দরজা আধাভেজানো। বৃষ্টির শব্দ আসছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার; ওঘরে দুটো আলোর সামনে বসে দুজন কাজ করছিল! এঘরে মোমবাতি জ্বলছে। তার কাঁপা আলোয় কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধকে দেখতে পেল সে। সম্পূর্ণ ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছেন। কাঁধে একটা ব্যাগ রয়েছে পলিথিনের। হাতে একটা ছেঁড়া ছাতা। বুক অবধি সাদা দাড়ি আর মাথার চুল উঠে গেছে অর্ধেকটা। দুই চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

'কি চাই?'

'নবেন্দু—!' গলার স্বর কাঁপল।

'আমি, আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। কার আত্মীয় আপনি?'

'নবেন্দু আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ভাই?'

তৎক্ষণাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপন লাগল। হঠাৎ দারুণ শীত করতে লাগল নবেন্দুর। ওই ভাই শব্দটার উচ্চারণ তাকে একটানে নিয়ে গেল আটচল্লিশ সালে, তারপর নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে টেনে সাতষট্টিতে যখন এঁরা বেরিয়ে গেলেন দল ছেড়ে। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে এঁর। এইরকম

বিধ্বস্ত অবস্থায় কোনোদিন কল্পনা কবে নি ওঁকে। সেই 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' দিনগুলোতেও এমনভাবে ভেঙে পড়তে দ্যাখে নি সে। কিন্তু এই মানুষটিব অস্তিত্ব অস্বীকাব কবা হয়েছে। কোনো বকম সাহচর্য বেআইনী, সাহায্য নিষিদ্ধ। পার্টি একবাব তাকে নির্দিষ্ট কাবণে বহিষ্কাব কবেছে, তাব কি প্রয়োজন এখানে, এত বাত্রে?

'আমায় সত্যি চিনতে পাবছ না?'

মাথা নাড়ল নবেন্দু, হ্যাঁ। তাবপব জিজ্ঞাসা কবল, 'কি ব্যাপাব?'

'আমি তিনদিন অভুক্ত। অন্ধ্র থেকে একজন আমাব সঙ্গে দেখা কবতে আসবে। দিনটা গুলিয়ে ফেলায় আজই এসে গেছি এই শহবে। অর্থ নেই যে হোটেলে উঠব। আব এই বৃষ্টিতে পথেও কাটানো অসম্ভব। তোমাব কথা মনে পড়ল। তুমি আমাকে একটা বাত থাকতে দেবে ভাই?' একটা হাত থবথব কবে কাঁপছিল। সেটা সামান্য এগোল।

বুকেব মধ্যে এখন লোহাব বল নড়ছে। একি বলছে জগদীশদা। দল বিবোধী কাজ এবং উগ্রমানসিকতাব জন্যে বিতাড়িত মানুষকে সে আশ্রয় দেবে দলেব সক্রিয় সদস্য হয়ে। অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে নানান অভিযোগেব ছুবিব সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। এটা অপবাধ। অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়তেই জগদীশ বললেন, 'দেবে না? নবেন্দু আমি তোমাব কাছে ভীষণ আশা নিয়ে এসেছিলাম। এই বৃষ্টিতে বাইবে থাকলে আমি বাঁচব না। কত বাত ভালো কবে ঘুমুইনি। উপোসেব সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজলে এই বয়সেব শবীবটা মানাতে পাবে না। এই পুবনো শহবে ফিবে এসে তোমাব কথা মনে পড়ল। কত বছব আমবা একসঙ্গে আন্দোলন কবেছি। সেই আটচল্লিশে পুলিশেব—।' নিঃশ্বাস নিলেন জগদীশ। একটানা কথা বলায় বোগহয় হাঁপ ধবেছিল।

নবেন্দু একবাব ভেতবেব ঘবেব দবজা দেখল। ললিতা কি এসব শুনতে পাচ্ছে? না, এখন চাপা গলায় কথা বলছেন জগদীশদা। ওঘবে হ্যাবিকেনেব আলোয় ছায়া পড়ে নি। সে স্পষ্ট বলল, 'কিন্তু আপনি আমাদেব পার্টিব শত্রু।'

'পার্টিব হতে পাবি, তোমাবও কি আমবা দুজনেই কম্যুনিস্ট।'

'আগে দল আগে তাবপব আমি।

'আব মানুষ। আমাদেব মানবিক সম্পর্ক। নবেন্দু, আমিই তোমাকে হাত ধবে মার্ক্সিজম শিখিয়েছিলাম। মনে পড়ে? আজকেব বাতটা থাকতে দাও আমাকে। এই বৃষ্টিব বাত্রে কেউ একথা জানতে পাববে না। কোনো মানুষ পথে নেই। কথা দিচ্ছি ভোব হবাব আগে আমি চলে যাব। আমি আব পাবছি না, একটু ঘুমুতে দাও।'

নবেন্দু মাথা নাড়ল। দীর্ঘকালেব সংস্পর্শে, অনেক কৃতজ্ঞতা তাকে সপ্তবথীব মতো ঘিবে ধবেছিল। একটা বাত তো। কেউ জানবে না। ললিতা পর্যন্ত জগদীশদাকে চিনতে পাবে নি। কাকপক্ষী জাগাব আগে যদি মানুষটা ঘুমিয়ে নিয়ে চলে যান তাহলে—। সে মাথা নাড়ল আবাব, 'ঠিক আছে, এই সোফায় শুয়ে পড়ুন। ভোবেব আগেই চলে যাবেন। ওপাশে একটা বাথরুম আছে।'

'তুমি আমাকে বাঁচালে নবেন্দু।' যেন প্রাণ ফিবে পেলেন বৃদ্ধ।

'ললিতাকে আমি বলব আপনি আমাব সহপাঠী নবীনেব বড়দাদা।'

ভাবী পায়ে পথে ফিবে আসতেই ললিতা প্রশ্ন কবলো, 'কে গো?'

উত্তবটা মুখেই ছিল, জানিয়ে দিল নবেন্দু, 'বাত্রে থাকতে চাইলেন, থাকবেন।'

'কোনোদিন নাম শুনিনি তো ওব। অবস্থা খুব খাবাপ বলে মনে হলো।'

'হুঁ।' খসড়াটাব ওপব নজব বাখলেও মন বসছিল না নবেন্দুব।

'খেয়ে নাও। বাত হয়েছে। ও হ্যাঁ, উনি খেয়ে এসেছেন?'

'কে?'

'তোমার বন্ধুর দাদা।'

'কি জানি। তুমি আমারটা দাও।'

'সেকি। বাড়িতে থাকবেন যখন জিজ্ঞাসা কর খাবেন কিনা।'

'থাকতে দিয়েছি তাই যথেষ্ট, আবার খাবার কি।'

'তাই কি হয়। ওঁর জামাকাপড় তো সব ভেজা। তোমার একটা লুঙ্গি দাও ওঁকে। অতিথি বাড়িতে থাকলে তাকে যত্ন করা উচিত।' ললিতা উঠে একটা পরিষ্কার লুঙ্গি আর তোয়ালে এনে দিল নবেন্দুকে।

নবেন্দু তবু বলল, 'খামোখা নিজেদের খাবারের ভাগ—।'

'চুপ করো তো। মাঝে মাঝে এমন উল্টো কথা বল তুমি আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

শুকনো পরিধানবস্ত্র এবং পেটভরা খাবার খেয়ে জগদীশ তৃপ্ত। একসঙ্গে খাওয়া হলো কিন্তু কোনো কথা হলো না তেমন। নবেন্দু লক্ষ্য করলো জগদীশের শারীরিক পরিবর্তন এত বেশী যে তাকে চট করে চিনে ফেলা অসম্ভব। ললিতার পক্ষে তো নয়ই। তাছাড়া ওর হাতে গলায় একধরনের চর্মরোগ এবং মুখের খোলা জায়গায় চামড়া কুঁচকে থাকায় পরিচিতি লোপ পেয়েছে।

পাশের ঘরে জগদীশের নাক ডাকছিল। সোফায় পড়ামাত্র ঘুমে কাদা হয়ে গিয়েছেন মানুষটা। বোঝাই যায় দীর্ঘকাল উদ্বেগ এবং অনিদ্রার পর আজ এই মুহূর্তে শান্তি পেয়েছেন। নিজের বিছানায় শুয়ে নবেন্দু ওঁর কথা ভাবছিল। আটচল্লিশ থেকে বাষট্টি একসঙ্গে কাজ করে যাওয়া, বাষট্টির পর দল বিভক্ত হলেও একই সঙ্গে থাকা এবং তারপর সাতষট্টিতে হঠাৎ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষটির আজ আশ্রয় নেই, খাবার নেই সামান্য স্বস্তির জায়গা নেই। কি লাভ হলো ওঁর দল ছেড়ে? অথচ কর্মী এবং সংগঠক হিসেবে জগদীশদার তুলনা ছিল না।

নবেন্দু সারা রাত ঘুমুতে পারল না। তার ভয় হচ্ছিল যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে যদি রোদ ঢোকার পরও জগদীশদা ঘুমিয়ে থাকেন এবং ভোরবেলায় অরুণ এসে পড়ে তাহলে বিপদ তারই হবে।

বিছানার একপাশে ললিতা ঘুমিয়ে আছে। অদ্ভুত স্নেহশীলা মহিলা। নইলে অপরিচিত মানুষকে যেচে খাবার দেয়। নবেন্দুর মনে হলো ললিতাদের মতো মেয়েদেরই পার্টির প্রথম সারিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলেই দেশের সাধারণ মানুষ ওদের ভালবাসা পাবে। কিন্তু এই নির্বাচন না লড়ে যে উপায় নেই। এটা এখন আত্মসম্মানের পর্যায়ে চলে গেছে

তখন চারটে বাজে কি না বাজে। নবেন্দু বিছানা থেকে নামল। আর একটু বাদেই ভোর হয়ে যাবে। জগদীশদার এখনই চলে যাওয়া উচিত। বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। সে ললিতার দিকে তাকাল। ঘুমে অচেতন হয়ে আছে মেয়েটা।

নিঃশব্দে বাইরের ঘরে চলে এলো নবেন্দু। জগদীশের মুখ হাঁ, চোখ বন্ধ। শরীর এলানো। হ্যারিকেনটার আলো সামান্য বাড়িয়ে সে ওঁকে ডাকতেই তড়বড় করে উঠে বসলেন তিনি। খুব ভীত এবং সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওঃ তুমি।'

'ভোর হয়ে আসছে।'

'তাই বুঝি।' এখনও শরীরে ঘুম এবং ক্লান্তি। কিন্তু জগদীশ উঠে দাঁড়ালো, 'বড় জোর ঘুম এসেছিল গো। বৃষ্টি থেমেছে?'

'হ্যাঁ।' নবেন্দু একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা জগদীশদা, এইসব করে আপনারা কি পেলেন? কি লাভ হলো?'

'কি সব?' জগদীশ তৈরি হচ্ছিলেন।

'এই হঠকারিতা। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের শান্তি নষ্ট করা?'

হাসলেন জগদীশ। তারপর বললেন, 'এবার চলি ভাই। তোমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিও। জানি না আবার দেখা হবে কিনা কিন্তু তুমি আমার আশীর্বাদ নিও।'

দরজাটা নিঃশব্দে খুলে বাইরে তাকালেন জগদীশ। তখনও অন্ধকার পথ জুড়ে। সকালের দেরি করিয়ে দিচ্ছে মেঘলা আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে জোর। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জগদীশ বললেন, 'কি লাভ হলো জিজ্ঞাসা করছিলে তুমি। লাভ নিশ্চয়ই হয়েছে। পঁচাত্তর কোটি মানুষের বুকে একটা খোঁচা লাগল তো।' সাতষট্টি থেকে একাত্তর আমরা যা করেছিলাম তার বাস্তব কোনো মূল্য নেই। কিন্তু তোমরা যারা মার্ক্সবাদে বিশ্বাস কর তাদের বিবেকে যদি সামান্য আঁচড় লাগে তাহলেই তো বড় লাভ, বড় পাওয়া। তাই না?'

আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে গেল জগদীশ। শরীরটা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। দরজা বন্ধ করে সোফায় এসে বসল নব্যেন্দু। চুপচাপ। একটা অস্বস্তি এলো, আশংকার বোঝা মাথার ওপর থেকে নেমে গিয়ে হঠাৎ আর একটা কিছু জন্ম নিল, জন্মস্থান হৃদয়।

রোদ উঠল ঝলসিয়ে। কিন্তু তার রঙে হলদের ঝোঁকটা বেশী। কেমন ফ্যাকাশে, নীরক্ত।

কিছুটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল নব্যেন্দুকে। কেন মানুষটা কাকভোরে বেরিয়ে গেল এক কাপ চা-ও না খেয়ে? নব্যেন্দুর ভদ্রতায় আটকানো উচিত ছিল। ললিতার মুখের দিকে না তাকিয়ে নব্যেন্দু বলেছিল নিজেকে, ছিল। সবই ছিল। কিন্তু রাখতে পারিনি। সেই সঙ্গে সে ভীষণ হালকা হয়েছিল। এক রাত্রের যাতায়াতে কোন কথা উঠবে না কোথাও। কিন্তু সারাদিন একটু একা হলেই জগদীশের শেষ কথাটা বুকে ঝাপটা মারছে। কি বলতে চেয়েছেন জগদীশদা। দীর্ঘকাল একসঙ্গে পুলিশের কাছে মার খেয়ে খেয়ে যখন পুলিশের ওপর হুকুম করার সুযোগ এল তখন জগদীশদারা আবার ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। এখন তারা যা করছে সেটাই তো কাম্য ছিল, নাকি ছিল না। রাষ্ট্রযন্ত্র হাতের মুঠোয় আসার পরও কেন এত অতৃপ্তি থেকে যায়।

কিন্তু এইসব চিন্তাভাবনা সাময়িক। সারা দিন রাত এত কাজ, দলের হয়ে মিটিং মিছিল আর সমাবেশ করে এইসব চিন্তা মাথা থেকে উধাও হতে দেরি হল না নব্যেন্দুর। দুদিন বাদে হঠাৎ একটা জরুরী মিটিং-এর সমন পেয়ে চমক লাগল তার। কেন্দ্রীয় নেতা আসছেন আগামী নির্বাচন এবং দলীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে। প্রত্যেক দায়িত্বশীল সদস্যকে সেদিন অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

মিটিং শুরু হলো। অন্য কয়েকটা এজেন্ডার পর লোকাল কমিটি সম্পাদক নিবাচন প্রসঙ্গ। হঠাৎ কেন্দ্রীয় নেতা বললেন, 'এবং আগে একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আমাদের একজন কমরেড যার ওপর পার্টি আস্থা রেখেছিল, তিনি দলবিরোধী কাজ করছেন। আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইব তিনি কি করে পার্টি থেকে বিতাড়িত জগদীশবাবুকে রাত্রে নিজের বাড়িতে আশ্রয় এবং খাবার দেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন পুলিশ যাকে খুঁজছে, পার্টির প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকে আশ্রয় দেওয়া জঘন্য অপরাধ। এই ঘরে একটা আলপিনের শব্দও বুঝি শোনা যেত। বিস্ময়ে প্রতিটি মানুষ অন্যকে লক্ষ্য করছে। নব্যেন্দু চোখ তুলল। ললিতা কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে। মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল।

কেন্দ্রীয় নেতা এবার সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কমরেড নব্যেন্দু, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।'

নব্যেন্দু অনেক কষ্টে শীত ভাবটাকে প্রতিকূল করল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি এক বৃষ্টির রাত্রে জগদীশবাবুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন?'

না,' মাথা নাড়ল নব্যেন্দু।

'আপনি তথ্য গোপন করতে চাইছেন। এতে আপনার দায়িত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

'আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি। সেইরাত্রে আমি দরজা খুলিনি। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।'

ললিতা মাথা নাড়ল, 'আমি দরজা খুলেছিলাম। সেদিন লোডশেডিং ছিল। জগদীশকে আমি চিনতে পারিনি। উনি আমার স্বামীর খোঁজ করছিলেন তাই ওঁকে ডেকে দিয়েছিলাম।'

কেন্দ্রীয় নেতা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এরপরে তাকে রাত্রে থাকতে দিয়েছিলেন। খাবার দিয়েছিলেন। নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দিয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যেকথা বলে।'

নব্যেন্দু মাথা নাড়ল, 'মোটেই নয়। আমি ওঁকে খাবার দিতে চাইনি। আমার স্ত্রী জোর করে ওঁকে খেতে দেন, পরিষ্কার লুঙ্গি দিতে বলেন।'

ললিতা বলল, 'সত্যি নয়। এসব করেছিলাম যেহেতু আমায় বলা হয়েছিল উনি আমার স্বামীর বাল্যবন্ধুর দাদা। তাই।'

নব্যেন্দু বলল, 'কথাটা সত্যি। জগদীশদা আমার বাল্যবন্ধুর অগ্রজ।'

কেন্দ্রীয় নেতা হাসলেন তাই শেষরাত্রে গোপনে রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন আপনারা?'

চমকে তাকাল নব্যেন্দু। আর ললিতা না-কাঁপা গলায় জানাল কি করে সেই রাত্রে সে নিজেকে সংবরণ করেছিল। গোপনে নব্যেন্দুর উঠে যাওয়া, জগদীশের সঙ্গে আলোচনা এবং যাওয়ার সময় জগদীশের কিছু জ্ঞানগত উপদেশ পাওয়ার পর নব্যেন্দুর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা সে খুঁটিয়ে বিবৃত করল। এখন প্রতিটি মুখ নব্যেন্দুর দিকে ফেরানো।

কেন্দ্রীয় নেতা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন কেন?'

ললিতার গলা কাঁপল না, 'আমি আমার পার্টির প্রতি অনুরক্ত। মার্কসীয় জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। আমার স্বামী যদি সেই বিশ্বাসে অংশীদার না হতে পারেন সেটা অন্যকথা কিন্তু পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয় এমন কাজ করায় তিনি আমার শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।

সমস্ত ঘরে যেন লক্ষ পায়রা উড়ল হাততালিতে কান বন্ধ হয়ে গেল একজন শ্লোগান দিয়ে ফেলল চাপা গলায়, 'কমরেড ললিতা জিন্দাবাদ।'

কেন্দ্রীয় নেতা বললেন, 'নব্যেন্দুবাবু, এই নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আমার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাবো। ওরা যতদিন কোনো সিদ্ধান্ত না নিচ্ছেন ততদিন আপনি পার্টির কোনো সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না।'

নব্যেন্দু উঠে দাঁড়ালো, 'আমাকে কি সাসপেন্ড করা হলো?'

ব্যাপারটা সেই রকম।'

নব্যেন্দু চুপচাপ বেরিয়ে এলো। এখন বেশ রাত টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। নব্যেন্দু হাঁটতে হাঁটতে গলির মুখে চলে এলো। তার মাথার ভেতর শূন্য হয়ে গেল। ওরা শুধু অভিযোগ করে গেল কিন্তু কেউ জানতে চাইল না কেন সেদিন সে জগদীশকে আশ্রয় দিয়েছিল। এমন কি ললিতাও এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে কোনো কথা বলে নি। ললিতার সঙ্গে এতকালের সম্পর্ক অথচ সে-ও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি একবার। কিন্তু দলের কাছে গোপন রিপোর্ট পাঠাতে দেরি করে নি।

এতবছর একসঙ্গে বাস করেও যদি এতটা ফারাক হয়ে যায় দুটো মানুষের মধ্যে তাহলে অনেককাল একটি পার্টির জন্যে যৌবন এবং শ্রম দান করেও এই ব্যবহার পাওয়া স্বাভাবিক। সেই রাত্রে কেউ সাক্ষী ছিল না। ললিতা যা বলেছে তা মিথ্যে প্রমাণ করতে সে যদি তৎপর হয় তাহলে ওই বেচারা মুস্কিলে পড়বে। কি দরকার। নব্যেন্দু হাসল, জগদীশদার শেষ কথাটা মনে

পড়ল। বুকেব ভেতব একটা আঁচড় লেগেছিল তাই বাইবেব এই আঘাতটা খুব বড় মনে হচ্ছে না। ববং ললিতা তাকে সাহায্যই কবল। লোকাল কমিটিব সম্পাদক আব ওকে হতে হচ্ছে না। কোনো লক্ষ্যহীন পথে এগিয়ে যাওযাব ভাঁওতায ভুলে থাকতে হবে না। কিন্তু নবোন্দু মাথাব ওপব ছাতা খুলল ললিতাব সেক্রেটাবী হিসেবে নির্বাচন সুনিশ্চিত। স্বামী এবং দলেব মধ্যে শেষটাকেই এ সম্মান দিল নিজস্ব বিচাবে। এখন কি ও একসঙ্গে থাকতে চাইবে?

বৃষ্টি পড়ছে। পার্টিব মিটিং ভেঙে গেল। নবোন্দু একটা আড়াল দেখে দাঁড়িযে বইল। মানুষজন বেবিযে যাচ্ছে। তাবপব ললিতাকে দেখতে পেল। গলি দিযে দ্রুত পাযে আসছে সঙ্গে অরুণ। বাস্তাব মোড়ে দাড়িযে অরুণ বলল, 'চল ললিতাদি তোমাকে পৌঁছে দিযে আসি। বৃষ্টি পড়ছে '

না না, কোনো দবকাব নেই, আমি একটা বিক্সা নিয়ে যাব। তুমি কাল সকালে অবশ্যই বাড়িতে এসো। ললিতাব গলাব স্ববে কর্তৃত্ব।

'কিন্তু নবোন্দুদা যদি বাড়িতে ফিবে '

ওসব ভয় কবো না তাহলে তো বাঁচা যায় না। কথাটা বলে ললিতা বৃষ্টি মাথায় নিযে হাটতে লাগল। অরুণ চলে গেল উল্টো বাস্তায।

নবোন্দু দ্রুত কয়েক পা হেঁটে ডাকল, 'শোন।'

চমকে ফিবে তাকাল ললিতা বাস্তাব ভিজে আলোয তাকে অদ্ভুত নাভাস দেখাল।

নবোন্দু হাসল বৃষ্টিতে ভিজো না।' ললিতাব মুখ তখন বক্তশূন্য, চোখে বিস্ময এবং ভয।

ছাতটা এগিযে দিল নবোন্দু এটা বাখো।'

আশ্চর্য প্রদীপ

নি নি বোদ্দুবে ছেলেটা হাঁটছিল। শামবাটিব খাল পেবিযে বাস্তাটা দুদিকে চিবে গেছে। লাল ধুলো এখন উড়ছে না, এইসময বাতাস বড় দুর্বল থাকে। তেলে গন্ধ ওঠা গামছাটা মাথা থেকে খুলে ও শবীবেব ঘাম মুছল। এটা ও কখনোই কবতে চায না কাবণ শবীবেব ঘাম কাপড়ে মুছলে সেটা কালো হবেই কাবণ ঘামে শবীবেব বঙ থাকে। বাবুদেব বেলায ঠিক উল্টোটা হয। ওব এক একসময ইচ্ছে করে এই গামছায কোন বাবু তাব গাযেব ঘাম মুছুক, এটা খানিক ফবসা হোক। কিন্তু যা গন্ধ, বাবুবা নেবে কেন? মা বলে বাবুদেব গাযে নাকি ফুলেব সুবাস থাকে বোতলে বিক্রি হয।

এক হাতে টিনেব ক্যানটা নিযে অন্য হাতে কপাল ঘষতে ঘষতে সে মোড়টায এসে দাঁড়াল। কোন দিকে ওবা? আজ সকালে মাকে বাপ বলেছিল যে টুবিস্ট লজে স্যুটিং পার্টি এসেছে, জোব পান বিক্রী হচ্ছে। তাবা নাকি এদিকটায মাঠ ঘাটে স্যুটিং কবে বেড়াচ্ছে। এব আগে একবাব পৌষালিব সামনে স্যুটিং দেখেছিল সে মাযেব সঙ্গে। ফবসা ফবসা বাবুবা মেযেদেব সঙ্গে কেমন কেমন কথা বলছিল আব সে সব কথা ক্যামেবা দিয়ে লোকজন ছবি কবে নিচ্ছিল।

মা বলে সেগুলোন নাকি সিনেমা হল এ বই হয়ে আসবে। মার সিনেমা দেখার বড সখ, বাপ পয়সা দিতে চায় না। বলে মেয়েছেলের হাতে পয়সা দিলেই সংসারে সব্বোনাশ হয়। মা বলে তার বাকীটা কি থাকল— কোনরকমে দুবেলা ভাত গেলা ছাড়া এ সংসারে আর নতুন কিছু হল না। বাপ বলে, তাই পায় ক'জন। এই যে আমি ঘরে বসে ফুর্তি করি তা কি নিজের পয়সায়? তালতোড়ের গগনখুড়ো দেয় বলেই তো খাই। খেয়ে ঘরে থাকি। মা বলে, ছেলে পাশ দিয়ে দুই কেলাসে উঠল – তার বইটই কেন অন্তত। বাপ বলে, কত বড মানুষ কিনতে পারছে না আমি তো ছার। ছাপা নেই বই—ছাপা হয় যেখানে সেখানে হরতাল। তা তোমার ছেলে একা নাকি—দুনিয়া সুদ্ধ পড়াশুনা হবে না এখন।

তাই ও বালাই নেই। পডতে ভালও লাগে না তার। তার চেয়ে শামবাটির পুকুরে মাছ ধরা ভাল কিংবা ডিয়ার পাকে ঘুরে বেড়ান। এখন তাই মোডে দাড়িয়ে গোড়ালি উঁচু করে ও দুপাশে তাকাল। স্যুটিং পার্টি গেল কোথায়। তারা মনেই তো ভীড আর একটা গাড়ি। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না তো। বাপটা সত্যি বলল তো? ডানদিকে প্রান্তিকের রাস্তাটা ধরলেই হয় রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানটায় জমি বেশ উঁচু আশেপাশের অনেকটা তল্লাট দেখা যায়। চোখ আড়াল করে সর্যটা দেখল ও। তিনটের পর গগনখুড়ো আর ভাটিতে থাকে না। তখন যাওয়া মানে শূন্য হাতে ফিরে আসা। ক্যান খালি মানে বাপ বাখারি ভাঙ্গবে তার পিঠে - আর কি কি হবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠে ও সোজা বা দিকের রাস্তাটা ধরলো। মদ না খেলে বাপটা মাইরী দুঃশাসন হয়ে যায়। যাত্রায় দেখেছে সে, বোলপুরের গণেশ মুদি খুব ভাল দুঃশাসন সাজে, ইয়া বড গোঁফ। বাপটার অবশ্য গোফ নেই, এই যা।

গোয়ালপাড়ার পথটা ধরে এগিয়ে চলল সে। খালি গা, দডি দিয়ে হাফ প্যান্ট বাধা হাতে টিনের ক্যান। লাল ধুলো পথ ছেড়ে হাঁটু অবধি বাড়িয়ে দিচ্ছে। মাঝে মধ্যে ইঁটখোলায় লরি যায় এ পথ দিয়ে। তখন বাতাস দেখে পালাও, পালাও। লাল মেঘ হাত পা নেড়ে তেড়ে আসে যেন ডানদিকে ধেনো জমির ফাটল দিয়ে গরম নিঃশ্বাস উঠছে। মা লক্ষ্মী পাতালে বন্দী হয়ে কাঁদছেন এখন। শুখনো মাটি শুধু ফাটছে আর ফাটছে। ভুলেও কেউ জমি মাড়ায় না এখন, একটা দেশলাই কম করে জ্বেলে দাও আর সঙ্গে সঙ্গে খরগোসের মত আগুনটা চারধারে শুকনো ঘাস বেয়ে দৌড মারবে। বা দিকে বাবলাগাছ আর কাঁড়া তালের সরু ছায়া। ছেলেটা রোদে পুড়তে পুড়তে হাঁটছিল। পুজোর সময় বাপের মজাটা ছিল কম। শালা ভাটিখানা ভেসে গিয়েছিল জলে কোপাইটার কি গজন তখন ওরা সব শামবাটির মুখটায় দাঁডিয়ে হাঁ হয়ে দেখেছি — এই গোয়ালপাড়া, তালতোড, প্রান্তিক এই সপলেহনা—সব জলের তলায়। হুস হুস করে জল উঠছে- —এইসব ধুলোগুলোন তখন কোথায় হাওয়া। জলের কথায় সে রাস্তার ধারে সরে এল তারপর এক হাতে প্যান্ট সরিয়ে জলত্যাগ শুরু করল। যাঃ বাবা, এখন মাটির খাই দ্যাখ, রাক্ষসের মত সব শুষে নিচ্ছে—একটুও কাদা হতে দিচ্ছে না। শেষ হয়ে গেলে সেখানটায় একটা ভেজা দাগ রয়ে গেল সে থুতু ফেলে ঘুরে দাঁড়াতেই দূরে ধুলোর ঝড দেখতে পেল।

পথ থেকে নেমে দাঁড়াতে হ্যাট হ্যাট করে গরুর গাড়িটা সামনে এসে পড়ল। খালি গাড়ি যাচ্ছে বোলপুরে। গাড়োয়ানকে মুখে চেনে, চেঁচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যুটিং পার্টি কোথায়।' গাড়োয়ান রা কাড়ল না, হাতের লাঠি মাঠের দিকে উঁচিয়ে ধরল। ছেলেটা সেদিক লক্ষ্য করে দেখল বুনো গাছ আর তালতোড গ্রামের ঘরবাড়ির চাল ধানক্ষেত শেষ হলে উঁকি মারছে। তাহলে কি স্যুটিংটা তালতোড়ে হচ্ছে? দ্রুত পা চালাল সে গোয়ালপাড়ার পথে।

জলে এই গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। যেসব দেওয়াল সামান্য পলকা আর বয়সে পুরনো সেগুলো ধুয়ে গিয়েছে ঘর উঠেছে নতুন। এখন শুধু গাছের ডাল দেখলে বোঝা যায় জল কিরকম ছিল। শুখনো চালের খডগুলো গাছের ডালে লটকে দোল খাচ্ছে। ছেলেটা গ্রামে

ঢুকল। একটা লাথি মার পেল সব শরীর লাল —এইসান ধুলো। সামনের চায়ের দোকান এখন বন্ধ বা দিকে একটা দাওয়ায় বসে হরি হাজাম গাল কামাচ্ছে একজনের। বাড়িঘরের মধ্যে দিয়ে ও ডান পাশে ঘুরল। এক দাওয়ায় তালপাতার ওপর বুঁদে, তেলেভাজা আর শুখনো লেডিকেনি বিকোচ্ছে একটা বুড়ো। ছেলেটা বাঁ পকেটে হাত দিল. পাঁচটা পয়সা মায়ের কাছ থেকে এনেছে সে। এখন খাবে কি খাবে না দোটানায় পড়ল সে। তিনটে মোটকা মাছি এসে বুঁদেগুলো চেটে খেল একবার। বুড়ো হাত নাড়তেই লেডিকেনিতে বসল। ইস, যদি মাছি হওয়া যেত—ছেলেটা জুলজুল করে সেদিকে চাইতেই বুড়ো খনখনিয়ে বলে উঠল, 'ট্যাকে দশটা পয়সা আছে?' ঘাড় নাড়ল সে, না। 'যা ভাগ, মাল নেগে যা।' বুড়ো ভাগিয়ে দিল হাত নেড়ে। দশ পয়সা দশ পয়সা আনতে হবে—তা সেটা পেলে এখানে আসবে কেন? বোলপুর বাজারে কত কি পাওয়া যায়। একবার মুখ ভেংচে সে হাঁটা দিল।

গ্রামের যেখানে প্রায় শেষ সেখানেই ভাটিখানা। একটা ড্রামের তলায় গনগনে উনুন জ্বলছে সবসময়। দূর থেকেই গন্ধে মালুম হয়। প্রথম প্রথম বমি আসত ওর, এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে, নাব হয়নি। এই একটা জায়গায় বাবা হার মানে। মদ খেলে বাপ ঘরে ঢুকতে পায় না। দাওয়ায় খাটিয়া পেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে। মা বলে মদের গন্ধ নাকি পেটের নাড়ি ছিঁড়ে ফেলে। ওর অতটা মনে হয় না তবে ঝাঁঝ লাগে বড়। উনুনের পাশেই চালাঘর। চালচুলো নেই লোকগুলো ভাঁড় নিয়ে মুখোমুখি বসে গিলছে তার তলায়। ওপাশের সিমেন্টের দাওয়া, তাতে ভদ্রলোক বসে। একপাশে তেলেভাজা বিক্রী হচ্ছে জোর। ওকে দেখে দাওয়া থেকে চিৎকারটা ভেসে এল এই যে রামচন্দ্র বড্ড দেরী করে ফেললে আজ।' গগনখুড়ো ডাকছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন হা হা করে হেসে উঠল 'যা কয়েছেন। দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। সত্য সত্য সত্য।' তার গলা শুনে ছেলেটা বুঝল এর নেশা হয়েছে। গগনখুড়োকে আজ অবধি নেশা করতে দ্যাখেনি সে চুপচাপ বসে থাকেন আর লোকে টাকা চাইলে কাগজে সই নিয়ে দুই টাকা দিয়ে দেন। ওকে দেখলেই তিনি রামচন্দ্র বলে ডাকেন। ওর নাম মোটেই রাম নয়। কিন্তু ডাকটা শুনতে খারাপ লাগে না ওর।

দাও হে জগু চার ভাঁড় ঢেলে দাও রামচন্দ্রের কমণ্ডলুতে গগনখুড়ো বলতেই জগুশুঁড়ী ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। মদোমাতালদের পাশ কাটিয়ে সে ওর কাছে এগিয়ে যেতে একটা মাতাল চালাঘরে পা ছড়িয়ে বসে বলে উঠল, একিরে বাবা দাদার ছেলেও মাল খায়। কলিকালে কি যে হল।'

জগুশুঁড়ী ধমক দিল, 'এ্যাই চোপ।'

চার ভাঁড় দিয়ে ক্যানের মুখটা বন্ধ করে দিতেই গগনখুড়ো ওকে ডাকল। ক্যানটা এখন ভারী হয়েছে বেশ। ও পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াতে গগনখুড়ো তার সরু কাটি কাটি আঙুল দিয়ে ওর গলাটা টিপে দিল। রোজই দেয়—বিশ্রী লাগে তখন। টিপে টিপে গগনখুড়ো বলল, দশরথকে বলবি, আজকের মালটা ভাল ছিল না। আমার সঙ্গে ফোবটুয়েন্টি করলে কি আর লাভ হবে। আমি তো আর মালে জল দিই না, কি বল জগু? তোর হল জলের নেশা আমার শুখনো নেশা। শহর থেকে আমদানী হয় বলেই তোকে খাতির করি। বলবি কিন্তু— আমি কাল দেখা করব।'

ও ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে চলে আসছিল। এমন সময় কে যেন বলে উঠল, ও খুড়ো হিরোইনকে কেমন দেখলে? স্যুটিং হচ্ছে শুনলাম তোমার গাঁয়ে।' 'হিরোইন।' গগনখুড়ো নাক ঝাড়লেন 'একটা প্যাঁচিদাসাকে জুটিয়ে এনেছে— ও আবার হিরোইন নাকি। বুক পিঠ সব এক। হ্যাঁ সে ছিল কাননবালা—লীলা দেশাই, রাতে ঘুম আসত না।'

তাড়াতাড়ি পা চালাল সে। তালতোড়ে স্যুটিং হচ্ছে তাহলে। এখন কোন পথে যায় সে।

সেই শামবাটি হয়ে ঘুরে যেতে অনেকটা পথ। তার চেয়ে ডানদিকের কোপাই পেরিয়ে মাঠ ভেঙ্গে ইটখোলার পাশ দিয়ে গেলে সময় বেশী লাগবে না। ও আর দেরী করল না।

কোপাই তখন শুখিয়ে মনে গুটিয়ে গিয়েছে। খানিকটা চড়া ফেলে একপাশে হাঁটুর তলায় জল নিয়ে কুলকুল করে বইছে। কে চিনবে পুজোর সময়কার নদীটাকে। জলে নামল সে। আঃ, বেশ ঠাণ্ডা—শরীর জুড়োয। মজা করতে ও ক্যানের তলাটা জলের ওপর রাখতেই সেটাকে স্রোত সামান্য টানল। চট করে তুলে ধরল সে। বাপের মুখটা মনে পড়ল।

ভাল করে পা হাত ধুয়ে এপাবে উঠল ছেলেটা। আল ধরে হাঁটা ঠিক নয় এখন। তেনারা সব গরম সহ্য করতে না পেরে আলের পাশে ঘাসের নিচে শরীর লুকোন। একটু শব্দ পেলেই অন্ধের মত ছোবল ছুঁড়বেন রাগে। রাগটা যার ওপরই হোক ছোবল পেলেই শুয়ে পড়তে হবে। বরং শুকনো মাঠ দেখে হাটা ভাল। একটা মরা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিল সে। তারপর একহাতে ক্যান ধরে ডালটাকে মাটিতে হাঁকড়াতে হাঁকড়াতে চলল সে তালতোড়ের দিকে।

অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে সে উঁচু ডাঙ্গাটায় উঠে এল। ওই তো তালতোড় গ্রাম। সামনে একগাদা বাবলা গাছের জঙ্গল সেটা পেরোলেই হল। এই বিকেলের রোদ্দুরে কেউ বের হয়নি মাঠে। স্যুটিং পার্টির বাবুদের রোদ লাগে না? অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল সে, হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে চমকে গেল পা দুটো। সামনেই একটা বাবলা গাছের তলায় তিনি। তিনি নয়, ঠাওর করে বুঝল তেনারা। দুটিতে জড়িয়ে জড়িয়ে এক হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কি শব্দ, বাস। যেন রাগে এ ওকে খায়। কিন্তু খাচ্ছে না তো! চট করে তার মনে পড়ল সাপে যখন লীলা করে তখন এরকমটাই হয়। সে দৃশ্য নাকি পৃথিবী আর ভগবান দেখে। মানুষের পাপ চোখে নাকি এসব পড়ে না। তবে যদি কেউ সত্যি সত্যি দেখে ফেলে তবে একটা নতুন কাপড় পেতে দিতে হয় তেনাদের জন্য। সেই কাপড়ে যদি তেনারা একবার গড়াগড়ি খান তাহলেই হয়ে গেল। যার কাপড় সে রাজা হয়ে যাবে। মাকে এ গল্প করেছে তার ঠাকমা। ঠাকমার বাপ নাকি বড় ওঝা ছিল। কিন্তু এখন নতুন কাপড় পাবে কোথায়? সে অসহায়ভাবে চারপাশে তাকাল। এখন দৌড়ে তালতোড়ে গিয়ে কারো কাছ থেকে চেয়ে এনে যদি দ্যাখে এনারা নেই, তবে? আর দৌড়াতে গেলে পেছন-তাড়া করতে পারেন বিরক্ত হয়ে। কি করবে সে। এক হাত দিয়ে মাথা চুলকোতে গিয়ে আঙুলে গামছা ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে গামছা খুলে নিল ও। কাপড় বলতে আছে প্যান্ট আর এই গামছা। দুটোই ময়লা কালো। প্যান্টটা বাসি আর গামছা সকালে জলকাচা হয়েছিল। এটাই পেতে দিই তেনাদের জন্য—কিছু তো উপকার হবে। তুলসীজল ছিটিয়ে দিতে বলবে না হয় মাকে। ক্যানটা মাটিতে সন্তর্পণে রেখে সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সাপদুটো নিথর হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ঢুকঢুক করছে, পা ভারী, কোনরকমে ওদের পাশে গামছা বিছিয়ে সে পায়ে পায়ে সরে এল ক্যানের কাছে। সাপদুটো চুপচাপ ওকে দেখছে, ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। দূরে সরে এসে বুক হালকা করে ও বাতাস ছাড়ল। রাগ করো না মা মনসা, আমার মনে কোন অন্যায় নাই—বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগল সে। কাজ হল যেন, সাপদুটো আবার নড়ছে। ল্যাজদুটো পরস্পরকে আঘাত করে মাটিতে আছাড় খাচ্ছে এখন। আর একটু হেল—আর একটু হেল—যাঃ, সরে গেল। গামছাটার কাছ ঘেঁষে এসেও সরে গেল সাপদুটো। ও মা মনসা, রাজা করে দাও গো, ও মা মনসা। চোখ বন্ধ করে সে মনসাকে ডাকতে লাগল। এক মিনিট পার করে দিয়ে সে চোখ খুলতেই স্থির হয়ে গেল। তেনারা একদম গামছার মধ্যিখানে এসে গেছেন। মা মনসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে কেঁদে ফেলল।

তারপর একসময় তেনাদের লীলা শেষ হয়ে যেতেই তেনারা দৌড়ে যে যার থানে চলে গেলেন। চুপচাপ চারধার, শুধু একটা ঘুঘু কোথাও ডাকছে। সে রোমাঞ্চিত শরীর টেনে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে গামছাটা তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। আঃ, সে রাজা হয়ে যাবে এবার। রাজা

না হোক, নতুন কাপড় নয় যখন তখন গগনখুড়োর মত টাকা হবে নিশ্চয়ই। এটাকে এখন কোথায় রাখে। মাথায় রাখলে তো ঘাম লাগবে। তার চেয়ে শক্ত করে কোমরেই বাঁধা যাক। নিশ্চিন্তে ক্যানটা নিয়ে সে তালতোড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। পায়ের তলায় এখন যেন গরম গালচে বিছানো।

তালতোড়ের মুখটাতেই শ'লোকের ভীড়। সেই যেখানে বাইশটা তালগাছ গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে ছায়া ফেলে রেখেছে জমিতে সেখানে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেশ জোরে জোরে পা ফেলে সে রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল। গাঁয়ের লোক একপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার মধ্যে এবং ওপাশে কয়েকটা প্যান্ট-পরা লোক মাথায় টোকা চাপিয়ে হাত পা নেড়ে কি সব বলাবলি করছে। ওদের পেছনে কালো কাপড়ে মোড়া একটা যন্ত্র তার পেছনে একটা মানুষ মাথা মুড়ে এক একবার কি দেখছে আর বেরিয়ে আসছে।

বড় বড় চোখ মেলে সে রাস্তাটা পেরিয়ে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে যখন হাঁটতে শুরু করেছে তখন কাট কাট বলে চিৎকারটা উঠল। 'আঃ যতীন, তোমায় বললাম রাস্তাটা গার্ড দাও, দিলে নষ্ট করে।' সে অবাক হয়ে দেখলে কালো কাপড় থেকে মুখ বের করে একজন চেচামেচি করতে লাগল।

সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই একজন এসে তার হাত ধরল ছুটে। 'এ্যাই ছোঁড়া, সরে যা সরে যা। খবরদার রাস্তা ক্রশ করবি না।

ঠিক সেই সময় ও একটা মোটা গলা শুনল, 'যতীন, ওকে নিয়ে এসো তো এখানে।' কথাটা শেষ হতেই লোকটা ওর হাত ধরে টানতে টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল।

সেখানে যিনি এক হাতে খাতা আর মাথায় টোকা পরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ভাল করে ওকে দেখলেন। তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন, 'গুড, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সুনীলবাবু যখন গরুর গাড়িতে করে গ্রামে ঢুকলেন তখন এ, ধরা যাক গ্রামের ছেলে গরুর গাড়ির পেছনটা ধরে দৌড়ে আসতে থাকবে। একদম ন্যাচারাল হবে, কি বল?'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকে দারুণ দারুণ বলতে লাগল। হাতে খাতা ভদ্রলোক ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। 'এ্যাই, তোর নাম কি?'

'শ্রীরবীন্দ্রনাথ—।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে তিনি হো হো করে খানিকটা হেসে নিলেন 'আরে বাস, শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে আর্টিস্ট হিসেবে পেয়ে গেলাম। বুঝলে হে, এইসব চাইল্ড ট্যালেন্টকে ট্রেইন্ড করাই হচ্ছে এ্যাকচুয়েল এফিসিয়েন্সি। কোন ক্লাশে পড়িস? পড়িস তো?'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল তার, কোন রকমে বলল, 'টু।'

'হুঁ। এ্যাকটিং করবি সিনেমায়? তোর বাড়ি কোথায়?'

'সেন্ট্রাল অফিসের কাছে।'

'দৌড়াতে পারবি?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল সে। এটুকু ও বুঝতে পারছিল সিনেমার যে ছবি এখন ইনারা তুলবেন সেখানে তার ছবি থাকবে। তাকে দৌড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে খালি হাতে গামছাটা চেপে ধরল। আঃ মা গো, তুমি যদি দেখতে। ততক্ষণে কোথা থেকে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়েছে সামনে। তাতে একজন সুন্দর চেহারার পুরুষ বসে আছেন। গাড়োয়ানকে বলা হল গাড়িটা জোরে চালাতে আর তাকে ওরা বলল গাড়ির পেছনটা ধরে সেই তালে ছুটতে। এটা তো একটা মজার খেলা, ওরা কত করে আর তখন গাড়োয়ানরা কি চেঁচায়। একহাতে ক্যানটা নিয়ে সে গাড়ির পেছনটা ধরতেই কয়েকজন হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এল। 'এই এটা রেখে দে, এটা নিয়ে ছুটবি কি রে।' একজন এসে প্রায় জোর করে তার হাত থেকে ক্যানটা ছিনিয়ে নিল, 'কি আছে

এতে?'

মদ।' কোনবকমে বলল সে।

'মদ! কে খায়—কাব মদ?'

'বাপ খায—গোয়ালপাড়াব ভাঁটিখানা থেকে আনলাম।'

'আরে বাস। ও যতীনদা, বাপেব জন্য ছেলে এই বোদ্দুবে মদ নিয়ে যাচ্ছে এবকম তো বাপেব জন্মে শুনিনি দাদা। আঃ বেশ গন্ধ তো। এাই ঠিক কথা বলছিস তুই?'

'হ্যাঁ। আমি বোজ আনি। গগনখুড়ো বিনি পযসায দেয।' প্রায কেঁদে ফেলল সে। 'বিনি পযসায মদ দেয। তোর বাপ করে কি?'

'পানেব দোকান আছে—ট্যুবিস্ট লজেব সামনে।'

'ওবে শালা, ওই বুড়োটা তোব বাপ।'

এমন সময খাতা-হাতে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'বেডি, মনিটব।'

সঙ্গে সঙ্গে যতীন বলে মানুষটা বলল, 'নে ছোঁড়া এটা আমাব কাছে থাকল, ভয নেই। যা যা ছোট।'

অগত্যা সে ছুটল। গাড়িটা হেট হেট কবে ছুটতেই সেই সুন্দব মত পুরুষ শুযে পড়লেন। কি গাযেব বঙ তাব যেন সকালবেলাব সূর্য। চোখ ভবে দেখতে দেখতে খানিক দৌড়াল কাবণ কিছু দূবে যেতেই পেছন থেকে চিৎকাব কবে তাদেব থামতে বলা হল। এব পব গাড়ি ঘুবিয়ে আবাব আগের জাযগায এসে ওদেব ছুটে যেতে বলা হলো। গাড়িও ছুটছে, সেও। ওকে বাবংবাব করে ঘাড় ঘুবিয়ে পেছনে তাকাতে নিষেধ কবা হযেছিল তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে দেখল না। কিন্তু এবাব থামতেই ও পেছনে সেই কালো যন্ত্রটাব দিকে তাকাল। নির্ঘাৎ ওখানে ছবি উঠছে তাব।

কাছাকাছি ফিবে আসতেই একটা লোক ওব দিকে দুটো টাকা এগিয়ে ধবল, নে এ্যাকটিং কবলি, তাব ফি।' প্রায জড়ভবতেব মত সে টাকাটা ধবল। আবে বাপ, শুধু সিনেমায ছবিই উঠবে না আবাব ওকে তাবা টাকাও দিলো। ও বিস্ময কাটিযে উঠতে না উঠতেই সেই খাতা-হাতে লোকটা ওপাশেব গাঁযেব লোকদেব দিকে এগিযে গিযে বলল, আমাদেব কাজ শেষ। আপনাদেব অনেক ধন্যবাদ। এখানে যদি ছবিটা আসে অবশ্যই দেখবেন। ছবিটাব নাম "এব নাম সংসাব।" আপনাদেব গাযেব নাম ছবিতে থাকবে।'

গাঁযেব লোকেবা খুশী হল। ছেলেটা দেখল সেই সুবেশ পুরুষ গরুব গাড়ি থেকে নেমে মোটব গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। তিনি যখন ওব পাশ দিযে হাঁটছেন তখন যেন নাব বন্ধ হযে গেল ওব। মনে হল উওবাযণে যখন গোলাপ যুঁই বজনীগন্ধা ফোটে তখনও এত সুন্দব সুবাস ছড়ায না। ভীষণ লোভীব মত বাব বাব নিঃশ্বাস নিল সে। আঃ, বুক ভবে যায যেন।

জিনিসপত্র গোটানো হযে গেলে সেই যতীন নামেব লোকটা ওকে ক্যান ফিবিযে দিল। হাতে নিতে ও চমকে উঠল বড খালি খালি ঠেকে। ক্যানেব ঢাকনা খুলতেই ওব সামনেব গাঁটা যেন ঘুবে গেল আচমকা ক্যানটা খালি। মুখ তুলে সে দেখল যতীন মুচকি মুচকি হাসছে, চোখাচোখি হতেই একটা হাত আকাশে তুলে বলল, 'যা ভাগ।'

'মদ কোথায, মদ?' চিৎকাব কবে উঠল সে।

'আবাব চেঁচায?' ধমকে উঠল যতীন।

'আপনি আমাব মদ নেছে'—দেন, ফিবায দেন।' প্রায কেঁদে ফেলল ও। সঙ্গে সঙ্গে ভীড জমে গেল ওদেব ঘিবে। খাতা-হাতে লোকটা এবাব এগিযে এল 'কি হযেছে?'

কে একজন বলল 'মদ নিযে যাচ্ছিল ছোঁড়া যতীন ফেলে দিযেছে।'

'মদ? তুই মদ নিযে যাচ্ছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কার জন্যে?'

'বাপের জন্য। বাপ আমার চামড়া খুলে নেবে। এ্যাঁ এ্যাঁ!' চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ছেলেটা।

খাতা-হাতে লোকটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা, 'কি রকম বাপ ভাই, ছেলেকে এই রোদে মদ আনতে পাঠায়।'

'আমার মদ দেন—দেন বলছি। আপনার টাকা ফিরায় নেন।' প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে যাচ্ছিল সে।

এমন সময় সেই সুন্দর পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে এল, কি হয়েছে?'

খাতা-হাতে লোকটা ঘটনাটা বলে শেষ করল, 'যতীন মদটা ফেলে দিয়েছে। অবশ্যই ঠিক করেনি কিন্তু আমি ভাবছি কতখানি পাষণ্ড হলে বাপ নিজের ছেলেকে মদ আনতে পাঠায়। অদ্ভুত ব্যাপার।'

সুবেশ পুরুষ বলল, 'কিন্তু এটা ঠিক হয়নি লোকাল লোককে চটিয়ে আমরা এখানে কাজ করতে পারব না। ওকে বরং মদের দামটা দিয়ে দিন।

খাতা-হাতে লোকটা যতীনকে বলল, 'এই, ওকে দশটা টাকা দিয়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল ছেলেটা 'না আমায় মদ দেন, টাকা নিয়ে কি করব। গগনখুড়ো না হলে টাকা দিলেও আমায় মদ বেচবে না জগুগুঁড়ী।' ঘ্যানর ঘ্যানর কান্নায় ওরা ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। এদিকে ব্যাপার দেখতে দূরে দাঁড়ানো গাঁয়ের লোক ক্রমশ ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে খাতা-হাতে লোকটা ঘাবড়ে গেছে। সুন্দর পুরুষ ওর কাছে আসতেই ছেলেটা কান্নার ফাঁকে ফাঁকে নাক টেনে গন্ধটা নিচ্ছিল সেটা সবাই নজর করছিল।

সুন্দর পুরুষ ওর খালি কাঁধে হাত রাখল, 'মদ যখন ফেলেই দিয়েছে তখন আর কি করবি, দশটা টাকা দিচ্ছে সেটা রাখ, বাপকে আমার নাম করে দিবি, বুঝলি?

ছেলেটা আবার নাক টানল। তাই দেখে পুরুষটি বলল, 'গন্ধটা পছন্দ হয়েছে? নিবি তুই?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথাটায় সব গোলমাল হয়ে গেল ছেলেটার। গন্ধটা তাকে দেবে বলছে। মার মুখটা মনে পড়ে যেতেই সে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।'

'আমার ইন্টিমেটটা এনে দাও তো।

হুকুমটা হতেই একজন গাড়ি থেকে একটা বাক্স বের করে তা থেকে সুন্দর শিশি এনে তার হাতে দিল। পুরুষটি সেই শিশি ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল 'খুশি তো?' এর মধ্যে কে যেন দশটা টাকা গুঁজে দিয়েছে হাতে। সে দেখল যেন বিরাট ফাঁড়া কেটে গেছে, এ রকম ভঙ্গীতে ওরা দ্রুত গাড়িতে উঠে চলে গেল জায়গাটা ছেড়ে। ছেলেটা এবার এগিয়ে আসা গাঁয়ের লোকদের দেখে কেমন থতমত হয়ে বুঝতে পারল এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। টাকাগুলো ক্যানের মধ্যে ফেলে অন্য হাতে শিশিটাকে নিয়ে সে শ্মশানবাটির দিকে দৌড়তে লাগল।

পেছনের চিৎকার, হাসি দ্রুত পায়ে এড়িয়ে সে খালটার পাশে এসে দাঁড়াল। এখনও দূরের আকাশে ছুটে যাওয়া গাড়ি থেকে ওঠা ধুলোর ঝড় পাক খাচ্ছে সে সন্তর্পণে হাতের মুঠো খুলল, একটা ছোট শিশির ভেতরে রঙিন তেল টলমল করছে। হাতটা মুখের কাছে নিয়ে এসে গন্ধটা নাক দিয়ে টানল সে—আঃ! কিসের সঙ্গে মেলে এটা। গোলাপ-যুঁই-উঁহু। বোতলের মুখটা শক্ত করে সাদা ছিপিতে আঁটা, তার গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো। কৌতূহলী আঙুলে ছিপিটার মুখে জোরে চাপ দিতেই তীরের মত সাদা ধোঁয়া আকাশের দিকে ছিটকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী যেন সেই অপরূপ গন্ধে ভুর ভুর করতে লাগল এ রকমটা হবে জানা ছিল না, ভয়ে চট করে সে হাত সরিয়ে নিতেই শিশিটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই গন্ধটা শরীরে মাখতে চাইল। আঃ। এখন এই মুহূর্তে ওর সামনে থেকে

শেষ হয়ে আসা সূর্যটা, রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকা খোয়াই যেন মুছে গেছে। সমস্ত চরাচরে সে ছাড়া আর কেউ নেই।

শ্যামবাটি পেরিয়ে গামছাটায় শিশিটা আচ্ছা করে বেঁধে সে হাঁটছিল। ডানদিকে উত্তরায়ণ-শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তা, ওকে বাঁ দিকের পথটায় যেতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে সে লক্ষ্য করছে যারাই ওর পাশ দিয়ে হাঁটছে তারাই অবাক হয়ে নাক টানছে। কিন্তু কেউ যেন অনুমান করতে পারছে না তার শরীর থেকেই গন্ধটা আসছে। ভীষণ মজা লাগছিল ওর, ঠিক লুকোচুরি খেলার মতন।

রাখাবির দরজা ঠেলে সে যখন উঠোনে ঢুকল তখন সন্ধে হব হব। ওদের ঘরের দাওয়ায় খাটিয়াটা শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। আর সেদিকে তাকিয়েই ওর পেটটা কেমন চিনচিন করে উঠল। আটটা বাজলেই বাপ আসবে, এসে ওই খাটিয়ায় শোবে হাতের ক্যানটার দিকে তাকাল সে। এতক্ষণ, সেই শিশিটা হাতে পাবার পর থেকে যে ভয়টা উবে গিয়েছিল সেটা যেন তাড়কা রাক্ষসীর মত হা হা করে ফিরে এল। মদ না পেলে বাপ রাখাবি ধরবেই—এখন কি হবে?

মাটিতে পা ঘষে ঘষে সাহস আনতে চাইল সে। মা মনসা তাকে যদি রাজা করে দেন, না হোক গগনখুড়োর মত টাকা দেন তাহলে দিনরাত ভরপেট মদ খাওয়াবে সে বাপকে। তোমার আর পানের দোকান দিতে হবে না বাপু, ঘরে বসে দিনভরে মদ খাও। এই কথাটা সে কি করে বাপকে বোঝাবে?

এই সময় সে মাকে দেখতে পেল। ঘর থেকে বাইরে পা দিয়ে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, 'এ্যাই, কি হলো তোর? মদ আনতে গিয়ে খেয়ে এলি নাকি? যেমন বাপ তেমন বেটা হবে না? আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল।

সে তবু নড়ে না। বাপ একবার মার গায়ে হাত তুলেছিল তারপর তিনদিন ঘর আসেনি। মা গিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। মা কি তার কথা শুনবে? ও অন্য কোন উপায় পেল না, এক পা এগিয়ে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে, মার চোখ ঘুরছে।

কি ব্যাপার রে, অমন চোরের মত তাকাস কেন? মার গলায় সন্দেহ। তারপর উঠোনে নেমে পড়ে তার দিকে দ্রুত আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নাক টেনে ঘ্রাণ নিল, কিসের গন্ধ রে, কি মদ এটা?'

মদ নয়।' শুকনো গলা থেকে আওয়াজটা কোন রকমে বের হল

ততক্ষণে মা কাছে এসে পড়েছে। দ্রুত নাকটা টানছে মা 'তোর শরীর থেকে বের হয় যে—কি মেখেছিস—কোথায় পেলি?' আলতো করে তার হাত ধরল মা।

'স্যুটিং পার্টি দিল।'

'স্যুটিং পার্টি? তুই সেইসব দেখতে গেছিলি?

'হুঁ। আমাকেও ছবিতে দেখা যাবে। ওরা আমার দৌড়ানোর ছবি তুলেছে।'

ছেলেটা কথা শেষ করতেই মা ওকে জড়িয়ে ধরল 'সত্যি?'

মায়ের শরীরের কাছে বসে ও পুটুর পুটুর করে সমস্ত ঘটনাটা বলল। সেই মা মনসার সাপ দুটো তার গামছায় লীলা করেছে আর সুনীলবাবু নামে সুন্দর পুরুষটা তাকে শিশি দিয়েছে সেই সঙ্গে বারো টাকা

বাপ আমাকে মেরে ফেলবে মা—মদ না পেলে বাপ—।'

তার কথা থামিয়ে মা চিৎকার করে উঠল, 'চুপ কর। মদ খেয়ে সে তো নর্দমা হয়ে পড়ে থাকে—এ রকম গন্ধ সে বাপের জন্মে এ বাড়িতে এনেছে? হ্যাঁরে বইটার নাম কি?'

ওরা বলল, এর নাম সংসার। লোকটা কি সুন্দর দেখতে।'

'এর নাম সংসার।' মনে মনে যেন মুখস্থ করল মা তারপর বলল, 'তোমার ছবি দেখিছি

রাস্তায়। তুই আমার রাজা হবি রে ববি—তোর ছবি কত লোক দেখবে।' ওকে জড়িয়ে ধরে মা যেন কি করবে বুঝতে পারছিল না।

গামছা টা খুলে সে মায়ের হাতে দিল। শিশিটা এখন তার হাতে। মা চোখ বন্ধ করে গামছাটা মাথায় ঠেকিয়ে দ্রুত উঠে গিয়ে ঘরে রেখে এল, 'দেখি দেখি শিশিটা।'

ও মাটিতে বসে মায়ের দিকে তাকাল। শিশিটা হাতে নিয়ে মার মুখ হা হয়ে গেছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখের সামনে শিশিটা নিয়ে দেখছে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে সামান্য উপুড় করে দেখল তেলটা বের হয় কি না। শেষে হতাশ হয়ে ছেলের দিকে তাকাল। সে হেসে ফেলল। এখন কায়দাটা তার জানা মায়ের হাত থেকে শিশিটা নিয়ে সে ফুটোটা মায়ের দিকে করে ছিপিতে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াটা ছিটকে গেল মায়ের শরীরে, আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে মা উল্টে পড়ে যাচ্ছিল তার শুকনো মুখে এখন অপ্রস্তুত ভাব। সে আঙুল সরাতে ধোঁয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। মা উঠে বসে জোরে জোর নিজের শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল, 'আঃ, দেখ কি সুন্দর। অ ববি, তোকে পেটে ধরেছিলাম বলে এটা পেলাম রে।' পাগলের মত দুটো হাত মুখে ঘষতে লাগল মা।

তৎক্ষণে ক্যানটার দিকে নজর গেল ছেলেটার। খুব সন্তর্পণে সে ক্যানের ঢাকনাটা খুলল। তলায় নোট দুটো পড়ে আছে। আঙুল দিয়ে সে দুটোকে তুলতেই দেখল গা-মাখা মদে নোট ভিজে একসা হয়ে আছে। মার নজর পড়েছিল এদিকে, হাত বাড়িয়ে ক্যানটা নিয়ে দেখল একটু তলানি রয়ে গেছে এখন। গন্ধটা যেন বমি এনে দিল মার একটানে ছুঁড়ে দিল মা সেটাকে উঠোনের একপাশে খু খু। নোট থেকেও গন্ধ বের হচ্ছে মদের মা সেটাকে হাতে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না প্রথমটায়। 'দশ টাকা আর দুটাকা। বারো টাকা। কাউকে দিবি না ওই বইটা এলে লোকে ডেকে দেখব বুঝলি?' মার কথা শেষ হতেই সে বলল, 'কিন্তু বড় মদের গন্ধ ছাড়ে যে।

সঙ্গে সঙ্গে মা চিন্তা করে ফেলল তারপর নোট দুটো দুই আঙুলে সামনে ধরে বলল, ওই গন্ধের ধোঁয়াটা এর ওপর ছাড় তো মদো গন্ধটা ঠিক পালিয়ে যাবে, ছাড়।'

শক্ত করে শিশিটা হাতে ধরে ফুটোটা সেদিকে তাক করে সে ছিপিতে চাপ দিল। পিচকারীর মত ধোঁয়াটা একরাশ গোলাপ যুঁই রজনীগন্ধা নিয়ে নোট দুটো ভিজিয়ে দিল। মার মুখটা কি মিষ্টি দেখাচ্ছে এখন, মাকে এমন সুন্দর করে হাসতে সে জন্ম থেকে দ্যাখেনি।

হঠাৎ তার খেয়াল হল ধোঁয়াটা যত বের হচ্ছে তত শিশির তেল কমে আসছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সে আঙুলটা সরিয়ে নিল তারপর শিশিটা দেখে নিয়ে মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'মা এটা শেষ হয়ে গেল আর গন্ধ বের হবে না যে।'

হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে মা বলল, 'অর্ধেকটা আছে, তোর বাপের গায়ে একটুস না হয় দিয়ে দিস। বাপের জন্মে সে এসব দেখেনি তো।'

উৎসবের রাত

এখনও অনেক কিছু পারেন না প্রতিভা। এই যেমন, একা একা বাড়ির বাইরে যাওয়া, ছেলে-মেয়েদের উঁচু গলায় ধমক দেওয়া, বউমাদের খোঁটা দিয়ে কথা বলা কিংবা অপরেশ ঘরে থাকলে তাঁর সামনে কাপড় পাল্টানো। শেষেরটি নিয়ে নিয়ত কথা শুনতে হয় তাঁকে। তুমি কি এখনও আঠারো বছরের খুকী যে আমায় দেখে লজ্জায় মরে যাচ্ছ। পঞ্চাশ বছর ঘর করছি তবু যে এত লজ্জা কোত্থেকে আসে বুঝতে পারি না। যে পুরুষের সঙ্গে সারারাত শোওয়া যায়, পঞ্চাশ বছর ঘর করা যায়, দিনের আলোয় তাঁর সামনে বেআব্রু যদি না হতে পারেন তো তিনি কি করবেন। পারেন না এইটেই শেষ কথা।

অথচ অপরেশ এই নিয়ে অনর্গল খোঁচা দিয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিভার তাঁর কি লজ্জাটজ্জার বাড়াবাড়ি আছে? নেই নেই করেও সত্তর বছর হয়ে গেল। সত্তর বছরে স্ত্রীলোকের শরীরে আর কি রহস্য থাকে। চল্লিশের পর থেকেই একটু মোটার দিকে ধাত ছিল কিন্তু এমন মোটা নন যাতে চলা বসায় কষ্ট হয়। মেয়েদের বয়স হলে যে সব রোগ জোটে, বলতে নেই, সেগুলো এখনও তাঁকে স্পর্শ করেনি। মন ভাল থাকলে অপরেশ তাঁকে ভুবনেশ্বরী বলে ডাকেন। নাতনি কাজল বলে, 'দিদা তোমার স্কিন দেখলে হিংসা হয়। মাইরি এই বয়সেও কি করে ম্যানেজ করে রেখেছ কে জানে। ব্লাউজ ছেড়ে এখন সেমিজ পরেছেন প্রতিভা তবু ছুঁড়ির কথার ছিরি দ্যাখো। যার দুদিন বাদে বিয়ে হবে তার মুখে রকের ভাষা শুনলে গা রিরি করে। কিন্তু কিছুই করার উপায় নেই। ওর বাবা, মানে প্রতিভার বড় ছেলে সুব্রতরও হাত পা বন্ধ ও ব্যাপারে। কাজল অপরেশের চোখের মণি নাতনিকে কিছু বললেই দাদু কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। তা তেনারও তো পচাত্তর পেরিয়ে গেছে গত শ্রাবণে। গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। চশমা ছাড়াই কাগজ পড়ার চেষ্টা করেন মাঝে মাঝে। সারাজীবন নেশা ভাঙ করেননি, এখন প্রতিভার পান চেয়ে নেন মাঝে মাঝে। প্রতিভা ওঁর মুখে জর্দার গন্ধটা পান কিন্তু সেটা আসে কোত্থেকে বুঝতে পারেন না। কারণ সেবার প্রেসারে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার পর থেকে অপরেশের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। তা এই মানুষের যদি এখনও শখ হয় সত্তর বছরের বুড়ির কাপড় ছাড়া দেখবেন তাহলে ভীমরতি ছাড়া আর কি বলা যায়। পুরুষ মানুষের বোধ হয় চিতায় না শোওয়া পর্যন্ত এই ভাবটা মরে না। ভগবান যৌবন কেড়ে নিয়েছেন শরীর থেকে অনেকদিন তবু তার ছায়ায় রং বোলানোর চেষ্টা। যত বয়স হচ্ছে তত মুখে আগল থাকছে না। কিন্তু রাত্রে যখন শুতে যান প্রতিভা তখন একটা হাত ওঁর গায়ের ওপর রেখে শিশুর মত ঘুমোন অপরেশ।

আজ কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। সকালবেলায় স্নান সেরে ঘরের দরজা ভেজিয়ে কাপড় ছাড়ছেন এমন সময় তিনি এলেন। অথচ এই সময় সামনের বাগানে থাকার কথা অপরেশের। চমকে উঠে কাপড় চোপড় নিয়ে তিনি ঠাকুরঘরে সেঁধিয়ে যাওয়ার সময় বুঝতে পারলেন আজ কথার হুল সইতে হবে। কিন্তু ঘরে যখন ফিরে এলেন চিরুনির জন্যে তখন অপরেশ ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে কাগজ পড়ছেন। তিনি ঘরে ঢুকেছেন তা নজরেই নেই। খটকা লাগল, এরকম তো হবার নয়। কাছে গিয়ে বললেন, 'আজ কোনদিকে সূর্য উঠেছে'

গলার স্বর পেয়েই যেন চমকে উঠলেন অপরেশ চকিতে কাগজটা ভাঁজ করে সন্ত্রস্ত চোখে তাকালেন তিনি, 'কি বলছ, কিছু বলছ?'

'অমন করছ কেন?' স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন প্রতিভা।

'কই কিছু না তো। স্নান হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

একটু একটু করে হাসি ফুটলো অপরেশের মুখে, 'না না, আমি ভাল আছি। তোমার একথা মনে হল কেন?'

প্রতিভার সন্দেহ তবু ঘুচলো না। একটা কিছু লুকোচ্ছে মানুষটা। কি সেটা? বললেন, 'দশটার মধ্যে মেয়েদের এসে যাওয়ার কথা।'

'হুম।'

প্রতিভা আর দাঁড়ালেন না কতক্ষণ আর! আজ অবধি যখন কোন কথা না বলে থাকতে পারেনি তখন এটাও চেপে রাখতে পারবে না আজ প্রচুর কাজ, এই নিয়ে থাকলে তাঁর চলবে না।

বারান্দায় পা দিতেই বড় বউমা বলল, 'একি মা, আপনাকে নতুন শাড়ি পরলেন না?'

প্রতিভা হাসলেন, 'আর লজ্জা দিও না বাপু। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আর তোমরা —।' সত্যি ওঁর মুখটা লালচে হয়ে উঠেছিল।

'না, তা বললে শুনছি না। বড়দি এলে কি বলবেন?'

'ঠিক আছে সে হবেখন। তোমরা কিন্তু তিলকে তাল করছ। কেউ যেন আর পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে থাকে না। লোকে শুনলে কি বলবে।'

পাশ কাটাচ্ছিলেন প্রতিভা কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কাজল উদয় হল, 'এম্মা দিদা, তুমি এখনও ঝি হয়ে আছ। উফ, তোমাকে নিয়ে পারি না। জানো না সেদিন কাগজে বেরিয়েছে একটা পেয়ার পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে থাকার পর ফের বিয়ে করেছে। বিয়ে দিয়েছে ছেলেমেয়েরা। সেরকম একটা কিছু করলে হতো।'

'গ্র্যান্ড আইডিয়া!' বড় নাতি সুব্রত চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা আগে বলিসনি কেন?'

'বেটার লেট দ্যান নেভার। এখনই করা যেতে পারে।' কাজল হেসে বলল।

'তাহলে আমাদের ঠাকুরমশাইকে ডেকে আন। দিদা' না বললে কিন্তু শুনছি না।' সুব্রত এগিয়ে এসে দু হাতে প্রতিভাকে জড়িয়ে ধরল আচমকা, 'আঃ মাইরি তুমি কি নরম।'

প্রতিভার তখন হাসফাঁস অবস্থা, 'ছাড় ছাড় উঃ কি দস্যি ছেলে রে বাবা!'

এই সময় বড় মেয়ে সুনীতা এসে গেল পঞ্চাশও হয়নি কিন্তু এর মধ্যেই মাথার চুল প্রায় সাদাটে। পেটের গোলমালে খুব ভোগে বলে একটু খিটখিটে স্বভাবের হয়ে গেছে। সঙ্গে দুই ছেলে আর ওর স্বামী সুখেন। দৃশ্যটা দেখে সুনীতা পর্যন্ত হেসে ফেলল 'এই অত জোরে চাপিস না, লেগে যাবে।'

সুব্রত প্রতিভাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'না পিসি, দিদার মোটেই লাগবে না। দাদু বলেন যৌবনে উনি নাকি গামার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উঠোনটায় হাসির ফোয়ারা উঠল। প্রতিভা এমন অপ্রস্তুত যে পালিয়ে পথ পান না। যেমন নাতি তেমন নাতনি, কারোরই মুখে কিছু আটকায় না। অপরেশই এদের মাথায় তুলেছেন, ছেলেমেয়েরা এরকম ছিল না।

রান্নাঘরে তখন তুলকালাম কাণ্ড। ঠাকুর উনুন ধরিয়ে বসে আছে। জলখাবারের তরকারী কাটা হয়নি। এটা ছোট বউমার দায়িত্ব। অন্যদিন যেমন তেমন আজ সে বেচারা পেরে উঠছে না, বছর চারেক বিয়ে হয়েছে এখনও পেটে কিছু আসেনি। কাজকর্ম যা কিছু বিয়ের পর প্রতিভাই শিখিয়েছেন। বলেছিলেন, 'ঠাকুর চাকর যতই থাক, যে মেয়ে স্বামীর মনের মত খাবার তৈরী করতে পারে না সে কিন্তু কখনই ভাল স্ত্রী নয়।'

প্রতিভা বললেন 'তুমি সবো ছোট, আমাকে দাও।'

ছোটবউমা মাথা নাড়ল 'সেকি, না মা, আপনি আজকে কাজ কববেন কেন? ছি ছি আমাব হয়ে এসেছে।

প্রতিভা দ্বিতীয় বঁটিটা টেনে নিলেন। 'পাকামি কবো না তো। এত লোকে খাবে তুমি ছেলেমানুষ একা কি কবে পাববে।'

কিন্তু প্রতিভাব পক্ষে তবকাবি কাটা বেশীক্ষণ সম্ভব হল না। সুপ্রিয়া ওব স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসেই হৈ চৈ বাধিয়ে দিল, 'একি বউদি, তুমি আজও মাকে খাটাচ্ছ।'

গলা শুনে বড়বউমা ছুটে এল 'ওমা, এ আপনি কি কবছেন?'

চেঁচামেচি শুনে বড় ছেলে ধীবেন বাবান্দায় নেমে এল, 'ছি ছি, তোমবা কি। বাড়িতে এতগুলো বউ মেয়ে, আব মাকে আজকেব দিনে হেঁসেলে ঢুকতে হচ্ছে। তোমাদেব লজ্জিত হওয়া উচিত। এই কাজল দিনকে দিন গিন্নী হচ্ছো একটু বান্নাঘবে গেলে কি মান যাবে?'

কাজলেব গলা শোনা গেল 'দিদাই তো আমাকে ঢুকতে মানা কবেছে ওখানে। তুমি খামোকা আমাকে দোষ দিচ্ছ বাবা।'

ছোটছেলে প্রাণেশ নিজেব বউয়েব উদ্দেশে চেঁচালো 'মাত্র এইকটা লোকেব খাবাব, তাতেও যদি মায়েব সাহায্য নিতে হয় তাহলে বলাব কিছু নেই।'

ব্যাপাবটা এমন হচপচে হয়ে গেল যে ছোটবউ হাঁটুতে চোখ বাখল। প্রতিভা কি কববেন বুঝতে পাবলেন না। তাবপব ছোটবউয়েব কাঁধে হাত বেখে নীচু গলায় বললেন, 'একটা কথা বলি ছোট পুরুষ মানুষেব কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বেব কববে। ওদেব কথায় শুধু হুলই থাকে কিন্তু হুলে বিষ নেই। ওদেব কথা শুনে কাঁদবে কেন বোকা মেয়ে।'

বড়বউমা পাশে এসে বসল, 'আজকেব দিনে মন খাবাপ কবিস না ছোট। ওদেব কথাই ওইবকম। আব আপনিও কিছু মনে কববেন না মা, একটা দিন কাজ না কবলেই কি নয়।'

অতএব প্রতিভাকে উঠতে হল। বাইবে বেবিয়ে আসতেই দুই ছেলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘবে ফিবে গেল জামাইদেব নিয়ে। কাজল বলল, 'তোমাব জন্যে খামোকা বাবাব কাছে বকুনি খেলাম।'

প্রতিভা বললেন, 'আহা মাখনেব পুতুল, গলে গেলেন।' বলাব ভঙ্গী দেখে কাজল পর্যন্ত হেসে উঠল। সুপ্রিয়া এগিয়ে এল, 'একি মা, তুমি আজ নতুন শাড়ি পবোনি।'

সুনীতা মায়েব দিকে তাকিয়ে বান্নাঘবে মুখ ফেবালো 'সত্যি বড় তোমবা এ বাড়িতে কি কবতে আছ বুঝতে পাবি না। আজকেব দিনে মাকে পুবনো কাপড় পবিয়ে বেখেছ।'

প্রতিভা বলে উঠলেন, 'ওবে কি যা তা বলছিস। বউমা তো বলেছিল, আমি বাজী হইনি। এই বুড়ো বযসে এমন আদেখলেপনা মানায় না।'

'কি যা তা বলছ মা।' সুনীতা প্রতিবাদ কবল, 'স্বামী-স্ত্রী পঞ্চাশ বছব একসঙ্গে আছে এবকম ক'টা ঘটনা চোখে পড়ে। আমাদেব মতন ভাগ্যবান আব কে আছো বলো। এবকম দিনে আমবা একটু আনন্দ কববো না।'

এই সময় সুব্রত অপাবেশেব ঘব থেকে বেবিয়ে এল। এসে গলা তুলে বলল, 'না, না, এখন পুবনো শাড়ি অঙ্গে থাক। আমাব সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

সুপ্রিয়া বলল, 'কি ব্যবস্থা?

সুব্রত জানাল, 'আমি চাকবী পেয়েছি বলে তোমবা খেতে চেয়েছিলে। তা সেই টাকাটা আমি অন্যভাবে খবচ কবব আজ। দুই পিসী এবং মা কাকীমা, তোমবা পাঁচ মিনিটেব জন্যে বাবাব ঘবে এসো। ও, ওখানে তো সবাই আছে, ভালই হয়েছে। একটা জরুবী আলোচনা সেবে নেওয়া যাক। আব দিদা, তোমাব হাজব্যান্ড তোমাকে ডাকছেন কিন্তু আমি বলেছি আজ বিকেলেব আগে দেখা হবে না। কাজল, তুই দিদাব কাছে থাক। দিদাকে আজ চা ছাড়া কিছু

সলিড খেতে দিবি না।'

কাজল বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, ছুটে এসে সে প্রতিভার দু হাত চেপে ধরল।

এরা যে এতটা করবে প্রতিভা বুঝতে পারেননি। একই সঙ্গে অস্বস্তি, সঙ্কোচ এমনকি বেশ রাগও হচ্ছিল। রাগটা অপরেশের ওপর। ঘটা করে নাতি নাতনিদের বলতে যাওয়া হয়েছিল। এখন উনি তো সেঁধিয়ে আছেন ঘরের কোণে। যত জ্বালা হয়েছে প্রতিভার। প্রতিভা বললেন, 'হাত ছাড় বাপু, আর পারি না।'

কাজল চোখ পাকিয়ে বলল, 'যাবে কোথায়? উহু দাদুর ঘরে তোমার যাওয়া চলবে না। ঠিক আছে, তুমি এই ঘরে এসো।'

প্রতিভা হাল ছেড়ে দিলেন। কাজল ওকে ওর ঘরে নিয়ে এল।

'ইস, কি নোংরা করে রেখেছিস ঘরটাকে। এত বড় মেয়ে, একটুও লক্ষ্মীশ্রী নেই?'

'তোমাদের মত অত পিটপিটুনি আমার ভাল লাগে না।'

'তাই বলে বাসি শাড়ি পেটিকোট চারধারে ছড়ানো থাকবে? বইগুলোর কি দশা।'

'ঠিক আছে, দশা তো দশা তুমি এখানে চুপ করে বসো।' কাজল দ্রুত হাতে বিছানাটা ঠিক করে বলল, 'তোমার বিয়ের বেনারসীটা এখনো তোলা আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জল যেন বরফ হয়ে গেল। প্রতিভার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কাজল সেদিকে লক্ষ্য না করে বলল, 'ঠিক আছে না থাকলে ম্যানেজ হয়ে যাবে। তুমি এখান থেকে নড়ো না আমি ওদিকে কি হচ্ছে দেখে আসি।

কাজল বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রতিভা খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। ওঁর বুকের ভেতর সেই চাপা কষ্টটা যেন ওজন বাড়াচ্ছিল। একি গেরোতে পড়লেন তিনি। পঞ্চাশ বছর পরে এদের খেলার সামগ্রী হতে হল। হ্যাঁ, বেনারসীটা এখনও যত্ন করে তোলা আছে। পঞ্চাশ বছর আগে যেটা পরে তিনি অপরেশের সঙ্গে ট্রেনে উঠেছিলেন। কিন্তু বুকের মধ্যে উথাল পাথাল শুরু হল প্রতিভার। এই ঘরে বেশীক্ষণ বসতে পারলেন না তিনি। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দেখলেন বারান্দা কিংবা উঠোন ফাঁকা। ওরা বোধহয় এখন ধীরেশের ঘরে।

বারান্দা পেরিয়ে নিজেদের ঘরে চলে এলেন প্রতিভা। নিজের বাড়ি নিজের বারান্দা তবু হাঁটতে অস্বস্তি হচ্ছে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন অপরেশ বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে আছেন, চোখ বোজা। বুকের ওপর খবরের কাগজটা ভাঁজখোলা হয়ে রয়েছে। ছিলা ছাড়া তীরের মত ছিটকে এলেন প্রতিভা, অপরেশের মুখের সামনে এসে চাপা গলায় শুধোলেন, 'এসব কি করছ?'

চমকে উঠেছিলেন অপরেশ, খবরের কাগজটা পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললেন, তারপর দুচোখে প্রশ্ন করলেন, 'কি?

'সুবুকে তুমি লেলিয়ে দিয়েছ?'

'ওই নিজে থেকে বলল।'

'কিন্তু তুমি রাজী হলে কেন?'

'ওটা হওয়া দরকার' অপরেশের গলা পরিষ্কার।

'দরকার? এতদিন এই দরকারী কথাটা মনে ছিল না?'

'ছিল। কিন্তু গুরুত্ব দিইনি।'

'তার মানে বুড়ো বয়সে তোমার পাপবোধ হল?' প্রতিভার গলাটা ধরে গেল।

অপরেশ উঠে বসলেন, 'না, পাপ আমি কখনও করিনি। প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রশ্ন তাই না। তুমি এই ব্যাপার নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?'

প্রতিভার চোখে জল, গলায় কি যেন কি, বললেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে আজকের রাত্রে

'কি বলেছিলে ভুলে গেলে?'

ভুলিনি। প্রভা, পঞ্চাশ বছরে এমন একটা দিনের কথা বলতে পারো যেদিন আমি তোমার অসম্মান করেছি?' অপরেশ কাতর গলায় প্রশ্ন করলেন

প্রতিভা জবাব দিলেন না, কিন্তু তাঁর দু চোখের ধারা বন্ধ হচ্ছিল না।

অপরেশ নীচু গলায় বললেন, 'ওরা যা করছে করতে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা মুখ তুললেন, 'বুড়ো বয়সে টোপর পরার খুব শখ হয়েছে না? লজ্জার মাথা খেয়েছ?'

অপরেশ এবার হাসলেন, 'এ কথাই যদি বলো তা আমাদের এমন একটা বয়স যখন লজ্জাঘেন্না থাকার কথা নয়। আর কখনও তো টোপর পরিনি তাই আজ যদি নাতি নাতনি ওটা পরায় তো একটু লোভ হয় বইকি।'

প্রতিভা কিছুক্ষণ শূন্যচোখে অপরেশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অদ্ভুত নিস্তেজ গলায় বললেন, 'আমার ভয় করছে।'

'কেন?'

সব যদি ভেঙে পড়ে।'

'কিছুই ভাঙবে না। স্রোতের সঙ্গে ভেসে চল প্রভা। ভাসতে ভাসতে দেখবে কিছু না কিছু গায়ে এসে ঠেকবে, সেইটুকুই লাভ।'

সেটা তো লোকসানও হতে পারে।'

'লাভও তো হতে পারে।'

যাই বলো আমার মন মানছে না। এতদিন পরে তিল তিল করে এই সংসারটাকে সাজালাম, যদি কিছু হয়—'

কিছু হবে না।' অপরেশ যেন নিশ্চিন্ত।

প্রতিভা ওঁর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন কি সাধারণ গলায় কথা বলছে মানুষটা। কোন তাপ উত্তাপ নেই প্রতিভা এবার সত্যি কথাটা বললেন, 'ওরা ছেলেমানুষী করছে আর তুমি তাতে সায় দিচ্ছ। কিন্তু আমি পারব না।

'প্রভা এবার অপরেশ একটু বিচলিত।

'হ্যাঁ সেই রাতের কথা আমার— আমি পারব না।'

'পঞ্চাশ বছরেও সেই রাতটাকে ভুলতে পারলে না প্রভা'

'ভুলে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করো তাকে আমার একটুও মনে নেই একবার হয়তো দেখেছিলাম কিন্তু আজ মুখটাকেও মনে করতে পারব না। কিন্তু বিয়ের আসরটাকে—'

প্রভা, তুমি তোমার চার ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছ'

'দিয়েছি। তুমি কি আমাকে একবারটির জন্যেও ওদের বিয়ের আসরে যেতে দেখেছ।'

অপরেশ কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ক্রমশ ওঁর মুখ কালো হয়ে আসছিল। মাথা নীচু করে বললেন, 'ভেবেছিলাম সব ভুলে গেছ তুমি।'

প্রতিভা কি করে বোঝান ওটা একটা কাটা দাগের মত। কবে রক্ত পড়েছিল জ্বালা করেছিল এখন শুধু শরীরে দাগ রয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামালে নয়। সময়ে সেটা মিলিয়ে যেতে যেতে যেটুকু রয়ে গেছে সেটুকু ভুলেও চোখে পড়ার কথা নয়। কেউ যদি মোটা আঙুল সেই দাগে বোলায় তখনই হয়তো জ্বালা কিংবা রক্ত নয় কিন্তু অনুভূতিটা ফিরে আসে। এও ঠিক সেইরকম।

খবরের কাগজটাকে ভাঁজ করে অপরেশ বললেন, 'আমি তোমাকে কোনদিন শাসন করিনি প্রভা, কোনদিন জোর করে কিছু চাপিয়ে দিইনি কিন্তু আজ আমি বলছি নাতিনাতনিরা যা চাইছে

তাই হোক।'

'এতদিনে নিজের ওপর বিশ্বাস হারালে?'

'এতদিনে মুক্ত হলাম।'

'মুক্ত! মানে?'

'সব মানে জানতে চেও না প্রভা। আমরা তো জীবনের পঁচানব্বুই ভাগ শেষ করে এসেছি। এখন ঈশ্বর ছাড়া কারো কাছে কৈফিয়ত দেবার কথা নয়। কিন্তু ওই পাঁচ ভাগের জন্যে মানুষকে আমাদের প্রযোজন হচ্ছে। ওদের খেলা যদি আমাদের মুক্ত করে সেইটুকুই লাভ।'

'কি মুক্তি বলছ? আমি কি তোমাকে জোর করে বেঁধে রেখেছি?'

'ছি প্রভা অবুঝ হয়ো না।'

ঠিক এইসময় উঠোনে ওদের কথাবার্তা শোনা গেল। প্রতিভা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাইরে কাজলের গলা পাওয়া গেল 'দিদা দিদা কোথায় গেলে?'

প্রতিভা চাপা গলায় বলল 'এখনই চেঁচামেচি শুরু করবে।'

ঠিক বালিকার মত প্রতিভা দ্রুত পাশের ঠাকুরঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজল দরজায় এসে দাঁড়াল। একবার চোখে ঘরটাকে দেখল তারপর বড় বড় পা ফেলে অপরেশের সামনে এসে বলল, 'দিদা এই ঘরে এসেছিল?'

ওকি এল, ওকি এল না বোঝা গেল না। অপরেশ নাতনির হাত ধরলেন।

'ইস মাগো একটুও লজ্জা নেই। বিয়ের নামেই গান গাওয়া হচ্ছে।'

'তবে বিয়ের পাত্রী যদি বদলে যেত তাহলে আরো নির্লজ্জ হতে পারতাম।'

'থাক অনেক হয়েছে। আচ্ছা তোমাকে বাবা কাকা পিসিরা এত ভয় পায় কেন? আর একটা নাম বললি না তো।'

'কে? হ্যাঁ, দিদাও। শোন তারা সবাই মিলে ঠিক করেছে আজ সন্ধেবেলায় তোমাদের সুবর্ণজয়ন্তী বিবাহ পালন করবে। একদম ঠিকঠাক যেমন করে বিয়ে হয় সেইসব নিয়ম মেনে। তবে তোমাদের বয়স হয়েছে বলে বর কনের মত সব নিয়ম মানতে হবে না মানে খেতে টেতে পাবে। এটা অবশ্য [illegible] আমাদের মানতে হয়েছে।'

'তাহলে আমার পাঞ্জাবিটাকে [illegible] আর ধুতিটাকে কুঁচিয়ে রাখিস।'

'ওমা তুমি যে পা বাড়িয়ে বসে আছ আর দিদা বিয়ের নামে উধাও হয়ে গেছে। দেখি কোথায় গেল।' কাজল যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। অপরেশ এবার খাট ছেড়ে নীচে নামলেন। তারপর খবরের কাগজটা নিয়ে ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে একটা উপায় ভাবছিলেন। এটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার। অবশ্য যে জায়গাটায় ওটা ছাপা হয়েছে সেটুকু ছিঁড়ে ফেললেই ল্যাটা চুকে যায় কিন্তু ছিঁড়লেই তো সকলের নজরে পড়বে। বয়স হয়ে গেলে লুকোবার জায়গাগুলো বড্ড কমে যায়।

'কেমন আছ বাবা?' সুনীতা ঘরে এসে দাঁড়াল। পেছনে ওর স্বামী।

অপরেশ মেয়েকে দেখলেন। ঠিক উনপঞ্চাশ বছর বয়স এখন। ও যখন হল তখন খুব সামান্য রোজগার করতেন তিনি। ওর ছেলেবেলায় অপরেশ ওকে কিছুই দিতে পারেননি। বললেন 'কখন এলি?'

'এই তো। আজ তোমাদের নিয়ে খুব কাণ্ড হবে।'

'হুঁ।'

'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'ওই আর কি। তুই কেমন আছিস?'

'আমার কথা আর বলো না। পেটটাই শত্রু হয়ে গেল। একটু [illegible] কিছু খেলে তিনদিন

বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। ছেলে মেয়েদের ধকল সামলে হাঁপিয়ে উঠি।' সুনীতা স্বামীর দিকে তাকাল।

বড় জামাই বলল, রোজ যদি তিনটে বাজিয়ে দেয় খেতে তাহলে শরীরের কি দোষ বলুন নিজে যদি নিজের শরীরের অযত্ন করে তাহলে ওষুধে কি হবে।'

এই সময় সুপ্রিয়া এল। বড় ও ছোটর বয়সের ব্যবধান অনেক, ব্যবহারেও। সুপ্রিয়া এসে চুপ করে বসে রইল খাটে। ওর স্বামী বোধহয় প্রাণেশের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে এই মেয়ের বিয়েটা ঠিকঠাক হয়নি বলে মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর। ওদের দুজনের স্বভাবের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশী। কতদিন মানিয়ে থাকতে পারবে কে জানে।

'তোর শরীর ভাল আছে তো?' ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন অপরেশ।

নীরবে মাথা নাড়ল সুপ্রিয়া।

তোরা দুই বোনে কিছুদিন থেকে যা না এখানে।

সুনীতা বলল, তাহলেই হয়েছে। দুদিন সংসার ছেড়ে এলে ওদিকে ত্রাহি রব উঠবে। একমাত্র শ্মশানে যাওয়ার আগে মুক্তি পাবো না।'

'আঃ, যত বাজে কথা। তোর স্বভাব খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছি এসব কুকথা খামোকা না বললে সুখ পাস না, না?' বেশ জোরেই ধমক দিলেন অপরেশ। সুনীতা কিন্তু রাগ করল না হেসে বলল, 'তুমি বুঝবে না। কখনো তো সংসার চালাওনি সব ঝক্কি মা একা সামলাচ্ছে।

কিন্তু তোমার মা কোনদিন এসব বাজে কথা বলেনি।' কথাটা বলেই অপরেশের মনে হল বলাটা ঠিক হয়নি। কারণ ওদের মুখের হাসিটা অস্বস্তিকর।

বড় জামাই নীচু গলায় বলল, এখন এই হয়েছে বাবা, মেজাজ কিছুতেই ঠাণ্ডা থাকে না।

এই সময় ছোট বউমা অপরেশের খাবার নিয়ে এল। ট্রেতে এক গ্লাস হর্লিকস আর গোটা চারেক বিস্কুট। অথচ এই সময় রোজ পেট ভর্তি জলখাবার খান অপরেশ ট্রের দিকে তাকিয়ে ওঁর কপালে ভাজ পড়ল। ছোট বউমার দিকে একনজর দৃষ্টি বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার।'

ছোট বউমা মাথা নীচু করে বলল, ওরা বললেন আজ এই দিতে

'কেন? আমি কি আমাশার রুগী?'

সুনীতা বলল, বাঃ, আজ তোমাদের বিয়ে দিচ্ছে নাতিনাতনি বিয়ের দিন কি কেউ খায় নাকি?' কথা শেষ করে সে হাসল। এবং অপরেশ বুঝলেন ব্যবস্থাটায় এদের প্রত্যেকের সম্মতি আছে।

এইসময় কাজল ফিরে এল, 'কি আশ্চর্য ও বড় পিসিমা দিদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

'সেকি' সুনীতা চমকে উঠল 'পাওয়া যাচ্ছে না মানে?

'সমস্ত বাড়ি খুঁজে কোথাও দেখতে পেলাম না। বাথরুমেও নেই।'

প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সুনীতা, ছোট বউমা এবং জামাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অপরেশ দেখলেন সুপ্রিয়ার নজর ঠাকুরঘরের দিকে। তিনি হাসলেন, ঠিক ধরেছিস। যা ওকে ডাক।'

'বাবা।'

হরলিক্সে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্ক গলায় অপরেশ জবাব দিলেন, 'কি।'

'বাবা।' এবার সুপ্রিয়ার গলা ধরে এল

কি হয়েছে মা।' অপরেশ গ্লাসটাকে টেবিলে রেখে মেয়ের দিকে তাকালেন। দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ডুকরে উঠল সুপ্রিয়া, 'আমি কখনও মা হতে পারব না '

বুকের ভেতর লোহার বলটা যেন ছিটকে উঠল। অপরেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে

গেলেন। শেষ পর্যন্ত গলায স্বব ফুটলো, কি কবে জানলি?

ডাক্তাব বলেছে। ঘবে এখনও সুপ্রিয়াব কান্না ফোযাবাব মত ছিটকে উঠছে। কি কববেন অপবেশ। এখন চেযে থাকা ছাড়া আব কি বা কবা যায়? এই মেযে একটু একটু কবে বড় হল চোখেব সামনে পূর্ণতা পেল তাকে নিষ্ফলা জানাব পব কিছু কি কবাব থাকে। ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে বন্ধুব মত কোনকালেই মেশাব সময় পাননি কিন্তু এইটিব ওপব তাব খুব টান ছিল। বিযেব পব চাব পাশ ফাকা লাগতো। সেই মেয়ে আজ কি শোনালো। অপবেশেব খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধবতে, কিন্তু পা এগোয় নি। তিনি বলতে পাবলেন, ডাক্তাবও তো ভুল কবতে পাবে, একবাব কাউকে দেখালে, আমি চিনি।

এই মুহূর্তে কোন ঘটনা তিনি চাইছেন না কিন্তু বলতে পাবে হালকা লাগতো কিছু।

সুপ্রিয়া নিজেকে সামলে নেবাব চেষ্টা কবছে প্রাণপণে এমন সময় ঠাকুবঘবেব দবজা খুলে প্রতিভা বেবিয়ে এলেন। মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয না অনেকখানি কেঁদে নেওয়া হয়েছে এব মধ্যে। অপবেশ দেখলেন দুটো মুখে একই ছবি, একজন অতীতেব কথা ভেবে অন্যজন ভবিষ্যতেব দিকে তাকিয়ে।

অপবেশ স্বাভাবিক গলায় বলতে চেষ্টা কবলেন, ওই তো, ওদেব মা এসে গেছেন কোথায় থাকো? এদিকে বাড়িসুদ্ধ লোক তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রতিভা কথাটাকে আমলই দিলেন না। একটু বিস্মিত চোখে মেযেব দিকে তাকিয়ে কাছে এগিয়ে গেলেন, কি হয়েছে তোব?

ঘাড় নাড়ল সুপ্রিয়া, কিছু না।

এবকম মুখ কবে বসে আছিস কেন? প্রতিভা একবাব মেযে আব একবাব অপবেশেব মুখেব দিকে তাকিয়ে কাবণটা বুঝতে চাইছিলেন।

অপবেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি ওকে বকেছি বলে কাঁদছে।

কেন? কি কবেছে ও? সত্যি, ওই একটি জিনিস ছাড়া তুমি বোধহয় কিছু জানো না।

প্রতিভা ঘবেব বাইবে যেতেই উঠোনে হই চই উঠল। তাব দেখা পেতেই যেন সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। অপবেশ মেযেব কাছে এসে কাঁধে হাত বাখলেন, চুপ কবে বসে থাকিস না মা। ভগবানেবও যে ভুল হয ডাক্তাব তো সাধাবণ মানুষ। ওঠ, সহজ হ।

সুপ্রিয়া উঠল, তাবপব মাথা নীচু কবে বাইবে পা বাড়াল। হঠাৎ কি হল অপবেশেব, কোনদিন যা বলেন না আজ তাই বললেন, এবাব আমাব কাছে কিছুদিন থেকে যাবি মা?

সুপ্রিয়া যেন এবকম কিছুব প্রত্যাশায় ছিল, মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে বাবান্দায় নামল।

দুপুবেও আহাব জুটলো না। সববত আব মিষ্টি খেতে হল। বযস বাড়াব পব মিষ্টিটাকে এড়িয়ে চলেন অপবেশ। ডায়াবেটিস এখনও থাবা বাড়ায়নি কিন্তু ওৎ পেতে যে নেই তাই বা কে জানে। সেবাব মাথা ঘুবে পড়ে যাওযাব পব ডাক্তাব বলে দিয়েছিল দুশ্চিন্তা একদম কববেন না। বললেই যেন দুশ্চিন্তা বন্ধ কবা যায়। কাজলকে দিয়ে এক কৌটো জর্দা আনিয়েছিল কিছুদিন আগে পানেব সঙ্গে সেটা খেলে গা গবম হয। কিন্তু তা খেতে হয প্রতিভাকে লুকিয়ে চুবিয়ে। কৌটোটা বয়েছে ববীন্দ্র বচনাবলীব পেছনে। প্রয়োজনে বেব কবা সম্ভব হয না প্রতিভা ঘবে থাকলে।

খাবাব নিয়ে ভেবেছিলেন চেঁচামেচি কববেন। বুড়ো বযেসেব একটা মানুষকে ওবা না খাইযে বাখছে এ কেমন বসিকতা। কিন্তু সুব্রত আব কাজল যেভাবে বুঝিযে গেল তাতে সে ইচ্ছেটাকে বাতিল কবতে হল। বড় ছেলে ধীবেশ এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ কবেনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ও চুপ কবে গেল। প্রতিভা যে সেই ঘব ছেড়ে বেবিয়েছেন আব ফিবে আসেননি।

মিষ্টি খেয়ে অপরেশ বারান্দায় এলেন। হায় ভগবান, ওরা এর মধ্যেই বাড়িটার রং পাল্টে দিয়েছে। উঠোনে ছাদনাতলা হয়েছে। কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। মাথার ওপর সামিয়ানা। কে যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, গায়ে হলুদটা হল না? [illegible] বড় বউমা রেগেই জবাব দিলেন, ভদ্রপুরে ও কথা মনে করে কি হবে।

অপরেশের বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছিল। একটু আগে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হবে কিনা। তিনি 'না' বলে দিয়েছেন। বন্ধু বলতে [illegible] এখন কেউ নেই। দু একজন সমবয়সী পরিচিত আছেন মাত্র। তাঁদের [illegible] ডেকোরেটরের লোকজনদের দেখে বুঝতে পারলেন ওরা অনেককেই হয়তো নিমন্ত্রণ করেছে। অপরেশ আবার ঘরে ফিরে এলেন। আর তখনই কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল। [illegible] কে নিয়ে গেল? লুকিয়ে রাখবেন ভেবেছিলেন কিন্তু রাখা হয়নি। [illegible] বাড়িতে। সারাবাড়ি অপরেশের কাগজ নিয়ে টানাটানি করা হয় [illegible] গলা তুলে বললেন, 'কাগজটা কে নিয়ে গেল?'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর বড় বউমার গলা শোনা গেল, কে নিয়ে এসেছে কাগজে? একটু বাদেই [illegible] নিয়ে [illegible] হয়ে গেছে।'

[illegible] মাথা নেড়ে সেটি হস্তগত করে বিছানায় ফিরে এলেন তিনি। তারপর সন্তর্পণে [illegible] বালিশের তলায় চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন অপরেশ। সকালবেলায় বারান্দার দিকে [illegible] ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেননি কিন্তু নীচের লেখাগুলো পড়বার পর থেকেই তার [illegible] ভয় করছিল। সুব্রত কাজল যখন আব্দার করল তখন মনে হল এটাই এই ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা। চট করে রাজী হয়ে গেলেন। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে তাদের একসঙ্গে থাকার কাল। পঞ্চাশটা বছর ধরে একসঙ্গে অনেক সুখ এবং দুঃখ [illegible] আরো চারজন এসেছে। তাদের বিয়ে থা দিয়ে এখন [illegible] আধুনিকতা তিনি পছন্দ করেন না আর এই সংবাদটা পেয়েছে বলেই [illegible] একটা আপাত কনজারভেটিভ পরিবেশ ভাঙছে। এসবই ভেঙে পড়বে [illegible] যাবে যদি ওরা জানতে পারে অপরেশ এর [illegible]

এতদিন এসব কথা ভাবেননি অপরেশ। আজ [illegible] কি হবে [illegible] পারে একথা? ওরা কি নিজেদের জারজ ভাববে [illegible] ফসল হিসেবে নিজেদের গায়ে থুতু দেবে? অপরেশ জানেন না [illegible] না। হয়তো আত্মহত্যা করতে পারে সে। মেয়েদের ওপর নিশ্চয়ই চাপ আসবে তাদের শ্বশুরবাড়ি থেকে। কাজল আর সুব্রত কি করবে তিনি জানেন না কিন্তু এক মুহূর্তেই এই সুন্দর সংসার তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। নিজে প্রেম করে বিয়ে করেও ছেলেমেয়ের প্রেম সহ্য করতে পারে না এরকম ঘটনা তো আকছার দেখা যায়। কিন্তু যদি পিতামাতা অবিবাহিত— এই সত্যটি সহ্য করা যে বড় মুস্কিল হবে ওদের কাছে। শোনার পর কি ছেলেমেয়েরা ওদের মৃত্যু কামনা করবে? বড় ভয় হল, তাই সুব্রতদের কথায় রাজী হয়ে গেলেন। পঞ্চাশ বছর পর ওরা বিয়েটার নবীকরণ করতে চাইছে, সেই সুযোগে আসল কাজটি সেরে নেওয়া যেতে পারে। তারপর যে যাই বলুক কিছু এসে যায় না।

কিন্তু এতদিন কি কিছু এসে যাচ্ছিল? এতদিন কি বুক ফুলিয়ে অপরেশ পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াননি? একথা ঠিক প্রতিভা বাড়ি থেকে একদমই বের হতো না কিন্তু চেষ্টা করলে কি অপরেশের খোঁজ পাওয়া যেত না? এটাই ওঁর কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। সেই মানুষটা এত নির্লিপ্ত হয়ে রইল কি করে? একটাও খোঁজ করল না, পুলিশকে জানালো না।

প্রতিভার মামা না হয় লজ্জায় ঘেন্নায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া চলে। ব্যাপারটা প্রথম দিকে অপরেশের ভাবনায় আসতো। কিন্তু কখনই তিনি প্রতিভার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেননি। গোড়ার দু'তিনটে মাস কেটে গেলে প্রতিভা ভুলেও এসব প্রসঙ্গ তোলেনি। ছরের ধুলোগুলো জমে জমে ঢেকে দিয়েছে সেই রাতটাকে। কিন্তু আজ সকালের খবরের কাগজটা যে এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে ওটাকে নগ্ন করবে এটা কল্পনা করেননি অপরেশ।

অপরেশের প্রথম চাকরী কানপুরে। ভার্গবদের বিরাট চামড়ার ব্যবসায় মোটামুটি মাইনেতে তর একার চলে যাচ্ছিল তখন বয়স চব্বিশ চলছে। টগবগে যৌবন। বিয়ে-থা করার জন্য কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে। এই সময় উনি প্রতিভাকে দেখতে পেলেন প্রথম দেখায় জড়িয়ে গেলেন।

কাছাকাছি বাড়ি অথচ দুই-একবার কথা হয়েছে কি হয়নি কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্রতিভারা ব্রাহ্মণ, বাপ মা নেই, মামার কাছে মানুষ। প্রতিভার মামার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে ভাগ্নীকে ঘাড় থেকে নামাতে তিনি একটি সৎ ব্রাহ্মণ পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত। অপরেশ ব্রাহ্মণ নন জানার পর তাঁর সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না ভদ্রলোকের। এই সময় প্রতিভার চিঠি এল অপ্রত্যাশিতভাবে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে কিছু একটা করুন।

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল অপরেশের। এই মাইনেতে বিয়ে করা যায় না। অথচ প্রতিভাকে তাঁর চাই। বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত ছেড়ে ছেড়ে তখন তিনি ক্লান্ত। শেষ পর্যন্ত গৌহাটির এক ওষুধের কোম্পানী থেকে ডাক এল ইন্টারভ্যুর। চাকরীটা হবে ভাবতে পারেননি। খুশী মনে কানপুরে পুরনো পাট চুকোতে ফিরে এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন। দিন সাতেকের মধ্যেই নদীর জল অনেক এগিয়ে গেছে। সেদিনই প্রতিভার বিয়ে। পাত্র কানপুরের একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর গৌহাটিতে চাকরী পাওয়ার খবর ওখানে না জানিয়ে তিনি ভার্গবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন। সেই রাতের ট্রেনে ফিরে যাবেন এমন ব্যবস্থা ঠিক

রাত এগারটায় ট্রেন। স্টেশন তেমন দূরে নয়। প্রতিভার বিয়ে সন্ধ্যে লগ্নে চুকে গেছে জিনিসপত্র নিয়ে বেরোতে যাবেন এমন সময় সে এল বেনারসী নয় সিল্কের শাড়িতে প্রতিভা ঝকঝক করছে। এই সময় যত কাছেই হোক, বিয়ের কনে বাড়ি থেকে বের হতে পারে তা কল্পনায় ছিল না।

উত্তেজনায় কাঁপছিলেন প্রতিভা চিঠিটা পেয়ে কিছুই করলেন না?'

অপরেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তুমি'

শুধু প্রশ্নটা করব বলে এসেছি।

'করতে চেয়েছিলাম। যখন খবরটা তখন সময় পেরিয়ে গেছে।

সময় কি সত্যি পেরিয়ে গেছে?'

ওর হাতে শাঁখা কপালে সিঁদুর। অপরেশ কথাটার মানে বুঝতে পারছিলেন না।

আমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে?'

'না। নেই।'

অপরেশ ওই দুটি কথাই বলতে পেরেছিলেন। এবং সেই রাত্তিরেই কানপুরের ট্রেন ধরেছিলেন ওঁরা। একটুও দ্বিধা করেননি প্রতিভা। স্টেশন অবধি কি আশংকায় কেটেছিল। প্রতিভাকে দেখে বিয়ের কনে বলে না মনে হওয়ার কোন কারণ ছিল না কানপুর বলে তবু পক্ষে কিন্তু কনের বাড়ি থেকে যে লোকজন বেরিয়ে পড়বেই খোঁজাখুঁজি করতে। অথচ কিছুই হল না। স্বচ্ছন্দে গৌহাটি চলে এলেন ওঁরা। নতুন জায়গায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে চমৎকার মানিয়ে গেলেন দুজনে। শাঁখা-সিঁদুর থাকায় কোন ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। কিন্তু প্রতিদিন মনে হতো এই বুঝি পুলিস এলো সেই আশংকায় একটার পর একটা চাকরী ছেড়েছেন আর জায়গা

পাল্টেছেন অপরেশ। প্রতিভা কোনকালেই বাইরে বের হতে চাইতো না কানপুরের কেউ দেখে ফেলবে সে আশংকা তাই কম ছিল। মাঝখান থেকে অপরেশের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য কোনদিন আফসোস হয়নি। যে সত্যটা তাকে খুব আলোড়িত করে তা হল, সামান্য আলাপ এবং কোমল সম্পর্কটাকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছিল প্রতিভা যে বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে সরাসরি চলে এসেছিল যাচাই করতে? একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'সেই এলে তো বিয়ের আগে এলে না কেন?'

প্রতিভার যুক্তিতে সত্য ছিল। সেদিনই তো তিনি কানপুরে ফিরেছেন। ফিরে খবর শোনার পর আর বাড়িতে থাকেননি। সব কিছু চুকিয়ে সন্ধের পর ঘরে এসেছেন। প্রতিভার পক্ষে তার দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না। জানতে চেয়েছিলেন যদি বাজে লোক হতাম তোমার কথায় প্রতিভা হেসেছিলেন ভেবো না বলব আত্মহত্যা করতাম আমি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতাম তোমাকে কাপুরুষ ভেবে।

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের আইন বা ধর্মের বিয়ে হয়নি। তুমি কি তাই চাও?

এক মুহূর্ত ভেবেছিলেন অপরেশ তারপর হেসে বলেছিলেন কোন দরকার আছে? মনের চেয়ে কি ধর্ম এবং আইন বড়? যে মুহূর্তে তুমি আমার কাছে এসেছ সেই মুহূর্তে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার বিবেক পরিষ্কার তো

অপরেশ জানিয়েছিলেন তিনি এ-ব্যাপারে মুক্ত

তারপর তো পঞ্চাশটা বছর কেটে গেল। একটাও ঢেউ ওঠেনি আর পাঁচটা বিবাহিত দম্পতির মত তাঁরা সহজ স্বচ্ছন্দ। ঠিক এই সময় ওই কাগজে দেখতে পেলেন অপরেশ খবরটা সঙ্গে সঙ্গে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা ভয় যা কিনা বাইরে থেকে নয় ভেতর থেকেই উঠে আসছে। তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই নাতি-নাতনিদের আবদারে সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন অপরেশ। কিন্তু একথা তো বোঝানো যাবে না প্রতিভাকে জানেন এ নিয়ে কথা বললে প্রতিভার কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে তাকে। অতএব এই ভাল এখন তো ধর্মের বিয়েতে আপত্তি নেই।

খবরটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল। কারণ বিকেল হতেই আত্মীয় স্বজনরা এসে পড়লেন। পাড়াপ্রতিবেশীও এমন কি কাগজের লোকেরাও। তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হল অপরেশকে

সন্ধে নাগাদ সুনীতা এল নতুন পাঞ্জাবী-ধুতি নিয়ে। বলল, 'বাবা এগুলো পরে নিতে হবে। এখন ঘর ভর্তি লোক। বয়স্করাই এখানে বসেছেন। অপরেশ লক্ষ্য করছিলেন যে কোনদিন তাঁর সামনে হালকা কথা বলার সাহস পেত না সেও আজ রসিকতা করছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে এবার একটু দুর্বল বলে মনে হল নিজেকে। শেষ পর্যন্ত ওর হাতে ছেড়ে দিলেন সব।

প্রতিভার দর্শন সকালের পর আর পাননি তিনি। সারাদিন ধরে ইচ্ছে করছিল নিভৃতে ওর সঙ্গে একটু কথা বলেন। সুযোগ পাওয়া যায়নি কিংবা প্রতিভা নিজেই সুযোগ দিতে চাননি। খবরের কাগজটাকে এখন নিরাপদে রেখেছেন অপরেশ। আলমারির জামাকাপড়ের তলায় পাতা পুরোন কাগজ ফেলে দিয়ে আজকেরটাকেই ভাঁজ করে রেখেছেন। কারো চোখে পড়বে না।

হাসি চিৎকার চেঁচামেচিতে উঠোনটায় বিয়েবাড়ির পরিবেশ। ওখান থেকে যখন হুকুম হল বর আনো বর আনো তখন ছুটে এল সুব্রত আর কাজল। দাদুকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে এল আসরে। সমবেত দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠল ওঁকে দেখে। আসবার সময় কাজল তাঁর রূপটি দেখিয়ে দিয়েছে আয়নায়। ভাঙা গাল, বয়সের নখরসা মুখ অথচ সব মিলিয়ে কি উজ্জ্বল

দেখাচ্ছে। মাথায় টোপর পরার পর সত্যি বলতে কি একটু লজ্জাই লাগছিল তার। জীবনে প্রথমবার এই বেশধারণ।

কিন্তু ছাদনাতলায় ও কে বসে? লাল বেনারসীর পুঁটুলিটাই কি প্রতিভা? মাথা নীচু করে থাকায় মুকুটটি বর্শার মত দেখাচ্ছে। কেউ যেন চেঁচালো, ও দিদিমা, দ্যাখো দাদুকে কেমন দেখাচ্ছে?

কাজল কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, পঞ্চাশ বছরে কোন চেঞ্জ হয়েছে?

বিয়ের প্রতিটি কাজ মেয়েরা যত্ন নিয়ে করছে। ছোট জামাই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, 'পের বিয়ে দেখা কি উচিত?' বোধহয় সুপ্রিয়ার প্রতি কটাক্ষ এটা কিন্তু অন্যদেরও মনে লাগল খোঁচাটা। কিন্তু পুরুতমশাই জানিয়ে দিলেন, সুবর্ণজয়ন্তীর বিবাহ তো ছেলেমেয়েরাই দেয়।'

আলোচনা কানে আসছিল কত ভাগ্য হলে তবেই না পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন কাটানো যায়। ক'জনের ভাগ্যেই বা ঘটে এমন?

জামাইরা এসে পিঁড়ি ধরল। অপরেশ দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ প্রতিভাকে পিঁড়িতে বসিয়ে ওরা তাকে পাক দিচ্ছে। তারপর মুখোমুখী হলেন ওরা। এবং যতই মুখ নামিয়ে থাকুন অপরেশ বুঝতে পারলেন যে কোন মুহূর্তেই প্রতিভা কেঁদে ফেলবেন। ওর হাতের আঙুল কাঁপছে। অপরেশের খুব ইচ্ছে করছিল বলেন, প্রভা একটু শক্ত হও। অন্তত সবার সামনে কিছু করে বসো না। এই সময় চিৎকার চেঁচামেচিতে কান রাখা দায়। সুব্রত বলল, দাদু, এবার মালা বদল হবে। কাজল বলল সেকি রে! আগে শুভদৃষ্টি হোক, তারপর তো—। জামাইরা বলল, 'আর পারছি না ধরে রাখতে, তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি—।' কে যেন ফুট কাটলো, 'পঞ্চাশ বছরের ভার জমেছে তো হাজার হোক।

কাপড় দিয়ে চাঁদোয়া করা হল কাজল এল দাদুর পাশে সুব্রত দিদার। বলল, 'এবার দাদুর চোখের দিকে তাকাও।

কাজল বলল খবরদার দাদু, দিদাকে এখন চোখ রাঙাবে না বেশ রোমান্টিক চোখে তাকাও তো।

অনেক অনুরোধে প্রতিভা মুখ তুললেন। চোখের পাতা খুলতেই অপরেশ সেখানে টলটলে জল দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজল উলু দিল মেয়েরা। শুধু কাজল বলল, 'ওমা, দিদা তুমি কাঁদছ কেন?' প্রতিভা মুখ নামালেন। ওর শরীরে এখন কাঁপুনিটা ছড়িয়ে পড়েছে,

যা আশংকা করেছিলেন অপরেশ তা ঘটল না। বিয়েটা নির্বিঘ্নেই ঘটে গেল। ছাদনাতলা থেকেই অপরেশ চলে এলেন নিজের ঘরে, প্রতিভাকে নিয়ে গেল মেয়েরা। ঘরে ঢুকে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন অপরেশ। এর মধ্যে ওরা বিছানাটাকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। কাজল বলল 'এখন শুধু টোপরটা খোল। শোওয়ার আগে পাঞ্জাবি ছাড়বে না। পুরুতমশাই বলেছেন তোমাদের কালরাত্রি করতে হবে না আজই ফুলশয্যা।'

তারপর আরো রাত বাড়লে, খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে প্রতিভাকে নিয়ে ওরা এল। এখন অবশ্য প্রতিভার মাথায় মুকুট নেই কিন্তু বেনারসী আর ফুলের মালায় হঠাৎ অপরূপা বলে মনে হল অপরেশের। কাজল বলল 'নতুন বউকে দিয়ে গেলাম দাদু, একটু দেখো।'

দরজা ভেজিয়ে ওরা চলে যেতেই প্রতিভা ধীর পায়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। ইজিচেয়ার ছেড়ে অপরেশ অস্থির চোখে ঠাকুর ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে দরজার আগল তুলে দিলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বসলেন ইজিচেয়ারে। খুব ক্লান্ত লাগছে এখন। সারাদিন ধরে কম ধকল গেল না।

কাজের বাড়ির লোকজনের গলা ধীরে ধীরে মিইয়ে এল। শেষ পর্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন অপরেশ। পায়ে পায়ে ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দেখালেন প্রতিভা পাথরের মূর্তির মত বসে

আছেন সেখানে। খুব নীচুগলায় তিনি ডাকলেন, 'প্রভা।'

চেতনা এল যেন শরীরে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন প্রতিভা। আলো নিভিয়ে এই ঘরে এসে বসলেন, 'রাত হয়েছে, শুয়ে পড়।'

অপরেশের গলায় যেন কিছু আটকালো, 'প্রভা!'

প্রতিভার চিবুক অকস্মাৎ বুকে গিয়ে ঠেকল, 'তুমি খুশী হয়েছ তো।'

'তুমি হওনি?'

'আমি? হ্যাঁ হয়েছি। তুমি খুশী হলেই তো আমি খুশী হব।'

প্রতিভা গলা থেকে মালা খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর ওপাশের আলনা থেকে আটপৌরে শাড়িটাকে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে কি একটা ভাবলেন। অপরেশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলেন। যে ঘটনাটা কখনও ঘটেনি এখন তাই ঘটল। এই ঘরে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিভা শাড়ি পাল্টাচ্ছেন। নিজের কাছেই অস্বস্তিকর মনে হল অপরেশের। তিনি যেন লক্ষ্য করছেন না এমন ভাব করে পাঞ্জাবি খুলে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন।

এখন টুকিটাকি কাজ সারছেন প্রতিভা। রোজই যেমন করেন। অপরেশ টানটান শুয়ে ফুলের গন্ধ পেলেন। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। আহা, এরই নাম ফুলশয্যা! বালিশ থেকে ফুলগুলো সরিয়ে একটু দূরে রাখলেন তিনি। আর এই সময় কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল।

আজ তাঁর শ্রাদ্ধ। কাগজের দ্বিতীয় পাতায় যে বৃদ্ধের ছবি ছাপা হয়েছে তাঁকে দেখে চিনতে পারেননি অপরেশ। ইদানীং শোকসংবাদ দেখলেই চোখ বোলান, চেনাজানা, কেউ গেল নাকি! বৃদ্ধের ছবির তলায় লেখাটাই তাঁকে টালমাটাল করে দিল। কানপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী অমুকচন্দ্র অমুক গত দোসরা বৈশাখ সাধনোচিতধামে গমন করেছেন। আগামী পনেরই বৈশাখ তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উপস্থিতি কাম্য।

এর একটু নীচে ব্যক্তিগত কলমে আর একটি বিজ্ঞাপন। 'দাদা যাওয়ার আগে আপনার কথা বলতেন। আপনি আছেন কিনা জানিনা, কোথায় আছেন তাও জানিনা। যদি এই কাগজ চোখে পড়ে তাহলে পনেরই বৈশাখে দাদার কাজ করলে তিনি তৃপ্ত হবেন।'

আজ সেই পনেরই বৈশাখ। পঞ্চাশ বছরে একটি কথাও প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখেননি তিনি, আজ রাখতে হল। সারাদিন ধরে যত ভাবছেন তত ছবিটা তাঁকে তাড়া করছে। যে মানুষটা পঞ্চাশ বছর নিরাসক্ত হয়ে রইল সে ছবি হয়ে তাঁকে বিব্রত করতে পারল?

সকালবেলায় ছবিটি দেখেই যে চিন্তাটা তাঁর মাথায় চলকে উঠেছিল তা হল আইন এবং ধর্মের চোখে প্রতিভা আজ বিধবা হয়ে গেল। কথাটা মনে হতেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তাই সুব্রত যখন এসে আবদার করল তখন সম্মতি দিয়েছিলেন বিয়েতে। হ্যাঁ, এখন তো কোন বাধা নেই!

আলো নিভিয়ে প্রতিভা পাশে এসে শুলেন। অপরেশ শক্ত হয়ে শুয়ে ওঁর নড়াচড়া অনুভব করছিলেন। প্রতিভা কথা বলছিলেন না, তিনিও। ক্রমশ এই নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠতেই ওঁর সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। কথা বলতে চেষ্টা করলেন অপরেশ, 'ছোট মেয়ের কথা শুনেছ?'

প্রতিভা জবাব দিলেন না। কয়েক মুহূর্তে অপেক্ষা করে অপরেশ বললেন, 'খুব ভেঙে পড়েছে বেচারী।'

আর ঠিক তখনই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন প্রতিভা। বালিশে মুখ গুঁজে থাকা সত্ত্বেও কান্না ছিটকে উঠছিল। অপরেশ হতভম্ব গলায় ডাকলেন, 'প্রভা!'

প্রতিভা কান্না গিলতে চাইছেন, পারছেন না। অপরেশ উঠে স্ত্রীর পিঠে হাত রাখলেন, 'কি হল তোমার?'

'আমি পারছি না, আজ কেবলই সেই রাতের কথা মনে পড়ছে।' স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরলেন প্রতিভা। অপরেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

প্রতিভা বললেন, 'কেন তুমি রাজী হলে? তুমি যে মন্ত্র উচ্চারণ করলে আমি তাঁকে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুনেছি। ও, ভগবান বিশ্বাস করো, এতদিন বাদে নিজেকে বেশ্যার মত মনে হচ্ছিল।'

অপরেশ অন্যমনস্ক গলায় বললেন 'তিনি তো আজ না-ও থাকতে পারেন। তাহলে—।'

প্রতিভা ধীরে ধীরে অপরেশের কোলে মাথা রাখলেন। তারপর কেমন করুণ গলায় বললেন, 'দ্যাখো, আমার হাত দ্যাখো, আজ আমি নতুন শাখা, নতুন নোয়া পরেছি।'

অপরেশ নিজেকে সংবরণ করলেন। না খবরটা কিছুতেই দেবেন না তিনি। সস্নেহে বললেন, 'তুমি খুব সরল।'

'জানি, এরকম কান্না বোকামী। আর কাঁদবো না দেখো। পঞ্চাশ বছরের পুরনো নোয়াটাকে যে আজ গঙ্গায় ফেলে দিতে দিলাম।'

উনুনের খেলা

ভাতারখাকী বলে বদনামের গল্প যার গায়ে তার কাছে অনেকেই ভনভনিয়ে আসবে এ আর নতুন কথা কি। তবে কিনা একটু আড়াল আবডাল ধরি মাছ না ছুঁই পানির চোখঠারা না থাকলে গাঁয়ে বাস করা যায় না। রাতবিরেতে কিছু ঘটলে ছেলেপুলের বাপ মা সংসারী মনুষেরা জিভ নাড়তে পারে না, আবার দিনদুপুরে দেখা পেলেই বুকে বেড়াল আঁচড়ায়।

দৃষ্টান্ত তো ভূরিভূরি। মগরা স্টেশনের রেলের ছোটবাবু রাসয়ে হাত ধরেছিল, গেল বার থানার বড়বাবু নাকি ওকে জেরা করতে গিয়ে নিজেই জেরবার হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন ধরে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বাদলা রাত হলেই ওদিকে পা বাড়ান। অবশ্যি এইসব গল্পগাছায় ডানায় আর কতটা জোর, মুখ থুবড়ে একসময় পড়লই। তবে ওই যা, ছাই খুঁচিয়ে আগুন খোঁজার লোকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে। ফর্সা জামার তলায় ছেঁড়া গেঞ্জি যেমন জেনেও না জানা হয়ে থাকে তেমনি এইসব নিয়েই দিনরাত দিব্যি কেটে যায়। মুশকিল ঘটাল কয়েকটা ঘটনা।

হাত ধরার কয়েকদিনের মধ্যে রেলের ছোটবাবুই লাইন পেরোতে গিয়ে লোকালের চাকায় দুটুকরো হয়ে গেল। রক্ত আর খুচরো পয়সায় চারদিক থই থই। ক'দিন আগে মাঝরাত্রে যখন আকাশ ঝমঝমিয়ে নামছে তখন ওই বাড়ির সামনে পা পিছলে ছাতি উল্টে পড়তে পড়তে সন্ন্যাস রোগে মুখ বেঁকে গেল পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের। বাঁ দিকটা অসাড়। দু-দুটো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দারোগা বাবুর যখন তখন গাঁয়ে ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। চুল্লি জ্বলছে গনগনিয়ে কিন্তু শকুনের দেখা নেই। ভাতার মরলে যদি ভাতারখাকী তবে নাগর মরলে কি? তা একটা নয়, দু দুটো। সন্ন্যাসে শুয়ে থাকা আর দুটুকরো হওয়া তো এক কথাই। অতএব

ভাতাবখাকী হল মবদখাকী। তল্লাটেব সেবা মবদ দাবোগাবাবুব প্রাণে তাই ভয ঢুকেছে তিনি আসেন না, নজবানা যায ফি হপ্তায। এ মন্দেব ভাল। সামনে এলে যে সাতপ্যাচে অঙ্কটা বাড়তো তা সবাই জানে। তাই ভাতাবখাকী বল আব মবদখাকী বল, পুবো গ্রামটাকে স্বস্তিতে বেখেছে যে তাকে চোখ বাঙাবে এমন সাধ্যি কাব?

চোখ বাঙানো সইতে বযেই গেছে আতববালাব। এই শ্রাবণে আঠাশে পড়ল সে। বাপ নাম বেখেছিল বটে। যে দ্রব্য চোখে দ্যাখেনি তাব নামে নামকবণ। ভাতাব বলত, 'আমি তোব তাই তুই আতব।' মবে যাই আব কি। এখন দ্যাখো গ্রামটাব চেহাবা, যেন সবাই নেতিয়ে লেজ নাড়ছে পাযেব তলায। আতব যদ্দিন আছে তদ্দিন উনুন ভাঙবে না, হাঁড়ি ওল্টাবে না। কথাটা সঠিক কবে বললে বলতে হয যদ্দিন ঠমক আছে তদ্দিনই আতবেব সামনে লেজ নাড়া। তাবপব আব একটা আতব তৈবী হযে যাবে ঠিক।

চুল বাঁধতে বাঁধতে আবশিতে মুখ দর্শন কবল সে। বেলেব ছোটবাবুব মনটা ভাল ছিল। যদি বল, বুঝলে কি কবে তবে তাব উত্তব একটা চাল টিপলেই তো বোঝা যায। যে পুরুষ সোজা চোখে বুক দ্যাখে অথচ তাব দৃষ্টিব সামনে অস্বস্তি হয না সে মন্দ লোক নয। মবে যাওযাব আগে কলকাতা থেকে বেলেব ছোটবাবু এক শিশি এনে দিযেছিল তাকে। হবিণেব নাভি থেকে তৈবী আতব। দেবাব সময হাত ধবে বলেছিল, 'এখন মাখিস না। যেদিন আমাব ফ্যামিলি থাকবে না কোযাটার্সে সেদিন মেখে আসিস।' ওই হাতধবাটা দেখেছিল পাঁচজনে। দুটুকবো হবাব খবব পেযে যে কষ্ট হযনি তা নয, কিন্তু সে কাবণেই শিশিটা খোলেনি এমন নয ইদানীং চিবুক বুকে ঠেকালে কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগে। এই যে এখন, গবমকাল, দবদবিযে ঘাম গড়ায কপালে গলায, ডুব দিযে এসে গা মুছলেই গন্ধটা যেন জানান দেয। কাউকে জিজ্ঞাসা কবতে ভয লাগে। গপ্প তো লকলক কবছে প্রত্যেকেব জিভে। মাঝবাতে মেযেটা বলে, 'কিসেব বাস মা? আতবেব?'

ধমকাতে হয অকাবণে, 'হিঁদু ঘবেব বেধবা, মাঝ বাত্তিবে আতব মাখতে যাব কেন'' কিন্তু আতব জানে কথাটা মিথ্যে নয। একটা গন্ধ বেব হয। কোত্থেকে যে হয তাই অজানা। ভাতাব মবেছে ছয বছবেব মেযেকে বেখে। তাব গলাব কাঁটা আবাব অন্ধেব লাঠি। মেযে পাশে শোয বলে বাত দুপুবে উটকো লোককে ঠেকানো যায। পঞ্চাযেতেব প্রেসিডেন্ট মোল্লা সাহেব অবশ্যি আসতো। এসে বসে থাকতো দোব গোড়ায পিঁড়ি পেতে চুপটি কবে। ঘুমন্ত মেযেটাকে দেখত আব বলত, 'তোব এখন দুটো ঘব দবকাব আতব। মেযে বড় হচ্ছে হাজাব হোক।'

'একলা ঘবে শুযে কি কবব? আমাব ভূতেব ভয লাগে।'

'ভূত? আমি এলে ভূতেব বাপেব হিম্মত হবে ভয দেখানোব।'

'আপনি তো বাদলা না হলে আসেন না।'

'এসেই বা কি হবে। এই তো দোব গোড়ায এসে থাকা।'

মেযে ছিল বলেই তো গণ্ডী পাব হওযা সম্ভব হল না এ জীবনে প্রেসিডেন্ট সাহেবেব। অবশ্য এখন মবদখাকী বলে নাম ছড়াবাব পব কেউ আব সখেব বাগান ভাবে না, চোবাবালি বলে এড়িযে যায। নইলে ওই দাবোগাবাবুকে এড়িযে থাকা যেত? সাত বাচ্চাব আধবুড়ো বাপ ধর্মেব ষাঁড়েব মত ধেযে এসেছিল প্রায।

কিন্তু আল পড়ল না হয বেনোজল ঠেকাতে, দেওযাল উঠল চৌদিকে চোব ডাকাত ঠেকাতে, কিন্তু তাব নিজেব কি হল? এ দেওযাল যে চৌদিক গ্রাস কবে তাকেই নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না। আঠাশ বছব মানে পুরু হলদে সব পড়া দুধ। টানটান সেই সবেব ছাতেব তলায গনগনে আঁচে তেতে ওঠা দুধ ছটফটিযে মবে। একটু ফাঁক পাওযাব সুযোগ, অমনি ফিনিক দিযে উঠবে। আব সেই বযসে যাব চাবপাশে বদনামেব লোহাব দেওযাল উঠল কোন মনসাব চ্যালা

হাতে গর্ত খুড়বে?

পান খাওয়া লালচে ঠোঁটে চিলতে হাসি ঝুলল আতরের। মরদখাকী! মন্দ কি! কিন্তু মরদ কোথায়? চারপাশে তাকালে শুধু শেয়াল শকুন নয় নেড়ে। ওই প্রেসিডেন্ট কিংবা দারোগা মানেই তো ওই। রেলের বাবুটার গলায় নরম সুর থাকতো। লোকটা বুঝে ওঠার আগেই দুম করে মরে গেল।

তা আঠাশ বছর বয়সেও সাতকালের পিরীত তো কারো সঙ্গে হল না। চলানি করতে হয় গ্রামটার জন্যে. প্রথমে অবশ্যি ছিল নিজের পেট বাঁচানোর তাগিদ, সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরো গ্রামের হাঁ বন্ধ করার কারণ। মেয়ে বড় হচ্ছে আর ক'দিন। তারপর তোমার মনের মানুষ এলেও মনকে চিতায় তুলতে হবে।

এখন তার অকারণে বদনাম ছড়াচ্ছে। ছড়াক গে। ইঁদুরে তো রাতে আঁচল আলগা করে ঘুমানো যাবে। ক'দিন থেকে আবগারীর নতুন বাবু তার দিকে তাকায় আবার তাকায় না। এরকম ক্ষেত্রে নিজেই আগ বাড়িয়ে কথা বলে আগুনে জল ঢেলে রাখে আতর। কিন্তু ওই মানুষটাকে দেখামাত্রই হাঁটুদুটোয় ঝিঁঝি ধরে, কানে রক্ত জমে। পানুকাকা খবর এনেছে বাবুটির নাম রতন। চাকরীতেও নতুন, সংশয়ে। খেয়াল পাশে এর মধ্যে বার তিনেক মুখোমুখি হয়েছে সে। গতকাল গাঁয়ে ঢুকে যে আবগারীবাবুরা শাসিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে রতনবাবুও ছিল। যতবার চোখাচোখি ততবার বুকের মধ্যে পাক খেয়েছে বাতাস। কিন্তু তাতে কার কি? পৃথিবীর কোন ভগবান তাকে দেবে, তার সেরকম ইচ্ছেকে দেবে এবং সেইসঙ্গে ইন্দুকেও? এইটেই তো জ্বালা। চাওয়ার মুখ যার বড় তার পাওয়ার কপাল তো এই এতটুকুখান।

মায়ের সঙ্গে মেয়েও ঘোরে। ঘরে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। একা থাকতেও চায় না মেয়ে। বাপের স্বভাব। বাপ ভয় পেত ভূত আর পুলিশকে। বাপই নাম রেখেছিল মেয়ের। দেশের মাথা এসেছিলেন শ্যামগুহাবরাতে তার নামেই নাম। যে মেয়েছেলেকে সারা দেশ ভক্তি আর ঈর্ষা করে তাকে তো কেউ বদনাম দিতে সাহস করে না। সেই মেয়েছেলের স্বামী মরেছে অকালে তবু তো কেউ তাকে বলে না ভাতারখাকী? ইন্দুকে হতে হবে ওইরকম। হেসে ফেলল আতর। কে কাকে খায়? ওসব খাওয়ার জিনিস হল? মরণ।

ইন্দু হাঁটছিল তার মায়ের আঁচল ধরে। এই এক বদ অভ্যেস। হাত ছাড়িয়ে আতর ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'নিজের পায়ে চল। মাথা উঁচু করে হাঁট। এই এরকম। চলতে ফিরতে শুধু আঁচল ধরা।' হাতটা সরিয়ে দিল ঝটকায়.

মেয়ে ফ্যালফেলিয়ে তাকাল একবার মায়ের দিকে। কিন্তু তারপরেই সে মায়ের চলা নকল করার চেষ্টা করল. কিন্তু পা ফেললেই মায়ের শরীরে যে নাচন লাগে তা তো তার শরীরে হয় না। হাড়জিরজিরে শরীরের তিন জায়গায় ফেঁসে যাওয়া ফ্রকটা টেনেটুনে নেয় ইন্দু। সকালে পান্তা খাওয়ায় পেট এখন ভারী। ইচ্ছে করেই সে মায়ের কাছ থেকে সরে সরে হাঁটতে শুরু করে। কাছে থাকলে যা বোঝা যায় না, সামান্য দূরত্ব তা স্পষ্ট করে। যেমন এই মুহূর্তে ইন্দর মনে হল এই গাঁয়ে মায়ের মত দেখতে আর কেউ নেই।

দুপাশে দুটো মজাল পুকুর। মজাল হলেও হাঁটু মুড়লে ওপর থেকে দেখা যায় না। মাঝখানের চওড়া ঢালু জমিটায় রাবণের চিতা জ্বলছে। আহা কি দৃশ্য। দশ হাত দূরে দূরে দিয়ে শুরু হয়েছিল, প্রয়োজনের চাপে এখন উনুনগুলো ঘেঁষাঘেঁষি হয়েছে। দু দশটা নয়, বিয়াল্লিশটা, অবশ্য রোজ সবক'টাতে আগুন পড়ে না। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় চুল্লুর কারখানা এটা। জন্মইস্তক আতর ওই আগুন জ্বলতে দেখেছে। তখন মাল তৈরী হত খুব যত্ন নিয়ে। মাল ফুটিয়ে মাটির হাঁড়িতে মুখ বন্ধ করে হয় মাটির তলায় নয় পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হত ঠিক তিন হপ্তা। এতে বিষ মরতো, স্বোয়াদ বাড়তো। যত জমে তত মজে। তারপর আবার আগুনে তুলে

এ হাঁড়ি থেকে ও হাঁড়িতে গরমরসের ধোঁয়া পাচার করা হত। সেই ধোঁয়া জমে জমে যেই রস হয়ে যেত তখন অমৃত তো কোন ছার। যত বেশী মজবে তত মাল দামী হবে। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। অত সময় নষ্ট করার মত সময় নেই কারো। পেট খাঁ খাঁ করছে সবার। এখন ফোটাও ঢালো আর বেচে দাও। তবে হ্যা এই গাঁয়ের চুল্লু খেয়ে কেউ চোখ উল্টেছে এমন বদনাম দেওয়া যাবে না।

সাত সকালেই আজ পনেরটা উনুন জ্বলছে। কোমরে হাত দিয়ে গুনল আতর। এই উনুন জ্বলা দেখলেই তার যৌবনের কথা মনে পড়ে। ভাতারখাকী। উনুনের কাছে এলেই ভাতারের মুখ মনে পড়ে। রোগা ঢ্যাঙা মাথা মোটা লোকটা। চুল্লুর হাতটাই যা ছিল ভাল। বেচত যত খেত তার কম নয়। রাত্তিরে আতরকে প্রায়ই শবসাধনা করতে হত। পুলিশ দেখলেই চিত্তির হত ওর প্রাণ। চুল্লু বিক্রী করে এক রাত্তিরে ফেরার পথে মাঠের মাঝখানে মরে পড়ে রইল। কে মারল, কি ভাবে মরল সে-রহস্য আজও অন্ধকারে। ভাতার মরলে কাঁদতে হয় বলে কেঁদেছিল আতর, কিন্তু কান্নাটা বুক থেকে আসেনি। যা সত্যি তা বলতে ভয় পায় না সে।

বাঁদিকের বেলগাছটার গা ঘেঁষে যে উনুন সেটাই আতরের। হারাণ তাতে আগুন জ্বেলেছে সাত সকালে। মাল বেচলে দিনে দশটাকা দিতে হবে এই কড়ার। আঠারো বছরের ছেলেটা খাটতে পারে খুব। তাকে দেখে বলল, আজ হাওয়া খারাপ।

আতর চোখ ছোট করল, 'কেন?'

'হাফ সেপাই এসে বলে গেছে উনুন না জ্বালতে আজ।

'কেন?'

'তা জানি না।

ওপাশ থেকে শিবুকাকা এগিয়ে এল, হাক ভাঙতে চাইল না কিন্তু মন কু গাইছে বড় একবার থানায় গিয়ে খবর করলে বড় ভাল হত।'

উদাসী মুদ্রা আনল হাতে আতর, 'যান না, পেটের দায় তো সবার।

'আমরা গেলে তো দোর থেকেই ভাগিয়ে দেবে। নইলে কি যেতাম না ভাবছ'

অনুরোধ বললে কম হবে, প্রায় কাকুতি মিনতি শুরু হয়ে গেল চারপাশ থেকে। যে পূজার যা মন্ত্র। কানাই জোরে বলল, 'তুমি হলে গিয়ে মহাশক্তি, তুমি না গেলে অসুরদমন হবে কি করে? আজ বিকেলের মধ্যে মালগুলো পাচার করতে পারলে না হয় দুদিন বিশ্রাম নেওয়া যায়। কি বল সবাই?'

চিন্তিত মুখগুলো নড়ে চড়ে দ্রুত সায় দিতে লাগল। এইরকম পরিস্থিতিতে আতরের নাকের পাটা বড় কাঁপে। হাঁটুর ওপরটা ভারী হয়ে যায়। রাজেন্দ্রাণীর মত সে তৎকাল চারপাশে একটাও মানুষ নেই, যেন এই জীবসকলের দায়িত্ব একমাত্র তার সে পুকুরের দিকে মুখ ফেরাল। তারপর সন্ধানী চোখে জরিপ করে বলল, 'জলের তলায় সাতটা আছে?'

কানাই জ্যাঠা বলল, 'হ্যাঁ, আজ সকালেই রেখেছি।'

'দুঘণ্টায় যা হবার হয়ে গেলে সবক'টাকে জলের তলায় পাঠানো হোক।'

হারাণ মাথা নাড়ল, 'এতে বড় বদনাম হয়ে যাচ্ছে বাজারে। এর পরে লোক মাল নিতে চাইবে না। খদ্দের বলছে সরেস হচ্ছে না।'

সরেস। যে দেশে মেয়েছেলে নেই সেদেশে হিজড়েও মহারানী। থুতু ফেলল আতর, 'মাল না পেলে তো হাওয়া চাটবে মিনসেগুলো। একদিন সরেস না পেলে চলবে। আগে হাওয়াটা বুঝে আসি। কে যাবে আমার সঙ্গে?'

কেউ মুখ খুলছে না। খুলবে না জানতো আতর। দারোগাবাবুর সামনে গেলে সব দুমাসের শিশু হয়ে যায়। এবং এইটেই চাইছিল সে। হেঁকে বলল, 'যেতে পারি। কিন্তু উনুন প্রতি একটা

কবে টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ। মনে থাকে যেন।'

পারিশ্রমিকটা বড়ই ন্যায্য। যেতে আসতে তো একটা টাকাই বাস ভাড়া লেগে যাব। আপত্তি না করতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। আতরের চোখে নির্দেশ ঘুরতেই হারাণ হাত পাততে লাগল উনুনে উনুনে ঘুরে। চারপাশে এখন ম'ম' করছে হাঁড়ির বাষ্পের গন্ধ। আঃ। আতর তাকিয়ে দেখল তার তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে ইন্দু সেই গন্ধ নাকে টানছে। তার চোখ বড় হল, 'অ্যাই খেলতে যা, এখানে কি?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।

'কোথায়?

যেখানে যাচ্ছ।'

'একি মেয়েরে বাবা। যেখানে যাচ্ছি সেখানে এক তান্ত্রিক বসে আছে। বাচ্চা মেয়ে পেলেই ছাগল তৈরি করে মাঠে ছেড়ে দেয়।'

'আর বড় মেয়ে পেলে?'

হোঁচট খায় আতর সেটা পেলে কি করে তাই দেখতে যাচ্ছি।'

'যদি তোমাকেও ছাগল বানায়?'

'কেটে মাংস খাবে। এমনিতেই তো নোলা ঝরছে। যা। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়ি যাবি না। আর খর্বদার, পুকুরে নামবি না।

বারোটা টাকা পাওয়া গেল। বাকী সব ট্যাকখালি জমিদার। এখন এ নিয়ে কচলাকচলি করে কোন লাভ নেই। টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে রওনা হল আতর। সিকি মাইল কাঁচা রাস্তা পার হলে তবে বাসের দেখা মেলে। অন্তত তিনজনকে কৈফিয়ত দিতে হল এরই মধ্যে। কোথায় যাচ্ছে সাতসকালে তা না জেনে যেন মানুষগুলোর স্বস্তি হচ্ছে না। একটু নির্জনে পড়ামাত্র পেছনে সাইকেলের ঘণ্টা বাজল। সরে যেতে যেতে দেখল আরোহী দু'পায়ে ব্রেক কষেছে, 'যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'এই একটু, কাজে।' আতর ঠিক বুঝতে পারছিল না তার দাঁড়ানো উচিত কিনা।

'কাজটা কোনদিকে?'

'থানায়।'

'অ। তা এখনও অনেকটা হাঁটতে হবে বাস ধরতে হলে।'

'তাই তো হয়।'

'কথাটা হল কি, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক আলাপটালাপ নেই। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন আছে। অবশ্য ইচ্ছে হলে জবাব দেবে নইলে নয়।'

আতর লোকটার দিকে তাকাল। ত্রিবিশের গায়েই বয়স। শহরে থাকে। সেখানে নাকি বই বাঁধাই-এর দোকান আছে। ইদানীং গাঁয়ে আসেই না। প্রেসিডেন্ট সাহেব বিছানায় পড়ার পর আসা যাওয়া বেড়েছে। বাপের সম্পত্তি হাতাবার সুযোগ কেউ ছাড়ে না। আতর মুখ ঘোরাল, 'পথে দাঁড়িয়ে তো আর জবাব দেওয়া যায় না। সময়ও নেই।'

'ঠিক কথা। সময় আমারও নেই। অবশ্য এক কাজ করতে পার। আমার ক্যারিয়ারে চেপে বস। পথটাও কমে যাবে, কথাটাও শেষ হবে।'

'আমি কারো বোঝা হতে চাই না।'

'বোঝা মনে করলেই বোঝা। উঠে এস, অসম্মান হবে না।'

'পাঁচজনে দেখলে কুগপ্প রটবে।'

'দ্যাখো বাবা, কে কি বলল তাতে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কারো খাই না পরি? অবশ্য নিজেরটা তুমি ভাবতে পারো।'

গল্পে তো ডুবে আছি আর বত গল্প লাগবে শরীরে।' রাস্তাটা কম নয়। আতর উঠে বসল ক্যারিয়ারে। প্যাডেল ঘুরিয়ে টাল সামলে প্রশ্ন করল, 'আমার নামটা জানো?'

'জানি।'

'অবশ্য বিয়ের পর যখন তুমি গাঁয়ে এলে তখন থেকেই আমি কলকাতায়।'

'কি প্রশ্ন ছিল?' সিটের পেছনে দুটো গোল রিঙে আঙুল শক্ত করে বসেছিল আতর। ভয় হচ্ছিল শাড়ি না জড়িয়ে যায় সাইকেলের চাকায়।

'বাপ কি তোমার কাছে যেত?'

বুকের ভেতর ধাক্কা লাগল আতরের। মোল্লা সাহেবের সুপক্ক মুখখানা মনে পড়ল। 'উত্তরটা চাই অবশ্য দিতে ইচ্ছে করলে।'

'তিনি দেখা করতেন।' কথাটা বলামাত্র শরীরের সেই বিশেষ গন্ধটা নাকে লাগল আতরের। 'ঠিক কি রকম সম্পর্ক ছিল?'

'উনি গল্প বলতে ভালবাসতেন।' সামনে বসা লোকটা কি গন্ধটা টের পাচ্ছে? 'কি গল্প?' যেন স্পষ্ট নাক টানল লোকটা। মুখ ফিরিয়ে দুপাশে গাছ দেখল।

'এই সেই।' কথাটা বলে যেন প্রাণপণে নিজের স্বরূপ ঢাকতে চেষ্টা করল আতর। 'আর কিছু?'

'না।' এবার যেন গন্ধটা কমছে। নিঃশ্বাস সরল হয়ে এল আতরের।

'বাদলার রাত্রে কি তোমার ঘরে ঢুকেছিল?'

'না।'

'অ। তা সবাই বলছে তোমার জন্যেই তার শরীর পড়েছে।'

'পিতৃতুল্য লোকের সম্পর্কে কুকথা বলতে নেই।'

'পিতৃতুল্য?'

'নয়তো কি? আমার বয়স আর তার বয়স?'

কথা বলতে বলতে আতরের চোখ এড়াল না পথচারীদের দিকে। সবাই হাঁ হয়ে দেখছে। 'তুমি যাই বল, আমার বাপের মেয়েছেলে দোষ ছিল। যদি তোমাকে বিয়ে করত—।'

'আমি করতাম না।'

'কেন? গ্রামের প্রেসিডেন্ট। তোলাই ছাড়াই ভাল চলে।'

'বুড়ো হাবড়াকে মন দেব এমন ছাতাধরা মন নাকি আমার?'

'ও।' কিছুক্ষণ চুপচাপ চালানোর পর আবার প্রশ্ন, 'তাহলে যা শুনেছি তা সত্য নয়?'

'শহরের মানুষেরা শুনেছিলাম বুদ্ধিমান হয়।'

'হুঁ। বাসের রাস্তা এসে গেছে। তা থানায় কেন?'

'পেটের ধান্দায়।' বলে নেমে পড়ল আতর। তাকে নামতে দেখে লোকটাও। আতর চারপাশে তাকাল। বাসের জন্যে অনেকেই দাঁড়িয়ে। তাঁদের গাঁয়েরই কেউ কেউ। আর একটা গল্প জিভে জিভে জন্ম নিচ্ছে। নিক। সে হেসে বলল, 'আবার কেন, বললামই তো, মোল্লা সাহেব খুব ভাল মানুষ ছিলেন।'

'ছিলেন? বাপ কিন্তু এখনও মরেনি। শোনা কথা যাচাই করে নিচ্ছিলাম। তুমি কিছু মনে করো না। পেটের ধান্দায় থানায় কেন?'

তোমার বাপেরও কিছু ছিল না, তোমারও না। বলতে গিয়ে থমকে গেল আতর।' গাঁয়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন কর্তব্যটা করেছে লোকটা? এতগুলো উনুন জ্বলে। কিন্তু দারোগাবাবুর সঙ্গে তো লড়াই করতে যায়নি। তার ছেলের মুখের প্রশ্নের জবাব দেবে কেন সে?

তবে লোকটার বোধবুদ্ধি আছে। জবাব না পেয়ে হাসল। বলল, 'তোমার হিম্মত আছে। খুব

ভাল। তিনটে নাগাদ ফিবব, যদি আসো তো ক্যাবিযাবে চাপাতে পাবো। বাস দেখা যাচ্ছিল। আতব উত্তব না দিযে এগিযে গেল।

ইন্দুদেব দলে নযজন। প্রায সমবযসী সবাই। আব একটু বাড়লেই তো ওপাশেব উনুনেব কাজে লেগে যেতে হয। পুকুবেব উলটো দিকে ওই নয জন উনুন সাজাচ্ছিল। খেলাব উনুন। তিন পাথবেব খাঁজে কল্পিত আগুন গুঁজে এই খেলা শুরু হয। ঠিক যেমন যেমন বড়বা কবে তেমন কবেই খেলা ওদেব। খেলতে খেলতে ব্যাপাবটা প্রায নিখুঁত হযে এসেছে। পাঁচ থেকে নযেব মেযেগুলোব লিকলিকে শবীব, ছেঁড়া জামা আব উদোম গাযেব ইজেব পবা ছেলেব দল সেই খেলায অংশ নেয। নকল উনুনে কল্পিত আগুন জ্বলে পাতাব হাঁড়িতে স্বপ্নেব বস ফোটে। সেই পাতা পুকুবেব জলে ডুবিযে বাখা হয যত্ন কবে। নিযমেব কোথাও ভুল নেই। অনেক দূবেব সত্যিকাবেব উনুনগুলোব দিকে পেছন ফিবে নাক টানে, 'আঃ কি বাস না বে।' তাবপব দিনেব শেষে যে যাব হাঁড়ি নিযে শহবে চুল্লু বিক্রি কবতে যাওযাব নাম কবে যখন ঘবে ফেবে তখনই খেলা শেষ। কিছুদিন হল এই খেলাব কর্ণধাব হল ইন্দু। বাকাবা বোধহয দেখেছে ওব মাযেব প্রতাপ কিভাবে ওদেব বাপকাকাবা মেনে নিচ্ছে। হযতো সেইটেই কাজ কবছে ইন্দুব নেতৃত্ব মানাতে।

নযজনেব দলটা জড়ো হতেই ইন্দু গালে হাত বাখল, 'সব্বোনাশ হযেছে।'

৮টি মুখগুলো অবাক হল, 'কি হযেছে বে?'

'মা গেছে থানায। হাব সেপাই বলে গেছে উনুন না জ্বালাতে।' ইন্দু জানাল।

'জ্বাললে কি হবে?' সবচেযে যে কচি তাব প্রশ্ন।

'জ্বাললে কি হয জানো না? মাঝে মাঝে ওদিকে যখন পুলিশ হামলা কবে তখন কি হয দ্যাখো না?' ইন্দু ঝাঁঝিযে উঠল।

বড়সড় একজন বিজ্ঞেব মত ঘাড় নাড়ল, 'ও দ্যাখেনি। শেষ বাব হযেছিল এক বছব আগে। ও তখন আসত না।'

ইন্দু বলল, 'এলে হাঁড়ি ভাঙ্গে, সব বস পুকুবে ঢেলে দেয, মেযেছেলেব ওপব অত্যাচাব কবে। যাকে পায তাকেই কোমবে দড়ি বেঁধে মাবতে মাবতে নিযে যায।'

'আজ কি হবে?' আব একজনেব উদ্বেগ।

'মা গেছে থানায। আমাব মা তো কখনও হাবে না।'

কিছুক্ষণ গজব গজব হবাব পব নতুন খেলাটা জন্ম নিল। নজনেব মধ্যে চাবজন হযে গেল থানাব দাবোগা বাবু, হাব সেপাই এবং দুই বন্দুকধাবী। বাকী পাঁচজন যখন উনুন জ্বালবে বস ফোটাবে তখন পুলিশবা ছুটে আসবে বে বে কবে। উনুন ভাঙ্গবে, হাঁড়ি ফাটবে, রস ফেলবে জলে। শোনামাত্র উত্তেজনা বাড়ল শীর্ণ শবীবগুলোতে। বৈচিত্র্যে কাব না আনন্দ হয। চাবজন চলে গেল পুকুবেব ওপাশে ঝোপেব আড়ালে। পাঁচজনে যখন বস ফোটাতে ফোটাতে আড়চোখে সেদিকে তাকাচ্ছে তখনই হইহই কবে ছুটে এল তাবা। গাছেব ডাল ভেঙ্গে লাঠি বানিযে সেগুলো ঘোবাতে ঘোবাতে মুখে চিৎকাব ছোটাল। খুশীমুখে এই পাঁচজন অমনি সবে দাঁড়াল। যাত্রা দেখাব মত ওবা ভাঙ্গচুব হওযা দেখল। ইন্দু চেঁচিযে উঠল, 'এই দাবোগা, তুই হাসছিস কেন?'

ঢ্যাঙা ছেলেটা মাথা নাড়ল, 'দাবোগা হাসে না? সেবাব দাবোগাবাবু এসেছিল তোদেব বাড়িতে, আমি হাসতে দেখেছি।'

কথাটা শোনামাত্র মনে পড়ল দৃশ্যটা। মাকে জেবা কবতে কবতে দাবোগাবাবু খুব

হয়েছিল। চেয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল খেয়েছিল। কিন্তু তবু ঠিকঠাক হচ্ছে না। খেলাটা কিছুতেই জমছে না।

আতরকে দেখে দারোগাবাবুর মুখে কোন ভাবান্তর হল না। ঘরে দুটো সেপাই আর একটা গুফো লোক দাঁড়িয়েছিল। আতর যে ঘরে ঢুকেছে তা তিন জোড়া চোখের ঘুরুনিতে বোঝা গেলেও দারোগাবাবুর কোন বিকার হল না। শেষ পর্যন্ত বাজখাঁই গলায় বিরক্তি ঝরল, 'কি চাই? এরা সব হুটহাট করে ঘরে ঢোকে কি করে? অ্যাই সেপাই সেপাই।

থানায় ঢোকার আগে তিরিশ পয়সার পানে ঠোঁট লাল করেছিল আতর। দারোগার কথায় সেই লালে মোচড় লাগল। বাঁ হাত কোমরে রেখে চোখ ছোট করল সে, কথা ছিল।'

'কি কথা?'

'পাঁচজনের সামনে বলতে পারি?'

দারোগা চট করে গুফো লোকটাকে দেখে নিল আপনারা একটু বাইরে যান তো ভাই। ইনফর্মার। বুঝতেই পারছেন। যাও একে নিয়ে পাঁচ মিনিট পরে এস। শেষের নির্দেশ সেপাইদুটোকে। ঘর ফাঁকা হলে দারোগার গলায় বিরক্তি ঝরল 'কি মতলব?'

চেয়ারে বসার খুব লোভ হচ্ছিল আতরের। কিন্তু পায়ে কোথায় যে আটকায় সে হাসল 'আমরা তো সব ঠিকঠাক দিচ্ছি তবে আবার এ ঝামেলা কেন?'

'কিসের ঝামেলা?'

'আজ আবার হামলা হবে বলে শুনলাম'

'কে বলেছে?' দারোগার চোখ ছোট হয়ে এল।

মাথা নাড়ল আতর খবর তো হাওয়ায় ভাসে। জামাই আদরে আপনাকে পুষছে গায়ের লোক, তারপরেও? হাব সেপাই এর নাম বলে ভবিষ্যতে খবর পাওয়ার পথটা বন্ধ করার মত বোকা সে নয়।

'পুষছে? কি কথার ছিরি। ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না?'

'ছোটলোকের মুখে বড়লোকের কথা কি করে আসবে?'

'বড্ড বাজে বকো। প্রেসিডেন্টকে কি করেছিলে?'

'আমরা কি কিছু করি? ওনারা নিজেরাই নিজেদের করে থাকেন।'

'বড্ড ঝোলাচ্ছ আমাকে। শালা রেলের ক্লার্কের সঙ্গে মজাকি করতে পার আর আমার জন্যে দরজা খুলতে তোমার বুকে বাত ধরে যায়। লোকে বলছে তোমার ছায়ায় গেলে নাকি দুর্ঘটনা ঘটবে। তাই নাকি?'

'তাহলে আর আসবেন কেন? তবে কারো দুর্ঘটনা ঘটার আগে আমার শরীরে চাঁপার গন্ধ বের হয় এমনি এমনি। দেখুন, দেখুন।' টেবিল ঘুরে কনুইটা সে নিয়ে গেল দারোগার নাকের সামনে। পুলকিত দারোগা নাক টেনে বলল, 'আঃ, কি মেখেছ? আতর?'

'না। রক্তের গন্ধ। আজ হামলাটা বন্ধ করুন।'

তখনও বোধহয় গন্ধটা শরীরে, দারোগা ঘন ঘন মাথা নাড়ল, 'দূর, কে তোমাদের গুল মেরেছে। পুলিশ নিয়ে গাঁয়ে ঢোকার কোন প্ল্যানই নেই। আজ রাত্রে আমি যাব একা একা। মেয়েটাকে সরিয়ে রেখ। কি মেখেছ গো?'

মদ খাওয়া ঢোল মুখের দিকে তাকিয়ে আতর বুঝতে পারছিল না লোকটা সত্যি বলছে কিনা। হাব সেপাই কি তামাসা করতে অদ্দুর হেঁটে গেল? সে যে সন্দেহ করছে তা দারোগার নজরে পড়ল, 'রাতের উত্তরটা পেলাম না।'

হাসল আতর, 'বেশ তো। আপনার বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমার মেয়ের সঙ্গে

এখন খেলা করবে।

আ'?' চোখ বড় হয়ে গেল দারোগার, 'গেট আউট। গেট আউট। আমার ফ্যামিলি নিয়ে ইয়ার্কি।'

আতর বাইরে বেরিয়ে এল। গুফো লোকটা তার দিকে তাকাচ্ছে। সে থানার বাইরে এসেই দেখল পাশের চায়ের দোকান থেকে সুড়ুৎ করে চলে এল হাক সেপাই, 'কি বলল শালা? ঠাণ্ডা করতে পারলে? করে লাভ নেই কাল ওর বাবারা এসেছিল। টাকা দাও বলে খবরটা দিয়েছি। নাম বলোনি তো?'

না। বাবারা মানে?'

ওপরতলার অফিসার। দারোগার কিছু করার নেই। গাঁয়ে গিয়ে উনুন নেভাও।'

বাস ধরার আগেই কেবলরামের সঙ্গে দেখা হল। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় চুল্লুর সাপ্লায়ের ডান হাত। কেবলরাম অনুযোগ করল আতরের গাঁয়ের মাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানিক বলছে এইরকম চললে বাজার নষ্ট হবে। কিছুক্ষণ বকর বকর করতে হল লোকটার সঙ্গে। কেবলরাম আরও খবর দিল কয়েকটা চুল্লুর আড়তে নাকি এ সপ্তাহে রেইড হবে। ব্যাপারটা সামলানো যাচ্ছে না।

অতএব কিছু করার নেই। দুঘণ্টা দাঁড়াবার পর বাসে উঠে আতর ঠিক করল গাঁয়ে গিয়ে জানান দেবে যার যা হয়েছে, এবার উনুন নেভাও। দিন দুয়েক হাত পা গুটিয়ে বসা যাক। বাস থেকে নামতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সে দাঁড়িয়ে আছে সাইকেলে ঠেস দিয়ে। ওকে দেখামাত্র এগিয়ে এল, 'এক ঘণ্টা আগেই চলে এসেছ। আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না নাকি?'

'না না। আমার খুব তাড়া আছে।'

'ও চল, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

আতর ভাবল ভালই হল। পায়ে হেঁটে যতটা তার সিকি সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে সাইকেলে। 'কিন্তু ওকি। ক্যারিয়ারে মালের বস্তা যে।' দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে বলল, 'ওসব কিনতে হল বাপের সেবার জন্য। তুমি এই রডে উঠে বস।'

আতর চারপাশে তাকাল। বাস স্টপের দশ গণ্ডা মানুষ ওদের দিকে তাকিয়ে। সব ক'টা চোখ এখন ছোবল মারছে। সাহস আছে মানুষটার। সাহসী লোকদের চিরকালই পছন্দ আতরের। অতএব সে রডে চেপে বসল। দুপাশে দেওয়ালের মত দুটো সবল হাত হ্যান্ডেল চেপে ধরেছে। সিঁটিয়ে বসতে চেয়েছিল আতর, ধমক খেল, 'ও ভাবে বসলে পড়ে যাবে।'

পাঁই পাঁই করে সাইকেল ছুটল। জনসাধারণ কথা বলার সুযোগটি পর্যন্ত পেল না ওই মুহূর্তে। প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে নাক টানল সে, 'আঃ, নামকরণ সার্থক। কি মেখেছ?'

'কিছু মাখিনি।' এখন শরীরে শরীরের স্পর্শ, হঠাৎ গায়ে কাঁটা ফোটে কেন?

'যাঃ। মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।'

'ওটা এমনি এমনি বের হয় শরীর থেকে।'

'যাঃ।'

'মন ভাল হলে বের হয়।' এবার হাসল আতর।

ব্রেক কষল সে। হ্যান্ডেলের ওপর আচমকা ঝুঁকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলাল আতর, 'কি হল?' চোখ ফেরাতেই প্রশ্ন শুনল, 'এখন তোমার মন ভাল?'

কি বলবে আতর। মুখ নামাল। আর সেই সময় গোঁ গোঁ করতে করতে তিনটে জিপ ধুলো উড়িয়ে খোয়া পথ অন্ধকার করে ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে। পুলিশ।

ছটফটিয়ে উঠল আতর, 'তাড়াতাড়ি চালান। সর্বনাশ হয়ে গেল।'

'কিসেব সবনাশ?'

পুলিশেব জিপ গেল হাঁড়ি ভাঙবে কোমবে দড়ি পবাবে।' চোখে অন্ধকাব দেখল আতব আ। কিন্তু তুমি গিয়ে কী কববে? পুলিশ চলে যাক তাবপব গাঁয়ে ফিবো।'

'না, না। আমি ছাড়া কেউ ওদেব সামলাতে পাববে না।'

'একটা কথা বলি। এসব নোংবা কাজ ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দেব?' অবাক হয়ে গেল আতব।

মাথা নাড়ল ও, 'আমাব ওপব ভবসা কবতে পাববে?'

এই নির্জনে সাইকেলেব পিছনে বসে কেঁপে উঠল আতব। দূবেব ধুলোব ঝড়টা এখন মাঠেব ওপব ভেসে বেড়াচ্ছে। সে বলল, 'পবেব কথা পবে আগে আমি গাঁয়ে ফিবব।'

প্যাডেল ঘোবাতে ঘোবাতে সে নাক টানল 'যাচ্চলে। গন্ধটা নেই। কি কবে হল?' জবাব দিল না আতব নিজেকে তখন শাপমন্যি কবছে সে। কেন দেবি কবল অকাবণ। কেবলবামেব সঙ্গে কথা শেষ কবে দু দুটো ভীড় বাস কেন ছেড়ে দিল। কেন সময়টাকে নিজেব কাছাকাছি আনতে চাইছিল? এইসময় সে খেয়ালই কবছিল না দুটো হাত হ্যান্ডেল ধবে বেখেও ব্যবধান কমিয়েছে তাব শবীবেব অনেকটাই চালকেব স্পর্শেব মধ্যে। তাব চোখ শুধু গাঁয়েব পবিচিত দৃশ্যগুলো খুঁজছিল। এবং তখনই চিৎকাব চেঁচামেচি কানে এল যখন সাইকেল ব্রেক কষল। সে লাফিয়ে নামতে গিয়ে দেখল পায়ে ঝিঁঝি ধবেছে। নিজেকে সামলাবাব সময় চালক বলল 'আমি কাল অবধি গাঁয়ে আছি ভেবে দ্যাখো।'

নয়াজোড়া চোখ ঝোপেব আড়ালে বোগা শবীব লুকিয়ে দৃশ্যটা দেখল তিনটে জিপ থেকে পনেবটি পুলিশ নামল বে বে শব্দ কবে লাঠি উঁচিয়ে। কয়েকজন বন্দুক তুলল। ফটাফট হাঁড়ি ভাঙছে। চিৎকাব চেঁচামেচি সমানে চলছে। কেউ কেউ মাঠেব মধ্যে নেমে পড়েছিল পালাবাব জন্যে। তাদেব টেনে হিঁচড়ে ফিবিয়ে আনা হচ্ছে সিটিয়ে ছিল নয়টি শীর্ণ শবীব। বেধড়ক মাব চলছে একতবফা। কয়েকজন পুলিশ যখন নেমে এল পুকুবধাবে তখনই ছুটে এল আতববালা। চিৎকাব কবে দুহাত তুলে এলো চুলে। আচল মাটিতে লুটিয়ে সে যখন দাবোগাব ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন আটজোড়া চোখ বন্ধ হয়ে গেল ভয়ে।

দুই পুকুবেব মাঝখানেব মাঠ এখন শ্মশান। ভাঙা হাঁড়ি আধাভেজা উনুনেব ধোঁয়া আব বসেব গন্ধ ছাড়া সেখানে একটি প্রাণেব অস্তিত্ব নেই। গাঁয়েব সমস্ত মানুষ বসে আছে বাস্তাব পাশে আহতদেব ঘিবে। এবাবে পুলিশ কাবো কোমবে দড়ি পবায় নি। হাতেব সুখ কবাব পব বলে গেছে আবাব যদি উনুন জ্বলে তাহলে বাকীটুকু কববে। কোমবে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওযাব পবিকল্পনা তাদেব ছিলও না। যাদেব মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে তাদেব হাসপাতালে নিয়ে যাওযাব জন্যে টেম্পো ডাকতে লোক ছুটেছে বাস স্টপে। পুলিশ চলে যাওযাব পব ভীড় বেড়েই চলেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল আতব। তাব শবীব ছেঁড়া শাড়িতে ঢেকে বাখা হয়েছিল। মাঝে মাঝে কাঁপছে শবীবটা। কিন্তু নিতম্বেব স্ফীতি, পাযেব খোলা গোছেব ওপব নজব পড়ছে দর্শকদেব। এইসময় সাইকেল চালক এসে দাঁড়াল তাব পাশে। পাশে বসে জিজ্ঞাসা কবল, 'কি লাভ হল? বাবণ কবেছিলাম শুনলে না।'

মাটিতে মুখ গুঁজে আতব শবীবেব যন্ত্রণা ঢাকতে ঢাকতে তখন অন্য একটা গন্ধ আবিষ্কাবে বিভোব ছিল। পৃথিবীব শবীবেও এমন গন্ধ বেব হয় তাব জানা ছিল না প্রশ্ন শোনাব পব সে দুলে উঠল। এবং তাবপব হঠাৎ সে সশব্দে কেঁদে উঠল উপুড় হয়েই। লোকটাব হাত তাব পিঠে পড়াব পব কান্নাটাকে সে থামাতে পাবছিল না।

যত মানুষ মার খেয়েছিল তত মানুষই হাসপাতালে গেল না। টেম্পো আসার আগেই বেশির ভাগ উঠে গেল নিজের ঘরে। শরীরের যন্ত্রণার চাইতে হাড় ভাঙ্গার বেদনা এখন বড় হয়ে উঠেছে। এ কেমন বিচার! প্রতি মাসে টাকা নিচ্ছ অথচ মারার সময় সেটা খেয়াল থাকছে না? কেউ কেউ বলল, এ দারোগার কর্ম নয়। সে এসেছিল ওপরওয়ালার চাপে বাধ্য হয়ে। তবে আতর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন সুযোগটা হাতছাড়া করেনি এই যা। তখন অবশ্য দৃশ্যটা দেখার মত সময় ছিল না কারো। প্রত্যেকেই জান বাঁচাতে ছুটছিল। তবে নজরে যে একেবারেই আসেনি তা নয়। আতরের শাড়ি ছিঁড়েছে, জামা টুকরো করেছে দারোগা। এখন কেউ মানতে পারছে না সে থানায় গিয়ে দারোগাকে কি বোঝাল? এতগুলো মানুষের পেটে ভাত যায় যে কাজের জন্যে সেটাই যদি বন্ধ হয়—। শোনামাত্র কেউ কেউ ধমকাল, বন্ধ হতে যাবে কেন? দুবছর কালবৈশাখী হয় বলে কি কেউ রাস্তায় বের হয় না।

গুলতানির ফাঁকেই আহতরা সরে পড়ছিল। যাদের উপায় নেই নড়নচড়নের তারাই পড়ে মাটিতে। আতরের পাশে মোল্লা সাহেবের ছেলে তখনো বসে। মানুষজনের ভিড় বেশ জমেছিল। একজন জানতে চাইলো, খুব চোট লেগেছে মনে হয় আতরের। ও আতর

মোল্লা সাহেবের ছেলে বলল, চোট না পেলে কোন মেয়েছেলে এভাবে শুয়ে থাকে?

তা বাবা মেয়েছেলের শোয়ার কি কোন ভাব আছে? আমি তো আজও ঠাহর করতে পারলাম না। তা তুমি যাবে নাকি ওর সঙ্গে হাসপাতালে?

আপনারা যখন যাবেন না তখন আমাকেই যেতে হবে। আপনাদের পাড়ার একা মেয়েটা—'

মোল্লা সাহেবের ছেলে কথা শেষ না করে টেম্পো দেখে উঠে দাঁড়াল। সবাই [illegible] চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল। শুয়ে থাকা মানুষদের তুলে নিয়ে যখন টেম্পো চলে গেল তখন ইন্দু পেছন পেছন ছুটছে।

ইন্দুর কান বাঁচিয়ে গুলতানিটা হচ্ছে না। সবই শুনতে পাচ্ছে সে। মোল্লা সাহেবের ছেলে আতরের পিঠে হাত রেখেছে টেম্পোতে উঠেছে সবসমক্ষে। কেউ বলল, ওদের নাকি ওর সাইকেলে আসতেও দেখা গেছে। দারোগা তো হাতের সুখ মিটিয়ে নিয়েছে। আর সেটা জানার পরেও এত কাণ্ড? সন্ন্যাস রোগে বাপ পড়েছে। ছেলের এবার কি হয় তাই দ্যাখো। কলকুচি করা জল কেউ মুখে তোলে? অবশ্য একথাও অনেকে স্বীকার করল, আতর যদি [illegible] ছুটে না যেত তাহলে পুলিশ সবকটাকে সদরে চালান দিত।

মানুষজন যখন যে যার ঘরে ফিরে গেল তখনও ইন্দু মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার খুব রাগ হচ্ছিল মায়ের ওপর। যাওয়ার আগে মা তার সঙ্গে একটাও কথা বলে গেল না। কিন্তু মোল্লা সাহেবের ছেলের হাতটা চেপে ধরেছিল। কেন?

ওকে তো মা চেনেই না। যদিও লোকটা টেম্পোতে উঠে চিৎকার করে তাকে বলেছিল, 'খুকী, ভয় পেয়ো না, তোমার মা ওষুধ নিয়ে আজ রাতেই ফিরে আসবে', তবু তার রাগটা শরীর জুড়ে ছিল।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইন্দু দেখল দূরে তার আট খেলার সঙ্গী বসে আছে দঙ্গল পাকিয়ে। আট জোড়া চোখ দমবন্ধ করে নাটক দেখছিল এতক্ষণ। ওদের কাউকে তো টেম্পো নিয়ে যায়নি হাসপাতালে। আজ রাত্রে যদি মা না ফেরে তাহলে সে কার কাছে থাকবে? কি দরকার ছিল মায়ের ওভাবে ছুটে যাওয়ার?

আটজনের একজন নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াল। এখন সব শান্ত। শুধু বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে বসের গন্ধে। পুকুরে লুকিয়ে রাখা হাঁড়িগুলো নিয়ে গেছে গ্রামের লোক পুলিশ চলে যাওয়ার পর। উনুনের আগুন নিভিয়ে দেওয়ার পরও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হঠাৎ সেই শিশু তার ভাঙ্গা

ডালের লাঠি আকাশে উঁচিয়ে ছুটে গেল দুই পুকুরের মাঝখানে। তার মুখে জিপের ইঞ্জিনের শব্দ। কাছাকাছি পৌঁছে সেটা সরু হুঙ্কারে পরিণত হল। এবং সেই সঙ্গে এলোপাথাড়ি আঘাত করল কয়েকটা ভাঙ্গা হাঁড়িতে, যেমন পুলিশরা করেছিল।

দৃশ্যটা দেখামাত্র আর একজন উদ্বুদ্ধ হল। এবং তার পরেই দেখা গেল পুরো দলটা পুলিশ হয়ে ভাঙ্গা হাঁড়িকে আরও টুকরো করছে। কিন্তু এ খেলায় বেশী মজা নেই। আটজনের দলটা দুটো ভাগে আলাদা হল। চারজন চলে এল গাছের এপাশে লাঠি হাতে। তারা পুলিশ। ঢ্যাঙা ছেলেটি নেতা। অন্য চারজন ধোঁয়া বের হওয়া উনুনে ভাঙ্গা হাঁড়ি চাপাল। এই প্রথম সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে খেলাটা। হাঁড়িতে তখনও রস গড়ানো আছে। চোখে মুখে ধোঁয়া লাগায় খেলার চেহারাটা আরও আন্তরিক হল। এইসময় গাছের আড়াল থেকে জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ উঠল। তারপরই চারজন লাঠি আকাশে ঘুরিয়ে লাফিয়ে পড়ল 'মার শালা, ধর শালা' চিৎকারে। তাণ্ডবটা শুরু হওয়া মাত্র দেখা গেল মাঠ পেরিয়ে ইন্দু ছুটে আসছে। তার গলায় আকুতি মিনতি, ভেঙ্গে দিও না, আমাদের পেটের ভাত মের না, দোহাই তোমাদের।'

ঢ্যাঙা ছেলেটা এই কথা শুনে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেইসঙ্গে অন্যরাও। ইন্দু চিৎকার করে উঠল, 'এই গাধা! পুলিশ তখন অমন করে তাকিয়েছিল?'

লজ্জায় জিভ কেটে ঢ্যাঙা বলল, 'আবার বল।'

ইন্দু আবার শব্দগুলো ছুঁড়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢ্যাঙার ওপরে। ওপাশে সঙ্গীরা হাঁড়ি ভাঙ্গছে কিংবা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। ঢ্যাঙাকে ইন্দু বলল, 'আবার চুলের মুঠি ধর' গালাগাল দে।'

ঢ্যাঙা খপ করে ইন্দুর ঝুঁটি ধরতে গিয়ে একটা পাশ ধরে রাগী ভঙ্গীতে বলতে পারল, 'আই শালা'।' তারপর দু তিনবার ঝাঁকাল। এতেই হাড়জিরজিরে শরীরটায় প্রবল যন্ত্রণার সৃষ্টি হল। তবু ইন্দু মায়ের ভঙ্গী তুলল সারা শরীরে। ছটফটিয়ে সে চিৎকার করছিল বাধা দেওয়ার জন্যে। ঢ্যাঙা ছেলেটি আবার দিশেহারা। ইন্দু সেই অবস্থায় চাপা স্বরে বলল 'আমার বুকের কাছটা ছিঁড়ে দে না।' সচকিত ঢ্যাঙা দারোগাকে নকল করল, করে থেমে গেল। ফুঁসে উঠে ইন্দু তার হাড়সর্বস্ব পাঁজরে ঢ্যাঙার হাত নিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, 'খামচে ধর, দারোগাকে দেখিসনি? বক্ত বের করে দে।'

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ঢ্যাঙা ছেলেটি ডুকরে কেঁদে উঠল। তার মাথা দুপাশে দুলছিল, 'না, আমি পারব না আমি পারব না।'

কাঁকলাস

বিলিতি মদ দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে পায়ের শুকনো চামড়া নরম হয়ে যায়। তারপর একটু একটু করে উঠতে উঠতে সাফসুতরো—, এই পরামর্শ দিয়েছিল গদাধর। টায়ারের জুতো পরে পরে চামড়াটা মোষের ঘাড়ের মতো হয়ে গেছে। ব্যথা নেই, রস গড়ায় না কিন্তু চোখ পড়লেই বিশ্রী হয়ে যায় মনটা। তার এখন যে বয়স তাতে শরীরের খোলতাই কেউ আশা করে না। হাজামের

কাছে উবু হয়ে বসতে কখনও কখনও দিন দশেকও পার হয়ে যায়। খাকি শার্ট আর রঙিন পাজামায় ঘাম জমে জমে বিদঘুটে যে গন্ধটা তৈরি হয় তার সঙ্গে পাকা কাঁচা খোঁচা দাড়ি চমৎকার মানিয়ে যায়। এইজন্যে অবশ্য মালিকেব কাছে কোনো কটু মন্তব্য শুনতে হয় না জীবনের। তবে গাড়িতে উঠলে নাক কুঁচকে যায় মেমসাহেবের। অবশ্য মেমসাহেব এ গাড়িতে উঠেছেন গোনাগুনতি তিনবার। এই পাগলা গাড়িতে কেউ উঠতে চায় না যদি পেটে কিছু না পড়ে।

তিন বছর জিপটা চালাচ্ছে আকাশলাল। এর আগে সে ছিল শিলিগুড়িতে। বলরামবাবুর অ্যাম্বাসাডার চালাত। তার আগে কাটিহারে। জীবনভোর কত গাড়ি চালানো হলো। সবক'টা গাড়িব চরিত্র আলাদা। মর্জি না বুঝেছ তো ফাঁসলে। সেইসব জেনেশুনে চালাত বলে আকাশলালের খ্যাতি হয়েছিল। বলবামবাবুর ওখান থেকে তাকে নিয়ে এলো এই মালিক। লোকটাকে দেখে তার ভালোও লেগেছিল। ঝকঝকে চেহাবা, ফর্সা, বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছে। দেখলে বেশ স্নেহ স্নেহ বোধ জাগে। বলরামবাবু বলেছিল, 'চলে যাও ডুয়ার্সে। কাজেব ঝামেলা কম। তোমারও তো বযস হচ্ছে। তিরিশ টাকা বেশী মাইনে দেবে। ছোকবার এখন খুব ভালো সময় যাচ্ছে। কোনো নেশা ভাঙ করে না, অনেক উঁচুতে উঠবে।'

কি যেন মন বুঝল বলরামবাবুর গ্যাবাজ ছেড়ে চলে এলো নতুন মালিকের সঙ্গে। তখন এই মালিকের দুটো গাড়ি ছিল। ফিয়াটটা চাপত মেমসাহেব। জিপে বড্ড হাওয়া ঢোকে, হুড খোলা থাকায় আব্রু থাকত না বলে ফিয়াটটাই পছন্দ করত মেমসাহেব। ফিযাট চালাত একটা নেপালি ছোকরা। খুব সাজগোজ ছিল তার। তার পোশাক-আশাক এবং বয়স দেখে কথাই বলতে চাইত না ছোকরাটা। সেই গাড়ি নেই, সেই ছোকরাও নেই। তখন মালিক আর মেমসাহেবকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখন দেখতে ইচ্ছে করে না।

তিন বছর আগে হুইলে বসত আকাশলাল। সকাল সাতটায় নাস্তা খেয়ে চটপটে পায়ে এসে জিপে উঠত। সোজা সাইটে কিংবা সদরেব ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে ছুটে যেতে হত তাকে। ভোর ভোর স্নান সেরে পুজো করে নিয়ে পবিত্র মনে স্টিয়ারিং ধরে ভোবেব হাওয়া রোদ মাখতে খুব আরাম লাগত আকাশলালের। ডুয়ার্সের ঝকঝকে বাস্তায় দুপাশে গাছের সারি রেখে ছুটে যেতে কি যে আরাম লাগত! শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে এসে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে বলে মনে হত। এইরকম হাওয়া শরীরে লাগালে বেঁচে থাকাটা বেশ আরামদায়ক হয়। যেতে যেতে মালিক জিজ্ঞাসা করত, 'এই জিপটাকে চালাতে তোমার কেমন লাগছে আকাশলাল?'

'বহুৎ আচ্ছা মালিক, ঠিকই হ্যায়।'

'আমার বউ এই জিপটায় উঠতেই চায় না। বুঝলে? কেন উঠতে চায় না জান?'

'নেহি মালিক।'

'ও বলে জিপ হচ্ছে কাঠ'খাট্টা পুরুষের মতো, রসকস নেই!' কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠত মালিক। কথাটা আকাশলালের মন খারাপ করে দিত। ড্রাইভার হিসেবে সে যে ওই নেপালি ছেলেটার চেয়ে ঢের ভালো এটা মেমসাহেবের জানা উচিত।

রবিবার মালিক বাড়ির বাইরে বের হত না। সেদিনটা চমৎকার কাটত আকাশলালের। ছিপ নিয়ে বেরিয়ে যেত ঝিলে। বিশাল ঝিল। কালো জল সেখানে স্থির হয়ে থাকে অনেক রহস্য নিয়ে। পুঁটি কাতলার বাচ্চা চটপট উঠে আসে। কিন্তু তাদের সাইজ এক বিঘতের মধ্যে। আকাশলাল মাছ মাংস মদ খায় না। শিকার করা মাছগুলো সে পৌঁছে দিত মালিকের বাড়িতে। প্রথম দিনই মালিক মাথা নেড়েছিল, 'এই মাছ কে খাবে আকাশ? ছোট মাছ বেজায় কাঁটা। আমার বউ কাঁটা বাছতে পারে না। তুমি খেয়ে নিও।'

'আমি তো মাছ খাই না মালিক।'

'আচ্ছা? তাহলে ধরো কেন?'

'ধরতে ভালো লাগে।'

'তাহলে রেখে যাও। চাকরবাকর খাবে।'

তাই করত আকাশলাল। তিন রবিবার। শেষ পর্যন্ত ছিপ নিয়ে বের হওয়া বন্ধ করল। সারাদিন কাঠের ঘরের সিঁড়িতে বসে দেখত প্রচুর মানুষ দঙ্গল বেঁধে বসে গেছে ঝিল-এর চারপাশে। মানুষ যা পারে তা ঈশ্বরও পারেন না। দেখতে দেখতে ঝিলটা ফাঁকা হয়ে গেল। বঁড়শি পড়লে ফাৎনা নড়ে না। শুধু মাঝখানে জল তোলপাড় করে একটা বিশাল মাছ শরীর মোচড়াতো। অনেকে অনেকরকম চেষ্টা করেছে। কোনো টোপই চেখে দ্যাখেনি মাছটা। হতাশ মানুষেরা রটিয়ে দিয়েছে মাছটার শরীর এত পেকে গিয়েছে যে তার শক্ত মাংস খাওয়া যাবে না। এখন দু-একজন ঝিলের পাশে বসে কি বসে না। এ দৃশ্য উদাস চোখে চেয়ে দ্যাখে আকাশলাল। দ্যাখে আর পায়ের শক্ত চামড়ায় হাত বোলায়। গদাধর বলেছিল বিলিতি মদে ভিজিয়ে রাখতে। বিলিতি মদের দাম অনেক। যারা বিলিতি পেটে ঢালে তারা পায়ের চামড়ায় কি নষ্ট হতে দেবে। কয়েক মাস আগে হলে সে নিজেই একটা বিলিতি কিনে ফেলতে পারত। তারপর তুলোয় জড়িয়ে পায়ের চামড়া ভেজাতো। কিন্তু তিনমাস আগে শেষ টাকা পেয়েছে মালিকের কাছ থেকে। বড় ভয় লাগে জমানো টাকা খরচ করতে। আগে এমন হলে চট করে সে অন্য একটা গাড়ির স্টিয়ারিং ধরার চাকরি নিয়ে চলে যেত। গেছেও তো কতবার। কিন্তু এবার পারছে না। বয়স হয়েছে এর? সেকথা ঠিক। এমনকি শরীরের চামড়াও কুঁচকেছে। কিন্তু তাই বলে খাটবার শক্তি তো যায় নি। তবু যেতে ইচ্ছে করছে না কোথাও। অস্বস্তি না ভয়, সেটা বুঝতে পারে না আকাশলাল। ডুয়ার্সের এই জায়গাটা তার মন থেকে শেকড় নামিয়েছে হাজারটা। তাছাড়া, গত কয়েকমাস সে ক'বার স্টিয়ারিং ধরেছে গুনে বলতে পারে। গাড়ি না চালিয়ে না চালিয়ে চালাবার মনটায় কেমন জং ধরে গেছে। যা টাকা তার কাছে আছে তাতে আরও এক বছর এই ঘরে বসে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মালিকের জন্যে। এইখানেই একটু গোলমাল হয়ে যায় আকাশলালের। ঈশ্বরকে মানুষ খেলায় না মানুষকে ঈশ্বর? ছয়মাস আগে হলে সে প্রতিদিন রাত্রে বোতল বোতল বিলিতি মদ পায়ে ঢালতে পারত, তখন তো পায়ের চামড়াটা শক্ত হয় নি। এখন চেষ্টা করলে মালিকের সঞ্চয় থেকে আধ বোতল দিশি সরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু দিশিতে এটা সারবে না বলে জানিয়েছে গদাধর।

বড় কন্ট্রাক্ট পাওয়ার কথা ছিল মালিকের। শিলিগুড়ির হরি সাহার কাছে গিয়েছিল খোশ মেজাজে। যাওয়ার সময় মালিক জিপে বসে বলেছিল কাজটা এত বড় যে তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ওটা করতে পারলে সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা যাবে। শিলিগুড়ির হরি সাহাও কাজটা চায় কিন্তু তার একার দ্বারা হবে না। অতএব দুজনে মিলতে চায়। পার্টনারশিপে ব্যবসাটা চালাবে শুধু এই কাজটার জন্যে। কখনও কখনও মালিকের মন ভাল থাকলে এইসব কথা বলত। ব্যাপারটা ভালো লাগে নি আকাশলালের। অন্যের ওপর বিশ্বাস কতদিন টিকে থাকে? কিন্তু কিছুই বলে নি সে। তার সাজে না মতামত জানানো।

কিন্তু সেই রাত্রে, জলপাইগুড়ি শহরের বাইপাস দিয়ে হু হু করে গাড়ি চালিয়ে ফেরার সময় একদম বেহুঁশ হয়ে থাকা মালিকের শরীরটার দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করেছিল, 'এটা ঠিক না মালিক। নিজের শরীরটা অন্যের কাছে ছেড়ে দিলে কুকুরও লাথি মারে। নিজের ব্যবসা অন্যের সঙ্গে জুড়লে তার ইচ্ছেটাও রাখতে হয়। লোকটা আপনার বন্ধু নয় মালিক। প্রথম রাত্রে এত মদ খাওয়ায় যে, সে আপনার বন্ধু হতে পারে না।' কিন্তু সেসব কথা শোনার ক্ষমতা ছিল না মালিকের। বাড়ির সামনে জিপ থামিয়ে আকাশলাল দেখেছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেটা

ভালোই বলে মনে হয়েছিল তার। মালিকের ওই অবস্থা অন্য চাকরবাকর দেখুক সে চাইছিল না। মালিকের শরীরটা কাঁধে তুলে নিয়ে গেট খুলে সোজা দোতলায় উঠে গিয়েছিল। কোন্ ঘরে মালিক ঘুমোয় তা সে জানত না। দরজা বন্ধ সব ক'টা ঘরের। তার মনে হয়েছিল যে বাড়ি মালিক যত্ন করে বানিয়েছে তার দরজা অন্য মানুষরা বন্ধ রাখে কেন? সে চাপা গলায় ডেকেছিল, 'মেমসাব, মেমসাব, মালিক আয়া হ্যায়।'

দক্ষিণের ঘরের দরজা খুলে গেল। মেমসাহেব আলো জ্বেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

'আমি মেমসাব। মালিকের শরীর ঠিক নেই।' তারপর মালিককে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চুপচাপ নেমে এসেছিল নিচে। সেই রাত্রে তার খুব খারাপ লেগেছিল। মালিকের মদ খাওয়াব জন্যে তো বটেই, আরও খারাপ লেগেছিল এই জন্যে মেমসাহেব কি করে ঘুমিয়ে ছিল? অতরাত্রে বিনা নোটিসে মালিক কখনও বাড়ি ফিরত না।

একবার আগল ভাঙলে জল ঢোকা বন্ধ করে কার সাধ্য। সন্ধেবেলায় মালিকের যাওয়ার জায়গা বেড়ে যেতে লাগল। আজ শিলিগুড়ি তো কাল হাসিমারা, সামচি থেকে মালবাজার ছুটোছুটি করতে হত আকাশলালকে। আর গভীর রাত্রে বেহুঁশ একটা শরীর কাঁধে তুলে পৌঁছে দিয়ে আসত আকাশলাল। তখন ঘর অন্ধকার থাকত। তাকে ডাকতে হত না। মেমসাহেব কোনো কথা বলত না। কাজ শেষ করে সে চুপচাপ নেমে আসত। ক্রমশ মালিকের শরীরটা পাল্টে যেতে লাগল। একটা কালো ছায়া চেহারাটাকে মুড়ে ফেলল ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটল। হরি সাহার কাছে গিয়েছিল মালিক। বাড়ির বাইরে জিপ নিয়ে বসেছিল আকাশলাল রোজ যেমন বসে থাকে। রাত-বাড়লে, রাস্তায় মানুষচলা শেষ হলে ভেতর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল। তারপর মালিক বেরিয়ে এলো টলতে টলতে। তাব মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। হরি সাহা পেছন পেছন ছুটে এসে চিৎকার করল, 'প্রমাণ কর আমি তোমার টাকা মেরেছি। ফের যদি এই নিয়ে কথা বল তাহলে লাশ নামিয়ে দেব। আজ রক্ত দেখিয়ে দিলাম মাত্র।'

আকাশলালের হাত নিসপিস করছিল। কিন্তু মালিক গাড়িতে উঠে সিটে শরীর এলিয়ে দিয়ে কোনোমতে বলল, 'বাড়ি চল, বাড়ি চল।'

আকাশলালের মনে হয়েছিল হাসপাতালে যাওয়া উচিত। মালিক বিড়বিড় করে নিজের মনে উচ্চারণ করেছিল 'সব শেষ, ফতুর হয়ে গেলাম।' তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল আকাশলালের। তার বলতে ইচ্ছে করছিল, 'কিছু শেষ হয় না মালিক। সব শেষ মানেই কিছুর শুরু। আপনি কাঁদবেন না।' তার আগেই মালিক চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ এদিকে?'

'হসপিটাল মালিক।'

'কোন্ শুয়োরের বাচ্চা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছে? ঘোরাও গাড়ি।'

'মালিক আপনার বহুৎ খুন—।'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মালিক তাকে বলেছিল গাড়ি থামাতে। হসপিটালের কাছাকাছি নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামানো মাত্র মালিক তাকে বলল, 'স্টিয়ারিং থেকে সরে যেতে। ভয়ে ভয়ে সে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে উঠে বসল। তার পরেই শুরু হলো ছুটে যাওয়া। ছুটে যাওয়া না বলে উড়ে যাওয়া বললেই ভালো হত। গাড়ি একবার রাস্তার এপাশে চলে যাচ্ছে আর একবার ওপাশে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল আকাশলাল। মালিককে তখন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। তার চিৎকারে কোনো কাজ হচ্ছিল না। প্রাণের ভয়ে সে সরে এলো পেছনে। মাথার ওপরের রড দুহাতে ধরে পা ঝুলিয়ে রাখল বাইরে। যে মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হবে সেই মুহূর্তেই যাতে লাফিয়ে পড়তে পারে এমন ভঙ্গিতে তৈরি হয়ে থাকল সে। যে রাস্তা তার আসতে লাগত

একঘণ্টা মালিক চলে এল প্রায় আধা সময়ে। বাড়ির সামনে জিপের ইঞ্জিন বন্ধ করে টলতে টলতে ঢুকে গেল বাড়িতে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছিল আকাশলালেব। ওই জিপটাকেও তার মনে হচ্ছিল একটা পাগলা ঘোড়ার মতো। মালিক চলে যাওয়ার পরও সে ঝুম হয়ে বসে ছিল একই ভঙ্গিতে। চেতনা সচকিত হলো মেমসাহেবের গলায় নিজের নামটি শুনে। চমকে লাফিয়ে নেমেছিল জিপ থেকে। মেমসাহেব বলেছিলেন, 'অনেকক্ষণ তোমাকে ডেকেছি, ঘুমুচ্ছিলে নাকি! গাড়ি চালিয়ে এলো কে?'

'মালিক।' আকাশলাল এত রাত্রে মেমসাহেবকে এখানে দেখবে তা কল্পনাও করে নি। কিছু বোঝার আগেই মেমসাহেব ফিরে গেলেন বাড়িতে।

দুদিন গাড়ি বের হয় নি তারপর। বেহুঁশ ছিল মালিক জ্বরে। ডাক্তার যাওয়া আসা করেছে। ডাক পড়ে নি আকাশলালের। ঝিলের ধারে কাঠের বারান্দায় বসে সে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করেছিল। খানা পাকাতে ইচ্ছে করে নি, ছাতু খেয়েছে একদিন। তারপর ছিপ নিয়ে বসে থেকেছে জলের ধারে। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বেশ সময় কেটে যায়।

মালিকের বাড়িতে দুটো ঘটনা ঘটল। নেপালী ড্রাইভারটাব চাকরি গেল। গাড়িটা বিক্রি করে দিল মালিক। কানে আসে মেমসাহেব নাকি আপত্তি কবেছিলেন। বিক্রি করতে হলে জিপটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। মালিক শোনে নি। সকাল বেলায় মাদারিহাটের কাছে একটা সাইটে তাকে নিয়ে যেত আকাশলাল। ওটাই মালিকেব শেষ কাজ। রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কনস্ট্রাকশনের কাজও চলছে। স্নান করে ফিটফাট হয়ে যখন মালিক জিপে চাপত তখন স্টিয়ারিং হাতে খুশী হত আকাশলাল। কিন্তু সাইটে গিয়েই মদের বোতল খুলত মালিক। একটা কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল কাজের জন্যে জল তুলতে। সেটা ভরে উঠল মদের বোতলে। আর রাত বাড়লে যখন কোনো হুঁশ নেই তখন প্রাণ ধড়াস ধড়াস করত আকাশলালেব। চিৎকাব করে তাকে স্টিয়াবিং ছেড়ে দিতে বলত মালিক। টলতে টলতে গাড়িতে ইঞ্জিন চালু করলেই ওটা একটা বন্য জন্তু হয়ে যেত। দুটো পা বাইরে ঝুলিয়ে মাথার ওপরের রড ধরে রাম নাম জপ করতে শুরু করে দিত আকাশলাল। হেডলাইট অন্ধকারকে ফালা ফালা করে ছুটত দুপাশে জঙ্গল রেখে। কতটা জোরে ওই জিপ ছুটতে পারে তা বোধহয় ওর নির্মাতাও জানত না। মদ খেলে মানুষটা কেন এত গতি চায়? এবং এই করতে গিয়েই জিপটা একরাত্রে নেমে এলো পাশের মাঠে। জঙ্গল কম, বুনো লতাপাতা ভেদ করে লাফাতে লাফাতে শেষ পর্যন্ত আটকে গেল উঁচু ঢিবিতে। রাস্তা ছাড়ার সময় লাফ দিয়ে নিচে পড়েছিল আকাশলাল। সেই অবস্থায় জিপটাকেও মাতাল বলে মনে হয়েছিল তার। ওপাশে কোনো শব্দ নেই। হেডলাইটের আলোটা শুধু ঢিবির গায়ে স্থির হয়ে আছে। গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে পিচের রাস্তা এবং মনুষ্যহীন জঙ্গলমহল। হুড়মুড়িয়ে ছুটেছিল সে জিপটার কাছে। তারপর উদ্বেগে চিৎকার করেছিল, 'মালিক, মালিক।'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। মালিক স্টিয়ারিং-এ মাথা হেলিয়ে পড়ে আছে। প্রথমে ধক্ করে উঠেছিল বুক। তারপর ঠোঁট নড়তে দেখে সে চিৎকার করল, 'মালিক, আপনি ঠিক আছেন?' কয়েকবার ডাকাডাকির পর মালিক হাত বাড়াল, 'ড্রিঙ্ক! হুইস্কি!'

গলায় এমন একটা সুর ছিল যে সম্মোহিত হয়ে গেল আকাশলাল। গাড়ির খোপ থেকে বোতল বের করে হাতে দিতে গিয়ে দেখল মালিকের হাত উঠছে না। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মতো সে মালিককে মদ খাওয়াল। সেটা পেটে যেতে মালিক বলল, 'সাবাস।' তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ল। আকাশলাল যেটুকু বুঝল তাতে নিশ্চিন্ত হলো মালিকের শরীর ঠিকই আছে, রক্ত বের হচ্ছে না। জিপটারও কিছু হয় নি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল যার ডাকে তাকে এখানে আশা করে নি আকাশলাল। দরজায় দাঁড়িয়ে মেমসাহেব হুকুম করল, 'তাড়াতাড়ি কর, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

মেমসাহেব আর দাঁড়ায় নি। তৈরি হয়ে দুদ্দাড় করে ছুটল সে। মেমসাহেব ঝি-এর হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে এলেন একটু বাদেই। সঙ্কুচিত হয়ে স্টিয়ারিং-এ বসতেই মেমসাহেব বললেন, 'তুমি স্নান করো না? কি বিচ্ছিরি গন্ধ!'

'জী মেমসাব, রোজ করি। শুধু এটাই হপ্তাতে একবার কাচতে হয়। কোন্ স্টেশন যাব?'

'কেন, ফালাকাটায় চল। ওখান থেকে সকালে ট্রেন পাব।'

আকাশলাল কোনো কথা বলল না। হাইওয়েতে পড়ে নিবিষ্ট মনে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। পথে কোনো কথা বলে নি মেমসাহেব। আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে নি সে। এক্তিয়ারের বাইরে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করে নি সে কোনোদিন। আজ কেন করবে?

ফালাকাটায় নেমে মেমসাহেব একশটা টাকা দিল তাকে, 'কলকাতার টিকিট কিনে নিয়ে এসো। জিজ্ঞাসা কর ট্রেন কখন আসবে?'

খবর নিয়ে ফিরে এল আকাশলাল, 'এখন কোনো ট্রেন নেই মেমসাহেব। দুপুরের আগে কলকাতার কোনো ট্রেন নেই। টিকিট কাটবো?'

'অন্য কোন স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেন পাওয়া যায় না?'

'জানি না মেমসাব, তবে গিয়ে দেখতে পারি।'

'তাই চল।'

এপাশে যদি ব্রডগেজ ওপাশে ন্যারো গেজ লাইন। দুটোর মধ্যে ব্যবধান তিরিশ কিলোমিটার। আধঘণ্টায় পৌঁছে গেল তারা। ন্যারো গেজের স্টেশনের অবস্থা খুব খারাপ। লোক খুঁজে পেতে সময় লাগল। আকাশলাল ফিরে এসে জানাল, 'প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আসার কথা বেলা বারোটায়। সেটা রোজ ছয় ঘণ্টা লেট করে।'

মেমসাহেব খবরটা শুনে খুব হতাশ হলেন। তারপর নিজের মনেই বোধহয় বললেন, 'কিন্তু আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। এখানে কোনো ভদ্রমানুষ বাস করতে পারে না।'

আকাশলাল বিনীত গলায় বলল, 'আগে থেকে সিট রিজার্ভ করে তৈরি হয়ে এলে মনে হয় ঠিক হবে মেমসাব। এইসব ট্রেনে খুব ভিড় হয়, আমি দেখেছি।'

'খুব ভিড় হয়?'

'হ্যাঁ মেমসাব। মেয়েছেলের ইজ্জত ঠিক থাকে না।'

মেমসাহেব চোখ বন্ধ করলেন। তার মাথা ঈষৎ পেছন দিকে ঝুঁকল। এই ভঙ্গী দেখে আকাশলালের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। তাকে খুব দুঃখী দুঃখী লাগছে এখন। অত ফরসা মুখে কালো ছায়া দুলছে। মেমসাহেব বললেন, 'শিলিগুড়িতে গেলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এই ভয়টাই করছিল আকাশলাল। ওখানে গিয়ে পয়সা ফেললে বাঘের দুধও মেলে। সে হাঁউমাঁউ করে বলে উঠল, 'আপনি চলে গেলে মালিক বাঁচবে না মেমসাব।'

'সে কি এখন বেঁচে আছে? এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে? না, আমি বাপের বাড়িতেই ফিরে যাব। ওর সঙ্গে থাকার কোনো প্রবৃত্তি নেই আমার।' মেমসাহেব মাথা নাড়লেন।

আকাশলাল বলল, 'ঠিক আছে মেমসাব।'

কথাটা শোনামাত্র মেমসাহেব তার দিকে চমকে তাকালেন। তারপর দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল?'

আকাশলাল খুব সঙ্কুচিত হলো, 'কিছু না মেমসাব। আমি কি বলতে পারি।'

'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। চল, ফিরে চল। আমি ওকে বাঁচাবার জন্যে ফিরে যাচ্ছি না। আমি নিজে বাঁচতে যাচ্ছি। আর মাথা নিচু করে থাকব না। উঠে এসো।'

ফেরার সময় মনটা প্রসন্ন হলো আকাশলালের।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই মেমসাহেব নেমে গেলেন। ব্যাগটা কাঁধে করে পৌঁছে

ফিরে গেল সে। এবং গিয়ে জানল মালিক বাড়িতে নেই। মেমসাহেব বাড়ি ফিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তার থাকার জায়গা আলাদা করাতে হবে। মালিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মালিক থাকবে সিঁড়ির তলায়, ঢোকার মুখে। এবং তারপর মেমসাহেব তাঁর নির্দেশটি জানালেন। আকাশলাল যেন মেমসাহেবের অনুমতি না নিয়ে জিপ না বের করে। এই বাড়ি এবং সম্পত্তি মেমসাহেবের নামে আইনত লেখা। অতএব এখন থেকে সব কাজ তাঁর হুকুমেই চলবে।

এত রাগ কেন বুঝতে পারে না আকাশলাল। স্বামী ব্যবসা করত, টাকা আসত। ব্যবসা চোট খেল, টাকা গেল। স্বামী মদ ধরল। এসব তো নিত্যদিন ঘটছে। তাই নিয়ে এরকম ব্যবহার করার কি মানে আছে! সিঁড়ির চাবি চলে গেল মেমসাহেবের কাছে। আর মালিককে খুঁজতে বের হলো আকাশলাল। এই গঞ্জ এলাকায় মালিক বড় একটা কারো সঙ্গে আড্ডা মারত না। গাড়ি ছাড়া রাস্তায় হাঁটতে তাকে দ্যাখে নি সে এই ক'বছরে। কিছুক্ষণ পথে পথে ঘুরতেই এলাকাটা শেষ হয়ে গেল। মেমসাহেবের ঝি বলেছে মালিক নাকি পায়ে হেঁটে বেরিয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদে গদাধরের সঙ্গে দেখা হলো তার। 'এই যে আকাশভাই, তোমার নাকি চাকরি চলে যাচ্ছে?'

চমকে উঠল আকাশলাল, তুমি কি করে জানলে?

আমার মালিক বলছিল। তোমার মালিকের সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে। জিপটাও বিক্রি করবে।

'জিপের মালিক মেমসাব, মালিক নয়।

'ও সবাই সমান। হাতের এপিঠ ওপিঠ। পুরুষ মানুষই হলো মেয়েদের পরিচয়। যাচ্ছ কোথায়?

মালিককে খুঁজতে।

হো হো করে হাসল গদাধর, তোমার মালিক মাল খাচ্ছে।'

কোথায়? অবাক হলো আকাশলাল। এই গঞ্জে মালিককে সে কখনও মদ্যপান করতে দেখেনি।

কিছুটা অবিশ্বাসের গলায় সে প্রশ্ন করল, কার বাড়িতে?'

'বাড়ি কেন হবে!' বলে আঙুল তুলে ইশারা করে দেখাল পাচু শা-এর ভাটিখানাটাকে। বিশ্বাস করতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না আকাশলালের। ওই ভাটিখানায় দিশী মদ বিক্রি করে পাচু। তার খদ্দের হলো যত কুলি-কামিন আর ট্রাক ড্রাইভার। দুটাকায় অনেকখানি গলায় ঢালা যায়। মালিক কেন যাবে ওখানে?

গদাধর বলল, যাও যাও, গেলেই দেখতে পাবে। চৌমাথার সবাই গিয়ে দেখে এসেছে। দেখার মতো দশা বটে।

এরপরে আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না। আকাশলাল একটু ইতস্তত করল। তারপর পা চালাল। বড় রাস্তা ছেড়ে সরু গলি নেমে গেছে নিচে। দুপাশে পরিত্যক্ত ড্রাম আর ছেঁড়া কাগজের স্তূপ। উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। পাচুর দোকানের সামনে বিশাল চালার নিচে ছেঁড়া মাদুরে বসে কুলিকামিনরা মদ খায়। সেখানেই দেখতে পেল মালিককে সে। পাজামা পাঞ্জাবি পরে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। মুখটা লাল, সামনে প্রায় শেষ হওয়া বোতল পড়ে আছে। তাকে দেখতে পেয়ে কাউন্টার থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'আর এক পাইট হটিতে পারবে না।'

আকাশলাল কাছে গিয়ে ডাকল, মালিক, আমি আকাশ।

লোকটা একবার ঝাঁকানি দিয়ে টলল। এই মানুষকে নিয়ে সে বাড়িতে ফিরবে কি করে। আকাশলাল ছেড়ে দিল। তারপর কিছুটা দূরে চুপচাপ বসে রইল। এই সকালে মাল খেতে আসেনি ভিড় হয়নি। দু একজন যারা আসছে তারা বোতল কিনে ফিরে যাচ্ছে। এখন কারো মদ

যাওয়ার সময় নয়। তারা মালিককে দেখে হাসছে। কিন্তু কিছু করার নেই তার।

দুপুর যখন পার হব হব তখন মালিক চোখ খুলল। ইংরেজি ভাষায় কি সব বলল বিড়বিড় করে। তারপর পড়ে থাকা বোতলটাকে টেনে নিয়ে গলায় ঢালতেই লাফিয়ে কাছে চলে এলো আকাশলাল, 'মালিক আর খাবেন না মালিক।'

'হু আর য়ু বাবা?'

'মালিক আমি আকাশলাল।'

আকাশলাল। আমার বউকে নিয়ে ভেগেছে।'

'নেহি মালিক। এমন কথা উচ্চারণ করবেন না। শুনলেও পাপ।'

নিঃশব্দে হাসতে লাগল মালিক। তারপর বলল, 'পাপ। পাপ মাই ফুট। আমার বউকে নিয়ে তুমি ভেগেছ আকাশলাল। তোমাকে আমি মাটিতে টেনে নামাব।'

মালিক মেমসাব বাড়িতেই আছেন।'

'বাড়িতেই আছেন মানে? সে ফিরে গেছে। হায় কপাল।' মালিকের চোখ মুখে প্রীতি ফুটে উঠল। 'ও কলকাতায় চলে যায় নি?'

নেহি মালিক।

'গুড ইয়াংম্যান। যা শালা ওর সমস্ত কিছুর চাট কেউ আমাকে বিরক্ত করবি না, এখানে তোকে কে আসতে বলেছে। সেই ড্রাইভারটা?'

'নেহি মালিক। আমি নিজেই এসেছি। এবার আপনি ঘর চলুন।'

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিল মালিক, 'ঠিক হ্যায়। খানা লিয়াও, কেন আউর বোতি।'

মালিক বাড়িতে ফিরে যাবেন, আমার সঙ্গে চলুন। টাকাগুলো কুড়িয়ে ফেরত দিল আকাশলাল। তারপর সাহস করে মালিকের হাত ধরল।

'তোমার ধান্দাটা কি বল। আর আমার আর সাধ্য কিছু নেই তোমাকে মাইনে দিতে পারব না। এবার কেটে পড় এখান থেকে। জিপটাকে শালা বিক্রি করে দিলে কিছুদিন চিন্তা করতে হবে না আমাকে।' মালিক এবার আকাশলালের সাহায্যে উঠল। 'জিপ কোথায়?'

'বাড়িতে। মেমসাব চাবি নিয়ে নিয়েছে।'

'শালা হারামি। এখানে কি মুখ দেখাতে এসেছ? তুমি বিয়ে করেছ?'

'না মালিক।'

'আরে ব্যাস। এ তো দেখছি বড়ো বয়সে নাজিল। ছি ছি বাবা, তোমার তো কোনো স্বাদই হয় নি। জন্মটাই বৃথা গেল। আমাদের আগের নেপালী ড্রাইভারটা আরে যেটা জিপটা চালাত, পদম না কি যেন নাম, মনে পড়ছে?'

'হ্যা মালিক।'

'আমার বউ ওর সঙ্গে শুতো। মাইরি বলছি। ওকে ছাড়াতে চায়নি বউ। তোমাকে রাখতে চেয়েছিল। তুমি বুড়ো বলে কোনো আগ্রহ নেই, তার ওপর তোমার গায়ে বোটকা গন্ধ। তবে তুমি ভার্জিন জানলে কি করবে জানি না।' মালিকের এবার হেঁচকি উঠল।

'এসব কথা বলবেন না মালিক।'

কেন বলব না? আমি আমার বউকে সুখ দিতে পারি না, বাচ্চা দিতে পারিনি এটা তো সত্যি কথা। কারও দোষ না। ভগবান দেয়নি তাই আমি পারি না। কিন্তু কেউ যদি পারে তাহলে দেখাতে দোষ কি? এটাই বউটা বোঝে না।'

'মালিক।' শিউরে উঠল আকাশলাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

হি হি করে হেসে উঠল মালিক, 'মানুষ মানুষ, মানুষ যদ্দিন থাকবে তদ্দিন সব চাপা থাকবে,

ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নেচে যাও কেউ বা কাড়বে না কিন্তু যেই তুমি ফতেবাবু হয়ে গেলে অমনি ব্যাঙাচিও লাথি মারবে। ঘাগুলো দগদগিয়ে উঠবে চাঁদ।

মালিককে নিয়ে পথে নেমেছিল আকাশলাল। লোকজন তাকিয়ে আছে হাঁ করে। মালিকের তাতে গ্রাহ্য নেই। বাড়ির কাছাকাছি এসে মালিক মাথা নাড়ল, না না, ওই হারামির বাড়িতে আমি যাচ্ছি না, প্রাণ থাকতেও না।'

হতভম্ব আকাশলাল জানিয়েছিল, 'ওটা মালিক আপনারই বাড়ি।'

সেকথাই তো বলছি। ওখানে আমি যাচ্ছি না। তোমার ওখানে চল।'

'আমার ওখানে? মালিক আপনি কি বলছেন?'

'ঠিক বলছি আকাশলাল। তুমি আকাশ, আমার বউকে নিয়ে ভেগেছ, তোমাকে ঠিক বলব না? আমার বউ হলো পায়রা, রকমরকম পায়রা, ওড়ে তো আকাশেই।'

আকাশলাল ভেবেছিল মালিক নেশায় আছে। সে বাধ্য হয়েছিল ঝিল-এর ধারে তাকে নিয়ে আসতে। ঘরে ঢুকে মালিক সতরঞ্চির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বলেছিল, 'আঃ কি আরাম।' তারপর মালিক ঘুমিয়ে পড়েছিল। আকাশলাল ছুটে গিয়েছিল মালিকের বাড়িতে। মাথা নিচু করে মেমসাহেবকে জানিয়েছিল মালিক এখন কোথায় আছেন মেমসাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন, 'এখন ভাটিখানায় জুটেছে। ছি। ও মদ নিয়েই থাকুক আকাশলাল। এ বাড়িতে না ঢুকলেই আমি শান্তি পাবো ও হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম জিপটাকে বিক্রি করে দেব। কিন্তু পরে মত বদলেছি। চলুক না চলুক একটা গাড়ি থাকা দরকার। তুমি ওই ঘরটাতেই থাকো। যখন দরকার হবে ডাকব। বাকি সময়টা ইচ্ছে করলে অন্য কাজ করতে পাবো।'

আকাশলাল কথাটার অর্থ বুঝতে পারেনি সঠিকভাবে। মেমসাহেব কি তাকে ঠিকে হিসেবে রাখতে চাইছেন। নিয়মিত মাইনেপত্র দেবে না? তাহলে তার চলবে কি করে? সে অবশ্য গদাধরের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্যাক্সি ড্রাইভারি করতে পারে কিন্তু এখন আর ওসব ধান্দা করতে একটুও ইচ্ছে করে না। সে মেমসাহেবকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করবে। তার টাকাপয়সা বেশী চাই না। খাওয়া পরা আর খইনির পয়সা হলেই চলে যাবে। আকাশলাল ফিরে এলো ঝিলের ধারের ঘরে। খিদেতে পেট জ্বলছে। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। ঘরে এসে সে দেখতে পেল মালিক নেই। আশেপাশে কেউ নেই যাকে জিজ্ঞাসা করবে হদিশ। আবার খুঁজতে বের হবার মতো ক্ষমতা ছিল না আকাশলালের। সে ছাতু মেখে মুখে তুলল। ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব চিন্তিত ছিল। এক মালিক ছিল তাকে নিয়ে নিল আর একজন। সে যেন একটা খেলনা, যে যার ইচ্ছে মতো খেলাচ্ছে। এই সময় ঝিলের জলে বেশ শব্দ করে খেলা করে গেল মাছটা। তার পর সব শান্ত।

আর তখনই আকাশলাল আবিষ্কার করল দাগটা। পায়ের অনেকটা জায়গায় কালচে ছায়া পড়েছে। আঙুল দিয়ে ঘষলেও উঠছে না। বরং মনে হচ্ছে সাড়টা কম। ভালো করে ঝিলের জলে পা ধুয়ে এলো সে। দাগটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। আকাশলালের মন খারাপ হয়ে গেল। এটা আবার কি ধরনের অসুখ।

মালিকের বাড়ি থেকে কখনো সখনো ডাক আসে। সেদিন মেমসাহেব সেজেগুজে বসে থাকে আগে ভাগে। এখন তার প্রতি কড়া নির্দেশ গন্ধওয়ালা জামা পরে গাড়ি চালানো চলবে না। প্রথমদিন বিকেলবেলায় মেমসাহেব পাশে বসে বলেছিলেন, 'শিলিগুড়ি।' পথে কোন কথা হয়নি শহরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হরি সাহার কাছে চল।'

চমকে উঠেছিল আকাশলাল। যে লোকটা মালিককে মেরে শাসিয়েছেন, পথে বসিয়েছে, তার কাছে যেতে চাইছে মেমসাহেব। কিন্তু নির্দেশ মান্য করাই তার কাজ পরিচয় দেবার পর হরি সাহার কর্মচারী তাঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে মেমসাহেবকে জিপে

পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল হরি সাহা। হাত কচলে বলেছিল, 'আজ আমি কৃতার্থ। মন চাইলেই চলে আসবেন, আমি সবসময় আপনার সেবায় তৈরি আছি।'

গাড়ি চললে মেমসাহেব আনন্দিত গলায় বলেছিলেন 'সব মানুষই খারাপ নয় আকাশ, ভালো ব্যবহার করলে শয়তানও ঈশ্বর হয়ে যায়।'

না, বাড়িতে কেউ আসতো না। কিন্তু মেমসাহেবের বাইরে যাওয়া বন্ধ হল না। আজ হরি সাহা, কাল প্রীতম সিং পরশু বদরিনারায়ণ। এরা সবাই মালিকের ব্যবসার বন্ধু। মেমসাহেব যখন ফেরেন তখন তাঁর পাশে জিপে বসে গন্ধ পায় আকাশলাল। গন্ধটাকে চেনে। সেই সঙ্গে তার মনে একটা ভয় পাক খেতে থাকে। কবে মেমসাহেব স্টিয়ারিং কেড়ে নেবেন আর তাকে বসতে হবে পেছনে পা ঝুলিয়ে। সেই অবস্থায় মেমসাহেব একদিন জড়ানো গলায় বলেছিলেন, 'তুমি খুব ভালো আকাশ, খুব ভালো। কিন্তু তুমি মদ খাও না।'

জী মেমসাব।'

কেন খাও না?

ইচ্ছে হয় না মেমসাব। তাছাড়া পয়সাও নেই।

ওই লোকটা তো ভিক্ষে করে মদ খায়। দিশী মাল শুনেছি ভোরবেলায় তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় ভাটিখানায়। তুমি ওকে পয়সা দাও আকাশলাল?

'জী মেমসাব।'

কেন দাও?

মালিক চাইলে না বলতে পারি না।'

কে তোমার মালিক? আমি না সে? তুমি হাত বদল হয়ে গেছ আকাশ। মনে থাকে যেন। ওকে আর পয়সা দেবে না।'

মালিকের বড় কষ্ট মেমসাব। ঠিকমত খান না। আমি আর কি খাওয়াতে পারি। ঝিলে মাছও নেই।'

ঝিলে একটা পাকা মাছ আছে শুনেছি। ওটা আমার চাই।

'ঠিক আছে মেমসাব। কিন্তু মাছটা বঁড়শি খায় না।

'নিশ্চয়ই খাবে। খাওয়াতে হবে। তোমার মালিক যদ্দিন আমাকে বাইরে যেতে দেয় নি তদ্দিন আমি তাই জানতাম। ও নিজে পারত না বলে অন্যকে লেলিয়ে মজা দেখত। কিন্তু এখন আমি জেনে গেছি যত বড় মাছ হোক ঠিক মতন বঁড়শি ফেললে খাবেই।'

দুইজন দু'প্রান্তের। দু'প্রান্তেরই বা কি করে বলা চলে। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। মাঝখানে সে। আকাশলাল অসহায় হয়ে পড়ে। মালিকের প্রতি তার কোনো দায় নেই তবু তাকে ছাড়তে পারে না। মেমসাহেব অবশ্য তাকে মাইনে দিচ্ছে এখন কিন্তু সেটা মানতে পারে না সে। এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার মনটা এখন অসাড় হয়ে গেছে। কি করবে সে। চব্বিশ ঘণ্টায় খুব কম সময় মালিক হুঁশে থাকে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সব সময় পয়সা চাইলে হ্যাঁ বলে না আকাশলাল। খারাপ লাগে তবু বলে না। আজ বিকেলে মালিক ছিল আধা হুঁশে। আর সেই সময় মাছটা ঘাই মারল। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল মালিক, 'আকাশলাল, মাছটার ওজন কত হবে মনে হয়?

'জানি না মালিক।'

'বিশ কেজি তো বটেই। তার মানে পঁচিশ করে হলে পাঁচশো। মাছটাকে আমার চাই। ধরে দাও আকাশ। তোমাকে একশ দেব। চারশোতে আমার দুমাস আরামসে চলে যাবে।' চোখ বন্ধ করল মালিক আবেশে।

'ও মাছ টোপ খায় না মালিক।'

'কিসের টোপ?'

'মযদা, ফড়িং, কাস্লে' কোমা —কোনোটাই না

ব্যাঙ কেন সাস্থ ব্যাঙ যে ব্যাঙের গা থেকে গন্ধ বেব হয়'

'ব্যাং হবে মাছ?

হ্যাঁ বাবা, আমি [illegible] বাছে শুনেছি। বঁড়শিতে গেঁথে ব্যাঙ ফেল জলে। নড়ে চড়ে বেড়াবে মাছ বুঝতে পাববে না ওটা গিললে বড়শি আটকাবে। ও মাছ আমাব চাই আকাশলাল। তোমাব একশ একদম পাকা কথা।' ফুর্তি নিয়ে বেবিয়ে গেল মালিক। যাওযাব সময বলে গেল ছিপ সুতো বড়শি আছে ও বাড়িতে। মাছেব বাপেব সাধ্যি নেই সেই সুতো ছেঁড়ে।

একশ টাকা। বোমাঞ্চিত হলো আকাশলাল। চাবশো হাতে পেলে মালিক নিশ্চযই আব তাকে বিবক্ত কববে না কিছুদিন। আব একশো পেলে সে একটা ছোট বিলিতি কিনে ফেলবে মালিককে লুকিয়ে। পাযে বড শক্ত হযে গেছে চামড়াটা। গরুব ঘাড়েব মতো। পুবো বোতল দিযে চামড়া ভিজিযে বাখলে আবাব আগেব মতো হযে যাবে। হাঁটতে আজকাল কষ্ট হচ্ছে বেশ।

আকাশলাল মালিকেব বাড়িতে গিয়ে ছিপ বড়শি সুতো প্রার্থনা কবল। মেমসাহেব হাসলেন, 'মাছটাকে ধবতে পাববে তো আকাশলাল? ভালো ফ্রাই হবে। সামনেব বুধবাব পার্টি আছে। আমি ফ্রাই খাওযাবো সবাইকে।'

মালিক মাছটাকে চায মেমসাব।'

কে চায? ওব চাওযাব কোন অধিকাব আছে? মাছ ধববে তুমি। তুমি আমাব লোক। ও চাইবে কেন? তুমি কাকে দেবে আকাশ? ওকে না আমাকে?' মদিব হাসলেন মেমসাহেব। বুকেব ভিতব চিতা জ্বলল আকাশলালেব।

'জী মেমসাব।'

'খুব বড মাছ?'

'দশ কেজি।'

'ও! ছেলে না মেযে?'

'জানি না মেমসাব।'

কাছে এগিযে এলো মেমসাহেব, ওব নাকেব ডগা দিযে বুলিযে আনবে মাছটা। তাবপব, 'আমি খাব আমি, আকাশলাল।'

ব্যাঙ কোথায পাওয়া, [illegible] গাযে গন্ধ আছে যে গন্ধ মাছকে টানবে। হ্যাবিকেন হাতে বাত দুপুব পর্যন্ত ব্যাঙ খুঁজে বেড়াল আকাশলাল। কত বকমেব ব্যাঙ চোখে পড়ল কিন্তু তাদেব গাযে তো গন্ধ নেই। খুঁজতে খুঁজতে চলে এল ভাটিখানাব পেছনে ডোবাব ধাবে। সেখানে পড়ে থাকা মদ ফেলে দেয চাকব-বাকব। বোতল ধোয জলে। গোটা চাবেক ব্যাঙ পেযে গেল আকাশলাল। নাকেব ডগায তুলতেই দারুণ গন্ধ ছাড়ছে যেন। মদ মদ মিঠে গন্ধ। মদ ধোওযা জলে বাস কবে শালাবা মাতাল হযে বসে আছে। পা চালিযে ঝিলেব ধাবেব ঘবে ফিবে এলো সে। মালিক পড়ে আছে চিৎ হযে। জ্ঞান নেই।

সকাল সকাল তোড়জোড় শুরু কবল আকাশলাল। যেখানে জল গভীব তাব কাছে পাড়ে বসে সে বড়শি ফেলল জলে। ব্যাঙেব পিঠেব কাছে এমন ভাবে বঁড়শি ঢুকিযেছে যাতে একটুও অস্বস্তি না হয ওটাব। বড়শিব এক বিঘৎ ওপবে সীসে বেঁধেছে। বেশ কিছুটা দূবে ব্যাঙটা জলেব ওপব খেলা কবছে। ফাৎনাটা তালে তালে দুলছে। এক দৃষ্টিতে চেযেছিল আকাশলাল। ঘণ্টাখানেক পাব হযে গেল মাছটাব কোনো চিহ্ন নেই। এব মধ্যে মালিক ঘুবে গেছে।

'খাচ্ছে? ঠোকবাচ্ছে?'

'না মালিক।'

পাবে ঠিক পাবে, আমি খদ্দের ধরতে যাচ্ছি। চারশো টাকা।'

মালিক যাওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদে মেমসাহেব এলো। সে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, মেমসাহেব বলল, আহা বসো বসো। মাছটা ধারে কাছে আছে?'

'জানি না মেমসাব।'

'ধরতে পারলেই ডাকবে। আমি জ্যান্ত দেখতে চাই ওকে। খুব সুন্দর একটা জিনিস দেব তোমাকে। সে কোথায়, তোমার আগের মালিক?'

'খদ্দের দেখতে গেলেন মাছটার জন্য মেমসাব।'

'দেখাচ্ছি খদ্দের। আমি তোমার মালিক মনে থাকে যেন।'

তারপর আরও দুঘণ্টা কাটল। নির্জন ঝিলের ধারে হাওয়া বইছে। চোখ টনটন করছে ফাৎনার দিকে চেয়ে চেয়ে। মাছটার কোনো পাত্তাই নেই। একবার বঁড়শি তুলে দেখেছে ব্যাঙটা দিব্যি আছে। ক্রমশ মনে হতে লাগল এই টোপ খাবে না মাছটা। কিন্তু কে অপেক্ষা করবে সন্ধে পর্যন্ত! দুটো মানুষকে দুঃখ দিতে পারবে না সে। দুটো লোকই চায় মাছটা উঠুক, সে চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু খিদেতে এক সময় অবসন্ন বোধ করল সে। অথচ ছিপ ফেলে ওঠাও যাবে না। ঘুম পাচ্ছে তার।

বুদ্ধি করে ছিপের ডগা থেকে সুতোটাকে খুলল আকাশলাল। তাতে ফাৎনাটা একটু কাঁপল মাত্র। তারপর সুতোর প্রান্তটা বাঁধল নিজের পায়ে যেখানকার চামড়া শক্ত এবং কালো সেখানে বাঁধনটা পড়তে তার ব্যথা লাগল না। নিশ্চিন্তি। এবার টানটান শুয়ে পড়া যাক। টোপ গিললেই সে জেগে যাবে।

চিৎ হয়ে শুয়ে সে আকাশটাকে দেখতে পেল। রোদ নেই। ঘোলা হয়ে আছে। হাওয়া বইছে। বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশলালের ক্লান্তি শিরায় শিরায়। ঘুম এলো লাফিয়ে। সমস্ত চরাচর এখন শব্দহীন। জলে ঢেউ কাঁপছে বাতাসের খেয়ালে।

হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান লাগল পায়ে। ঘুম ভাঙা হতভম্ব আকাশলাল বুঝতে না বুঝতে অনেকটা 'নেমে' এলো জলের পাশে। ঘোর কাটতে উবু হয়ে শক্ত কালো পায়ের চামড়া থেকে নাইলনসুতোর বাঁধন খুলতে গিয়ে আবার টান এলো। সবসমেত তার শরীরটা নেমে যাচ্ছিল নিচে। প্রাণপণে সে কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইল। কয়েক মুহূর্ত। শ্বাস নিয়ে সে আছড়ে পড়ল জলে। ব্যাপারটা এমন আকস্মিক যে একটা চিৎকারও তার গলা থেকে বের হলো না। একটানে অনেকটা জলের তলায় গিয়ে আলগা হলো সুতোটা। বাতাসের জন্য ছটফটিয়ে ভেসে উঠল আকাশলাল। চোখ মেলে দেখল পাড় অনেক দূরে। তখনই হ্যাঁচকা টান। কাঠের মতো ডুবে গেল তার শরীর। জলের মধ্যে কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিতে। চারধারে ঘোলা জল। হাঁ করতে তাই ঢুকে গেল পেটে। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আকাশলাল প্রাণপণে ওপরে উঠে এলো। তার চোখে অন্ধকার।

বাতাস ঢুকল বুকে। ঝিলের মাঝখানে সে। আবার টান এল। শরীরটা পেছনে পা সামনে ছুটে যাচ্ছে। এইসময় চেতনার শেষবিন্দুতে পৌঁছে সে মাছটাকে দেখতে পেল। চোয়াল শক্ত করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণপণে সুতোটাকে ছাড়াতে চাইল সে মাছটার শরীর থেকে। মাছটা ভয় পেল। জলজ শ্যাওলার মধ্যে সে ঢুকে যেতেই আকাশলালের শরীরটা এলিয়ে পড়ল। ছেঁড়া কাগজের মতো ভাসতে ভাসতে শ্যাওলার মধ্যে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

সীসেটা আটকে গিয়েছিল দাঁতে। মাছটার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কারণ সুগন্ধী ব্যাঙটা কপাৎ করে গিলে ফেলতেই অতবড় একটা ওজন তাকে টানতে হবে সে ভাবে নি। মরীয়া হয়ে এতক্ষণ ঝিলময় ছুটে বেড়িয়েছে সে। কিন্তু কিছুতেই ওজনটা তাকে ছেড়ে যায় নি। শেষপর্যন্ত সে কারণটা বুঝতে পারল। ওই নেতিয়ে পড়া মানুষটার সঙ্গে সে এক সুতোয় বাঁধা পড়ে আছে।

বাঁচতে হলে সুতোটাকে খুলতে হবে। কারণ ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে সুতোটাকে ছেঁড়বার সাধ্য তার নেই। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশী অস্বস্তি হচ্ছিল অন্য কারণে তার গলার কাছে ব্যাঙটা নড়ে বেড়াচ্ছে। ওটাকে বের করে দিতে পারলে খুশী হত সে। তার এমন যন্ত্রণার সময় ব্যাঙটা নড়ছে কেন? সে ওটাকে গিলতেও পারছে না শক্ত সীসের জন্যে। মাছটার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। এই ঝিলের সম্রাট সে। চেহারায় অহঙ্কার আছে। সে মানুষটার শরীরের কাছে এসে লেজ দিয়ে একটা আঘাত করল। নরম কাদায় মানুষটার মুখ সামান্য নড়ল মাত্র। এবার মাছটা সুতোর অন্যপ্রান্ত দেখতে পেল। মানুষের পায়ে বাঁধা আছে। টানাটানিতে আরও টাইট হয়ে গিয়েছে। কয়েকবার আঘাত করা সত্ত্বেও সুতো ছিঁড়লো না। সে সাঁতরাতে লাগল। শ্যাওলার বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষের শরীরটাকে তার এবার বেশী ভারি লাগল। যতক্ষণ মানুষটার প্রাণ ছিল ততক্ষণ তাকে টেনে বেড়ানো সহজ ছিল। তবু বন্ধনমুক্তির আশায় মাছটা সমস্ত ঝিলময় ছোটাছুটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে বিশ্রামের জন্যে একসময় শান্ত হলো। তবে এই ভেবে সে স্বস্তি পেল আর যাই হোক মানুষটার ক্ষমতা নেই তাকে আক্রমণ করার। শুধু গলার কাছে ব্যাঙটা যদি না থাকত।

কতো সময় কেটেছে মাছটা জানে না। এর মধ্যে প্রয়োজনে সে ওপরে উঠেছে, বাতাস নিয়েছে। মানুষটা শুয়ে আছে তেমনি, একাকী। মাছটা তার ঘ্রাণ নিয়েছে। সুতোটা খুলে গেলে সে একবার দেখবে মানুষটাকে খুলবে। ক্রমশ ওর গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। লোভনীয় খাবার বলে মনে হচ্ছে। অনেকদিন পেট ভরাবে মানুষটা। শুধু সুতো খুলতে যা দেরি। ক্লান্ত মাছ ঘোরের মধ্যে ছিল। হঠাৎ সে টান বোধ করল। কেউ তাকে ওপর দিকে টানছে। চকিতে প্রতিরোধ করল সে। কিন্তু ওপাশের শক্তি বেশ বেশী। বিহ্বল হয়ে সে দেখল নিচে শ্যাওলার মধ্যে শরীরটা নেই। সে টান লক্ষ্য করে ওপরে উঠে দেখল মানুষটা আরও ফেঁপে ফুলে ওপরে ভাসছে। জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের শক্তি যে এতো বেশী আবিষ্কার করে মাছটা আবার ছুটতে শুরু করল। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কারণ ওই মানুষটা কিছুতেই জলের তলায় নামতে চাইছিল না। মাছটা আরও কাহিল হয়ে পড়ছিল। শরীরটা ডুবছে আর ভাসছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল সে। তার বোধ হলো মানুষটা তার শত্রু নয়, সে মানুষটার নয়, সর্বনাশ করেছে সুতোটা। এইটে থেকে মুক্তি পেলে ওরা দুজনেই বেঁচে যেত।

লগি দিয়ে টেনে টেনে আকাশলালের বীভৎস শরীরটাকে তীরে নিয়ে আসা হলো। যারা ভিড় করে কাণ্ডটা করছিল তারা আকাশলালের চেয়ে নিঃস্ব মানুষ। উৎসাহটা তাদেরই বেশী। মালিক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। আকাশলালের বাক্সপ্যাটরা ঘেঁটে তিন হাজার টাকা পাওয়া গেছে। মাছ ধরতে গিয়ে লোকটা মরে গেল। চারশো টাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে লোকটা তিন হাজার দিয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'সৎকার খরচা আমার। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি।' তারপরেই হিসেব করে নিল দু'হাজার নয়শো পঞ্চাশে তার কতদিন চলবে। ঠিক অত টাকা নেই কাছে। কারণ মৃত্যুর খবর আর অর্থপ্রাপ্তির পর সে উদার হয়েছে। দিশীর বদলে আশি টাকা দিয়ে বিলিতি কিনে এনেছে। সেইটে হাতে নিয়ে সে উৎসাহ দিচ্ছিল এবার দেহটাকে টেনে তুলতে।

এইসময় মেমসাহেব এলেন। তাকে দেখে পথ ছেড়ে দিল অর্দ্ধনগ্ন মানষগুলো। মেমসাহেব আকাশলালের শরীরটার দিকে তাকিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, 'আহা বেচারা। ওর সৎকারের টাকাটা আমি দেব।'

'না আমি।' চিৎকার করে উঠল মালিক।

মেমসাহেব ঠোঁট বেঁকালেন। দেহটাকে তোলা হলো। ফুলে পচন শুরু হয়েছে। এবং তখনই একজন আবিষ্কার করল ওর পায়ে সুতো বাঁধা। কালো পুরু চামড়ায় সেটা বসে আছে।

মেমসাহেব তিনহাত পিছিয়ে গেলেন 'ইস, কি গন্ধ।'

মালিক এগিয়ে এল, 'গন্ধ বন্ধ কবে দিচ্ছি, কয়েক পেগ না হয় যাক।' তাবপব বোতলেব মুখ খুলে কিছুটা মদ ছড়িয়ে দিল আকাশলালেব শবীবে। এবং পুরু কালো চামড়ায পড়ল কয়েক ফোঁটা।

মেমসাহেব বললেন, 'হঠাৎ দেখছি বিলিতি?'

মালিক বলল, 'আবও অনেক কিছু দেখবে। যেমন দেখাচ্ছ।'

দেখাবই তো।' চাপা গলায় বলল মেমসাহেব, 'তোমাব সঙ্গে কথা আছে।'

আড়চোখে মেমসাহেবেব পেটেব দিকে দেখে নিয়ে মালিক বলল, 'তাই?'

এইসময় হৈচৈ উঠল। কয়েকটা হাতেব টানে সুতো উঠে আসছে। এব শেষতক মাছটাকে দেখা গেল। কয়েকজন নেমে গেল জলে। মাছটা কোনো প্রতিবাদ কবল না। হয়তো তাব সেটা কবাব শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। আকাশলালেব মৃতদেহেব পাশে সেই বিশাল মাছটাকে ফেলে দিতেই সে কয়েকবাব শেষ চেষ্টা কবল লাফাতে। ভিড়টা ভয় পেয়ে ছিটকে গেল দূবে। কয়েকবাব আছাড় খেয়ে মাছটা আকাশলালেব শবীব ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ আকাশলালেব পাশ থেকে সবিয়ে আনল তাকে দুজন।

মালিক নিজেব মনে বলল, 'বড্ড পাকা মাছ, বিক্রি হবে না।'

মেমসাহেব মাথা নাড়ল, 'ফ্রাই-এব মাংস হবে না।'

মালিক বলল, 'তুমি পঁচিশ দাও আমি পঁচিশ দিচ্ছি।

মেমসাহেব ভুরু তুলল, 'কেন?'

'সৎকাবেব জন্যে। কপালে পুণ্যি হয শুনেছি।'

আধাআধি পুণ্যি।'

মালিক চিৎকাব কবে বলল, 'কেটে ফেল মাছটাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুবি এসে গেল। ধপাৎ কবে কোপ পড়ল পেটে। গলগল কবে বক্ত এসে পড়ল শবীবেব পাশের মাটিতে। একজন সন্তর্পণে বঁড়শিটাকে বাঁচাতেই বোধহয মাছেব মুখ ফাঁক কবে। সীসে খুলে সুতোটাকে টেনে ছুবি চালিয়ে বঁড়শি আলগা কবতেই ব্যাঙটাকে দেখা গেল। সবাই হেসে উঠল। কাবণ ব্যাঙটা বেঁচে আছে এখনও।

সন্তর্পণে তাকে মুক্ত কবে মাটিতে ফেলে দিতেই সে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ পড়ে বইল। তাবপব নিজেব অস্তিত্ব প্রমাণ কবতে লাফ দিতেই মৃত মাছটাব শবীবে গিয়ে পড়ল। প্রবল উৎসাহে দ্বিতীয় লাফটা তাকে টেনে নিয়ে এল আকাশলালেব গলা শবীবে। এবং অনেক সময় বন্দী হয়ে যাওয়াব পব এখন ব্যাঙটা পবিচিত গন্ধ পেল। ভিজে ভিজে মদেব জল সে চুক কবে চেটে নিল জিভে, তৃতীয় লাফে সে নেমে গেল ঝিলেব জলে। মেমসাহেব চাপা গলায় বললেন, তোমাব নোংবা জামা থেকে আকাশলালেব গন্ধ বেব হচ্ছে।'

মালিক হাসল, 'তোমাব কথায আঁশটে গন্ধ। মাছটাব মতো।'

মেমসাহেব চকিতে সেদিকে তাকালেন। তাবপব অজান্তে একটা হাত উঠে গেল পেটে। সেখানে এক দুই এবং তৃতীয় লাফ দিয়ে কেউ শান্ত হল আপাতত।

গুরুচণ্ডালী কথা

সেই দ্বিপ্রহরবেলা হইতে সমগ্র শহর এবং নিকটস্থ গ্রামগুলি এই নদীচরে [illegible] ভাঙিয়া পড়িতেছে। আজ [illegible] চতুর্থী সারারাত্রিব্যাপী মেলা এবং প্রত্যুষে পুণ্যস্নান।

শহরটিকে মালার মত জড়াইয়া যে বাঁধটি তৈয়ারি হইয়াছে নদী হইতে তাহার দূরত্ব এখন প্রায় এক ক্রোশ। এই বিস্তীর্ণ বালুকাবেলায় কাশ এবং খড়ের জঙ্গলে শৃগাল ও খরগোশ নিরাপদে বিচরণ করে যতদিন বর্ষার আগমন না হয়। এখন শীতকাল। শীর্ণকায় নদীর চেহারা দেখিয়া ইহার তাণ্ডব করিবার ক্ষমতা বোঝা দুঃসাধ্য। কিন্তু স্রোতের তীব্রতায় বিদ্যুতের চমক আছে। এই বালুচরে প্রতি বৎসরের মত আজও মেলা বসিয়াছে। অসংখ্য হ্যাজাক এবং লণ্ঠনের আলোয় চতুর্দিক দিনের মত পরিষ্কার। অবশ্যই মেলার আশেপাশে যেখানে হ্যাজাকের আলো পৌঁছায় নাই সেখানে রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। বিরক্ত শৃগালেরা স্থানচ্যুত হইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া গলা খোলায় সেই রহস্য আরো বাড়িয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে ব্রাহ্মমুহূর্তে [illegible] নদীর হিমশীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া পাপ স্খলন করিলে জন্মজন্মে [illegible] হয়। লোকের আশা বড় মারাত্মক। যে জলে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে [illegible] অনেক [illegible] উপলব্ধি হয়। আজ রাত্রিশেষে সেই জলে [illegible] পাপ [illegible] সন্ধান পাইলে যা হয় [illegible]

সন্ধ্যা হইয়া [illegible] আর [illegible] ঈষৎ [illegible] পাইতেছে না। এই অন্ধকারে দুই ব্যক্তি বাঁধের উপর দিয়া নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করিতে করিতে আসিতেছিল। বোঝা যায় এই শহরের [illegible] মানুষের মত [illegible] ব্যক্তিটি শ্মশ্রুগুম্ফ [illegible] আলখাল্লা [illegible] যুক্ত এবং দেখিলেই [illegible] আত্মপ্রত্যয় [illegible] তাহার সম্মুখে [illegible] পাকবাশিয়া [illegible]। অন্যজন [illegible] ব্যক্তি [illegible] যদি বিফল হও তাহলে [illegible] মুখ দর্শন করব না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল 'গুরুদেব আপনার [illegible] বাধায় কিন্তু যদি [illegible] বলি, এত টাকার কি প্রয়োজন?'

গুরুদেব বলিল, গদাধর, পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিকল্প হল টাকা। ঈশ্বরের আশায় তিরিশ বছর কাটালুম, বদলে পেলুম তোমার মত মূর্খ শিষ্য। তাই ঈশ্বরের বিকল্প যখন চাইছি তখন একটু বুদ্ধিমান হবার চেষ্টা করো।'

গদাধর করুণ গলায় বলিল, 'আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন তো?'

গুরুদেব বলিল, 'থাকব। তবে নিজের দোষে যদি বিপদে পড় তবে আমার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করো না।'

গদাধর মিন মিন করিল, পাপের ভয়ে বুকটা ধড়ফড় করে [illegible]।'

গুরুদেব ধমক দিলেন, 'মূর্খ, ঈশ্বর এবং তার বিকল্প অন্বেষণে কোন পাপ নেই। মন শক্ত করো।'

গদাধর কহিল, 'যথা আজ্ঞা।' তারপর জনস্রোতে নিজেকে মিশাইয়া দিল।

একদিনের উৎসব বলিয়া বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা নাই। তাহা ছাড়া, এই অনুষ্ঠান ও মেলা আধা-অন্ধকারে ভাল খোলে বলিয়াই মানুষের ধারণা। গদাধর এই শহরে নবাগত, মেলায় [illegible]

বাই। সে লক্ষ করিতেছিল তাহার আশেপাশে যাহারা হাঁটিতেছে সবাই পশ্চিমা শ্রেণীর শ্রমিক সম্প্রদায়ের। ধর্মবিশ্বাস ইহাদের প্রবল। এই দরিদ্র মানুষগুলির টাকাকড়ি আত্মসাৎ করিবার সব রকম কৌশল গুরুদেব তাহাকে শিখাইয়াছেন। কিন্তু গদাধরের বাসনা মারিতে হইলে হাতি মারিবে যদিও গুরুদেব বলিয়াছেন তাহাতে বিপদ বেশী। বরং এই সব গরীবের ঘাড় মটকানো সহজ কাজ। কিন্তু সহজ কাজে তাহার প্রবৃত্তি নাই

মেলায় আসিতে হইলে দীর্ঘ বালুকাপথ হাঁটিয়া আসতে হয়। স্বভাবতই এই পথে আলো দেওয়া সম্ভব হয় নাই লাল পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকাইয়া গদাধর জিনিগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। এই প্রায়ান্ধকারে উহা প্রয়োগ করিলে কেমন হয়? কিন্তু মানুষজনের ব্যস্ততা ও অন্ধকারে উহার রূপ কেমন খুলিবে বুঝিতে না পারিয়া সে মেলার দিকে হাঁটিতে লাগিল। পায়ের চটিতে বালি ঢুকিয়া যাইতেছে। উত্তরবঙ্গের জলকাদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পায়ে নবা হাজার আগমন হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে বালি প্রবেশ করায় যন্ত্রণায় গদাধর ল্যাংচাইয়া ল্যাংচাইয়া হাঁটিতে লাগিল।

কাননবালার গান বাজিতেছে চোঙের গানে। একজন সুদেহী পুরুষ পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া সেই গানের তালে বালির ওপর নাচিয়া চানাচুর বিক্রি করিতেছে। কিছু গরীব রাজবংশী এবং বিহারী তাহাকে ঘিরিয়া আমোদ করিতেছে। এই জায়গাটায় ভিড় বেশী, গদাধর সরিয়া আসিল। চতুর্দিকে এখন বিভিন্ন জিনিসের দোকান। নিতান্ত সাধারণ জিনিসকে মেলায় কত আকর্ষণীয় বলিয়া বোধ হয়। বিশাল বিশাল বপু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে এক জায়গায় নামগান করিতেছে।

মেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে গদাধরের ক্ষুধার উদ্রেক হইল। নদীর শরীর ছুঁইয়া এখন বাতাস বহিতে শুরু করিতেছে। ফলে শীত জবরর বাড়িয়াছে। গদাধর তাহার লাল পাঞ্জাবির তলায় ছেঁড়া সোয়েটার এবং উপরে র‍্যাপার চাপাইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে খাবারের দোকানের দিকে চলিল। মাঝে মাঝে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া মানুষজন তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। এই ঠাণ্ডায় সেইগুলিকে মাতৃস্নেহের চেয়ে মনোরম মনে হইতেছে।

গরম গরম পুরি ভাজা হইতেছে দেখিয়া গদাধর দাঁড়াইয়া পড়িল। সারি সারি খাবারের দোকান এই তল্লাটে। মানুষজন হা-ঘরের ন্যায় তাহা সাবাড় করিতেছে। গদাধর পকেটে হাত ঢুকাইয়া দুইটি আধুলির সন্ধান পাইল। অনেক ভাবিয়া দোকানীকে চারটি পুরি তরকারি দিতে বলিয়া সে আসনের দিকে তাকাইল। রাত এখন কত বোঝা যায় না। অথচ আজ এই রাত্রির মধ্যে এক হাজার টাকা তুলিতে হইবে। বিশ্বস্ত শিষ্যের ন্যায় সে গুরু-আদেশ পালন করিবে—দীক্ষার সময় এই অঙ্গীকার যখন করিয়াছে তখন আজও তাহার অন্যথা হইবে না।

গরম পুরি পেটে পড়িতে শীত কিঞ্চিত কমিল। গদাধরের ইচ্ছা হইল গুরুদেবকে ডাকিয়া দুই চারিটা পুরি সেবা করায়—কিন্তু চতুর্দিকে নজর করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। হঠাৎ তাহার নজর এক ব্যক্তির উপর গিয়া পড়িল। দৈর্ঘ্যে মানুষটি গদাধরের সমান, তবে সামান্য কৃশ। আচার আচরণ দেখিয়া সেই সব লক্ষণের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। গুরুদেব শিকারের যে সব বর্ণনা দিয়াছেন ইনি তাহার প্রথম পর্যায়ে পড়েন। গোবেচারার মত এপাশ ওপাশ চাহিয়া লোকটি গদাধরের পাশে দাঁড়াইয়া দোকানীকে শুধাইল, 'গরম গরম দুটো নুচি ভাজ দিকিনি।' তারপর গদাধরকে প্রশ্ন করিল, 'হ্যাঁ মশায়, কেমন খাচ্ছেন?'

মুখভর্তি খাবার থাকায় ঘাড় নাড়িয়া গদাধর খাদ্যের উৎকৃষ্টতা জানাইল। লোকটির বোধ হয় মুখে জল আসিয়া গিয়াছিল, দোকানীকে আর একবার তাড়া দিয়া বলিল, 'নুচি খেয়েছিলাম একবার কোলকাতায়। বাগবাজারের নবীন ময়রার দোকানে। আহা!' তারপর পুরি তরকারি গলাধঃকরণ করিতে করিতে বলিল, 'তা, মশয় কি মেলা ঘুরতে এসেছেন?'

গদাধর ঘাড় নাড়িল, 'হ্যাঁ।'

লোকটি বলিল, 'এমন কিছু মেলা নয়, বাংলাদেশের সব বড় বড় মেলা আমি দেখিছি, এ তো নস্যি। তবে শুনেছি সকালবেলায় এখানে নাকি একটা কেলো হবে—তাই আসা—হেঁ হেঁ।

গদাধর অবাক হলেন, 'কি হবে?'

লোকটি বলিল, 'জানেন না দেখছি। আরে মশাই, এখানকার শহরে কে এক নামকরা বেবুশ্যে আছে—পটলদাসী না কি যেন—তিনি নদীর বুকে বসে তার পাপের কথা বলবেন। বুঝলেন?'

গদাধর ইহা জানিত না, শুনিয়া হাঁ করিয়া থাকিল।

লোকটি ফিসফিস করিল, 'তাই শুনে চলে এলাম। পটলদাসী যখন এসেছে তখন তাব সাঙ্গপাঙ্গরা কি বাদ গেছে? সন্ধে ইস্তক খুঁজে বেড়াচ্ছি, এখন উত্তর দিকটা বাকি আছে। জানেন নাকি?'

গদাধর ঘাড় নাড়িল। তাহার মাথায় ব্যাপারটি স্পষ্ট প্রবেশ করে নাই।

সে বলিল, 'নদীর বুকে বসে পাপের কথা বলবে কেন?'

লোকটি কিছু জবাব দিবার পূর্বে দোকানী বেশ গর্বের সঙ্গে বলিল, 'কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে যদি কেউ পবিত্র হয়ে নিজেব মন পরিষ্কার করতে পারে তবে অক্ষয় পূণ্যলাভ হয়।'

লোকটি বলিল, 'শুনলেন তো মশয়। জব্বর জমবে মনে হচ্ছে।' বলিয়া নিঃশব্দে শরীব নাচাইয়া হাসিতে লাগিল।

গদাধর গুরুদেবকে স্মরণ করিল। ইহার আচরণে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। লক্ষণগুলি হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। এই সব চালবাজ প্রমোদ-সন্ধানীরা উত্তম শিকার। পকেটে হাত ঢুকাইয়া গদাধর পযসা বাহির করিল তারপর লোকটির আপত্তি সত্ত্বেও দুজনের খাবারেব দাম মিটাইয়া দিল। লোকটি বলিল, 'হেঁ হেঁ মশয়, আপনি আমাকে ঋণী করলেন। তা ভালোই হল, একা একা ভাল লাগছিল না, আপনার সঙ্গ পেলাম। চলুন এবার উত্তর দিকটা দেখা যাক।'

উত্তর দিকে জনসমাগম কম, মানুষজন দ্রুত হাঁটাচলা করিতেছে। একটি চুড়ির দোকানেব সামনে শেষ হ্যাজাকের আলো জ্বলিতেছে। বাঁদিকে বেশ ঘন খড়ের জঙ্গল। শেয়ালের ডাক মাঝে মাঝে অন্ধকারকে রহস্যময় করিয়া তুলিতেছে। বাঁ দিকে একটি চালাঘর, সেখান হইতে প্রচণ্ড শব্দে হরিনাম ভাসিয়া আসিতেছে। গদাধররা সেইদিকে চলিল। উপরে চ্যাটাই-এর ছাউনি চারটি খুঁটিব উপব আচ্ছাদনের কাজ করিতেছে। তলায় অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে গোল হইয়া একদল রোগা রোগা মানুষ খোল বাজাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া হরিনাম করিতেছে। হঠাৎ গদাধরেব সঙ্গী তাহার কোমরে আঙ্গুল দিয়া খোঁচাইল, 'আগুনের ডানদিকে দেখুন, নির্ঘাত পটলদাসী।'

সহসা গদাধরের নজর পড়িল। লাল পাড় গেরুয়া রঙের শাড়ী পরিয়া একজন প্রৌঢ়া অগ্নিকুণ্ডের পাশে টানটান হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার দুই হাত নমস্কারের ভঙ্গীতে কোলেব উপব ন্যস্ত, চক্ষুমুদ্রিত, কপালে বৃহৎ সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করিতেছে। আগুনের লাল আভা তাহার গৌর অঙ্গে পড়িয়া কেমন হইয়া যাইতেছে। এই মুহূর্তে তাঁহাকে এই পৃথিবীর মানবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। যৌবন চলিয়া গেলেও সূর্যাস্তের পূর্বের রক্তাভাটুকু কি মায়ায় শরীরের হিমঘরে জমাইয়া রাখিয়াছে তাহা না দেখিলে বোঝা যায় না।

লোকটি বলিল, 'হেঁ হেঁ মশয়, চাবুক দেখতে, যৌবনে কেমন টুসকি ছিল ভাবুন তো।'

গদাধর মাথা নাড়িল।সত্যি চক্ষু ফিরানো যায় না। তারপর কি মনে পড়িতে চট করিয়া চারধার দেখিয়া পকেটে হাত ঢুকাইল। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর থরথর করিতেছে। গুরুর নির্দেশিত কর্মাদি করিতে করিতে সে আবার সম্মুখপানে তাকাইল। সেই পবিত্র মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার হঠাৎ দুর্গা ঠাকুরের কথা মনে পড়িয়া গেল। পটলদাসী বুঝি রূপের নিরিখে দুর্গা ঠাকুরকেও টেক্কা দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ দর্শন কবিযা লোকটি বলিল, 'চুলন মশয, বেশীক্ষণ এখানে দাড়ালে ধার্মিক হযে পড়ব।' তাবপব পিছু ফিবিযা দুই পা চলিতেই সে যেন প্রস্তববৎ দাড়াইযা পড়িল। পিছন হইতে গদাধব লক্ষ্য কবিল যে মাছ টোপ গিলিতেছে লোকটি ঈষৎ ঝুঁকিযা সেই দূববর্তী হ্যাজাকেব নিস্তেজ আলোয উদগ্রীব হইযা কিছু লক্ষ্য কবিতে কবিতে হঠাৎ গদাধবেব দিকে তাকাইল।

গদাধব জিজ্ঞাসা কবিল, 'কি হল।'

কেমন ফ্যাসফেসে অথচ টালমাটাল গলায লোকটি বলিল, 'দেখুন কি পড়ে আছে এখানে।'

গদাধব দ্রুত আগাইযা বালিব উপব হইতে একটি চন্দ্রহাব তুলিযা লইল, 'আবে এ যে দেখছি সোনাব হাব। এখানে এল কি কবে?'

লোকটি গদাধবেব কাঁধেব কাছে আসিযা বলিল, 'সোনাব তো?'

নিশ্চিন্ত প্রত্যযে গদাধব হাবটি দেখিতে দেখিতে বলিল, একশবাব সোনা। আমাকে সোনা চেনাতে আসবেন না। আমাব বাবাব বন্দকী কাববাব ছিল। তা চাব পাঁচ ভবি হবে বটে, যাব হাবিযেছে তাব কি অবস্থা কে জানে। চলুন মেলা কমিটিব কাছে জমা দিযে আসি।'

গদাধব হাটা শুরু কবিতেই লোকটি তাহাব হাত আঁকড়াইযা ধবিল 'আবে দাঁড়ান মশয, এ হাব কাব বুঝতে পেবেছি।'

গদাধব তাহাব দিকে অবাক হইযা তাকাইতে সে ফিস ফিস কবিযা বলিল, 'এ হাব নিঘাৎ পটলদাসীব। ঐ আখড়ায যাবাব সময এখানে কোমব থেকে পড়েছে। প্রচুব সোনাদানা নিযে এসেছে বোধ হয তাই খেযাল নেই। পাপেব টাকা পুণ্যবানে পায মশয। তাই বলছিলাম জমা দিলে তো পাঁচভূতে গাপ কবে দেবে, তাব চেযে আমি যখন প্রথম দেখেছি এই হাবটা আমিই নিযে নিই।'

'হেঁ, হেঁ,' গদাধব বলিল, 'আপনি নেবেন মানে?'

লোকটি হঠাৎ কোমব হইতে গেঁজে বাহিব কবিযা উহা হইতে তিনটি একশত টাকাব নোট লইযা গদাধবেব দিকে বাড়াইযা দিল। গদাধব কিন্তু কিন্তু কবিযা বলিল, 'চাব পাঁচ ভবি আছে, সোনাব দাম কত জানেন?'

লোকটি আব বাক্যব্যয না কবিযা আবো দুইশত টাকা যোগ কবিযা গদাধবেব হাতে গুঁজিযা দিযা হাবটি প্রায ছিনাইযা লইল। 'আমাব গিন্নীব মশয চন্দ্রহাবেব খুব শখ। কিন্তু দিন দিন কোমব বেড়ে যাওযায গড়াতে পাবছিলাম না, হেঁ হেঁ। আপনি মশয এইসব কথা কাউকে বলবেন না। বেশ্যাব হাব তো হাজাব হোক।' লোকটি এক হাতে গদাধবকে জড়াইযা ধবিযা হাঁটিতে লাগিল।

ঠিক এই মুহূর্তে গদাধবেব শবীবে লক্ষ কদম্ব ফুল সুবাস ছড়াইতেছিল। পঞ্চাশ টাকাব বিনিমযে নগদ পাঁচশো টাকা প্রাপ্তিতে তাহাব হৃদয ফুটবলেব মত নাচিতে লাগিল। হযতো চাপ দিলে আবো কিছু আদায হইত কিন্তু লোভই তো অনর্থেব কাবণ। এখন যতশীঘ্র এই লোকটিব সঙ্গ ত্যাগ কবা যায ততই মঙ্গল।

উত্তব দিকেব খড়েব জঙ্গলেব নিকটে আসিতেই মনে হইল অজস্র জোনাকি জ্বলিতেছে। কাছে আসিতে ভ্রম দূব হইল। কাহাবো হাতে কুপি, কাহাবো হাতে লণ্ঠন—বেগুনটুলিব বাসিন্দাবা মনোহব ভঙ্গীতে দাঁড়াইযা আছে। লোকটি বলিল, 'পেযে গেছি মশয। আঃ, এবা ছাড়া মেলা জমে?' হ্যাবিকেনেব আলোয সেইসব বঙিন মুখগুলি তাহাদেব দিকে গভীব প্রত্যাশা লইযা তাকাইযা আছে। লোকটি গদাধবেব হাত ছাড়িতেছে না। পবিদর্শনবত কোন সেনানাযকেব মত সে হাঁটিতে লাগিল। হঠাৎ গদাধবেব চক্ষুস্থিব হইযা গেল। একটি মেযেব কপালের ওপব টুনি বাল্ব জ্বলিতেছে। কি কবিযা তাহা সম্ভব হইল, মাথাব পিছনে বিবাট খোঁপাব অন্তবালে কোন ব্যাটাবিব অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা বোঝা গেল না। কিন্তু সেই বাল্বেব আলো কপাল চুঁইযা নাক মুখ বুকে আসা যাওযা কবিতে কবিতে জানাইযা দিতেছে ঈশ্বব ইহাকে মন

দিয়া গাড়য়াছেন। লোকটি নির্ঘাৎ জহুরী, কাছে যাইয়া বলিল, 'কি নাম তোমার?'

ঈষৎ মোটা গলায় উত্তর হইল 'পটল।'

লোকটি বলিল 'সে কি। পটলদাসী তো এখানে নামগান করছে।'

মেয়েটি হাসিল 'আজ রাতটার জন্যে আমরা সবাই পটলদাসী। আমি ভাল হরি-নাম করতে পারি, শুনবেন?'

'কত দিতে হবে?' লোকটি বলিল।

'দশ টাকা আর আমার ব্যাটারির খরচ দু টাকা।'

লোকটি ইঙ্গিতে সায় দিতেই মেয়েটি পিছনের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল গদাধর পিছাইয়া যাইতেই লোকটি তাহার হাত ধরিল,'যাচ্ছেন কোথায়, উটি হবে না আমি মশায় বিবাহিত লোক। একা থাকলে পাপ করে ফেলতে পারি, আপনিও চলুন, দুজনে একসঙ্গে তো পাপ হবে না নামগান শুনব। বলিয়া গদাধরকে টানিতে টানিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল গদাধরের হঠাৎ মনে হইল তাহার পকেটের পাচশত টাকার জলছাপ দেখিয়া লওয়া হয় নাই।

বেগুনটুলির বাসিন্দারা বাসা গাড়িতে দক্ষ। তাহা না হইলে এই খড়ের বনে বালুচরে বুদ্ধির এইরকম প্রয়োগ হইত না একহাতে বালি খুঁড়িয়া তিন চারিটি মানুষ শুইতে পারে এইরকম গর্ত করিয়া তাহার উপর খড়ের ছাউনি দেওয়া হইয়াছে। বালির উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহার একটু ঈষৎ ভেজা। কিন্তু এই শীতের রাত্রে ভেতরের আবহাওয়া বেশ উষ্ণ আরামপ্রদ। এক কোণায় একটি ভাঙ্গা কড়াইতে কাঠকয়লার আগুন মৌতাত ছড়াইতেছে। তাহারই আলোতে এক মায়াময় পরিবেশ তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। নিচু হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া গদাধরের মনে হইল, আর যাহা হউক না হউক শীতল বাতাসের হাত হইতে সাময়িক মুক্তি ঘটিল। কিন্তু এই অসভ্য পরিবেশ এবং এই লোকটির সঙ্গ ত্যাগ না করিতে পারিলে কপালে কি আছে তাহা বলা যায় না। হঠাৎ গদাধরের কপালে সিক্ততা অনুভূত হওয়ায় সে হাত দিয়া দেখিল সেখানে ঘাম জমিতেছে—এই শীতেও।

মেয়েটি তাহাদের বসিতে বলিল। বসিবার জায়গা অবশ্যই কম, তবু লোকটির পাশে গদাধর জায়গা করিয়া লইল। পেছনের বালিতে ঠেস দিয়া মেয়েটি খোপা খুলিয়া ছোট ব্যাটারী এবং টুনি বাল্ব খুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল একটু খাওয়া দাওয়া করবেন তো? ভাল জিনিস আছে।

লোকটি বলিল, 'এখানে পাওয়া যাবে?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িতে সে গদাধরের দিকে ফিরিয়া হাসিল 'সখী আমাদের দেখছি খুবই সংসারী। তা চলবে তো মশায়? না বললে শুনছিনে, হেঁ হেঁ।' মেয়েটি ততক্ষণে কড়াই-এর পাশে বালি সরাইয়া একটি বোতল বাহির করিয়াছে। তারপর ক্লিপ দিয়া তাহার কর্ক খুলিয়া এক ঢোক গিলিয়া লোকটির দিকে বাড়াইয়া দিল। মেয়েটির হাবভাব কথাবার্তা দেখিয়া গদাধরের সন্দেহ হইতেছিল সে এই তল্লাটের নয়। উত্তরবঙ্গে এত চালাক চতুর কথাবার্তায় এত মার্জিত মেয়ে এই লাইনে থাকিবে ভাবা যায় না। গেলাস নাই, তাহার প্রয়োজনও বোধ হয় নাই।

লোকটি ঢক ঢক করিয়া সবার্সরি গলায় ঢালিয়া প্রশ্ন করিল, 'নাম তো বললে না, দেশ কোথায়?'

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল, 'কলকাতায়।'

চোখ বড় করিয়া লোকটি তাহাকে দেখিল, 'এখানে এলে কি করতে?'

'চলে এলাম, পটলদির সঙ্গে যোগাযোগ হল।' গদাধর লক্ষ্য করিল কথা বলিতে বলিতে মেয়েটি বুকের আঁচল কোলের উপর আনিয়া ফেলিয়াছে।

লোকটি বলিল, 'তাই বল, বুঝলেন মশায়, কোলকাতায় খুব সুন্দরী সুন্দরী মেয়েছেলে

পাওয়া যায়।' মেয়েটি হাসিয়া উঠিল।

গুরুদেবের কাছে মাঝে মধ্যে কারণবারি প্রসাদ পাইয়াছে গদাধর, কিন্তু কোন নারীর সামনে বসিয়া মদ্যপান এই প্রথম। উৎকট গন্ধ এবং তীব্র জ্বালা তাহাকে এই মদ সম্বন্ধে নিরাসক্ত করিয়া তুলিল। এক ঢোকের পর আর খাইবার স্পৃহা রহিল না। তা ছাড়া তাহার মস্তকে আরো পাঁচশত টাকা উপার্জনের চিন্তা বাদুড়ের মত ঝুলিয়াছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোকটির চিন্তাশক্তি লোপ পাইল। জড়ানো গলায় সে বার বার মেয়েটিকে নামগান করিতে বলিতেছে। মেয়েটি সযত্নে শাড়ি ভাঁজ করিয়া একপাশে রাখিয়া গদাধরের দিকে তাকাইল, 'বেশীক্ষণ লাগবে না, দশ মিনিটের জন্যে ঘুরে আসুন না।'

তড়িৎস্পর্শ পাইয়া গদাধর উঠিয়া দাঁড়াইতে লোকটি এক হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে গেল, 'না, না যাবে না। আমরা তিনজনে নামগান করব আমি বিবাহিত লোক এরা থাকলে –'

শেষের দিকের কথা জড়াইয়া যাইতে মেয়েটি তাহার হাত নিজের দিকে টানিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল 'কি আছে, এসো নামগান করি।' গদাধর বাহির হইয়া আসিল।

যদিও এখন রাত গভীর তবু মেলার অপর অংশ হইতে মানুষজনের কণ্ঠ ভাসিয়া আসিতেছে। রেগুনটুলির বাসিন্দাদের পাশ কাটাইয়া আসিতে আসিতে গদাধরের কান লাল হইয়া গেল। উপোসী ছারপোকাদের মত তাহারা বাক্যবাণে তাহাকে ঠুকরাইতেছিল। দ্রুত পা চালাইয়া গদাধর ভাবিল, গুরুদেব যদি এই প্লটে তাহাকে দেখেন তবে রক্ষা নাই। আর যাহা হউক মেয়েছেলের প্রতি আসক্তি তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। পাশেই পটলদাসীর ছাউনি হইতে কীর্তনের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। রাত গভীর হওয়ায় স্বভাবতই গলার স্বর কিঞ্চিৎ দুর্বল। ওখানে গিয়া বসিয়া পড়িলে রাতটুকু উষ্ণতার মধ্যে কাবার হইতে পারে। কিন্তু আরো অর্থের দরকার। অর্ধপথে যাত্রাত্যাগ মূর্খতার সামিল।

হঠাৎ পিছনে ছায়ার মত কিছু নড়িতে দেখিয়া গদাধর চমকাইয়া উঠিল। চমক খাইলে হৃদপিণ্ড বুকের মধ্যে লাফ দিয়া ওঠে, সামলানো দায় হয়। স্থির হইলে গদাধর গুরুদেবের দর্শন পাইল। তিনি প্রসন্নমুখে হাসিতেছেন। যদিও তাহার সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত, শুধু নাক চোখ ও ঠোঁট উন্মুক্ত, তবু হাসির মায়াময়তা বোঝা কঠিন নয়। গুরুদেব বলিলেন 'না গদু তোমাকে আর মূর্খ বলা চলে না। কত বাগালে?'

গদাধর মাথা নিচু করিয়া বলিল, পাঁচশো।'

'চাপ দিলে আরো আসতো। থাক, বেশী লোভে কাজ নেই। তা মেয়েছেলেটাকে কিছু দিয়ে আসনি তো?' গুরুদেব প্রশ্ন করিলেন।

ঘাড় নাড়িয়া গদাধর অপরাধীর গলায় বলিল, 'গুরুদেব।'

গুরুদেব আবার সেই মায়াময় হাসি হাসিলেন, 'বৎস গদু ঈশ্বরের বিকল্প খুঁজতে এসে পথ নিয়ে চিন্তা করো না। তবে ঐ মেয়েছেলেটা বেশ খেলুড়ে। সঙ্কোচ রেখ না, টাকার গায়ে কখনো নোংরা লাগে না। তা মালগুলো তোমার কাছে রাখা ঠিক না আমায় দিয়ে দাও।'

গ্লানিমুক্ত গদাধর উৎফুল্লচিত্তে পকেটে হাত দিতেই তিন চারিটি নারীকণ্ঠে সোডা ওয়াটারের ফুৎকার শোনা গেল। গদাধর দেখিল রেগুনটুলির বাসিন্দাদের কয়েকজন প্রায় তাহাদের গায়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল ও অন্ধকারে ইহাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় নাই। একটি জড়িত নারীকণ্ঠ কহিল, 'অ, যাও প্যাবে, এইসা রাত ফির না আউঙ্গে।'

গুরুদেব বলিলেন, 'গদু, টাকাটা বের কর না। এরা শয়তানী। তুমি বরং পটলের কাছে যাও। ওখানে ভিড় আছে, ভিড়ে যাও সন্ধানী মন কখনো বিফল হয় না। আমি নিকটেই আছি। যাও।' শেষের দিকে গলাটি খুব দ্রুত চলিল। ফলে গদাধর আর অপেক্ষা না করিয়া পটলদাসীর ডেরার দিকে চলিল। চলিতে চলিতে সে গুরুদেবের আর একবার দর্শন পাইবার জন্য পিছন

ফিরিয়া চাহিয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না। তবে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে দুইজন বেগুনটুলিনীর সঙ্গে লম্বা যে দেহটি ঢুকিয়া যাইতেছিল তাহাকে—না, মন বড অপবিত্র হইয়া যাইতেছে—গদাধর ভাবিল। ঠিক সেই সময় শৃগালেরা উল্লসিত চিৎকার শুরু করিল।

পকেটে অর্থ থাকিলে মন বড সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, গদাধর কীর্তনে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশের মানুষেরা খোল করতালের সঙ্গে শীর্ণ কণ্ঠ মিলাইতেছে। গদাধর এক প্রান্তে বসিয়া পটলদাসীকে লক্ষ করিল। দুর্গা প্রতিমার মত চেহারা। কী মহিমা! আহা! পটলদাসীর চোখ তাহার উপরে পড়িতে গদাধর নজর ঘুরাইল। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, ডেরার পিছনেই নদী। তাহার তীরে বসিয়া এই রাতেও কাহারা কলাগাছের পেটোয় প্রদীপ ভাসাইয়া দিতেছে। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হয়, পৃথিবী হইতে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত এই সকল প্রদীপ যেন কোন বার্তা বহিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহারা প্রবেশ অধিকার পাইয়াছে কিনা বোঝা যাইতেছে না। কারণ, ঢেউগুলির গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা প্রবল। সম্মুখস্থ মানুষজনের মধ্যে মালদার কে আছে ঠাওব করিতে করিতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। কীর্তনের সুর উচ্চগ্রামে উঠিল। পার্শ্ববর্তী জঙ্গল হইতে বেগুনটুলিনীরা পটলদাসীর ডেরায় আসিতে লাগিল। যাহারা একা ছিল তাহারা তো বটেই, সঙ্গসুখ ত্যাগ করিয়া অন্যেরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উপস্থিত হইলে কীর্তন থামিল, পটলদাসী একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার শরীর হইতে আরো মহিমা বাহির হইতে লাগিল। সম্মুখস্থ বেগুনটুলিনীদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি ছোট্ট ভাষণ দিলেন, 'এবার আমি চানে চললাম। তোরা এবার যা খুশি কর, আমি বাধা দেবুনি। যে যত টাকা ধারিস সব ফিরি করে দিলাম। একটা কথা বলি, খপরদার পুরুষজাতটাকে রেয়াং করবিনি, শালারা হারামি। চান করার পর তো জীবনে বলতে পারবুনি তাই আর একবার বলেনি, শালারা হারামি।' কথাগুলো বলে তৃপ্ত মুখে পটলদাসী বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে বোল উঠিল। চতুর্দিকে হইচই পড়িয়া গেল। একটি কুলায় অনেক রকম প্রদীপ এবং ধান দূর্বা ফুল লইয়া একজন সামনে আসিল। ডেরার পাশে রাখা পালকিতে পটলদাসী উঠিয়া বসিলে বাহকেরা তাহা তুলিয়া ধরিল। কুলোধারীর পিছন পিছন পালকি চলিতে লাগিল। পালকির পিছনে যাবতীয় বেগুনটুলিনীগণ এবং দর্শক। পথ যত নদীর সন্নিকটস্থ হইল দর্শক তত বাড়িতে বাড়িতে গণনার সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেল। গদাধর দেখিল আকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। শুধু শুকতারার আভায় উত্তরাংশ দপদপ করিতেছে।

নদীর তীরে আসিয়া পালকি থামিল তবে মাটিতে নামিল না। কিছু রমণী কলার পেটোয় প্রদীপ ভাসাইয়া দিল। উহারা মালার মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একজন প্রবলবেগে শঙ্খ বাজাইলে শীর্ণকায় এক পুরোহিত পালকির দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পটলদাসী বলিলেন, 'বাবা, সব ব্যবস্থা হয়েছে তো?'

পুরোহিত কহিল, 'হ্যাঁ মা। ঊষা হতে আর বিলম্ব নেই। ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানই বিধেয়। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি ধর্মের কারণে, আপনার পাপের বোঝাটা কি রকম?'

বিস্মিত পটলদাসী বলিলেন, 'কেন?'

পুরোহিত বলিল, 'শাস্ত্রে আছে অল্প পাপে অল্প স্নান, বেশী পাপে—।'

বাধা দিয়া পটলদাসী বলিলেন, 'পায়ের নোক থেকে মাথার চুল অবধি ডুবে আছি বাবা।'

পুরোহিত বলিল, 'তাহলে তো মা আপনাকে একশো আটবার ডুব দিতে হবে।'

পটলদাসী নামিলেন। তাহার স্নান দেখিবার জন্য শতশত মানুষ হাঁ করিয়া আছে। বিনা পয়সার ফিস্টি লাগিয়া গিয়াছে যেন, গদাধর ভাবিল, একটু ঢাকিয়া ঢুকিয়া স্নানটা হইলে ভাল

হয় না?

পুরোহিত বলিল, 'মা, আজ অবধি যত পাপ করেছেন তার বোঝা একটু পরে হালকা হয়ে যাবে। একশ আটবার স্নান এবং তৎসহ দান ও যজ্ঞের পর স্বর্গের দরজা আপনার জন্যে খুলে যাবে। আর দেরি নেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মুহূর্ত আসবে, সূর্যদেব উঠবেন। আপনি জলের ধারে দাঁড়ান।'

পটলদাসী জলের ধারে আসিয়া পা ছোঁয়াইলেন, 'উঃ কী ঠাণ্ডা! পারবো তো ঠাকুরমশয়!'

কুলায় প্রদীপ জ্বালিয়া তাহা পটলদাসীর সামনে ধরিয়া পুরোহিত বলিল,'পারতেই হবে মা। তবে আপনার অতীত এখন ধুয়ে মুছে সাফ হবে। এখন থেকে আপনি অন্য মানুষ। লোকে আপনাকে দেখে পুণ্য সঞ্চয় করবে। খেয়াল রাখবেন আর যেন কোনদিন পাপ না করেন। তাহলে সব নষ্ট।'

হাঁ হইয়া তাকাইলেন পটলদাসী, 'কি বলেন বাবা, আর পাপ করতে পারবুনি?'

পুরোহিত ঘাড় নাড়িল, 'না।'

'সেকি।' প্রায় ডুকরাইয়া উঠিলেন পটলদাসী, 'তাহলে বাঁচব কি করে? অম্বল হয়ে যাবে যে!' সঙ্গে সঙ্গে সমবেত দর্শকমণ্ডলী প্রবলবেগে হাসিয়া উঠিল। পটলদাসী কহিলেন, 'যা পাপ করেছি তা আজ ধুয়ে দাও বাবা, আর প্রতি বছর যা পাপ করব প্রতি বছর নতুন করে ধুয়ে দিও, হবে না?'

পুরোহিত সবেগে ঘাড় নাড়িল, 'ওতে স্বর্গবাস হবে না। যে পুজোয় যা নিয়ম। আজকের স্নানের পরে আপনি আর কোনদিন পাপ করতে পারবেন না, জেনে রাখুন।'

মাথা নিচু করিয়া পটলদাসী কি ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'বেশ আর পাপ করবুনি। তবে আজ শেষবার পাপ করে নিই, অনেক দিনের অভ্যেস তো! আর পাপ যখন করতেই পারবুনি তখন সাধটা মিটিয়ে ফেলি।' কথাটা বলিয়া ধীর পায়ে সামনে আগাইয়া আসিলেন। এখন তাহার সম্মুখে বেশ কিছুটা জায়গা উন্মুক্ত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে গোল হইয়া মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। সূর্যদেবের উঠিতে একটু বিলম্ব আছে।

পুরোহিত বলিল, 'মা, আর পাপের দরকার কি? এবার স্নানের জন্য প্রস্তুত হন।'

পটলদাসী কহিলেন, 'জিভে এখনও নোলা লেগে আছে বাবা, শেষতক বাকি জীবন হেঁচকি তুলে মরব! তা হয় না। কিন্তু কি পাপ করি তাই ভাবছি।' চিন্তান্বিত চিত্তে পটলদাসী আরো দুই পা অগ্রসর হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিলেন। পাপ করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত সত্তা উদ্বেলিত। দুই হাত বুকের কাছে জোড়া করিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সারা জীবন যে পাপ করেছি তা তো এ বয়সে সম্ভব নয়। মিছে কথা বলেও ছাই সুখ হয় না। সোনাদানা টাকাকড়ি দিয়ে আর কী হবে—সে সব তো প্রচুর দেখলাম। কাউকে যে খুন করব সেটাও আর ইচ্ছে হয় না, এখন কাউকে ক্ষমা করে দিলে মনটা কেমন যেন ভাল হয়ে যায়। মরণদশা আমার।' এইমত ভাবিতে ভাবিতে পটলদাসী নদীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। কত রজনী নিদ্রাহারা লালসার মধ্যে কাটানো শরীরটার আজ সামান্য কোন ক্ষমতা নাই। আবছায়া আকাশটাকে ছাতির মত মাথায় ধরিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে। তাহার কোন খামতি নাই, চিরকাল হাতে কুপি জ্বালিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

পুরোহিত কহিল, 'মা আর দেরি নেই, প্রস্তুত হন।' শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, বেগুনটুলিনীরা উলুধ্বনি দিল, কে যেন সঙ্গে সঙ্গে কাঁসরঘণ্টা বাজাইয়া দিল। হাত নাড়িয়া পটলদাসী তাহাদের থামাইয়া দিলেন। তারপর সমবেত জনতার দিকে মুখ ফিরাইয়া পিঠ হইতে কাপড় টানিয়া মাথায় ঘোমটা দিলেন। তারপর দুই হাত যুক্ত করিয়া সামান্য উচ্চস্বরে কথা আরম্ভ করিলেন, 'আমার নাম পটলদাসী। আমি ভগবানের কাছে নিজেকে ধুয়ে ফেলে শুদ্ধ হয়ে যাব চিরকালের

জন্য। কিন্তু মনে বড সাধ শেষবাব পাপ কবে যাই। আব কখনো যখন কবতে পাববুনি— গলা ধবিযা আসিল পটলদাসীব। কোথাও কোন গোলযোগ নাই, সবাই বুডো আঙ্গুলেব উপব ভব কবিযা তাঁহাব কথা গিলিতেছে, 'তাই বলছিলাম, আমি তো ভেবে পেলামনি, তা আপনাবা যদি দযা কবে পাপেব হদিশ বলে দেন তো বড উপকাব হয।' কিছুক্ষণেব জন্য যেন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইযা গেল, শুধু দূববর্তী মাইকেব আওযাজ এবং নদীব কলতান কান বধিব কবিযা তুলিল। তাব পবই সমবেত জনসাধাবণ গুঞ্জন কবিযা উঠিল। এই ধবনেব প্রস্তাব যে আসিতে পাবে তাহা স্বপ্নেব অগোচবে ছিল। যে সমস্ত বযস্ক মানুষ এককালে বেগুনটুলিব আশেপাশে ঘুব-ঘুব কবিতেন পটলদাসীব ছাযা দেখিবাব জন্য অথচ সমাজেব ভযে ভিতবে ঢুকিতে সাহস পাইতেন না, এই মুহূর্তে মুখাভ্যন্তবে জিহ্বা সঞ্চালন কবিতে গিযা আবিষ্কাব কবিলেন তাহা শুষ্ক হইযা গিযাছে। গদাধব দেখিল সবাই উসখুস কবিতেছে। কেহ কেহ পটলদাসীব দিকে ফ্যাল ফ্যাল কবিযা চাহিযা আছে। এখন এই বযসে, সূর্য অস্ত হইযা যাইবাব পব পশ্চিমাকাশে যে বক্তাভাটুকু কযেক মুহূর্তেব জন্য বাখিযা যায, পটলদাসীব অঙ্গে অঙ্গে তাহাব বিচ্ছুবণ ক্ষণিকেব জন্যও মোহ ধবাইতে পাবে। হঠাৎ গদাধব লক্ষ কবিল, গুরুদেব তাহাব পিছনে ভিডেব মধ্যে মিশিযা আছেন। গদাধবেব চিত্তে আনন্দ হইল। তাহাব ইচ্ছা হইল গুরুদেবকে গিযা বলে, তিনি তো সবই জানেন, তাই পটলদাসীকে একটা পথ বাতলাইযা দেন। বেচাবী চাতকেব মত চাহিযা আছে। পবমুহূর্তেই তাহাব স্মবণ হইল গুরুদেব উমেদাবী একদম পছন্দ কবেন না।

পটলদাসী করুণ কণ্ঠে কহিলেন,'কই, কিছু বলুন। মাযাব বাঁধন ছেডাব আগে শেষবাব—আচ্ছা, আমি বললাম, যে আমাকে পাপেব বাস্তা শেষবাব দেখাতে পাববে তাকে পুবস্কাব দেব। এই ধরুন, একশ টাকা।' গুঞ্জন বাডিযা গেল, কিন্তু কেহ আগুযান হইল না। এই ধবনেব পুবস্কাবেব কথা কেউ কখনো শোনে নাই কিন্তু ভিড জমাট বহিল।

গদাধব শুনিল পার্শ্ববর্তী এক প্রৌঢ তাহাব সঙ্গীকে নিম্নস্ববে কহিতেছেন, যা বাব্বা, আগে পটলেব কাছে গেলে পযসায টান পডতো এখন ওই উল্টে টাকা দিতে চাইছে।' সঙ্গী কি কহিল শোনা গেল না।

পটলদাসী একটু উষ্ণ গলায কহিলেন, 'কি আশ্চয, সাহায্য কবতে না পাবলে সঙ-এব মত দাঁডিযে আছেন কেন? ঠিক আছে, পাঁচশো টাকা দিযে দেব। ক্ষেন্তি তোব কাছে আমাব যে টাকা আছে তা থেকে পাঁচশো আলাদা কব।' পার্শ্ববর্তী এক বর্ষীযসী বেগুনটুলিনী ঘাড দোলাইল।

সঙ্গে সঙ্গে চাবিধাবে সাডা পডিযা গেল। পাপেব পথ দেখাইলে পাচশো টাকা নগদানগদি। গদাধব অবাক হইযা দেখিল ভিড হঠাৎ পাতলা হইযা যাইতেছে। মানুষজন যেন আশঙ্কা কবিতেছে পটলদাসী টাকাব লোভ দেখাইযা তাহাদেব হঠাৎ শেষ পাপেব সঙ্গী কবিযা লইতে পাবে। গদাধবেব হাত নিশপিশ কবিতে লাগিল। গুরুদেবেব নির্দেশমত হাজাব টাকাব অর্ধেক তাহাব পকেটে, বাকিটা যখন পটলদাসীব মন ভিজাইলে পাওযা যায তখন তাহা ছাডিযা দেওযা মূর্খতাব সামিল। কিন্তু কোন পাপই সে—হঠাৎ তাহাব নজবে পডিল গুরুদেব কেটে পডা মানুষেব সঙ্গ লইতেছেন। তৎক্ষণাৎ সে গুরুদেবেব দিকে ছুটিযা গিযা তাহাব হাত ধবিল 'গুরুদেব যাচ্ছেন কোথায এ সুযোগ ছাডবেন না'

বিহ্বল গুরুদেব বলিলেন, 'আঃ গদা, হাত ছাড।

উত্তেজিত গদাধব বলিল, 'আপনি চলুন, আপনি ত্রিকালজ্ঞ, সামান্য জ্ঞান দিলেই পাঁচশো টাকা চলে আসবে। আমাব হাজাব টাকাব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। দযা করুন।' এই বলিযা পাগলের মত তাহাকে টানিতে লাগিল। গুরুদেব বিবক্ত, কুপিত এবং সব কিছু হইযাও হাত ছাডাইতে পাবিলেন না।

গদাধরের শরীরে যেন আজ লক্ষ হাতির শক্তি, মুখে এক বুলি, 'আর কেউ না পারুক আপনি পারবেন, গুরুদেব।'

সমবেত সজ্জনের সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য উপস্থিত হইল। ঈষৎ মোটা এক ব্যক্তি লাল আলখাল্লা এবং দাড়িযুক্ত এক ব্যক্তিকে হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। মেয়েছেলে এবং বোঝাই যায় দাড়িওয়ালা ব্যক্তি সন্ন্যাসী—দুই-এর সম্মিলন বড়ই উপাদেয়।

পটলদাসীর সম্মুখে গিয়া বুক ফুলাইয়া গদাধর বলিল, 'নিন, এই হলেন আমার গুরুদেব। আপনার পাপের পথ ইনি বলে দেবেন। কারণ, ইনি ত্রিকালজ্ঞ।'

পটলদাসী সম্মুখে এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তিভরে মাথা নিচু করিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি বড় হতভাগী, আমাকে দয়া করুন।'

গুরুদেব তখনও হাঁপাইতেছিলেন, চতুর্দিকে নজর করিয়া বুঝিলেন পালাইবার পথ নাই। দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিলেন, 'গদু!'

গদাধর জবাব দিল, 'বলুন গুরুদেব।'

পটলদাসী হঠাৎ আপ্লুত হইয়া গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, 'বাবা, দয়া করুন আমাকে।'

গুরুদেব কহিলেন, 'আমি চললাম।'

তাহার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমকাইয়া পটলদাসী মুখ তুলিলেন। তারপর অনেকক্ষণ নির্নিমেষ চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা, তুমি!' গদাধর দেখিল গুরুদেবের মুখ ন্যাপথলিনের মত সাদা হইয়া গেল।

ততক্ষণে পটলদাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন,'তাই বল, মুখ চোখ এমন জঙ্গল করে রেখেছ চিনবো কি!'

গুরুদেব ফ্যাসফেসে গলায় কহিলেন, 'কি বলছেন?'

কোমরে হাত দিয়া পটলদাসী চোখ ঘুরাইলেন, 'কি বলছি? আলখাল্লা তোল, দেখি তোমার হাঁটুর ওপরে সেই কাটা দাগ আছে কিনা।' সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পটলদাসী নাছোড়বান্দা, তাঁহার ইঙ্গিতে একজন আসিয়া গুরুদেবের আলখাল্লা তুলিয়া ধরিতে দুইটি শীর্ণ লোমশ পায়ের উপরের একটিতে কাটা দাগ দেখা গেল।

হঠাৎ পটলদাসী বালিকার ন্যায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 'ভগবান আছেন গো, ভগবান আছেন। সেই যৌবনকাল থেকে তোমাকে খুঁজছি। না, আর ভণ্ডামি করো না। আবার সন্ন্যেসী হয়েছেন। মনে নেই, তেরাত্তির কাটিয়ে দশ টাকা কম দিয়ে কেটে পড়েছিলে?'

গুরুদেব চাপা গলায় কহিলেন, 'আঃ, পটু।'

পটলদাসী উগ্র মূর্তি ধরিলেন, 'কি! আবার চোপা হচ্ছে। আমার শরীরটাকে শেষ করেছিল কে? কে আমাকে প্রথম রোগ ধরিয়ে বাঁজা করে পালিয়েছিল? থুঃ থুঃ থুঃ।' মাথা ঝাঁকাইয়া প্রবলবেগে গুরুদেবের দাড়িতে একরাশ সাদা থুথু ছিটাইয়া দিলেন পটলদাসী, তারপর ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'আমাকে মা হতে দিলে না গো এই ঘেয়োটা—'।

সমস্ত মেলা যেন বরফ হইয়া জমিয়া গিয়াছে। গুরুদেবের শরীরে যেন রক্ত নাই। হঠাৎ যেন বামনের মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে তাহাকে। গদাধরের মনে হইল তাহার চারিধারে, মাথায় যে উষ্ণ দেওয়াল ও ছাদ ছিল তাহা খসিয়া শীতের হিম বাতাস আসিয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ পটলদাসী চুপ করিয়া গেল। তারপর মাথায় কাপড় দিয়া কহিলেন, 'আর সময় নেই। শেষ পাপটা করে নিই তাহলে।' সমস্ত মেলাকে অবাক করিয়া দিয়া পটলদাসী তারপর সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম শেষ করিয়া কোনদিকে না চাহিয়া নদীর দিকে চলিতে চলিতে বলিলেন, 'পুরুতমশাই, এবার মন্ত্র পড়ুন, আমার সাধ মিটেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চারিধারে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, কাঁসি এবং উলুধ্বনি বাজিয়া উঠিল। পুরোহিত সবেগে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। পূর্বাকাশে সূর্যদেব উদিত হইতে লাগিলেন। পটলদাসীর স্নান শুরু হইল।

ভিড় হইতে নিঃশব্দে গদাধর নিজের অজান্তে নদীর ধারে চলিয়া আসিয়াছিল। এখন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে সে পায়ে পায়ে এই হিমবরফ জলে নামিয়া পড়িল। তাহার শরীরে কোন সাড় নাই। পটলদাসী হইতে খানিক দূরে অঙ্গ ডুবাইয়া স্নান করিতে গিয়া মনে হইল, তাহার পকেটস্থ টাকার জলছাপে জল লাগিতেছে। আর দেখিবার প্রয়োজন নাই।

চর, শহর এবং একটি বেকুফ

দিনরাত এখানে হাওয়া উথাল পাথাল হয়। চিকণ বালির সর গায়ে মেখে পাক খায় নিচু আকাশে। সূর্যের কড়া টানে ঝুরু-ঝুরু হয়ে গিয়েছে চরের বালি। কাশ আর বুনো ঝোপে ছেয়ে গেছে চওড়া নদীর বুক। শুধু এক পাশে, সেই সে-পাড়ে, পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা জলের ধারা তিরতিরিয়ে বয়ে যায় বাঙলাদেশের দিকে। ওপারের গরু হেঁটে পেরিয়ে আসে এদিকের চরে। স্বচ্ছন্দে।

দুই মাইল চওড়া এই নদী সেদিনও পৃথিবী কাঁপাতো। ছ'মাস নিরীহ সাপের মত গা এলিয়ে যে ঘুমতো তার গায়ে খুঁটি পোঁতার সাহস হয়নি কারো। যেই বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল, পাহাড়ে নাচন শুরু হল বর্ষার, সঙ্গে সঙ্গে নদী দাঁড়াতো ফণা তুলে। তারপর ছোবল আর ছোবল। দু'মাইল চওড়া ঘোলা জল দিনরাত গর্জে উঠত আর পাশের শহরটার প্রাণ সেই শাসানিতে হয়ে থাকত আধমরা। হঠাৎ একদিন জলগুলো নদী ছেড়ে উঠে এল দুই পাড়ে। দুমড়ে মুচড়ে শহরটাকে ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে নেমে গিয়েছিল আবার। লোকে বলল, প্রলয়, মহাপ্রলয়। মানুষ মরল, সম্পত্তি গেল, এতবড় শহরটাকে মৃত্যুপুরীর মত দেখাচ্ছিল!

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে নদীর দাঁত ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেল। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল নদীটাকে। সেই পাহাড়ের তলা থেকে বোল্ডার সাজানো হল, বাঁধ তোলা হল শহরের খানিক ওপর থেকে। ফণা তোলার আগেই কোমরে ঠিকঠাক ঘা মেরে রাখা হল। পোষা কুকুরের মত তখন ওই পঞ্চাশ গজে জল নেমে যায় বাংলাদেশের দিকে।

আশ্চর্য! নদী এই বাঁধন মেনেও নিল। আর তার ফণা নেই, নেই ফোঁসফোঁসানি। যদি কিছু বাড়তি জল বর্ষায় নেমে আসে তা চালান করে দেয় অন্য দিকে। পাহাড়ের গা থেকেই আর একটা ধারা অন্য দেশ অন্য গ্রাম দিয়ে বয়ে যায়। তাই শহরের মানুষ নিশ্চিন্ত। আর দিনের পর দিন বয়ে যাওয়া জল ক্রমাগত বালি ফেলে ফেলে চরের শরীর মোটা করেছে। নদী তাই নিজের বালি নিজেই অতিক্রম করতে পারে না। পঞ্চাশ গজেই প্রাণভোমরা ধুকপুক করে।

শহরটা কিন্তু চটপট নিজেকে সরিয়ে নিল। বেশ রঙচঙে হয়ে উঠেছে আবার। সেখান থেকে একটা লোক একদিন উঠে এল বাঁধে। উঠে জরিপ করল নদীর বুক। তারপর পেছন ফিরে

চিৎকার করল শহরটার উদ্দেশ্যে। তার ঝুপড়িটা ভেঙ্গে দিয়েছে নগরপাল। ঘর ভাড়া পাওয়া ওখানে স্বপ্নের মত ব্যাপার। শুধু দিনমজুরি করে যাও, তা বেশ, কিন্তু রাত্তির বেলায় ফুটপাতে থাকা যাবে না। একটা ভিখিরীকেও এই শহরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ঝুপড়ি ভেঙে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেলখানায়। তিনদিন বেদম পিটুনি দিযে বলে দেওয়া হয়েছে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। পকেটে যার টাকা নেই তাকে কে দেবে ঘর! অন্য মজুররা ওই ভিনদেশীকে দেয়নি ঠাঁই। ফলে লোকটা উঠে এল বাঁধে। এসে বলল, শহরের মুখে আমি ইয়ে করি।

লোকটা বালির মধ্যে হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর কয়েকটা বাঁশ আর দরমা দিয়ে তৈরী করে নিল মাথা গোঁজার জায়গা। নিচু হয়ে ঢুকতে হয় কিন্তু জানলা কেটে নিল সে। ফুরফুরে বাতাস ঢুকতে লাগল অবিরত।

আর তাই দেখে শহরের লোক উঠল আঁতকে। একি পাগল! ওই সাপের গালে গাল রেখে কেউ ঘুমোতে পারে? খবরটা পৌছালো নগরপালের কাছে। তাঁরা কাগজ নেড়ে দেখলেন নদীর চর শহরের সম্পত্তি নয়। অতএব যে মরতে চায় সে মরুক, শহরের লোকের তাতে কি যায় আসে!

অতএব তিনমাসের মধ্যেই চালার গায়ে লতানো গাছের কচিপাতা বাতাসে দোল খেতে লাগল। সারাদিনে মজুরের কাজ সেরে বিকেলে ফিরে যায় লোকটা চালায়। শহরের লোক ভুলেও চরে পা দিত না। দূরের বাধে দাঁড়িয়ে তারা চালাটাকে দেখত আর হাসতো। লতানো গাছে কি যেন একটা ফলও ফলিয়েছে লোকটা। খবরটা শহরের নিচুতলায় পৌঁছে গেল। যারা কোনমতে ঘর যোগাড় করে আধপেটা খেয়ে পড়ে ছিল তাদের দুজন সাহস পেল। কোন রকমে আর একটা চালা তৈরী করে নিল খানিক তফাতে।। তবে সে কিনা সংসারী মানুষ, বউ বাসন মাজে বাড়ি বাড়ি। দ্বিতীয় লোকটা অবশ্য সেই পয়সায় খায় না। তার গাঁজার মশলার হাত চমৎকার। এরকম একটা নির্জন চরে তার ব্যবসা জমে গেল খুব। সন্ধে হলেই শহরের ছোকরারা বাঁধ পেরিয়ে নেমে আসে গাঁজার টানে। অবশ্য বউটি ফিরে এলেই হাওয়া হয়ে যায় বাউন্ডুলেরা। তখন চড চাপড পড়ত গেঁজেলের ওপরে। প্রথম লোকটা শেষে চিৎকার করে বলেছিল, 'অ্যাই, যা কিছু ঝামেলা শহরে গিয়ে করবি এই চরে যেন কোন শব্দ না হয়।' লোকটার বিশাল চেহারা, একমুখ দাড়ি দেখে ভয় পায় এরা।

তারপর একদিন মেঘ পাক খায় আকাশে। ফিনকি দিয়ে জল ঝরতে থাকে। দ্বিতীয়জনের বউ ছুটে যায় প্রথমজনের কাছে, 'কি হবে, বর্ষা এল যে!'

লোকটা হাত ঘোরায়, 'যা ভাগ! বৃষ্টি দেখতে দে। ভয় তো এলি কেন?' এই গায়ে পড়া ভাবটা একদম সহ্য হয় না তার। বউটা দুতিনদিন চেষ্টা করেছিল ভালমন্দ খাবার পাঠিয়ে দিয়ে ভাব জমাতে। যেমন আছ তেমন থাকো, অত গা শোঁকাশোঁকির কি দরকার? গেঁজেলের খদ্দের কমেছে। বৃষ্টিতে চরে আসতে ভয় পায় সবাই। বউটা একটু নরম হয়েছে যদিও কিন্তু হঠাৎ জলের ভয় ধরেছে গেঁজেলেরও মনে। কিন্তু নদীটা যেন চিরে গেল হঠাৎ। ওপাশে ছিল পোষা কুকুরের মত, একটা ধারা হঠাৎ এপাশে এসে গেল বর্ষার জল পেয়ে, কিন্তু স্বভাব হল আদুরে বেড়ালের মত। মাঝখানের চরটা উঁচু হয়ে শক্ত বালি আর দুটো চালা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগল বেশ। এখন বেশ সুবিধে হয়েছে বউটার। জলের ধারায় গা ডুবিয়ে স্নান করে। চরের দিকে ফিরে বুকের কাপড় ছাড়ে। লোকটাকে চোখ বন্ধ করতে হয়। ছুটে গিয়ে শাসায় গেঁজেলটাকে, 'ভাল ভাবে যদি এখানে না থাকো তাহলে উড়িয়ে দেব চালা।'

গেঁজেলটা বুঝতে পারে না কিন্তু বউটা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ঢঙ!'

একটা বর্ষা ফুরোলেই শুকনো বালি ওড়ে হাওয়ায় আর দুটো রিকশাওয়াল নেমে আসে চরে। তাদের ডেরা ভেঙ্গেছে নগরপাল। সুন্দর উদ্যান হবে সেখানে। এসে জিজ্ঞাসা করে

প্রথমজনকে, 'এখানে ঘর তুলব? শহরে থাকার জায়গা নেই।'

লোকটা মাথা নাড়ে, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তবে আমাব চালা থেকে তফাতে।' আঁটোসাঁটো চালা বানায় তারা। তাই দেখে ভরসা বেড়ে গেল শহরেব নড়বড়ে আধ-পেটাদের। তিনমাস না ঘুরতে পনের ঘর বাসিন্দা হয়ে গেল চরের। বালির ওপব বুনো ঘাস গজাচ্ছে, নধর লতানো গাছে চালাগুলো ছেয়ে যায়। আর একটা চালায় রেডিও বাজে সারাক্ষণ। তবে লোকটা ফিরে এলেই তার গলা নেমে যায়। শহরের লোক সকাল বিকেল বাঁধে বেড়াতে এসে বলাবলি করে, সাহস খুব। একটা বর্ষা কোনমতে কেটেছে কিন্তু পবেব বর্ষায় নদী ক্ষেপলে দমবন্ধ হয়ে মবে যাবে ব্যাটারা। নদীর স্বভাব জানে না এই পবগাছাগুলো।

কিন্তু একদিন দারোগাবাবু এলেন চারজন পুলিশ পেছনে নিযে। বাঁধ থেকে বালিতে পা উঠিয়ে চালা অবধি হেঁটে এসে হাঁক দিলেন, এই, তোদেব মোড়ল কে? সর্দার কোই হ্যায়?'

গেঁজেলটার বউ আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল আলাদা চালাটাকে। দাবোগা তার সামনে গিয়ে গর্জন করল, 'কে আছিস, বেবিযে আয়।'

সারাদিন খেটেখুটে লোকটা, তখন সবে শুয়েছিল, অবাক হয়ে বেবিয়ে এসে দেখল পুলিশ।

'তুই এই চরের মোড়ল?'

লোকটা ঠোঁট নাড়ল। সে মোড়ল হতে যাবে কেন? সে কাবো সাতে-পাঁচে থাকে না।

পিছন থেকে বউটা চেঁচিযে উঠল, 'হ্যাঁ বাবু, ও মোড়ল।'

'শোন। এই চর তোমাদের ছাড়তে হবে।' দাবোগাবাবু হুকুম করলেন।

'ছাড়তে হবে?' লোকটার চোখ ছোট হল, 'কেন? অপরাধটা কি?'

'এই চরে লোক বাড়ার পর থেকে শহরে চুবিচামাবি বেড়ে গেছে। লোকে বলছে চবের লোকই বাতে শহরে চুরি কবতে যায়। এটা বেআইনী বসতি, অতএব উঠে যাও তোমবা। আমি কোন কথা শুনতে চাই না।' দারোগাবাবু লাঠি নাচালেন।

লোকটা মাথা চুলকালো, 'অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

'কি?'

আপনার হাতে খারাপ ফোঁড়া হয়েছে।'

'আমার হাতে?' দারোগাবাবু হকচকিয়ে দুটো হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'কই? নেই তো! ইয়ার্কি হচ্ছে হারামজাদা, শুযার—।'

লোকটা হাতজোড় করল, 'অভয় দিয়েছেন তাই বললাম। হুজুব, খারাপ ফোঁড়ার কথা শুনেই আপনি সেটাকে ডাক্তাব দেখাতে গেলেন না। ঘুরিয়ে ফিরিযে দেখলেন ঠিক কিনা? তাই তো?'

'কি বলতে চাস?'

'হুজুর, ভাল করে দেখুন, এখানকাব কেউ চুরি করে কিনা! সত্যি হলে আমি তাকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

দারোগাবাবু হাসলেন, 'বুদ্ধিমান লোক মনে হচ্ছে। বেশ, ধরতে পারলে আমি সব চালায় আগুন ধরিয়ে দেব, মনে বাখিস।'

দারোগাবাবু চলে গেলে আনন্দিত লোকগুলো ঘিরে ধরল লোকটাকে, 'দাদা, তুমি বাঁচালে এ যাত্রা। তোমাকে আমরা সবাই মোড়ল বলে মেনে নিলাম।'

লোকটা হুঙ্কার দিল, 'ভাগ শালারা। আমাকে একা থাকতে দে।'

লোকগুলো হেসে বলল, 'দাদার মন সরল, ঠিক সন্ন্যাসীর মত।'

লোকটা চেঁচালো, 'দারোগা কি বলে গেল সবাই নিশ্চয় শুনেছ। চোর-ছ্যাচোর এখানে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি।'

লোকগুলো হেসে উঠল, তাবপব ফিবে গেল যে যাব ডেবায়। এই সময় একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এল হেলতে দুলতে। তাব শবীব ভাবী এবং চোখ চড়ুই পাখিব মত উড়ছে বসছে। এসে বলল 'চুবি চামাবি মানে কি?'

লোকটা নিজেব ঘবে ঢুকতে গিয়ে ফিবে তাকাল, 'এটা আবাব কে?'

দ্বিতীয় জনেব বউ এগিয়ে এল পাশে, 'আমাব বোন। এখন থেকে এখানে থাকবে।'

'অ। তা বোনকে চুবিব মানে শিখিয়ে দাও।'

'আহা', তুমিই বল না শুনি। হুকুম কবলে, চোব-ছ্যাঁচোব থাকতে পাববে না। তা চুবি কবা কাকে বলে সেটা বলে দাও।' মেয়েটি চোখ ঘোবাল।

অন্যেব জিনিস না বলে নিলে চুবি কবা হয়।' লোকটি ভেবেচিন্তে জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল কবে হেসে উঠল মেয়েটি। তাবপব মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল 'কেউ যদি জিনিসটা হাবিয়ে ফেলে আব একজন যদি তা টুক কবে তুলে নেয়?'

'সেটাও চুবি বলে, লোকটা গম্ভীব গলায় জবাব দেয়।

'তাই?' চোখ ঘোবাল মেয়েটা। 'তাহলে তো চোব খুঁজতে যেতে হয়।'

মানে?

আমাব একটা জিনিস যে চুবি গেছে।'

কি জিনিস '

আঙুল তুলে ধীবে ধীবে বুকেব ওপব বাখল মেয়েটা। বেখে হেসে উঠল উচ্চস্বরে। সঙ্গে সঙ্গে তাব বোন আঁতকে উঠল, 'ওমা, কখন?'

'ওই যে, যখন দাবোগাব সঙ্গে কথা বলছিল। কি চমৎকাব কথা বলে না দিদি'

লোকটা আব অপেক্ষা কবল না। চালায় মাথা নামাবাব আগে চিৎকাব কবল, 'ওসব ছেনালি কথাবার্তা আমাব কাছে বলে সুবিধে হবে না। আমি মেয়েমানুষেব ছায়া মাড়াই না।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসিব ফোয়াবাটাকে তুলে নিল হাওয়া, সমস্ত চবময় ছড়িয়ে দিল যেন

নদীব বুকে বালি জমে যাওয়ায় খালটাব অবস্থা কাহিল শহবেব ঠিক মাঝখান দিয়ে খালটা বয়ে যেত জল গিয়ে পড়তো নদীব বুকে। সেই মহাপ্রলয়েব সময় এই খালটাকেও সঙ্গী হিসেবে ব্যবহাব কবেছিল নদী। নিজেব জল উজিয়ে দিয়েছিল খালেব বুকে। শহবেব মানুষ সে বাস্তাও বন্ধ কবেছে বাঁধ বেঁধে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছে লম্বা খালটা। একটু একটু কবে মজে গেছে জল, তলাব শ্যাওলাবা পর্যন্ত অখুশী এখন। গেল বিজয়াব ভাসান পর্যন্ত নৌকোয় চাপা হয়নি খালেব বুকে। একটা মবা আঁশটে গন্ধ ছড়ায় খালটা সাবাদিন। শহবেব মাতব্ববেবা বলল, এভাবে খালটাকে মেবে ফেলা ঠিক নয়। বেশ টলটলে জল থাকবে, নৌকো চলবে। হাউসবোট ভাসালে লোকে বেড়াতে আসবে এখানে, শহবটাবও ইজ্জত বাড়বে। নানাবকম ফন্দীফিকিব চলতে লাগল খাল-উন্নয়নেব জন্যে কিন্তু কোন বাস্তা বেব হয় না। খালেব সামান্য ঘোলাটে জল বাঁধেব গায়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বাঁধেব ওপাশে বালিব চব। তাব বহুদূবে নদীব ধাবাটি বয়ে যায়। আগেব মত খাল তাব বুকে মুখ ডোবাতে পাবে না। এমন কি তাব শবীবেব মাছগুলো যত গ্রীষ্মে পেট উল্টে ভেসে উঠেছে। এখন চওড়া খালেব ওপাবেব সুন্দব সেতুগুলোকে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়।

তবে এটা ঠিক, খালটা শহবেব লোকেব কাছে নদীব তুলনায় অনেক আপন। এটা যদি সম্পূর্ণ বুজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হাজার হাজাব টাকায় কাঠা কিনে বাড়ি বানাবাব লোকেব অভাব হবে না। বোধ হয় তাই এই মবা খালেব গায়ে কোন চালাঘব তুলতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ। আবর্জনা বাড়তে দেওয়া চলবে না। বাস কবতে চাও চলে যাও নদীব চবে। সেখানে তোমাব কি

হল না হল তাতে কর্তৃপক্ষেব কোন দায়িত্ব নেই। তবু শহরেব মানুষ অবাক হয়ে দ্যাখে নদী‹ চরের মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাডছে। বেশ গাছগাছালি লাগানো শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে ঘরদোরের গঠনও পাল্টাচ্ছে। বেশ শৌখিন আর মজবুত চেহারা নিচ্ছে সেগুলো। রিকশাওয়াল ঠেলাওয়ালা, দিনমজুর আর ঠিকে ঝিদের চমৎকার পাড়া হয়ে গিয়েছে ওটা। বর্ষায় যখন এদিকে একটা ধারা গজিয়ে যায় তখন ভেলা করে পাবাপার করে ওরা। সুন্দর হাওয়া ব সারাদিন ওখানে। চাসবাসেব একটা চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। রাত্রে কাছে পিঠে শেয়াল ডাকে না। শহরের কিছু বাউন্ডুলে ছেলে চলে যায় ওখানে। লুকিয়ে গাঁজা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ওবা। এই নিয়ে ঝামেলা লেগেই আছে। আর গেল বর্ষায় খালটা জলে ভরে গিয়েছিল। সেই জল স্থির হয়ে থেকে একটা পচা গন্ধ আরও তীব্র হয়ে শহরে ছড়াচ্ছে অসুখ বিসুখ হচ্ছে মানুষের। খালেব জল ব্যবহার করা নিষেধ হয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ স্থিব করেছেন এবাব খালটাকে বুজিয়েই ফেলবেন। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার যে পরিকল্পনা ছিল অর্থাভাবে বাতিল করে দিয়ে মোটা দামে জমি বিক্রী করে আব পাঁচটা ভাল কাজ কবা যাবে

সন্ধে নাগাদ চবে ফিরে এল লোকটা একটা মাছ হাতে ঝুলিয়ে। চমৎকাব নাদুস-নুদুস কাৎলা মাছ। এসে ঝাঁপ খুলে ওটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'যা খুব ভুল হয়ে গেল লোভে লোভে কিনে ফেললাম, এখন কাটবে কে?'

'চিন্তা কি, কেটে দেব, বেঁধে দেব, খাইয়েও দিতে পাবি।'

'কে?' চমকে উঠল লোকটা। ঘবটায় এখন আঁধাব, 'এই ঘরে কে?'

লোকটার হাকডাকেব উত্তরে একটা ছোট্ট হাসি বাজল, 'পেত্নী! চরের পেত্নী'!

দ্রুত হাতে কুপী জ্বালালো লোকটা। তারপর সেটাকে উঁচু কবে লোক খুঁজল। আলো পড়তে বুকে আঁচল টানলো মেয়েটা, 'আঃ, লজ্জা লাগে না। ব্যাটাছেলের চোখ না তো করাতেব দাঁত নামাও ওটাকে।'

বাজ পড়ল ঘরে, 'অ্যাই, এখানে কি চাই? চুরি করার মতলব?'

চুরি।' হাসল মেয়েটা, 'ডাকাতের ঘরে চুবি? লোকে হাততালি দেবে।'

মানে? আমি ডাকাত?'

'নিশ্চয়ই। আমার মন ডাকাতি করেছ গো।' তারপর সুর ধরলো, 'ও যে দিন-দুপুরে চুরি করে বাত্তিরে তো কথা নাই।' শুয়ে শুয়ে পা নাচালো, 'কি মাছ গো?'

লোকটি তখন তার বিশাল চেহারা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না নিচু ছাদের জন্যে ঘাড় নামিয়ে তবু ছুটে এল পাশে, 'অ্যাই, ওঠ, বেরো এখান থেকে। যা, চলে যা।'

'কোথায় যাবো?'

'কেন তোর দিদিব ঘর নেই। সেখান গিয়ে জামাইবাবুর গাঁজা সাজ।'

'ওই জন্যে তো পালিয়ে এলাম। যত রাজ্যেব বাবু ছোকরাগুলো দিনরাত সেখানে জাঁকিয়ে বসে থাকে। আমি গেলেই ড্যাবডেবিয়ে তাকায়। বুকের আঁচল ফেলে যে শোব তাব উপায় নেই। বাক্ষসগুলোব মধ্যে আমি থাকতে পারি? তুমি বল?' ঠোঁট ফোলালো মেয়েটি

'কেন তোর দিদি কোথায়? সে মাগীব তো বড় মুখ।'

'অ, দিদির কথা আর বলো না। সে তো এখন জামাই-এর দোসব হয়েছে। গাঁজা খেতে এসে ছোকরাগুলো ভাল টাকা দেয় বলে রসের কথা বলে। দিদির এখন গতর খাটিয়ে ঝিগিরি করতে বয়েই গেছে। ছিলিমে টান দিচ্ছে আর এর ওর সঙ্গে রস করছে। ওর মনে খুব দুঃখ।'

'দুঃখ? দুঃখ কেন?'

'বাঃ, দুঃখ হবে না? তোমার দিকে প্রথমে ঝুঁকেছিল। তখন এই চরে তোমরা দুইঘব ছাড়া

নাকি মানুষ ছিল না। তা তুমি পাত্তা দাও নি—।'

'পাত্তা দেব কেন? সে অন্যের বউ না?'

'তাই তো। তবে কাঁচ তো আর ছুরি দিয়ে কাটা যায় না, তাব জন্যে হিরে চাই।' বলে খিলখিলিয়ে উঠল মেয়েটি।

'তা আমি কি করব এসব শুনে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাও, আমায় একা থাকতে দাও।' লোকটার গলার স্বর ভাঙছিল।

'বাঃ, তুমি জানো না তো কে জানবে? তুমি এখানকার মোড়ল।'

'না, আমি কেউ নই। একা থাকতে চরে এলাম তাও সব ভিড় জমালো।'

'তাহলে ওরা ঠিকই বলে।'

'কি বলে?'

'তুমি পুরুষ মানুষ নও। তাই লুকিয়ে থাকতে চাও।'

'কে বলে?' গর্জে উঠল লোকটা।

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। আমি বলি কি, আজকের বাতটা এখানেই থাকি।'

'না, কক্ষনো না।'

'তোমাব পাযে পডি চেঁচিযে ওদের জানিও না। তাহলে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে আমাকে। কাল সূর্য উঠলে আমি চলে যাব।'

'কোথায়?'

'যেখানে দু' চোখ যায। মেযেছেলের শরীবে যৌবন থাকলে ঠিকানাব অভাব হয না। এখন মাছটা কাটবো?'

'মাছ?'

'ওই যে পডে আছে। দেখি দেখি ভাল কবে আলো ফেলো তো। এমা, এ যে পোযাতি মাছ। ব্যাটাছেলেদের কাটতে নেই।'

'পোয়াতি?'

'হ্যাঁ, দেখছ না পেট ভরতি ডিম?'

লোকটা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। সত্যি মাছটাব পেট বেশ ফোলা। কোনবকমে বলল, 'ঠিক আছে!' সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দিয়ে কুপির আলো নিবিয়ে দিযে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেযেটা, তুমি কেমন পুরুষ দেখব আমি?'

ঝটকা মেরে ফেলে দিতে চাইল লোকটা। কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধবে মেযেটা চাপা গলায় হিসহিস করল, 'ওরকম করলেই চেঁচাবো। বলব তুমি আমার ইজ্জত নিযেছ।'

'আমি?' লোকটার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

'হুম্। লোকে দেখবে আমার শরীরে কাপড় নেই। দ্যাখো না, দ্যাখো। মিথ্যে বলছি না।'

মাঝ রাত্তিরে লোকটার মনে হল মেয়েরা হল নদীর মত। শুকিযে থাকলে মরা চর আর ঢল নামলেই কালনাগিনীর মত হিংস্র, যতক্ষণ না গিয়ে গিলছে ততক্ষণ শান্ত হয় না। এই যে মেয়েটা এখন তার শরীরের ওপর হেলান দিয়ে কি আরামেই না ঘুমোচ্ছে। দু'দুবার সে ঝড তুলেছে তবে এই শান্তি। অবশ্য সুন্দর করে মাছ রেঁধেছিল, তাই দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়া গেছে। বেশ সুখী সুখী লাগছে আজ। ঘরে মেয়েছেলে থাকলেই হবে না, সেই মেয়েছেলেকে সুখ দিতে জানতে হবে তবেই পৃথিবীটাকে অন্যরকম লাগবে। তবে এ মেয়ে নির্ঘাৎ ভাল মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই অনেক ঘাট ঘুরেছে এর মধ্যে, নইলে এতো ছলাকলা শিখলো কি করে? যদি ভাবো খারাপ তো খারাপ, নইলে নয়। ওই নদীর কথাটাই ফিরে আসে। এ ঘাটে ছলাৎ ও ঘাটে

ছলাৎ, কেউ কবল স্নান কেউ কাচলো কাপড কিন্তু পবেব ঘাটে নদী আবাব নতুন। লোকটা মেয়েটাকে জডিয়ে ধবল হঠাৎ। ঘুম ভেঙে হাসফাস কবল মেয়েটি, অস্ফুট আওয়াজ বেরুল 'কি হল?'

লোকটা বলল, 'বাধ দিলাম, বেধে নিলাম।'

মেয়েটি হেসে ফেলল অস্বাস্তিতে, 'ওমা, আমি কি নদী?'

লোকটি বলল 'তাই'

বোদ উঠলে চবে শুরু হল হইচই। মেয়েটিব বোন আব গেঁজেলটা এল তেড়ে। চেঁচিয়ে লোক জুটিয়ে আনল, 'সোমত্থ মেয়েকে নিয়ে শুয়েছে সাবা বাত, বিচাব চাই।'

লোকজন উত্তেজিত হল। মেয়েটাব জন্যে যাদেব জিভে লালা জমতো তাবা বলল বেশী। থানায় যাও পুলিস ডাকো। একি কেলেঙ্কাবি। যাকে মোডল ভাবা হয় সে ই কিনা এই পাপ কবল। লোকটা মেয়েটাব দিকে তাকাল, 'কি বলছে সবাই, শুনেছিস?'

মেয়েটা শবীব মোচডালো, 'তুমি শোন ঘুম পাচ্ছে আমাব।'

মেয়েটাব বোন তাতে ভোলে না। তাব টাকা চাই। ক্ষতিপূবণ কবাতে হবে। খাইয়ে পবিয়েছে যাকে, তাকে বেইজ্জত কবেছে। লোকটা বলল, 'আমাব টাকা নেই।'

এবা নাছোডবান্দা কাজে যাওযা হল না লোকটাব। দুশো টাকা চাই এক পযসা কম নয়। লোকটা মাথা নাডে, অসম্ভব। দুপুব নাগাদ ঘুমিয়ে টুমিয়ে বেবিয়ে এল চালা থেকে, 'দিয়ে দাও দুশো।

লোকটা বলল, 'কোথায পাবো?'

মেয়েটা বলল, 'তা বললে চলে। ঠিক আছে, আমি দিদিব কাছে বইলাম তুমি টাকা দিয়ে ছাডিয়ে নিয়ে এসো আমাকে।' গতব দুলিয়ে সে চলে গেল বোনেব সঙ্গে। লোকটাব সামনে শুয়েছিল একটা বেডি, প্রচণ্ড লাথি খেয়ে সেটা চব ফাটাতে লাগল 'চৎকাবে' কি কবা যায় বুঝতে পাবছিল না লোকটা। ভিড এখন পাতলা। বেডিও বাজছে কোন এক চালায়। গেঁজেলের ঘবে মেয়েটা সেঁধিয়েছে বোনেব হাত ধবে। সেখানে জমেছে শহবেব ছোকবাগুলো। লোকটা ছটফট কবছিল। টাকা তাব আছে। সবসাকুল্যে আডাইশো টাকা। তাব নিজেব চালাব তলায় বালি খুডে এক হাত গেলে টিনেব কৌটোয। কিন্তু সে টাকা জমিয়েছে আপদ বিপদেব জন্যে দূবেব চালাগুলোব দিকে তাকাল সে। বেশ সংসাবী সংসাবী চেহাবা। ওপাশেব ধুধু-চব ঝলকাচ্ছে এখন। বুকেব ভেতবটা খাঁ খাঁ কবে উঠল। চালায় ঢুকতেই মোচড দিল মন এবকমটা কখনও হয়নি। কালকেব বাতটাই সব গোলমাল পাকিয়ে দিল। সাবাদিন খাওযা হয়নি তবু খিদে পাচ্ছে না। বিছানাব দিকে তাকাতেই কষ্টটা বেডে গেল। মেয়েমানুষেব শবীব, তাব ব্যবহাব, দুটো কথাবার্তাব টোকা আব বান্নাব স্বাদ শালা পাইথনেব মত। একবাব গিললে আব ছাডে না। দ্রুত হাতে বালি খুডে কৌটোটা বেব কবল সে।

গেঁজেলটাব চালাব দবজা সবিয়ে উঁকি মাবতেই মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে। বাপবে বাপ। গাঁজাব ধোঁযায ঘব এখন ভাসছে। ওকে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। পা ছডিয়ে সে শুয়ে ছিল বোনেব পাশে। সেই পাযে হাত বোলাচ্ছে শহুবে ছোকবা। লোকটা চেঁচালো, 'উঠে আয।' তাবপব ছুঁডে দিল টাকাগুলো।

বোনটা দ্রুত হাতে কুডিয়ে নিয়ে গুণে বলল, 'দুশো।'

তডাক কবে বেবিয়ে এল মেয়েটা, 'তবে যে বললে টাকা নেই? মবণ। এই নাহলে পুরুষ মানুষ।'

মাস তিনেক বাদে এক সকালে হাউ হাউ কবে কেঁদে উঠল মেযেটা। অবাক হযে লোকটা জিজ্ঞাসা কবল. 'কি হযেছে?'

মেযেটা পা ছডিযে বসল, 'কি হবে আমাব। পেটে একজন এসে গেল সাত তাডাতাডি।'

লোকটা হেসে বলল, 'এই কথা।'

'হেসো না। এখন তোযাজ কববে কি দিযে? ক'টা টাকা কামাও। আমাব এখন ঝাল মাংস খেতে ইচ্ছে কবছে, খাওযাও দিকি।' মেযেটা চোখ ঘোবাল।

লোকটাব জিভ শুকিযে এল। শহবে মাংসেব দাম অনেক। মাল বযে যা পায তাতে দুবেলা ভাত আব সেদ্ধ জোটে। তবু কোনবকমে একজনেব জন্যে মাংস নিযে এল বিকেল বেলায। চটেপুটে খেযে নিল মেযেটা। খেযে বলল, 'আমি খাচ্ছি না পেটেবটা খেল। কাল একটু ইলিশ এনো।'

লোকটা বলল, টাকা নেই। অত নোলা কেন?'

মেযেটা বলল 'পুরুষ মানুষ তো বাচ্চা ধবে না, বুঝবে কি ' লোকটা গোঁজ হযে বইল।

দুদিন বাদে মেযেটা বলল, 'দিদিব যে কাজ ছিল শহবে তা আমায নিতে বলল। ভালই হবে দু'টো পযসা পাবো।'

লোকটা বলল 'খববদাব তুই শহবে যাবি না।'

কেন, গেলে কি আমাকে খেযে ফেলবে? পেটে বাচ্চা আছে না?' মেযেটা রুখে দাঁডাল। লোকটা ভাবল তা বটে। বক্ষাকবচ তো পেটে বাঁধা। ভয কি।

দুদিন বাদে বেশ বগবগে ইলিশ বাঁধলো মেযেটা। লোকটাব পাতে ধবে দিযে বলল, 'পেটি খাও।'

লোকটা অবাক গলায বলল, 'পেলি কোথায? এব তো বহুত দাম।'

মেযেটা হাসল যে বাডিতে কাজ কবি তাব বাব দিযেছে। বাজাব থেকে আসছিল, পথে দেখা হতে হেসে বললাম, 'কতকাল খাইনি। বাবু গলে গিযে দিযে দিল।'

মাথায আগুন চডে গেল লোকটাব, 'খববদাব, ও বাডিতে আব ঢুকবি না।'

মেযেটা বলল, 'কেন?'

'ও তোব সর্বনাশ কববে।' লোকটা গর্জালো।

'মাথা খাবাপ তোমাব। সাপেব হাঁচি বেদেয চেনে। কাল সন্দেশ আনবো।'

'কোত্থেকে?'

'আব একটা বাবু দেবে বলেছে।'

লোকটা আব পাবল না। লাথি মাবল ইলিশ মাছে। তাবপব চিৎকাব কবে বলল, 'ফেব যদি শহবে ঢুকিস তাহলে গলা টিপে মাবব। সেদ্ধভাতে সুখ হবে কিনা বল?'

মূর্তি দেখে কুঁকডে গেল মেযেটা। ভযে ভযে বলল, 'হবে।'

লোকটা চেঁচালো, 'শহবে কেউ তোব গাযে হাত দিযেছে?'

মেযেটা সভযে মাথা নাডল 'না।'

দুদিন বাদে মেযেটা আবাব উসখুস কবল। লোকটা বলল, 'কি চাই?'

'আচাব। আমেব।'

'এই চবে ওসব পাওযা যায না। আমাব কাছে ঘ্যানব ঘ্যানব কবিস কেন? দিদিব কাছে গিযে চাইতে পাবিস না?' লোকটা মুখ ফেবালো।

'দিদিব কাছে চাইলে তোমাব মানে লাগবে না?'

'একি কথা। বোন দিদিব কাছে চাইলে আমাব মান যাবে কেন?'

তিনদিন বাদে এক বোতল বড আচাব এল। লোকটা বলল, 'বাবাঃ, এত কে দিল?'

মেয়েটা লাজুক হাসল, 'খেয়ে দ্যাখো।

কে দিল? তোর দিদি?'

'না, দিদির খদ্দের। ওই যে শহরের লোকটা যে গাজা খেতে আসে। আমার ইচ্ছের কথা শুনে শহর থেকে এনে দিল।'

'এমনি এমনি কেউ দেয়? কি করেছিল ও?'

'কিছু না। শুধু বলেছিল তোমার মিষ্টি হাতে গাজা সাজিয়ে দাও, দিয়েছিলাম।'

আগুন হল লোকটা, 'খবরদার, আর ও ঘরে যাবি না। হাত কেটে ফেলব।'

অনেক বাওরে মেয়েটা আদর খেতে খেতে বলল, 'তবে যে তুমি বল আমি নদীর মত তাহলে এত অবিশ্বাস কর কেন?'

লোকটা সরল গলায় বলল, 'নদীর মত হারামি আর কেউ নেই।'

এবার বর্ষার জোয়ার যেন বেড়ে গেল দশগুণ। ভেলায় চেপে পারাপার শুরু হল চর থেকে শহরের ভেতর যে খাল সেটা হয়ে গেল টইটুম্বুর। সাত দিনেও বৃষ্টি থামে না। বৃষ্টির জল জমছে শহরের রাস্তায় খালের জল উপচে উঠল দুপাশের শহরে। জলটা বাড়ছেই কারণ বেরিয়ে যাওয়ার মুখ বন্ধ। সেখানে বাধ আছে নদীকে আগলাতে। খবর এল পাহাড়ে জবজব জল ঝরছে। সব স্রোত এসে লাফিয়ে পড়ছে নদীতে। পুলিস হেঁকে বলে গেল, চরের লোক পালাও নইলে এবার ডুববে। পড়ি কি মরি করে পালানো শুরু হল যা কিছু শখের গাই নিয়ে লোকজন উঠল বাধে। প্রসববেদনা সামলে মেয়েটা বলল, 'পালাবে না

লোকটা মাথা নাড়ল, না।

মেয়েটা আতকে উঠল, জল আসছে, ভাসাবে সব।'

'আসুক আগে। অত মানুষের দঙ্গল আমার ভাল লাগে না।' বলে মেয়েটির স্ফীত উদরে হাত বুলিয়ে দিল 'এখানেই বাচ্চাটা হোক। এই নিরিবিলিতে।'

'তুমি কি পাগল? যেটা আসছে তার কথা ভাবো।' মেয়েটা ককিয়ে উঠল।

ভাবনার কিছু নেই।

মেয়েটা অসহায় চোখে তাকাল। এখন এই লোকটার ওপর নির্ভরতা এত বেড়েছে যে একা চলে যাওয়ার সামর্থ্য তার নেই। সে দুহাতে লোকটাকে জড়িয়ে কষ্ট সামলালো।

নদীর ধারে ঢল নেমেছিল পাহাড়ের নিচে। সেটা গড়িয়ে আসতে আসতে দুদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল চরের বালি এত উঁচু যে সোজা আসতে পারছে না। ফলে জলের ধারা মাঠ ভাসিয়ে পাকা রাস্তাটাকে বেছে নিল খাত হিসেবে। যেহেতু নদীর বিপরীত দিকে তাই ওই অংশে বাধ গড়া হয়নি। নিচু জমি পেয়ে ছুটে যাচ্ছিল জল। বৃষ্টি থামছিল না। ময়লা ন্যাতার মত চপচপে আকাশটা ছিড়ে ছিড়ে পড়ছিল। নদীর জল সেই মদত পেয়ে ঢুকে গেল খালে। টইটুম্বুর খালটা বহুদিন পরে নদীর স্পর্শ পেয়ে ছিটকে উঠল আকাশে। আর তখনই ডুবে গেল শহরটা। উল্টো দিক থেকে জল ঢুকছে কিন্তু বেরোবার পথ বাধের জন্যে বন্ধ। সমস্ত শহরের লোক যে যেভাবে পারে ছুটে এল বাধের ওপর প্রাণ বাচাতে। জলটা পাক খাচ্ছে শহরে। একতলা বাড়িগুলো গেল তলিয়ে। মানুষ আর জন্তুর মৃতদেহ ভাসতে লাগল সেই ঢেউয়ে। অতবড় শহরটা অতিকায় হ্রদ এর চেহারা নিয়ে নিল এবার। বাধগুলো তার দেওয়াল।

বাধে আর মানুষ ধরে না হঠাৎ ওদের নজর পড়ল চরটার দিকে। বিশাল নদীর চর শুকনো পড়ে রয়েছে। নিজের জমা করা বালি ঠেলে নদীর জল এদিকে আসতে পারেনি। কিছু লোক নেমে এল চরে। এসে হাত পা ছড়িয়ে বলল, 'কি আরাম।'

তাদের আরাম দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হল। মুহূর্তেই বাধের সঙ্কীর্ণ জায়গা ছেড়ে শহরের

সব মানুষ পিল পিল করে নেমে এল চরে। বাতিল চালার মালিকরা অসহায় চোখে দেখছিল তাদের চালাগুলো বেহাত হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারাও মিশে গেল শহরের লোকদের মধ্যে। এই মুহূর্তে পোশাকে আচরণে ওদের আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

লোকটা এক হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে দেখছিল এই জনস্রোত। এখন তার চারপাশে শুধু মানুষের মুখ। সে চাপা গলায় বলল, 'শালা!'

মেয়েটা বলল, 'ওরা যে শহর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এল।'

লোকটা দ্রুত হাতে বালি খুঁড়ে টাকা বের করে বলল, 'চল।'

'কোথায়?' মেয়েটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা কোন উত্তর দিল না। মেয়েটাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল বাঁধের ওপর। তখন শহরের কোন মানুষ বাঁধে নেই। এমনকি চরের লোকেরাও এখন সেখানে। লোকটা দেখল শহরটা এখন বিশাল হ্রদ, জল ফুঁসছে। আর চরটা যেন আচমকা শহর হয়ে গিয়েছে। রাত ঘনালে চরে আলো জ্বলে উঠল। লক্ষ লক্ষ হায়নার চোখের মত জ্বলতে লাগল চরটা। আর শহরটা গভীর জঙ্গলের মত অন্ধকারে মাখামাখি। মেয়েটার যন্ত্রণা বাড়ছিল। শেষে চিৎকার করে উঠল, 'ও, মাগো!'

লোকটা তাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। এবার কষ্ট মুছিয়ে দেবার গলায় বলল, 'বিয়ো, খুশী মনে বিয়ো।'

মেয়েটার কানে সে কথা ঢুকল না। কাটা ছাগলের মত ছটফট করছিল সে।

ওলট-পালট হওয়া আর নদীর শব্দ শুনতে শুনতে গালে হাত দিয়ে লোকটা বিহ্বল গলায় বলল, 'এখানে কেউ নেই এই বেলা সেরে নে।'

চার দেওয়াল এবং একটি খাট

ভালবাসা মরে গেলে ঘৃণা হয়ে যায়। কিংবা এমনও তো বলা যেতে পারে, যে কোন ঘৃণার আগে সেই ভালবাসার শব রয়ে যায়, যাকে ডিঙ্গিয়ে কিংবা এড়িয়ে ঘৃণায় বিদ্ধ হতে হয়। কিছু ফিরে তাকিয়ে বুকে-জমা মেঘগুলোকে স্পর্শ করতে চাইবার আগেই কখন যে তপ্ত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, হায়, একটা জলের দাগও রেখে যায় না। এখন সেই ভাঙ্গা টুকরো আগুন যা কিনা পোড়ো কাঠের তলায় গনগনে তাই আগলে বসে থাকা, শুধু সতর্ক চোখে বাতাসের পথ রুদ্ধ করা যাতে দাবানল না ছড়ায় এবং এইভাবেই দিনগুলোকে খরচ করে যাওয়া। নীতিশ আর পৃথার সম্পর্ক এইরকম মুখ বুঁজে থাকায়।

ভাইরা শরিক কিন্তু বন্ধু নয়। পাঁচজনের পাঁচটি ঘরকে এখন কারোরই অন্ধকূপ মনে হয় না। পিতৃদেবের রেখে যাওয়া এই নোনালাগা বাড়ির আধা-আলো মাখা ঘরটিতে নীতিশকে রাত থমকে গেলে ফিরে আসতেই হয়। খাটের ওপর, যে খাট তোষক গদি পনের বছর আগের ভালবাসা নিয়ে বিয়ের সকালে এসেছিল মুটের মাথায় পৃথার বাড়ি থেকে. শুয়ে আছে ছড়িয়ে

গুটিয়ে তিন ছেলে মেয়ে উলঙ্গ বাজার মত। পনের বছর তোষক গদি হয়তো বা খাটটাকেও নিঃশেষ করেছে, আরামের ফাঁপা ভুলো এখন গুটিয়ে একাকার। পৃথা আগে বলতো, এখন মুখ বুজে থাকে, ওটাকে পাল্টানোর কথা ভুলে গেলে চোখে ঠেকে না। রোজ দেখে দেখে অনেক কিছুই চোখ সয়ে নেয়। ওই যেমন চিমসে তোষক তেমনি পৃথার শরীর, যা ছিল রজনীগন্ধার ডাটার মত তা কিনা হ্যাঙারে ঝোলানো খাটো হয়ে যাওয়া শার্ট শরীর কোনও শরীরকে টানতে পারে না আর। এখন চারধারে হাঁ হাঁ অভাব, নিত্য কলহ শরিকদের সঙ্গে, মাসান্তের বেঁধে দেওয়া টাকাটা তুলে দিতে প্রাণান্ত হয় নীতিশের, যা দিলে বারোয়ারী ভাত ডাল দুবেলা আসে একান্নবর্তী হেসেল থেকে। বিয়ের, ভালবাসার বিয়ের দুবছর ছিল খুব মোলায়েম। প্রথম সূর্যের রঙ-লাগা জীবন, বড় পার্বলিসিটি ফার্মের শিল্পী নীতিশ তখনও আধুনিক ছবি আঁকে, বন্ধুদের নিয়ে অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শনী সাজায় হয়তো কখনো বিক্রী হবে এই আশায়। অর্থ আসে সবকিছু মানিয়ে নেবার মত। রাত গভীরে পৃথা বুকে মুখ গুঁজে যে শব্দ উচ্চারণ করত না তা হল এখানেই মরে যেতে চাই।

তারপর যা কিনা অমোঘ তাই হল সিঁড়ি না ভেঙ্গেই। বেপরোয়া বশ্যতা স্বীকার ধাতে নেই নীতিশের চাকরী গেল কিন্তু অন্যত্র এলো ফিরে। সেখানে মিলল না যখন মন তখন নিজেই স্বাবলম্বী হবার জেদ এল। তুলিটা জানা ছিল কিন্তু ব্যবসাটাকে নয়। ধারে ধারে বিকিয়ে যেতে যেতে সামাল দিল পৃথার গয়না। আর অক্ষমতা এবং অভাব কখন কুরে কুরে খেয়ে নিল সম্পর্কটাকে। যা ছিল এতদিন ঔদার্যের ঢাকনা দেওয়া তাকে একটানে ছুড়ে ফেলা হল একদিন। সন্তানেরা এসে গেছে এতদিনে। তাদের মুখ চেয়ে পৃথা প্রথম প্রথম কাঁদতো। হায়,'কান্নার জল যে আগুনের থেকেও উষ্ণ কখনো। এখন ওরা পরস্পরের সম্পর্কে নিরাসক্ত। শুধু দিন পার করে যাওয়া। বিয়ের খাটটির একপাশে পা গুটিয়ে শোয় পৃথা সারাদিন শরিকদের বউ-এর হাজার খোটা হজম করে ক্লান্ত শিরায় জড়ানো। হাত তবু নেতিয়ে পড়ে থাকে শিশুদের ওপর। খাটের অন্য কোণে চিলতে জায়গায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুম ডুবিয়ে দেয় নীতিশকে। বিছানার চাদরটার গায়ে সচ সুতোর সঙ্গে পৃথার স্পর্শ পিঠে ঠেকে না তার।

ডালহৌসির তিনতলায় সদ্যপ্রাপ্ত চাকরীর নামটি বেশ ভরাট, বেতন নয় ভেসে না বেড়িয়ে এখানেই দমাস নোঙর গেড়েছে নীতিশ। সাকুল্যে দুটি পরিষ্কার শার্ট এবং নিত্য দাড়ি কামানো সত্ত্বেও পায়ের প্লাসটিকের চটি অস্বস্তি দেয়। নীতিশ শেষ প্রতিজ্ঞা করেছে অবাধ্য হবে না এখানে। সেদিন সকালে একজন বড় ক্লায়েন্ট এলেন তাঁর জুতোর ব্যবসা। বিজ্ঞাপনের লে আউট করে রেখেছিল নীতিশ, মালিকের ঘরে ডাক এলে নিয়ে গিয়ে দেখাল। ক্লায়েন্ট নেড়ে চেড়ে দেখে বললেন, আরো স্ট্রাইকিং করলে ভাল হত। জুতো নিয়ে আধুনিক কবিতা কেউ লিখছে কিনা খোজ নেবেন?'

মাথা নেড়েছিল নীতিশ অবাধ্য হবে না সে।

ক্লায়েন্ট বলেছিল, আপনি ছবি আঁকেন?'

মালিক বলেছিল, 'হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনের ছবি।'

সেই দুপুরেই বিজ্ঞাপনটিকে আর একবার পাল্টে ওর অফিসে নিয়ে গিয়ে দেখানোর হুকুম হল। পিয়ন যায় এসব কাজে। মালিক বলল, 'বড় পার্টি, আপনিই যান।'

আধুনিক কবিতার লাইন পেয়ে গেছে নীতিশ। এবারও অবাধ্য হল না। ঠাণ্ডা ঘরে বসে সেটা দেখে ক্লায়েন্ট বেশ খুশী। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে এখনকার বড় মর্ডান আর্টিস্টদের আলাপ আছে?'

না বলতে নেই এতদিনে জেনে গেছে নীতিশ।

'তাহলে আমার একটা উপকার করুন। আমার এক বান্ধবী এসেছেন সুইজারল্যান্ড থেকে।

ওর ভারী শখ এখানকার আধুনিক ছবি দেখার। আমি তো আদার ব্যাপারী, আপনি একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন?'

সামান্য দ্বিধা কিন্তু মুহূর্তেই হাঁসের ডানা ঝটকালো নীতিশ।

হুকুমমত গ্র্যান্ড হোটেলে চলে এল সে। বান্ধবীর বয়স হয়েছে। কিন্তু পাঁয়ত্রিশে পৃথা যা হারিয়ে বসে আছে পঞ্চান্নে ইনি তা সাজিয়ে রেখেছেন। বাঙালীর ছেলে কম বললে ইংরেজিটা ভাল হয়। দামী গাড়ীতে করে বিদেশিনীকে নিয়ে নীতিশ এল অ্যাকাডেমিতে। ওখানে তো প্রদর্শনী লেগেই থাকে। মহিলা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কোনটায় ফরাসী প্রভাব কোনটায় জাপানী—চুলচেরা বিচার করে তিনজন নামীর নাম বললেন, ওঁদের ছবি দেখতে চান। অনেক কষ্টে অ্যাকাডেমি থেকেই ঠিকানা যোগাড় করে ছোটা হল। জানা গেল কেউ দিল্লী কেউ বোম্বাই আবার কেউ সাগরপারে পাড়ি দিয়েছেন। খুব নাম হয়ে গেলে এদেশে থাকার সময় পাওয়া যায় না বোধহয়। কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকলে বাঙালীরা বেশ ভাব করে নিতে পাবে। ভাঁড়ের চা খেয়ে বিদেশিনী শুধোলেন, 'তুমি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট?'

ঘাড় নাড়ল নীতিশ, 'তবে এককালে ছবি আঁকতাম।'

'আচ্ছা! চলো তোমার বাড়িতে গিয়ে ছবি দেখে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেল নীতিশ। চার শরিকের নোনাধরা চোখের সামনে ঘেমো গন্ধমাখা পৃথার অগোছালো ঘরে এঁকে নিয়ে যাওয়া যায়?

মহিলা নাছোড়বান্দা। বললেন, 'সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। ভ্যানগগ, গঁগার জীবনী পড়োনি?'

খেয়াল মাথা চাড়া দিলে আকাশ হাতের মুঠোয় আসতে বাধ্য হয়। বিশাল গাড়ি অবশ্য গলিতে ঢুকল না। বিদেশিনীকে দেখে কৌতূহল সবার। নীতিশ পা ফেলছে ইঁদুরের মতন। হায়, একটা কাপও নিটোল নেই যাতে চা দেওয়া যায়। বাড়িব সামনে এসে নীতিশ বলল, 'আপনার খুব অসুবিধে হবে কিন্তু।'

'ফ্যান্টাসটিক।' মহিলা খুঁটে দেখছিলেন, 'তোমাব স্টুডিও কোথায়?'

স্টুডিও! হাসি পেল নীতিশের। সরু প্যাসেজ দিয়ে ভিতবে ঢুকতেই তের বছরের ছেলেকে দেখতে পেল, 'চটপট মাকে গিয়ে বলো খাটের তলা থেকে ছবিগুলো বের করে ধুলো ঝেড়ে রাখতে।'

জন্মইস্তক এই বাক্যটি না শোনায় ছেলেটি ঘাবড়ে গিয়ে বিদেশিনীর পা দেখতে লাগল হকচকিয়ে। নীতিশ কি কববে বুঝতে পারছিল না। এঁকে কোথায় বসানো যায়? এ বাড়িতে একটিও বাড়তি ঘর নেই। শেষ পর্যন্ত সবার চোখের সামনে দিয়ে সে আধা অন্ধকূপে নিয়ে এল বিদেশিনীকে। অনেকদিন পর মনে হল এই ঘরটায় সত্যি মানুষ বাস করে না। এত নোংরা হয়ে কোন মানুষ থাকতে পারে না। বিছানায় ছেঁড়া চাদর, আলনায় স্তূপ হয়ে থাকা কাপড়, দরজায় দাঁড়ানো শরিকদের বউ এবং ছেলেদের মুখ দেখতে দেখতে একটা নড়বড়ে চেয়ার এগিয়ে দিল সে বিদেশিনীকে, 'এটা আমার ঘর।'

'তোমার স্টুডিও?'

'একদিন এটাই আমার স্টুডিও ছিল।' কথাটা শেষ কবে উবু হয়ে খাটেব তলা থেকে ধুলো এবং ঝুল জমে থাকা ছবিগুলো বের করতে গিয়ে একটু হোঁচট খেল সে। কতদিন এদের দ্যাখেনি সে। কিন্তু প্রথমে ছেঁড়া কাপড় এবং তার নীচে কাগজ মুড়ে সযত্নে রাখা আছে ছবিগুলো। কে করল জিজ্ঞাসা নয়, কবে করল এটাই ঢেউ তুলল আচমকা।

ধুলোর প্রলেপ কাপড়েই লেগেছিল। কিন্তু বোঝা যায় প্রায়ই হাত পড়ে এখানে। বাঁধন থেকে মুক্ত করতেই ঝকঝকে ছবিগুলো বেরিয়ে এল। পনের বছর আগে সেই খাঁটি বাংলাদেশের

গন্ধমাখা আধুনিক মননের ছাপ যে ছবিগুলোতে সেগুলো দেখে নিজেরই বুকে কাঁপুনি এল। সেকালে শুধু প্রদর্শনীতেই ঝুলেছিল মাত্র।

বিদেশিনী গালে হাত দিলেন। ছবিগুলোকে কিভাবে এই ছোট্টঘরে সাজানো যায়? শব্দে মুখ ফেরালো নীতিশ। পৃথা এখন ঘরে। ছোট্ট দুটো শব্দ, 'কি হবে?' নীতিশ প্রশ্ন শুনল অনেকদিন পরে, 'উনি সুইজারল্যান্ড থেকে এসেছেন। ছবি দেখতে চাইছেন।—আমার স্ত্রী।'

বিদেশিনী হাসলেন। পৃথা নিজেকে দেওয়াল করে একটার পর একটা ছবি তুলে ধরছে। বিদেশিনী চেয়ার ছেড়ে সেগুলোকে খুঁটিয়ে দেখছেন। সাকুল্যে আটটি, কিন্তু পৃথাকে দুবার দেখাতে হল। শেষ পর্যন্ত দুটি ছবিকে বারংবার দেখলেন মহিলা। পৃথাকে বললেন, 'তোমার স্বামীর হাত কিন্তু বেশ মিষ্টি। এই ছবি দেখলে কেমন একা লাগে নিজেকে।' ইংরেজী শব্দ, অস্পষ্ট উচ্চাবণ কিন্তু ভঙ্গীতে যে মায়া থাকে তাতে বোধেব তারে কাঁপন লাগে। পৃথা মুখ নামালো।

প্যাক করাব মত ব্যবস্থা নেই এ ঘরে। মুড়ে দিতে হল। বিদেশিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম বল?'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে আকাশপাতাল ভাবল নীতিশ। বিদেশিনী বুঝলেন কিনা জানা নেই। ব্যাগ খুলে দু-হাজার টাকা টেবিলে বাখলেন। বললেন, 'আমি জানি না, কম দিলাম কিনা. তবে তোমাব ছবি আমাব দেশে দেখাবো। হয়তো তোমাব কাছে আরো অর্ডার আসবে। তোমাব ঠিকানাটা লিখে দাও এখানে।'

দামী গাড়ি ছবি দুটোকে নিয়ে ফিবে গেল হোটেলে। নীতিশ এখন আড়ষ্ট। ছবিগুলো অমন সুন্দর হয়ে ছিল কি কবে? উত্তবটা সে জানে বলেই আড়ষ্টতা বেশী। এবকম কখনও হয়? মহিলাব যেচে এসে ছবি কেনা এবং অজান্তে ছবিগুলোকে বাঁচিয়ে বাখা, কোনটা বেশী সত্যি?

খবর হাওযায় ছড়ায়। মানুষ ঈর্ষান্বিত হলেও মুখে হাসি বাখতে জানে। রাত্রে বাড়িতে ফিবতেই শরিকদেব সেই সব হাসিমুখেব কৌতূহল মেটাতে হল। ঘরে ঢুকে দেখল টেবিলে দু-হাজার টাকা তেমনি একটা কিছু চাপা দেওয়া। বড় দুই ছেলে সেদিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

খাওযা হল। বোজ যেমন হয়। ছেলেবা শুয়ে পড়লে নীতিশ বলল, 'ওগুলো বাইরে পড়ে আছে। দিনকাল খারাপ।'

পৃথা বলল না কিছু। মাথা আরও নিচু হল তার।

আজকের রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থাটা একটুও পাল্টানো না। তবে চিলতেব বদলে আরো একটু বেশী জায়গা পেল নীতিশ। এখন লোডশেডিং। এই ঘরে হাওয়ারা আসে না। নীতিশেব খুব ইচ্ছে করছিল পৃথাকে স্পর্শ করতে। ছোট শিশুর পায়ের তলায় গুটিয়ে শুয়েছে পৃথা। রোজ যেমন শোয।

নীতিশ বলল, 'বড্ড গবম।'

পথা জবাব দিল না।

নীতিশ বলল, 'শোওযাব বড় অসুবিধে হচ্ছে, না?'

পৃথা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'খাটটাকে বাড়ালে অসুবিধে হবে না।'

'খাট?'

নীতিশ মৃদু গলায় জানাল, 'খাটটাকে বাড়ালে দেওয়ালে ঠেকবে না?'

খুব ধীরে অথচ স্পষ্ট গলায পৃথা বলল, 'তাহলে দেওয়ালটাকে সরিয়ে দাও আর একটু।'

ভালবাসা মরে গেলে ঘৃণা হয়? কোথাও কি জলেব দাগ লেগে থাকে না? কিংবা এমনও তো বলা যায় যে চোখের জলে তাপ লাগলে গনগনে আগুন জ্বলে, সেই জল জুড়িয়ে গেলে

নিশ্চুপ অভিমানে মুখ লুকোয়।) নীতিশ কোথায় যেন এমনটা পড়েছিল। কিন্তু সে জানতো না ঘৃণা বেঁচে উঠলে ভালবাসায় পৌঁছে যায়। শুধু দেওয়ালটাকে বড করাব জন্যে যেটুকু অপেক্ষা।

চৌকাঠে পা

সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে উঠে এলো ওরা। ট্রাম থেকে নেমে হাওড়া স্টেশনের ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা জানত বনি। ওপাশ থেকে হুড়মুড়িয়ে লোক নামছে। নীপার বুকের ভেতরে এখন দমকলের ঘণ্টা। বাস থেকে নামার পরই এটা শুরু হয়ে গেছে। বনি বলল, 'তুই ওইরকম মুখ করেছিস কেন? যে দেখবে সেই বুঝবে।' নীপা চেষ্টা করল অন্যরকম মুখ করতে। কিন্তু কীভাবে করতে হয় বুঝতে পারছিল না। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল আশেপাশের যেকোনও মানুষ হঠাৎ বলে উঠবেন, 'এই নীপা, তুই এখানে?'

হাঁটতে হাঁটতে বনি বলল, 'আমাদের ইউনিফর্মগুলো ছাড়তে হবে। কোথায় ছাড়ি বল তো?'

নীপা ওর দিকে তাকাল 'কেন?'

'বাঃ! স্কুলের ইউনিফর্ম দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে আমরা চলে এসেছি।' তারপর থেমে গিয়ে চারপাশে তাকাল, 'আবও ওপরে। আমি আর বাড়িতে যাব না, কখনো না। রেজাল্ট দেখলে মা আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে।' নীপা কিছু বলল না। গতকালই মিস বলে দিয়েছিল কারা কারা প্রমোশন পায় নি।

আজ রেজাল্ট কার্ড হাতে পেয়েও সেটাই জেনেছে। ফিজিক্স আর অঙ্কে ফেল। বাবা এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। বাবার সামনে ওই কার্ড নিয়ে দাঁড়ানো যায় না; মা হয়তো বকবে, কাদবেও কিন্তু বাবা—! বনি বলল, 'এসে গেছি। ওই যে বড় ঘড়ি, ওর নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে ওবা।'

দুজনের হাতেই কাজ করা চটের ঝোলানো ব্যাগ। ওতেই বই নিয়ে স্কুলে যায় ওরা। আজ তাব তলায় লুকিয়ে আনা হয়েছে দুটো স্কার্ট, একটা তোয়ালে, টুথপেস্ট, ব্রাশ, হলদে চিরুনি আর কয়েকটা রুমাল। ওপরে খাতাপত্তর।

গতকাল রেজাল্ট কী হয়েছে জানার পরই এই সিদ্ধান্ত। একটু একটু করে জমানো একশ সত্তর টাকা সঙ্গে এনেছে নীপা। এতদিন সেটাকে অনেক টাকা বলে মনে হতো তার। বনি বড় ঘড়ির তলায় দাঁড়িয়ে বলল, 'স্বপনটা চিরকাল লেট লতিফ। সেই সরস্বতী পুজোর সময় মনে আছে? আমাদের পনের মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।' স্বপন হলো বনির বয়ফ্রেন্ড। যাদবপুরে পড়ে। সরস্বতী পুজোর সময় প্রোগ্রাম করেছিল বনি। সেইসময় অতীনের সঙ্গে আলাপ। সারাদিন চারজনে টৈ টৈ করে শহরটা ঘুরেছিল। যেসব জায়গায় বাবার যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেইখানে গিয়ে বসেছিল; এই যেমন ভিক্টোরিয়ায়। আর সেইখানে গিয়েই অতীন তাকে বলেছিল, 'আই লাভ ইউ নীপা। আই অ্যাম ডায়িং ফর ইউ।'

স্বপন বনিকে নিয়ে বসেছিল দূরের একটা গাছের তলায়। অতীন তার পাশে। প্রথম আলাপ,

সঙ্গে সঙ্গে নাকের ডগায় ঘাম জমেছিল। মুখে রক্ত। কোনো রকমে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'

'ইউ আর সামথিং। তুমি কী তা নিজেই জানো না।'

'যাঃ তুমি আমাকে চেনই না, কখনও দ্যাখোনি।'

'শুনেছি। স্বপন আমাকে বনির কাছে শুনে সব বলেছে। তাছাড়া কাউকে চিনতে অনেক সময়, এক মুহূর্তেই যথেষ্ট। তুমি আমাকে প্রমিজ কর আর কাউকে ভালবাসবে না?' ওর হাত ধরেছিল অতীন। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল নীপা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঠোঁট কামড়েছিল, 'ভেবে দেখি।' কিন্তু চোখের সামনে তখন বাবার মুখ।। দুবছর আগেও বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে বলত, 'মা গো একবার বল, আর কাউকে ভালবাসি না তোমাকে ছাড়া।'

সেই কোন ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যেস। বাবার গায়ের গন্ধ খুব ভালো লাগত তখন। ইদানীং বাবা সেইভাবে আর জড়িয়ে ধরে না। তার শরীর যখন পাল্টে গেল, সেই গোপন ব্যাপারটা মা যখন আরও গোপনে বুঝিয়ে দিল তখন থেকেই বাবা যেন কেমন দূরে দূরে। তবু কখনও তার কাঁধ জড়িয়ে আদর করার চেষ্টা করলে সে নিজেই বিরক্ত হয়েছে 'আঃ, বিরক্ত করো না।' বাবা তার দিকে প্রথম প্রথম অবাক হয়ে তাকাত। সে যে বিরক্ত হয়, হতে পারে তা যেন বিশ্বাস করত না, এখন করে।

বনি বলল 'এই, লেডিস ওয়েটিং রুমে ঢুকে জামা পাল্টে আসবি?' নীপা কী বলবে বুঝতে পারছিল না। বাঁ দিকের একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন লোক তাদের দেখছে। সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল তার। বনিকে তো মোটেই নার্ভাস মনে হচ্ছে না ক্লাসের সবাই বলে বনির মধ্যে কেমন ছেলে ছেলে ভাব আছে। বনি ঘড়ি দেখল, 'কী ব্যাপার? ওরা তো আসছে না। তুই এখানে দাঁড়া, আমি ফোন করে আসি। ওই যে ওই কোণে ফোনের বুথ আছে।'

দ্রুত মাথা নাড়ল নীপা, না, আমি একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

বনি হাসল, 'তুই একটা কেবলি। চল।'

বনি যে স্টেশনটা ভালো চেনে তা বোঝা যাচ্ছে। ও এমনভাবে হাঁটছে যেন বাড়ির লোকেরা সঙ্গে আছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হইচই বেড়েছে।

বাবা বকছে মাকে, মা প্রতিবাদ করছে।

প্রতিবছর রেজাল্ট বের হবার দিন মা-বাবা একসঙ্গে তাকে নিয়ে স্কুলে আসে, আজও এসেছিল। রাস্তার ওপাশে গার্জেনদের ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরা সবাই চলে গেল অথচ নীপা আসছে না দেখে নিশ্চয়ই হেডমিসট্রেসের কাছে খোঁজ নিয়েছে। আর তখনই জানতে পেরেছে রেজাল্টের কথা। বনির সঙ্গে যে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে ও তা কেউ ভাবতে পারেনি। এখন কী করবে? নিশ্চয়ই বুয়ামামার বাড়িতে খোঁজ নেবে অথবা বীতমাসীর ওখানে। পাড়ায় ওর কোনো বন্ধু নেই। মা কারও সঙ্গে মিশতে দেয় না। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির মেয়ে সুন্দরী বলে মায়ের অস্বস্তির শেষ নেই। এবার ক্লাস নাইন হলেও মা চাইতো সবাই যেন তার দিকে চোখ বন্ধ করে থাকুক। তারপর বিকাশজেঠুর কাছে নিশ্চয়ই ছুটে যাবে বাবা। বিকাশজেঠু লালবাজারের বড় অফিসার। সেটা কখন যাবে?

বুথের সামনে বেশ ভিড়। বানর পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল নীপা। সুযোগ আসা মাত্র বনি ভেতরে ঢুকে বলল, 'ব্যাগটা ধর।' নীপাও বুথের ভেতরে পা রেখে স্বস্তি পেল। যেন এখন তিনদিকের মানুষ তার ওপর নজর রাখতে পারছে না। মিনিট দুয়েক অন্তত দশবার নাম্বার ঘোরাল বনি। প্রতিবারই বিলে করার মতো বলে যাচ্ছে এনগেজড। এখন আরও দুজন অপেক্ষা করছে টেলিফোন করবে বলে। তার একজন বেশ ছিমছাম চেহারা, মুখের ভঙ্গিটা অনেকটা জ্যাকি স্রফের মতো, হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'লাইন পাওয়া যাচ্ছে না?' বনি আরও জোরে

রিসিভার আঁকড়ে নাম্বার ঘোরাতে শুরু করল। কিন্তু তাতেও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা বলল, 'অত জোরে ঘোরালে স্টেশনের টেলিফোন কথা বলবে না। হয় আমারটা আমাকে করতে দাও নইলে তোমাদের সাহায্য করতে পারি।'

'কী সাহায্য করবেন?' বনি খিঁচিয়ে উঠল।

'রাগ করছ কেন? এটা পাবলিক টেলিফোন। দাও, আমি লাইন ধরে দিচ্ছি।' হাসিটা এমন যে বনিও রিসিভার হস্তান্তর করল। অতএব নীপা নেমে দাঁড়াল। লোকটা স্বচ্ছন্দে তুমি বলছে। বনিকে না হয় বড় দেখায় না কিন্তু—! রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'নাম্বারটা?' বনি ওকে একটা আধুলি আর নাম্বার দিল। শুনে নিয়ে নাম্বার ঘোরাল লোকটা। কিন্তু এবারেও কিছু হলো না। বনি মন্তব্য করল, 'পারলেন না তো।' লোকটা জবাব না দিয়ে আবার চেষ্টা করল। এবার ওর ঠোঁটে হাসি ফুটল। নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল নাম্বারটা ঠিক কি না। তারপর রিসিভারটা বনিকে দিয়ে বলল, 'কথা বল।'

'থ্যাঙ্ক।' বনি স্মার্ট হলো, 'হ্যালো, স্বপন আছে? নেই। কোথায় গেছে? কাল মালদায় গিয়েছে মায়েব সঙ্গে! কবে আসবে? ও। ঠিক আছে। না, আমার নাম বলতে হবে না।' বনির মুখে এমন মেঘ, যেন কেঁদে ফেলবে ও।

কোনও রকমে রিসিভারটা নামিয়ে সে বেরিয়ে এসে বলল, 'স্বপন নেই, মালদায় গিয়েছে। এখন আমরা কী করব?'

'সেকি? ওবা আসবে না?' নীপা হতভম্ব।

'কাওয়ার্ড। ব্যাকবোন নেই।' বনিব চোখে এবাব জল। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিল সে, 'আমাকে বিট্রে করেছে। আমি কী করব এখন, আমি আত্মহত্যা করব। বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না নীপা।'

কান্না পাচ্ছিল নীপারও। দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু তার একবারও অতীনেব জন্যে মন খারাপ করছিল না। অতীন আসবে না ভেবে কষ্টের বদলে কেমন একটা স্বস্তি হচ্ছিল। এবং তার বদলে ভয় করছিল বনি আত্মহত্যা করতে পারে। ওই তো ওপাশে ট্রেন, ওর তলায় পড়ে গেলেই হলো। সে বনির হাত ধরল, 'বনি, চল বাড়িতেই ফিরে যাই।'

'না।' মাথা নাড়াল বনি। তারপব ছোট্ট রুমালে চোখ মুছল, 'আমি চিঠি লিখে এসেছি। নিজেব জীবন নিজে ঠিক করে নিলাম। আমার খোঁজ করো না। এবপর আমি বাড়িতে ফিরতে পারব না। অসম্ভব। আমি আত্মহত্যা করব।'

'এই বনি, প্লিজ, তুই আত্মহত্যা করলে আমি কোথায় যাব?'

'তুই জানিস না নীপা, স্বপন আমাকে বউ বলত। বলত, কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না। আর আজ এখানে আসতে বলে মাকে নিয়ে মালদায় চলে গেল। মা ঠিকই বলে, পুরুষজাতটাই বেইমান।' দ্বিতীয়বার চোখ উপচে জল এল।

'তোমরা এইভাবে কান্নাকাটি করলে পুলিশ নির্ঘাৎ ধরে নিয়ে যাবে।' একদম পেছনে দাঁড়িয়ে লোকটা কথা বলতেই ওরা চমকে ফিরে তাকাল। লোকটা মিষ্টি করে হাসল, 'টেলিফোনে বন্ধুকে পাওনি তাই কাঁদতে হবে?'

বনি কথাটা শেষ হওয়ামাত্র নীপাকে বলল, 'চল।' আব ঠিক সেইসময় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী ব্যাপার? কাঁদছ কেন খুকী?'

সঙ্গে সঙ্গে নীপা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

লোকটার চেহারা বিকাশজেঠুর মতো, নির্ঘাৎ পুলিশ। বনিও মাথা নামাল। আর সেইসময় পেছনের লোকটা বলে উঠল, 'ওই যা হয়, রেজাল্ট বেরিয়েছে, কান্নাকাটি তাই।'

'পাশ করেনি?'

'হ্যাঁ। দাদা খুব রাগী তাই ভয় পাচ্ছে।'

'আপনার কে হয় এরা।'

'একজন ভাইঝি আর ও পাশের বাড়িতে থাকে।'

'বাড়ি নিয়ে যান।'

লোকটি বলল, 'চল। এখন কান্নাকাটি করে কী হবে? পড়াশুনা না করার সময় মনে ছিল না? চল, ট্রেনের দেরি নেই।'

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ওরা কিছুটা দূরে হেঁটে এলে লোকটা বলল, 'আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! রেলওয়ে পুলিশের বড়কর্তা। আমি না থাকলে তোমাদের এতক্ষণে চালান দিয়ে দিত। পুলিশের খাতায় একবার নাম উঠলে—! কোথায় যাবে তোমরা?'

নীপা বনির দিকে তাকালো। বনির মুখে এখন কান্না নেই। সে বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। সেখানে কেউ নেই। তারপর বনি বলল, 'আমরা একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।

লোকটা বলল, 'শোন, পাগলামি করো না। তোমরা স্কুল-য়ুনিফর্মে ঘুরলে পুলিশ আবার ধরবে। কারও আসার কথা ছিলো নিশ্চয়ই?'

প্রশ্নটা নীপার দিকে তাকিয়ে। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পায়নি? চল, ওই রেস্টুরেন্টে বসে স্থির করি কি করা যায়। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।' লোকটা আগে আগে হাঁটছিল। কিছু না ভেবেই ওরা অনুসরণ করলো। বনি ফিসফিস করে বললো, লোকটাকে কী রকম মনে হচ্ছে রে?'

'জ্যাকি শ্রফের মতন।'

'ভাগ। পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হবে না? স্বপনদের থেকে অনেক বড়। খারাপ লোক মনে হয়?'

'কী জানি। আমার ভয় করছে। চল, বাড়ি ফিরে যাই।'

'তুই যা। আমি বাড়ি যাবো না।' বনি জেদী গলায় বলল।

ফিসফ্রাই খুব ফেবারিট বনির। নীপার আবার ফিস ফিংগার ভালো লাগে। লোকটার নাম জেনেছে ওরা। সুন্দর সেন। বনি বলল, 'আপনাকে প্রফেসর ব'লে মনেই হয় না। নীপা বলছিল আপনাকে জ্যাকি শ্রফের মতো দেখতে।'

'সে আবার কে!' সুন্দর এমন মিষ্টি হাসলো যে বনি চোখ বড় করলো, 'ওমা, আপনি হিন্দি সিনেমা দ্যাখেন না?'

'তোমরা খুব দ্যাখো বুঝি?'

'রবিবারে আর চিত্রহারে।'

'কিন্তু তা তো হলো, তোমরা এখন কী করবে? কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নেই?'

নীপা বললো, 'আমার এক পিসী থাকেন আসানসোলে।'

'সেখানেও তো খবর যাবে। আসলে মালদা থেকে স্বপন না ফেরা পর্যন্ত তোমাদের একটা কোথাও থাকতে হবে।' সুন্দরকে চিন্তিত মনে হলো।

এই আধঘণ্টায় ওরা সুন্দরকে পছন্দ করে ফেলেছিল। খুব স্নেহপ্রবণ, মিষ্টি ব্যবহার এবং সবসময় ওদের সাহায্য করতে চাইছে। কথা বলছে যখন তখন মনে হচ্ছে সমানে সমানে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাবা মায়ের মতো তুচ্ছ করছে না। সুন্দর বলল, 'এক কাজ করতে পার! আমাদের গ্রামের বাড়িতে চল। সেখানে বউদিরা আছেন। তাদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকো। এর মধ্যে আমি স্বপনকে নিয়ে ওখানে হাজির করছি। ভেবে দ্যাখ।'

'ওরা কিছু বলবেন না?'

'কে বউদিরা? না না। ওরা আমাকে জানেন। একদম নিরাপদ তোমরা সেখানে।'

বাসে যে এত ভিড় হয় কে জানতো। হাওড়া থেকে ট্রেনে একটা জায়গায় নেমে বাসে উঠেছিলো ওরা। গ্রামের মানুষগুলো বারংবার ওদের দিকে তাকাচ্ছিলো। এ ধরনেব বাসে ওরা আগে ওঠে নি। জানলা দিয়ে ধানের ক্ষেত, পুকুর, তালগাছ দেখতে কি ভালোই না লাগছিল। বাসটা যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেল সেখানে একটা বিরাট বট গাছ। তার তলায় কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। বিকেল হয়ে এসেছিল। সুন্দর বলল, 'তোমাদের হাঁটতে কষ্ট হবে এবার। চল, শর্টকাট করি, গাড়ির পথ ধরলে বেশি হাঁটতে হবে।'

খুব মজা লাগছিল ওদের। মাথাব ওপরে নীল আকাশটা কী নীল! দুপাশে পাকা ধানের ঢেউ। ওরা আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। সুন্দব হঠাৎ খোলা গলায় গান ধরল, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়—।' সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরকে আরও ভালো লাগলো নীপার। নিজের অজান্তেই সে গলা মেলাল। এই মুহূর্তে তার বুকে কোনও ভয় জমে ছিল না। মাঠের প্রান্তে একটি দোতলা বাড়ি। পেছনে পুকুর। অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই। ওরা ভেতরে ঢোকামাত্র কয়েকটি মহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। সুন্দর বলল, 'এই হলো আমার তিন বউদি। বউদি, এ হলো বনি আর ওর নাম নীপা। খুব ভালো মেয়ে ওরা। এখানে ক'দিন থাকবে কিন্তু কেউ যেন না জানে ওরা এখানে আছে!'

'কেন গো, কী ব্যাপার?' ছোটজন প্রশ্ন করল।

বড়জন বকে উঠল, 'আর এখন পায়ে ধুলো আর প্রশ্ন তুললি তুই। এসো তোমরা।'

বড়বউদি ওদের ওপবের ঘরে নিয়ে গেলেন।

'আমাদের এখানে অনেকগুলো ঘর। তোমাদের থাকতে মোটেই অসুবিধে হবে না।' আঁচলে বাঁধা একটা চাবির তোড়া থেকে খুঁজে ওপাশের বন্ধ ঘরের তালা খুললেন তিনি। চমৎকার সাজানো ঘর। এরকম ফাঁকা মাঠের মধ্যে এমন ঘব ভাবা যায় না। বউদি বললেন, 'এখানেই তোমরা থাকবে, কেমন! এদিকের জানলায় দাঁড়ালে কেউ তোমাদের দেখতে পাবে না। ওপাশে জলা। বড় রাস্তা বাড়ির এ'পাশে। সেদিকে না গেলেই হলো। ও হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু ভাই সাহেবী বাথরুম নেই। পুকুরে স্নান কবি ভোববেলায। তবে তোমাদের জন্যে হাত মুখ ধোওযার জল দিচ্ছি। নিচে কলপায়খানা আছে। তা কী ব্যাপাব? বাপমায়ের সঙ্গে ঝগড়া?'

এবার মুখ নিচু করল নীপা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মা-বাবা পাগল হয়ে গিয়েছে।

মুড়ির সঙ্গে নারকোল খেতে খেতে বনি বলল, 'দারুণ, না?'

নীপা মাথা নাড়ল। তার মুড়ি খেতে ভালো লাগে না। চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু এক প্লেট ফিশ ফিংগার সেই সকালে খাওয়ার পর এটা অমৃত লাগছে। ওদের সামনে ছোট দুই বউদি বসে আছে হাঁটু মুড়ে। ছোটবউদি বলল, 'তোমাকে কী মিষ্টি দেখতে! ঠিক সিনেমার নায়িকার মতো। তা প্রেমিকরা এলো না কেন ভাই?'

বনি কিছু বলল না। মুখ নামাল। নীপা প্রতিবাদ করল, 'ওর বয়ফ্রেন্ড!'

বনি প্রতিবাদ করল, 'এই অতীন তোকে বলেছে আই লাভ ইউ। আমি শুনেছি।'

'আমি তো বলিনি।'

'শুধুই কথাই বলেছে আর কিছু করে নি? বল না ভাই, আমাদের স্বামীরা তো শহরে থাকে, হপ্তার বার। পাঁচ দিন একা একা থাকি। চুমু টুমু খায় নি ওরা?' ছোট হেসে গড়িয়ে পড়ল। মেজ ওকে চড় মাড়ল আলতো করে, 'কী মুখ রে বাবা। খেলে তোকে বলবে কেন?' ছোট বলল, 'আমাদের সুন্দরবাবু তো মেয়েদের থেকে হাজার মাইল দূরে থাকেন। সেই ছেলে তোমাদের নিয়ে এলো। পছন্দ আছে।'

এখানে ইলেকট্রিক নেই। হ্যারিকেন জ্বলছে। ওরা দুজন জানলার পাশে বসে মাঠ দেখছিল। সেখানে অজস্র জোনাকি। বউদিরা নিচে রান্না করতে গিয়েছে। ওদের দেখার পর আর একটুও

ভয় করছিল না। সুন্দর সেই যে গিয়েছে আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না তার। নীপা ফিসফিস করে বলল, 'এদের টয়লেট ভীষণ নোংরা।'

'গ্রামের দিকে এইরকম হয়।'

'তুই কখনও পুকুরে স্নান করেছিস?'

'না। মা সবসময় ঠাণ্ডা-গরম জলে স্নান করতে বলে।'

'আমাকেও।'

'তোর মন কেমন করছে?'

'হুঁ।' নীপা বলল, 'একসাইটেড হলে মায়ের বুক ব্যথা করে, হাঁফ ধরে। বাবার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। জানিস, বাবা না, আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমার কপালে একবার হাম খেত।'

'হাম।' হেসে ফেলল বনি, 'হাম তো বাচ্চাদের খায়। তুই কি বাচ্চা?' কথাটা খারাপ লাগল নীপার। হঠাৎ তার মনে হলো বাবাকে কোনদিনও সে দেখতে পাবে না। টপটপ করে জল পড়তে লাগল গাল বেয়ে। বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করতে লাগল।

হ্যারিকেনটা পেছনে থাকায় বনি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বনি বলল, 'স্বপন এলে আমি খুব বকব।'

'তারপর কি করবি?'

'কোথাও চলে যাব ওর সঙ্গে।'

'আমি কী করব?'

'আঃ স্বপন একা আসবে নাকি? অতীনকে নিয়ে আসবে।'

'আমি অতীনের সঙ্গে যাব কেন?'

'বাঃ। তোকে ও ভালবাসে না?'

'আমি তো ভালবাসি না।' নীপা মাথা নাড়ল, 'এমনি ভালো লাগে।'

'তাহলে তুই এলি কেন?'

'একা একা বড় হব বলে। মা-বাবার সাহায্য ছাড়া বড় হয়ে ফিরে যাব। মা প্রায়ই বলে আমার ভবিষ্যৎ নাকি ঝরঝরে। সেটা যে মিথ্যে তা প্রমাণ করব।'

'কী করে?'

'জানি না।' কেঁদে ফেলল নীপা।

'কাঁদিস না।' নীপার পিঠে হাত রাখল বনি, 'স্বপন অতীন এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এত ঝাল রান্না কখনও খায় নি নীপা। আর কী সব তরকারি! বাড়িতে হলে ছুঁয়েও দেখত না সে। হাঁটু মুড়ে খেতে বসে কষ্টও হয়েছিল। রান্না কিন্তু ভালো। মা রোজ একই মেনু করে। মাছ অথবা মাংস। ঝাল সত্ত্বেও মাছের প্রিপারেশন দারুণ লেগেছিল। আর পায়েসটা? উঃ, ফ্যানটাস্টিক। কিন্তু রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। বনিরও। এই প্রথম বাড়ির বাইরে রাত কাটাচ্ছে ওরা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কিন্তু বাইরে শেয়াল ডাকছে। কয়েকবার মনে মনে কেঁদেছে সে। একবার মনে হলো বনিও কাঁদছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল মালদা থেকে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? নীপা জানে না, জবাবও দিতে পারে নি। ভোর হতেই দরজায় শব্দ। ওরা দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে কে বলল। ছোটবউদির গলা ভেসে এল, 'চলে এসো, স্নান করতে হবে।'

বাড়ির পেছনেই পুকুর। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ওরা তোয়ালে নিয়ে ছোটবউদির সঙ্গে সেখানে এলো। আশেপাশে কেউ নেই। এখনও আলো ফোটে নি। ছোটবউদি বলল, 'তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে নাও। তোমাদের দেখলেই লোকে বুঝবে শহরের মেয়ে।' খুব ভয় লাগছিল জলে নামতে। কিন্তু জল ততো ঠাণ্ডা নয় কিন্তু কেমন ঘোলাটে। পায়ের তলায় কাদামাটি। নীপার

...ন হলো কয়েক পা গেলেই ডুবে যাবে। সে গায়ে জল ছিটিয়ে স্নানের চেষ্টা করতেই ছোটবউদি তার কাঁধ জলে চেপে ধরে ছেড়ে দিল। রাগ এবং ভয়টা কেটে যেতে খুব মজা লাগল তার। বনি এখন বারংবার ডুব দিচ্ছে। ছোটবউদি এবার তাগাদা দিচ্ছে ফেরবার। নীপা বলল, 'আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দিতে হবে।'

ছোটবউদি বলল, 'শেখাতে হবে না, ঠিকই শিখে নেবে।' গলার স্বরটা যেন কেমন।

সারাদিন ঘরে বসে থাকা আর লুডো খেলা। আর দারুণ দারুণ খাবার। কচু দিয়ে মাছের প্রিপারেশন দারুণ। দুধপুলিটা অসাধারণ। ছোটবউদি আজ দুজনকেই শাড়ি পরিয়ে দিল।

সন্ধের পরেই বড়বউদি ছুটে এলো, 'খবরদার কথা বলবে না তোমরা।'

চোখ মুখ দেখে চমকে উঠল ওরা, 'কেন?'

পুলিশ এসেছে গ্রামে। বাড়ি বাড়ি খুজে দেখছে।' বড়বউদি ওদের হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তার দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক জিনিসপত্র ঠাসা। দুই বউদিকেও সেখানে থাকতে বলল। তাকে হ্যারিকেনের আলোয় খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। দরজা বন্ধ করে বড়বউদি চলে গেলে নীপা জানলার কাছে গেল। বাইরে অন্ধকার। এদিকটা ওরা দ্যাখে নি। বাড়ির পাশে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে তাতে ত্রিপল ঢাকা। মেজবউদি ওর হাত ধরে টানল, মরার হচ্ছে হয়েছে, না? চলে এসো এদিকে। একটা কথা বলেছ কি কেটে ফেলব।' নীপা বিস্ফারিত চোখে দেখল মেজবউদির হাতে বড় ছুরি। ওর মাথা ঘুরতে লাগলো।

বনি অনেকটা শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা এই গ্রামে এলো কি করে?'

তোমরা যখন বাস থেকে নেমেছিলে তখন একজন স্কুল মাস্টার দেখেছে। কাগজে খবর পড়ে সে ব্যাটা জানিয়েছে। পুলিশ চলে গেলে তোমরা নেমে একটা ট্রাকে উঠে পড়বে। আর ত্রিপলের তলায় চুপটি করে শুয়ে থাকবে। সুন্দর তোমাদের নিয়ে তোমাদের প্রেমিকের কাছে যাবে।'

নিচে খুব হইচই হচ্ছে, ওরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আওয়াজটা ওপরে উঠে এল। বড়বউদি গলা ভেসে এল, দারোগাবাবু বলছি কেউ নেই তবু বিশ্বাস করছেন না। দেখলেন তো সব ঘর।'

পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওই ঘরে কে আছে?

আমার জায়েরা। অল্পবয়সী। বাইরের পুরুষের সামনে বের হবে না।'

'তবু একবার দেখব। ওপরওয়ালার হুকুম।'

টর্চের আলো পড়ল ঘরে। দুই বউদি ওদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। আলো নিভে যেতে বড়বউদি বলল, 'হলো তো! আপনাদের জন্যে মা-বোনের ইজ্জত থাকবে না। চলুন নিচে।

দ্বিতীয় একটি গলা কথা বলল, 'আপনাদের বাড়ির বউরা কি বব ছাঁট চুল রাখে? স্যার দেওয়ালে দুটো বব ছাঁটের ছায়া দেখলাম। আপনি ভেতরে ঢুকুন।'

খাটের ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল নীপা। পাশের ঘরে বাবা। লালবাজার থেকে নিয়ে আসার পথে এবং এখানে আনার পরে বাবা একটাও কথা বলে নি। ওঘরে এখন ভিড়। পাশের বাড়ির মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনলাম ট্রাক রেডি ছিল, রাত্রেই পাচার করে দিত লক্ষ্ণৌ। খুব বেঁচে গেছে। যাই বল দীপ্তি, তোমরা মেয়ে মানুষ করতে পারো নি।' সবাই চলে গেলে বাবা ঘরে ঢুকল, 'নীপু, বল তো, আমি তোকে কী দিতে পারিনি?'

পেছন থেকে মা চিৎকার করে উঠল, 'কথা বল না ওর সঙ্গে। ও রাক্ষুসী, মরে গেলি না কেন, কেন এই—। আমাদের মুখ পুড়িয়ে কেন এলি।'

বাবা বলল , 'এতদিন মেয়ের জন্য অজ্ঞান হচ্ছিলে আর এখন মরে যেতে বলছ। এভাবে কথা বল না। ওকে খেতে দাও। তুমি আবার দয়া করে খাব না বল না। আমি সহ্য করতে পারছি

না।'

ইচ্ছে ছিল না। কিছুই ভালো লাগছিল না। সুন্দর লোকটা অধ্যাপক নয়, মেয়ে ধরে চালান দেয়—কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তিন বউদি আর সুন্দরকে কোমরে দড়ি বেঁধে এনেছে পুলিশ। ওরা যে মিষ্টি গল্প করত—সেসব?

খাওয়ার টেবিলেব সামনে মা। ওপাশে বাবা চুপচাপ বসে। সেই এক মেনু। মাছের ঝোলটা মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখল সে। সঙ্গে সঙ্গে মা বলে উঠল, 'কী, মুখে উঠছে না? সেখানে কি রাজভোগ খেতে?'

মাথা নাড়ল নীপা, 'ওরা ফ্যানটাস্টিক রান্না করত। বাড়িতে কখনও এমন রান্না খাইনি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মা, 'কী, কী? প্রশংসা হচ্ছে? যারা তোমাকে জন্মের মতন বিক্রি করে দিত তাদের প্রশংসা করছ! কালসাপ, কালসাপ—'

নীপা বাবার দিকে তাকাল। এঁটো হাতে টেবিলে রাখা বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরল সে, 'আমি ওখানে খুব ভালো ছিলাম বাবা। ওরা খুব ভালো খাওয়াতো, পুকুরে স্নান করতে দিত। পুকুরে ডুব দিতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। কেমন হলুদ হলুদ পৃথিবীটা, কেমন হলুদ হলুদ।'

জননী

তিন তিনটে শকুন মাথার ওপর পাক খেয়ে গেল। খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা, ডানায় শব্দ তুলে ওপরে ওঠে গেল, অনেকটা ওপরে। জলে পা ডুবিয়ে ভেজা বালিতে আধা শোয়া বিন্দু দেখল ডানা টানটান করে মুখ ঝুঁকিয়ে ওরা ওকে লক্ষ করছে।

আকাশটা আজ সকাল থেকেই এই রকম। আধপোড়া কাঠের মত চেহারা। নামছে না একটা ফোঁটাও অথচ আলো বলতে যেটুকু মরা মাছের চোখেও বুঝি ভাব চাইতে বেশী চটক। কেমন থম ধরে আছে চারদিক। তিন তিনটি দিন কাঁদিয়ে ভাসিয়ে আজ এ কেমন ধারা গোঁ।

নদীটার অবস্থাও হয়েছে তেমনি। বুড়ো সাপের মত গতর। মতলব বোঝে কার সাধ্যি। বৃষ্টি নামার আগে বিন্দুরা দল বেঁধে সাঁতরাতো। দলেরই কেউ হয়তো দেখেছে, হুই যে কালো মুখ উঁকি মারে জল সরিয়ে। দাও ঝাঁপ দাও ঝাঁপ পলকে ক'টা শরীর জলে পড়ে শব্দ করে। চালাকি চলবে না বাপ্, বুঝেসুঝে হাত বাড়াও। একটু জোর খাটিয়েছ কি মারবে এমন থাপ্পড় যে দেখবে তুমি এই চত্বরের কোথাও নেই। বেয়াদপি করতে গিয়েছিল হারান সেনের ছোট ছেলেটা, ওর হাড়মাংসগুলো পাওয়া গেল কিংসাহেবের ঘাট ছাড়িয়ে কাশবনের চড়ায়। অতএব জলের যে দিকে মতি সে দিকেই চল, মাছের মত তারই মধ্যে একটু এপাশ ওপাশ হও, দেখবে বুড়ি তিস্তা ঠিক তোমাকে নিয়ে যাবে সেইখানে যেখানে কালোমুখ নৃত্য করে। যার সাহস বেশী, বুড়ি তিস্তা যাকে একটু দয়া করবে, সেই দেবে হাত। তারপর শক্ত হাতে হাল হয়ে স্রোত ধরে চল ওটাকে নিয়ে। এক সময় ঠিক চড়ায় গিয়ে ঠেকবে। সঙ্গে যারা এল গেল, তারা জলে চোখ জবা করে ফিরে যাবে আধ মাইল উজানে। আর যে পেল সে তো মহাখুশী। এখন শুকোক এ কাঠের

গুঁড়ি। রোদ্দুর খান দিনভর। কোপ বসাও মনমতন, টাকায দশ কিলো তো চোখ বুজে বিক্রি। সেই সক্কাল থেকে আসে মেযেগুলো, খ্যানপাড়ার যত বাঙ্গবংশী মেয়ের ঝাঁক ওত পেতে থাকে।

আজ তিন তিনটে দিন জবব বৃষ্টি। এই যে বিরাট বালিব চবটা। এখানে কেউ পা বাখবে বুকের পাটা কাব। বুড়ি তিস্তা ক্ষেপলে তাব নিঃশ্বাসেব সামনে কে আসবে গো। এই যে বুড়োব দাড়িব মত কাশফুলগুলো। একটারও ঘাড়ে মাথা নেই। এই তিন দিন তিন বাত সব্বাই যে যাব ঘবে। আজ সকালে যখন আকাশটা কেমন চুপচাপ, বিন্দু একাই দৌড়ে এল বাঁধেব ওপবে। আব এসেই শরীব হিম হল ওর। হা মা বুড়ি তিস্তা, তোমাব এ কি চেহাবা গো। মাটি খেযে খেযে জলের রঙ এত কালো হয। আই বাপ্ বুকে ভয লাগে। আব কি মোটা হযে গেল নদীটা। নদীটাবে বুড়ি কে বলবে এখন? স্রোতে কি ছোবল তাব। ভব বযসেব বিযেব জল-খোঁজা ছুঁড়িব মত চনমনে।

আব তাবপরেই চোখ পডল। এই তিন দিন ধবে বিন্দু ভাবছিল। বুড়ি তিস্তার যেখানে জন্ম, সেই পাহাড়ে তো এখন রাম-রাবণেব যুদ্ধ হচ্ছে নিশ্চযই। হায়, কত গাছ ভাঙলো, কত কাঠ ভেসে গেল। আর এখন বাঁধেব ওপবে দাঁড়িযেই ওব নজব গেল, স্রোতেব টানে হাবুডুবু খেতে খেতে চলেছে কালো মানিকেব ঝাঁক। বিন্দু বাঁধ থেকে নেমে ছুটলো। ভেজা বালিতে পা টানছে। ন'হাতি কাপড়টা সামলে ও হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিল নদীব ধারে। বৃষ্টিব আগে এর ডবল পথ হাঁটতে হত। কিন্তু কাছে এসে জলের গায়ে দাঁড়িয়ে বুকে থম ধরল বিন্দুর।

ও মাগো। বিন্দু বুকে হাত দিল। কি পাগলপাবা ঢেউ গো। সেই সেবার রাক্ষুসী যখন চলে এসেছিল বাঁধ কেটে ওদের দাওয়ায়, সেবার চেহাবা এমনতব ছিল। এটা কি বলে ফেলল ও, বাক্ষুসী কেন বলল? হেই মা, হেই বুড়ি মা, তিন-তিনবাব গড কবল বিন্দু। তুমি আমাদেব খেতে দাও পরতে দাও জননী গো, পাপ নিও না মা। বিন্দু মনে মনে বডঠাকুরের পা ছুঁযে নিল একবাব।

কিন্তু এ জলে নামবে কে? এই শোঁ শোঁ শব্দ, উথালপাথাল ঢেউ। বিন্দু নদীর ওপর দিযে তাকাল। ওপাবে, যেখানে বার্নিশ ঘাটের দোকানগুলো আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিন্দুব চোখ বড হল, বাপ, কি বড় বড় কাঠের গুঁড়ি, ঠিক মধ্যিখান দিযে যাচ্ছে গো। হাত-কামড়ানো কপাল-চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এদিকে ধারের জলে টান কম। গাছের বাকল, ভাঙা ডাল ঘুরপাক খাচ্ছে এদিকটায়। বিন্দু শাড়ি পেঁচিয়ে জলে নামল। বুড়ি মাগো, এক বুক যাবো, তার বেশী নয়।

বুড়ি তিস্তাব জল এমনিতেই মাঘ মাসের হাওয়াব মত, কিন্তু আজ এত শীতল কেন? হাড়মাস কেটে নিচ্ছে গো। কামটেব মত: জলের তলায় টুক কবে আঙুল কেটে নিয়ে গেল, তুমি টেরও পেলে না। কাশফুলের মত হালকা শরীর বিন্দুর, কোমল জলে ভাসাল। পাশের তলায় বালির গায়ে পলির সর জমছে, হাঁটবে সাধ্যি কি। আর সেই থেকে টুকবো কাঠ আব বাকল ধরেছে কোমর জলে দাঁড়িয়ে আর জমা করেছে ভাঙা কাশ গাছের গোড়ায়। তা এই করতে করতে দু' প্রহর বেলা গেল গড়িয়ে, আকাশ দেখে বুঝবেটা কে? কাঠ জমেনি এমন কিছু। শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে গেল বিন্দু। চিৎ হয়ে শুয়ে রইল ভেজা বালির ওপর নিথর হয়ে। শুয়ে আকাশ দেখল। তিন তিনটে শকুন চক্কর কাটছে। হিম বাতাস বইছে এখন। ভেজা শাড়ি, অঙ্গজুড়ে রাজ্যির শীত আনছে। বিন্দু ভাবল, আর নয়, এবার ফিরতে হবে। খ্যানপাড়ার কোন মেয়ে আজ আর আসেনি। এই জলে নামবে হিম্মত আছে কার? বাতাসে বিন্দুর শরীরে কাঁটা ফুটছিল। বিন্দু দেখল, খুব কাছাকাছি নেমে এসেছিল শকুনগুলো ডানার শব্দ তুলে, আবার উপরে উঠে গেল।

আব এই সমযেই ওব চোখে পডল। পডতেই তডাক কবে উঠে বসল ও। বেশ লম্বা, তা হাত দশেক হবে, বিন্দু আন্দাজ কবল, একটা কাঠেব গুঁডি এদিকে আসছে। আয আয বাবা এদিকে আয। উত্তেজনায বিন্দু উঠে দাঁডাল, 'পাঁচ পযসাব বাতাসা মা, ও মাগো বুডি, মানত বইল, ঠেইলে দাও এদিকে, ঠেইলে দাও।' গুঁডিটা ঢেউযেব তালে দুলতে দুলতে, কি আশ্চয অল্প জলে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল বিন্দু। জল টেনে টেনে গা ভাসাল খানিক। গুঁডিটা আব এদিকে আসছে না। অনেকটা দব চলে এসেছে বিন্দু। সমান্তবাল হযে চলছে গুঁডিটাব সঙ্গে। হেই মা বুডি এিক লোভ দেখালে মা, আমি ফিবব কেমন কবে? এখনও অবশ্য বড ঢেউ অনেক দূব। গুঁডিটা একটু এগিযে এসেছে। আহা বেশ মোটা গো। বিশ কিলো, না মণটাক তো হবেই। হাত বাডাল ও। বুকেব কাপড খুলছে ঢেউ। পাক খেল পেটেব তলায আঁচলটা। টানেব চোটে গুঁডিটা একটু সবে গেল। না হল না। মুখ দিযে জল ছিটোল বিন্দু। বুক ভবে বাতাস নিল তাবপব মবিযা হযে আব একটু এগোল ও। এই এই, বাস। হযে গেছে, হযে গেছে। গুঁডি থেকে বেবনো একটা ডাল এখন বিন্দুব মুঠোব ভিতবে। কি আবাম। বিন্দু চোখ বুজলো। তাবপব ডান হাতে জল কাটতে লাগলো ও। একটু একটু কবে স্রোতে গা ভাসিযে চলতে চলতে পাযে বালি এল হঠাৎ। আঃ, বিন্দু দু হাতে গুঁডিটাকে টানতে লাগল। হেই বাপ যা ভেবেছিলাম তা তো নয। বিবাট বড, সেই স্কুলবাডিব গাছটাব মত গাছ হে। জল বলে টানা যায। কিন্তু এখন এই যে চবে লেগে গেল তলাটা এখন যে আব ওঠে না। প্রাণপণে শবীব বেঁকিযে কাদা মেখে খানিকটা ওপবে আনলো বিন্দু। অর্ধেকেব বেশী এখন জলে। বেশ মোটা গাছ। বিন্দু বালিতে উঠে এল। হঠাৎ একটা খসখস শব্দে তাকাতেই বিন্দু ল ফিযে এক মানুষ দূবে ছিটকে পডল হাই বাপ। কালসাপ গো। বিন্দুব বুকটায কোন বাতাস নেই যেন। ফ্যাল ফ্যাল কবে ও দেখল হেলতে দুলতে একটা কালো গোখবো গাছেব পাতা সবিযে সবসব কবে বালিতে নামল। তাবপব ফণা তুলে বিন্দুকে একবাব দেখল। শেষ পর্যন্ত হেলতে দুলতে বালিব ওপব দিযে ভাঙ্গা কাশফুলেব জঙ্গলে ঢুকে গেল সাপটা

বেশ কিছুক্ষণ বিন্দু পাথব হযে বইল। তাবপব একটু ধাতস্থ হতে পাযে পাযে গাছটাব সামনে এসে দাঁডাল। ওব মনে হচ্ছিল সাপটাব নিশ্চযই একটা সঙ্গী আছে। কযেকবাব তালি বাজাল। মনসা গো, হেই মা মনসা, অস্তি, অস্তি চেঁচাল বিন্দু। একটু সাহস পেযে কযেক মুঠো বালি ছুঁডে দেখল কিছু নডে কিনা। যা পাতা গাছটাব।

এখন হবেটা কি। এই গাছ ফেলে যাবেই বা কি কবে। কমসে কম এক কুডি টাকাব গাছ। সেই গেঁজেলটাকে একবাব ডাকবে নাকি। বলবে নাকি, পোযা ভাগ দাম দেব, একটু হাত লাগাও। না, সে গেঁজেল আসবে না। ঘবে উনুন জ্বলবে না? কেন, বিন্দু কোথায। পবনে কাপড চাই? বিন্দুবে বল। গাঁজাব পযসা?—ও বিন্দু, বিন্দুমতি। কানেব লতি গবম হযে গেল ওব। পুরুষমানুষ, জমি নেই, লাঙল নেই, কিন্তু তাই বলে গতবও কি থাকতে নেই। মোষেব মত তো চেহাবা, গাঁজা খাবে আব ঝিমুবে। দুটো পাঁচটা কাজ বল, কি ফেবিঘাটে মোট বইতে বল, সে দূবেব কথা, গতব থাকলে কি এই আট বছবে বিন্দুকে বাঁজা থাকতে হয! মবণ মবণ। হেই বুডি তিস্তা তুমি তো সর্বখাকী, ওটাবে—। চোখে জল এসে গিযেছিল। একটা আক্রোশেব বশে ও গাছটাকে নিযে টানাটানি কবল খানিক। আব সেই সমযেই ওব নজব পডল।

নজব পডতেই ও একদম সিধে, কলাগাছেব মত কাঁপন শবীবে। একি হল, হেই মা, এটা কি দিলে। বিন্দু নিজেব চোখকে বিশ্বাস কবতে পাবছিল না। ও ভযে প্রাণপণে চিৎকাব করে উঠল। এখন টিপ টিপ কবে বৃষ্টি শুরু হযেছে। বিবাট তিস্তাব চবটা জনমানবশূন্য। বিন্দুব গলার শব্দ বালির ওপর দিযে গডিযে গডিয়ে জলেব সঙ্গে মিশে গেল। তিস্তার বুকে রাগী মোষের মত অজস্র ঢেউ-এব গোঁ গোঁ দাপানি। বিন্দু চোখ বড করে দেখল, কেউ নেই। জলপাইগুডি

শহবেব গা ছুঁযে এলাকা ওদেব, খ্যানপাডায মানুষ নেই নাকি' একটু বাদে, বুকেব শব্দটা কমে এলে ও জলে নামল। কোমবজলে যেতে হল না। তাব আগেই ও পবিষ্কাব দেখতে পেল। ঢেউ-এব তালে তালে শবীবটা এখন দুলছে না। শবীবটা নয শবীব দুটো। একে অন্যেব সঙ্গে জডিযে মিশে বযেছে। বিবাট গাছটাব ডালপালায শবীব দুটো ঢাকা। পুরুষটাব দুটো হাতেব মুঠিতে গাছেব ডাল ধবা। মুখ বুকেব ওপব গোঁজা। পুরুষটাব শবীব ধবে ঝুলছে মেযেছেলেটা মুখ হা কবে। পুরুষটাব বউ নাকি' বেঁচে আছে নাকি'

দাতে দাঁত চেপে বিন্দু পুরুষটাব দুটো হাতেব মুঠো গাছেব ডাল থেকে টেনে ছাঁডিযে আনল। কি শক্ত বাঁধন। হায গো। তাবপব জলেব ওপব দিযে টানতে লাগল ও। পুরুষটাকে জডিযে ধবেছে যে মেযেটা তাব হাতেব বাঁধন একটুও আলগা হল না। বউটাব মুখ জলে গোঁজা। কচুবিপানাব শেকডেব মত বাশবাশ চুল ভাসছে। পুরুষটাকে টানতে বউটাও ভেসে আসছিল চবেব দিকে। বিন্দুব বুকটা কেমন কবছিল।

বালিব ওপব ওদেব এনে বিন্দু লাফিযে চলে এল পুরুষটাব মাথাব কাছে। তাবপব ঝুঁকে পডে হাত নিযে এল পুরুষটাব নাকেব কাছে। না, বাতাস নেই। শবীবটা ফুলে ঢোল জামাকাপডে মাংস চেপে বসেছে। ক'দিনেব মডা কে জানে।বউটাব মুখ বালিব ওপব পাশ হযে আছে। উপুড হযে শোযা। বউটাব বযস কম সুন্দবই। বিন্দুব থেকে বেশ কম নিশ্চযই। মুখ চোখ দেখে তো সুন্দবই লাগে। বিন্দু দেখল বউটাব বাঁ নাকেব পাটায ফুটো তাব মধ্যে একটা সুতো জডানো। অজান্তে নাকে হাত দিল বিন্দু। না তাব নাক সে ফুটোতে দেযনি। এই নিযে মাযেব কি বাগাবাগি। আট বছবেব বিন্দু গো ধবেছিল না, আগে নাকছাবি দেব তাবপব নাক ফুটোবো। হলুদ সুতো পববো না। এখন এই বউটাব জন্যে হঠাৎ মাযা হল। আহা বেচাব

পুরুষটাব হাত ধবে টানতে লাগল বিন্দু। হেই বাপ, কি ভাব শবীবে। জলে [illegible] ফুলে শবীব খেযে নেয যে। বিন্দু প্রায ঝুঁকে পডে পুরুষটাকে টানতে লাগল [illegible] সত্যি না মবে থাকে। সেই সেবাব কাকে যেন মডা বলে জলে ফেলা হল সাত [illegible] আগুনেব বিডি ফুকতে ফুকতে ফিবে এল। কথায বলে জলেব মডা না মাটিব সব'। মাটিব [illegible] পচে গলে যাবে কিন্তু মাটিব সবায প্রাণভবে জল খাও থাকলে এও তেমন জলে [illegible] জীবন পায। গোডালি বালিতে বসে যাচ্ছে বিন্দুব, কপালে ঘাম জমেছিল। বালিমাখা শবীব কাদাখোচা পাখিব মত কাঁপছিল। টানতে টানতে ওদেব অনেকটা উঁচুতে, প্রায বাঁশঝাডেব জঙ্গলেব গাযে এনে ফেলল ও। বউটাব হাতেব বাঁধন একটুও আলগা হযনি। বালিব ওপব দুটো শবীব লাঙ্গলেব মত মোটা দাগ কেটে এসেছে। বিন্দু হাঁপিযে পডেছিল। ক্রমশ ওব কেমন ভয কবতে লাগল। এই নির্জন নদীতীবে দুটো মৃতদেহেব সামনে দাঁডিযে ও কেমন একা বোধ কবতে লাগল। অথচ এই এতক্ষণ, জল থেকে ওদেব টেনে তোলাব সময ওব মধ্যে এই ভযটা ছিল না। বিন্দু মুখেব কাছে দু হাত মেলে দেখল। না, কিছু লেগে নেই। ওব শবীব হঠাৎ সিবসিব কবে উঠল, আব তাবই দমকে বিন্দু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বাঁধেব দিকে, বাঁধেব পেছনে একহাঁটু কাদাব মধ্যে মুখ গুঁজে পডে থাকা খ্যানপাডাব দিকে। নদীব বুক থেকে একবাশ ভিজে হাওযা বিন্দুকে ঠেলে নিযে যাচ্ছিল যেন, বৃষ্টি শুরু হযেছে।

পাডাব ভিতবে এসে বিন্দু থমকে দাঁডাল।বাইবে কেউ কোথাও নেই। বৃষ্টিব জোব বাডছে। কাকে বলবে ও। সুবেন সেন পাডাব মাথা। লোকটাব চোখ সব সময বিন্দুকে দেখলেই চকচক কবে। নুলো হ। এখন তো সব যে যাব ঘবে। একবাব চেঁচাবে নাকি? বিন্দুব চকিতে গাছেব গুডিটাব কথা মনে পডে গেল। ভীড জমলে তো আব পাঁচটা হাত গাছে পডবে না? ক'জনকে সামলাবে ও। এই তিনদিন তো সবাই বেকাব। মাছ জল ছেডে উঠে এসেছে। পাডাব একহাঁটু কাদা ঠেঙ্গিযেও সবাই ছুটবে। না, চেঁচানো চলবে না।

বিন্দু কাপড় সামলে নিজের দাওয়ায় উঠে এল। বুড়ি শাশুড়ি তেমাথা হয়ে কোণায় বসে। বিন্দু দেখেও দেখল না। সোজা ঘরে ঢুকে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'হেই, উঠ উঠ, উঠ না কেন।' বিন্দু হাত ধরে ঝাঁকাল। বিন্দুর স্বামী হাঁ করে কি ভাবছিল, থতমত হয়ে বউকে দেখল। তারপর কাদাবালি মাখা ভেজা শাড়ি জড়ানো অদ্ভুত চেহারাটাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে মুখটাকে ছুঁচলো করল।

'আঃ, মরণ আমার। একবার নদীর ধারে চল কেন,' বিন্দু ছটফট করছিল।

'নদীর ধারে? এখন? পাগল নাকি।' লোকটা বলল।

'বিরাট গাছ ধরিছি। এক কুড়ি টাকার গাছ। আর জোড়া বরবউ। মড়া।'

'মড়া? মড়া তুই পালি কোথা?' এবার লোকটা উঠে বসল।

'ওই গাছের সঙ্গে ছিল যে।'

বিন্দু দেখল গেঁজেলটা কি ভাবল খানিক। তারপর 'চল' বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এত সহজে ওকে ঘর থেকে আনতে পারবে ভাবেনি বিন্দু। লোকটা একবার বৃষ্টি দেখল তারপর মাটিতে নামল। বিন্দু চকিতে দেওয়ালে গোঁজা দা-টা টেনে নিয়ে স্বামীর পিছন ধরল। গাছটাকে কেটে কেটে ছোট করতে হবে।

ওরা দু'জন প্রায় নিঃশব্দে হাঁটছিল। যদিও পাড়ার কেউ বাইরে নেই, তবু বিন্দুর সঙ্গে ওর স্বামীকে হেঁটে যেতে দেখলে অনেকের সন্দেহ হতে পারে। এ দৃশ্য খুবই অচেনা সবার। ওরা বাঁধের ওপরে উঠে এলে বিন্দু দৌড় লাগাল।বাতাসে ওর চুল কাপড় উড়ছিল। ওর তর সইছিল না। বৃষ্টি মাথায় করে ও ছুটছিল নদীর দিকে ভেজা বালি মাড়িয়ে। ওর স্বামী দৌড়বার চেষ্টা করল না।মুখ বেঁকিয়ে দাঁত চেপে গজরাল, 'হেই বাঁজা মেয়েমানুষটা, দৌড়াস কেন রে, ফুর্তির পোকা মাথায়? অ্যাঁ।'

বিন্দুর কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। দৌড়ে ও যতই নদীর কাছাকাছি আসছিল ততই ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। নদীর গায়ে এসে ও থপ করে বালিতে বসে পড়ল। না, গাছের গুঁড়িটা নেই জল বেড়েছে। বেশ খানিকটা উঠে এসেছে। হেই মা বুড়ি তিস্তা, এটা কি রকম বিচার মা। পাঁচ পয়সার বাতাসা মানত দিলাম তোমারে। বিন্দু আশেপাশের জলে গাছটাকে খুঁজে পেল না। স্রোত কখন এসে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

অবসন্ন হয়ে বিন্দু দেখল অনেক দূরে বালির ওপর দিয়ে ওর স্বামী আসছে। ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর। এই গেঁজেলটা ওর যম, ওর অপয়া। বিন্দু রাগে এক দলা থুতু ফেলল বালিতে। তারপর মুখ তুলে দেখল মড়া দুটো কাশফুলের গোড়ায় তেমনি পড়ে আছে। আর হ্যাঁ, শকুন তিনটে খানিক দূরে, যেন ওকে দেখেই সরে দাঁড়াল।

খানিক বাদেই গেঁজেলটা এসে গেল। এসে কোমরে হাত রেখে মড়া দুটোকে দেখল। তারপর বলল, 'বাহা, বেশ ডাগর বউ হে! শরীরখান জবর।' সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর মাথাটা ঘুরে গেল। যেন চৈত্তির মাসের ভরদুপুরে উনুনে হাত রাখল সে, দাঁতে ঠোঁট চাপল ও। মেয়েছেলের ন্যাংটো বুক দেখে নোলা ঝরছে। বিন্দুর হাতের মুঠো দা-এর বাঁটে শক্ত করে বসল।

জরিপ করছিল লোকটা। তারপর বলল, 'কি করবি লাস দুটো নিয়ে, হ্যাঁ?'

বিন্দু কোন জবাব দিল না।

গেঁজেলটা ঠোঁট ছুঁচলো করে একবার চুকচুক শব্দ করল। তারপর চার পাশ দেখে নিয়ে এক গাল হাসল, 'তোর কাঠ কই অ্যাঁ।'

বিন্দুর বুকের মধ্যে যেন পোড়া কাঠের ছেঁকা লাগছিল। ওর হাতের মুঠোয় ধরা দা-টা এখন কাঁপছে তিরতির করে।

গেঁজেলটা এবার মড়া দুটোর চারপাশে একবার চক্কর মেরে নিল, তারপর হাঁটু গেড়ে

পুরুষটাব পাশে বসে টেনে হিঁচড়ে বউটাব হাতেব বাঁধন খুলে এক পাশে সবিয়ে বাখল। পুরুষটা একটু কাত হযে গিযেছিল। জলে ভিজে শ্যাওলা বঙেব শবীব কেমন নিশ্চিন্তে শুযে আছে বঢপ হযে। গেঁজেলটা এবাব চটপটে হাতে পুরুষটাব জামা ধবে টানাটানি কবতে কবতে কলাব খোলাব মত শবীব থেকে ছাড়িযে নিল। তাবপব বিন্দুব দিকে তাকিযে হাসল, এব আব জামাব কি দবকাব বল? প্রাণ উড়ে গেলে শবীব মাটি হয।' বলে কোমবেব কসি খুলে কাদামাখা ধুতিটাও সবসব কবে খুলে নিল। ফুলে যাওযা শবীব থেকে কি কবে জামা কাপড় খুলে নিল গেঁজেলটা, বিন্দু চোখ চেযেও বুঝতে পাবল না।

একদম উদোম হযে পড়ে বযেছে পুরুষটা। জল খেযেছে জব্বব। জলে শবীব যেন শুযে নিযেছে। গেঁজেলটাব লোভ সাবা অঙ্গে। বিন্দু দা হাতে উঠে দাঁড়াল। এই সুযোগ, কেউ নেই, ব্যাপাবটাব সাক্ষী কেউ নেই। হেই মা তিস্তা, পাপ নিও না গো।

জামাকাপড় থেকে ভাল কবে জল নিংড়ে কাঁধে ফেলে বউটাব পাশে গিযে দাঁড়াল গেঁজেলটা। উপুড় হযে শুযে আছে বউটা। বুকেব পাশে খুলে যাওযা আঁচলটা তুলে গেঁজেলটা বলল, 'আই বাপ নতুন কাপড় হে।' বলে হিড় হিড় কবে টান দিল, যেন নৌকোব গুণ টানছে। বিন্দু দেখল বউটাব শবীব কযেক পাক সবিযে কাপড়টা খুলে এল।

কাদামাখা শাড়িটা নিযে গেঁজেলটা দু পা এগিযে এল, 'নে ধব, নতুন শাড়ি। হাই বাপ, মা কালীব মত দেখায যে তোবে। নে নে পবে নে ক্যান।' তাবপব গোপন কিছু বলছে এমন মুখ কবে বলল, 'শুনিস নাই, মৈথুন সাপেব অঙ্গছোঁযা বস্থ খুব পযমন্ত। এবাও তো সাপেব মত। জলে ভেসে এল যে।' বিন্দুব দিকে শাড়িটা ছুঁড়ে দিযে বাঁধেব দিকে কযেক পা হেঁটে মুখ ঘুবিযে বলল, 'লাস দুটো জলে ফেলে দেবে, ভেসে যাক। শালা জবাব দিতে দিতে প্রাণ ভোব হযে যাবে কিন্তু।'

কি বলল গেঁজেলটা? মৈথুন সাপেব কথা বলল কেন? বিন্দু হতভম্ব হযে পড়ল। সত্যি নাকি? বিন্দু ভাবতে পাবছিল না কিছু। যে ভাবে ওবা জড়িযে ছিল—হে মা মনসা, তাই কি তুমি গাছ থেকে নেমে এলে? বিন্দু ক্রমশ বোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

শাড়িটা দেখল ও। নতুন শাড়ি। জলে ভিজে কেমন আঁশটে গন্ধ হযে গিযেছে। ক্ষাব দিযে কেচে নিলেই হবে। এই মুহূর্তে কাঠ হাবাবাব দুঃখও ভুলে গেল।

লাস দুটো পড়ে আছে। বিন্দু পুরুষটাব পা ধবে আবাব টানতে লাগল। টানতে টানতে এক সময বালিব ওপব থেকে নামিযে তিস্তাব জলে ফেলল ও। এখন শবীবেব দিকে তাকানো যায না। ঘেন্না ঠিক নয, কেমন লজ্জাই কবে যেন। একবাব যখন বউ-এব বাঁধন খুলেছে তখন আব কেন। পা দিযে একটু ঠেলা দিতেই দূবে চলে গেল লাসটা। তাবপব স্রোতেব টানে ঘুবপাক খেযে পলকে উধাও।

এত ভাবী কেন বউটা। পুরুষটাব চাইতে ভাব বেশী। জল খেযেছে খুব। বউটাব শবীব ধবে বিন্দু এবাব টানছিল। ওব কপালে সদ্য জাগা ঘাম বৃষ্টিব জলে মুছে যাচ্ছে। খুব কষ্ট হল ওব বউটাকে জলেব কাছে আনতে। একটা হ্যাঁচকা টানে বউটাকে ও জলে নামিযে দিল। টানেব চোটে ঘুবে গেল শবীরটা, ঘুরে চিৎ হল। আর তখনই বিন্দুর সারা শবীর থেকে একটা চিৎকাব ছিটকে বেরিযে এল। মুখে আঙুল দিযে ও কাঁপতে কাঁপতে ঝুঁকে পড়ল। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি। উপুড় হয়ে ছিল বলে নজরে আসেনি। এখন চোখ বুজে বলে দেওযা যায়, ভব মাসের পেট। হাই মা গো।

ওটা কি! বিন্দু দেখল, নাই-এর পাশে বউটার চামড়া টান টান, পেটটায় একটা দিক খোঁচা হয়ে উঠে আছে। ভেতব থেকে সেটা ঠেলছে নাকি। বিন্দুর শরীরে লক্ষ কদমফুল চনবনিযে উঠল এবার, ওর কেমন ঝিমুনি এসে গেল। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতল বিন্দু, যদি কোন

শব্দ হয়। না, নিথর. একদম নিথর। বড় বড় চোখে বিন্দু দেখল, নাই থেকে একটা কালো রেখা নিচে চলে গিয়েছে সোজা। এর মানে ছেলে হবে। পেটের ভিতর বন্দী থাকা সেই মানিকটা এখন কি করে! হাই মাউ করে কেঁদে ফেলল ও।

তারপর বিন্দু যখন একসময় হাত সরিয়ে নিল তখন বউটার শরীর দুলতে দুলতে জলের তালে সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই তিনটে শকুন যেন নাচতে নাচতে বালির ওপর দিয়ে এগোচ্ছে পাখা ফুলিয়ে। তারপর তিনজনেই আলতো উড়ে গেঁজেলটার মত একটা চক্কর কেটে বউটার শরীরে গিয়ে বসল।

বিন্দু চিৎকার করে উঠল। এখনই ঠোকরাবে গো। হেই বুড়ি তিস্তা, ওরে ডুবায়ে দাও, জননী গো। হাঁটু জলে নেমে মুঠোয় ধরা কাপড়টা ছুঁড়ে মারল বিন্দু। ঐ গেঁজেলটা—আমার পাপ। আবরণটা থাকত, একটু আড়াল। না, বিন্দু দেখল, শাড়িটা বউটার শরীর পর্যন্ত পৌঁছল না।

শকুন তিনটে দেখছে এক চোখে। জলের কিনার ধরে বিন্দু দা-টা মাথার ওপর তুলে হেট হেট শব্দ করে ছুটছিল। বউটার নাই-এর পাশে বসেছিল যেটা, আলতো করে এবার ঠোকর বসাল। আর বিন্দু তখন তীব্র চিৎকার তুলে হাতের দা-টা ছুঁড়ে মারল শকুনগুলোর দিকে। শনশন শব্দ তুলে হাওয়া কেটে বউটার পেটে গিয়ে বিঁধলো সেটা। আচমকা আক্রমণে শকুনগুলো লাস ছেড়ে উঠল ওপরে। উঠে ঘুরপাক খেতে লাগল।

দা-টা বিঁধে যেতেই বিন্দুর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। টান টান পেটে দা-টা কি সহজে ঢুকে গিয়ে অনেকখানি চামড়া চিরে ফেলেছিল। আর তার ফাঁক দিয়ে সেই খোচা হওয়া জায়গাটা যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এল। বিন্দু দেখল একটা প্রায় পুরুষ্ট হাত সোজা পেট থেকে উঠে এসেছে। তার মুঠো যেন আকাশের দিকে বাড়ানো।

বউটার শরীর এবার স্রোতের টান পেল। সে নির্মল হাতটার দিকে বিন্দু লোভীর মত তাকাল। শকুন তিনটে ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে।

একটা গাছের গুঁড়ির মত সেই নির্জনে নদীতীরে দাঁড়িয়ে বিন্দু দেখল, একটা নরম নিটোল হাত আকাশটাকে মুঠোয় করে কি গভীর সুখে বউটাকে পালের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

জমা জমি

চাষযোগ্য ভূমির বড়ই অভাব এই গ্রামে। সেই কবে পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে-মাটি নিজেদের জন্য চিহ্নিত করে গিয়েছিল তার বেশী খুব একটা বাড়েনি। এক পুরুষ আগেও জঙ্গল কাটা যেত, জমির শরীর বাড়ানো যেত সুবিধে পেলে। এখন সরকার সেটাও বন্ধ করেছেন। তাছাড়া এই পাহাড়ের মাটিতে এত পাথর যে চাষ সহজ নয়। অনেক খাঁ খা প্রান্তরে দিনরাত হাওয়ারা খেলা করে। বিনি পয়সার সেই জমি দিলেও কেউ মুখ ফেরাবে না। অতএব যেটুকু চাষযোগ্য জমি তার ওপরে মায়া প্রতিটি পরিবারের সারা বছরের পেট ভরার যা অবলম্বন। কিন্তু তাই বা ভরে কই? দিন দিন নতুন মানুষ আসছে সংসারে। তাদের পেটের জায়গা বাড়ছে। অথচ জমি বাড়ছে না এক ফোঁটাও।

এই গ্রামের মানুষেরা শহরে যায় না, যেতে চায় না। বড় শহর নয়, মোটামুটি গঞ্জ এলাকা বলতে মানেভঞ্জন, তাও আট ঘণ্টার হাঁটাপথ। সেখানে গেলে যে কাজকর্ম পাওয়া যায় না তা নয়। মাল বইবার লোক দরকার হয় ব্যবসায়ীদের। হাতে নগদ পয়সা আসে। কিন্তু তা নিয়েও ঝামেলা আছে। আরও দশবিশটা গ্রামের মানুষ সেই একই ধান্দায় হাজির হয় সেখানে। এর ওপর আছে খোদ মানেভঞ্জনের বেকাররা। ওরা তাদের ভাল চোখে দেখে না। ফলে দিন দিন গঞ্জ কমে যাচ্ছে দ্রুত। আরও দূরে যে শহর দার্জিলিং সেখানে নাকি খুব বড় বড় মানুষ থাকে এই গ্রামের মানুষ অত দূরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আশেপাশের জঙ্গলে আছে প্রচুর কাঠ। মেয়েরা তাই চুপিসাড়ে নিয়ে আসে ভোজালি চালিয়ে। এখন বুক ফুলিয়ে কাঠ কাটার দিন নেই। মাঝে মাঝেই ফরেস্ট গার্ডরা টহল মারে। তবু কাঠ আসে গ্রামে। শীতকালে যখন শুরু বাতাস করাত চালায় তখন ওই কাঠ প্রাণ বাঁচায়। দুটো মাস তো সাদা হয়ে যায় গ্রামটা বরফে। জমির মুখ দেখা তো দূরের কথা, গাছের পাতাও চেনা মুশকিল হয়ে পড়ে। তখন যার উনুনে আগুন জ্বলে তার মতো ভাগ্যবান আর কে এই তল্লাটে। ওই জঙ্গলে এককালে জানোয়ারগুলোকে পাওয়া যেত। খিদে পেলে তীর ছুঁড়ে তাদের কাঁধে তুলে আনা যেত অনায়াসে। এখন জঙ্গলটাও খাঁ খাঁ করে। তার ওপর আছে ওই ফরেস্ট গার্ড। সবসময় শাসিয়ে যায়, খবরদার, বনের পশুর গায়ে কেউ হাত দেবে না। সব সরকারী মাল।

জঙ্গল সরকারী মাল, জঙ্গলের পশুও সরকারী মাল, তাহলে জঙ্গলের মানুষ কেন সরকারী মাল হিসেবে ঘোষিত হবে না? এই সরল সত্যটি কেন ওদের মাথায় ঢোকে না? তাহলে ওদের দেখভাল করার দায়িত্ব পড়ত ফরেস্ট গার্ডদের ওপর। সারা বছর ওই চাষের জমি আর কতটুকু খাবার যোগান দিতে পারে কম্বলটা সমস্ত শরীরে জড়িয়েও কাঁপুনি যাচ্ছিল না মানে লেপচার। বাতাসের দাঁত গজিয়েছে এর মধ্যেই গাছের পাতাগুলো লাল থেকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। শেষ ফসল কাটা হয়ে গেছে প্রত্যেকের। এখন জমি খাঁ খাঁ করছে। ক'দিন বাদেই সাদা বরফে ঢাকা পড়ে যাবে চৌদিক। মানে তাদের জমিটাকে দেখছিল। এই জমি তাদের পরিবারের পনের জনের পেট ভরায় কোনো রকমে।

আগামী বছরে পনের বছর পূর্ণ হয়ে ষোলয় পা দেবে মানে। বংশের ধারা অনুযায়ী চেহারা হয়নি, বেশ ছিপছিপে এবং লম্বাটে, মুখের চামড়া মোমের মতো মোলায়েম। দাড়ি দূরের কথা, ফিনফিনে লোমও উঁকি মারেনি নাকের তলায়। চোখের পাতায় সুন্দর ভাজ আছে যা কিনা এই গ্রামের আর কারো নেই। মানে একবার পেছন ফিরে তাকাল। গ্রামের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানেই তাদের বাড়ি। আর ওই বাড়িতেই আজ দুপুর থেকে চলছে ব্যাপারটা। জবরদস্ত আলোচনা। থুক শব্দ তুলে থুথু ফেলল সে। তারপর দূরের সান্দাকফু পাহাড়ের দিকে তাকাল। অন্তত দশবার গিয়েছে সে সান্দাকফু। কোনো মজা নেই, শুধু সাদা পাহাড়গুলোকে দেখতে পাওয়া ছাড়া। তা সেই দেখতে আসে কাঁহা কাঁহা থেকে মানুষজন। হেঁটে সান্দাকফুতে পৌঁছে এমন ভাব করে যেন রাজ্য জয় করে এল। এই গ্রামের পাশ দিয়েই উঠতে হয় ওদের। ওসব দৃশ্য দেখা বেশ মজার। এক হাত জিভ বেরিয়ে এসেছে চড়াই ভেঙ্গে ফোঁস ফোঁস করে জিজ্ঞাসা করে, কিতনা দূর?' তা এইরকম একটা দল তাকে নগদ বিশটা টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তিন হপ্তা আগে। চারজনের দলের সঙ্গে কোনো কুলি ছিল না। কাঁধের ব্যাগটা এত ওজনদার হয়েছিল যে সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল মানে। এমন কিছুই না। লোকগুলো কতরকম খাবার খেয়েছিল পথে, ভাগ পেয়েছিল সে। জীবনে কখনও ওইরকম খাবার জিভে পড়েনি তার। তারপর থেকে একটা নেশা হয়ে গেছে মানের। এই ঢালু জায়গাটায় এসে বসে থাকে সে। আবার যদি কোনো বাঙালিবাবুর জিভ বেরিয়ে আসে তাহলে পকেটে কাগজ আসবে। কাগজের বড্ড দাম এই গ্রামে।

মনে হলো, ওপরে যাওয়ার শৌখিন বাবুদের আজ আর পাওয়া যাবে না। ঠাণ্ডা বাড়ছে হুহু করে। আলো কমছে। সে একবার পেছন ফিরে তাকাল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে যা সিদ্ধান্ত নেবার নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধান্ত দুটো, হয় বড়াভাবী বেরিয়ে যাবে, নয় থাকবে। রিম্বিক থেকে বড়াভাবীর বাপ আর ভাইও এসেছে। জোর ব্যাপার।

মানে চোখ বন্ধ করে বড়াভাই-এর মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। দুকুড়ি দশ বছর বয়স ছিল লোকটার। সবসময় হাসতো। পরিবারের কর্তা হিসেবে সব দায় নিজের কাঁধে নিত। দুঃখ পেলেও হাসিটা ছিল মুখে। মানের যখন তিন বছর বয়স তখন বাপ মারা যায়। মা গিয়েছিল জন্ম দিয়েই। বড়াভাই তার বাপ হয়ে গেল। বড়াভাই-এর বাচ্চা নেই, বড়াভাবী তার মা হলো না কিন্তু। তার জন্যে ছিল মরা বাপের মা। তার কাছেই পরিবারের সব বাচ্চাদের থাকতে হতো। সে বুড়িও চোখ বুজেছে বছর তিনেক। বড়াভাই ছিল মাটির মানুষ। লেপচাদের কথা খুব ভাবত সে। লেপচারা সংখ্যায় দিন দিন কমে যাচ্ছে, বেশির ভাগই সাহেবদের ধর্ম নিয়ে নিয়েছে। বড়াভাই-এর এসব ব্যাপার একদম পছন্দ ছিল না। প্রায়ই তাদেব কাছে ওই খারাপ লাগার কথা বলত। বলত, আমাদের পরিবারের যেন কোন ভাঙ্গন না দেখা দেয়। ওই জমি আমাদের পনের জনের রক্তের মতন। ওই জমি আমাদের মা, আমাদের একই সঙ্গে বেঁধে রাখবে।

কিন্তু বড়ভাবী একদম মান্য করত না বড়াভাইকে। সারাদিন ঝগড়াই লেগে থাকত। বুড়ি দাদি গজগজ করত, একটা বাচ্চা পেটে দিতে পারলেই নাকি ঝগড়া থেমে যাবে। কিন্তু মাথার ওপরে যে ভগবান আছে সে নিজের কাজকর্ম ভাল করে বোঝে না। তাছাড়া বড়াভাবীর গায়ে নানান দুর্নামের গন্ধ লাগতে শুরু করেছিল। এই গ্রামের নিয়ম হল কোনো বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে নটঘট করলে কড়া শাস্তি হবে। কিন্তু অভিযোগ তুলতে হবে সেই মেয়ের স্বামীকে। বড়াভাই সব জেনেও চুপ করে বসে থাকত। তারপর হঠাৎ এই সেদিন পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল বড়াভাই-এর। আর দুদিনেই শরীর স্থির। সারা গ্রামের মানুষ বলেছিল, এরকম লোক আর জন্মাবে না।

কিন্তু তাতে কার কি লাভ হল? বড়াভাবী এবার চলে যাবে রিম্বিকে। যাওয়ার সময় পনের ভাগের দুভাগ জমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তার আর বড়াভাই-এর অংশ। ওই জমি চলে গেলে পেটে হাত পড়বে সবার। জমি যদি ছেড়ে দিতে না চায় তো পরিবারের বাকি লোক তা কিনি নিতে পারে বড় ভাবীর কাছ থেকে। কিন্তু সে-টাকা কই? খামোকা নিজের জমির জন্যে টাকা দিতে ধার করবে কেন সবাই? কিন্তু আর একটা আইন আছে লেপচা পরিবারে। জমি বাঁচাবার জন্যে যে আইন করে দিয়েছিল পূর্বপুরুষেরা। সেই আইনে বড়াভাবীকে বেঁধে রাখা যায়। আর তাই নিয়ে আলোচনা সভা বসেছে বাড়ির উঠোনে। মেজভাই এই সভার উদ্যোক্তা।

মানে আর একবার বাড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকারের পাতলা চাদর ঝুলবে এখনই। সে খানিকটা চড়াই ভেঙ্গে পরিত্যক্ত চালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই চালাটা ছিল একটা বুড়ির। তার না ছিল জমিজমা না ছিল সন্তান। লোকের কাছে হাত পেতে বেঁচে থাকত। কিন্তু মানুষটা ছিল অদ্ভুত। প্রত্যেক বাচ্চা ছেলেকে বলত আমি মরলে আমার বাড়িটা তোর। ওই বাড়িতে হাওয়া ঢোকে, বরফ আটকায় না, জল হলে ন্যাতা হয়ে যায়। কে থাকতে যাবে সেখানে। বুড়ি মরার পরও কেউ হাত দেয়নি, চালাটা অমনি আছে। মানের মতলব এল এটাকে সারিয়ে নিয়ে থাকলে কেমন হয়। গাঁয়ের আর পাঁচজন যদি আপত্তি না করে তাহলে বেশ একা একা থাকা যাবে! এই সময় কলরব শোনা গেল। চারটে মেয়ে কলবলিয়ে উঠে আসছে নিচের ঝোরা থেকে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ভরা কলসি। মানের খেলার সাথী ছিল একদিন। বড় হয়ে যাওয়ার পর ওরা এখন ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। মানেকে দেখামাত্র ওদের হাসি বেড়ে গেল। কলসি নামিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। তারপর ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে মুখরা সে হাত নেড়ে

বলে উঠল, 'এ মানে, ছি ছি, আজ তুই ওইরকম নোংরা জামা পরে আছিস, ছি ছি।'

মানে নিজের জামা দেখল, মোটেই নোংরা নয়। তাছাড়া এর অনেকটাই তো কম্বলেব তলায় ঢাকা আছে। সে বলল, 'যা ভাগ! নিজের কাম কর।'

'কাম?' মেয়েগুলো আরও গলিত হলো যেন। তারপর একজন গালে হাত রেখে বলল, 'পেট ভরে মিঠাই খাব কিন্তু। মানেভঞ্জন থেকে আনবি না সুখিয়াপোখরি?'

'মিঠাই? মিঠাই কেন খাওয়াতে যাব তোদের?'

'আই বাপ! আজ বাদে কাল তোর বিয়ে আর মিঠাই খাবো না?' সঙ্গে সঙ্গে হাসির বাজনা বাজল যেন। তারপর ওরা কলসি তুলে নিল আবার মাথায়। এবং এতক্ষণ যে মেয়েটি একদম কথা বলছিল না, সঙ্গিনীদের হাসির সঙ্গে তাল রাখছিল মাত্র, সে বলে উঠল, 'ওই বুড়ি জমিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাক।'

এই কথায় কোনো হাসি বাজল না। ওদেব শরীর দ্রুত গাঁয়ের দিকে ফিবে যাওযা মাত্র বাতাসে হাঁক ভেসে এলো, 'মানে, এ মা-নে, মানে দা-জু-উ-উ।'

হাঁকটা দিচ্ছে ওর মেজ ভাইপো। মাত্র আট বছর বয়স, তাব খুব ন্যাওটা। কিন্তু বুড়ি জমিকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে বলল কেন মেয়েটা? ওই জমি তাদের প্রাণ অন্নদাতা, তাদের বক্ত। ওই জমিকে ভালোবাসবে না তো তোকে জড়াতে যাব আমি? মেয়েটির উদ্দেশে একটি গালাগাল সজোরে উচ্চারণ করতেই তাকে আবিষ্কার করে ফেলল ভাইপো, 'এ দাজু, সবাই তোমাকে খুঁজছে আব তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? চল, চল।'

'খুঁজছে কেন?' মানে খেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে কি দবকার? বড়াভাবী বাপেব বাড়িতে চলে যায় নি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ভাইপো। না, যায় নি। তার মানে পরিবারেব জমি পবিবারেই থাকছে। একটু ভালো লাগা শুরু হতে না হতেই আর একটা দম বন্ধ উত্তেজনা জন্ম নিল বুকে। মেজভাই গাঁয়ের মাতব্ববদের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু সঠিক উত্তবাধিকারীর সন্ধান পাওযা সম্ভব হয়নি। আজকের সভায স্থির ছিল যদি বড়াভাবীব বাড়ি ছেড়ে যাওয়া বন্ধ করা যায় তাহলে সেই সন্ধানটি আজকেই মিটিয়ে ফেলা হবে। মানের সমস্ত রক্ত কম্বলের তলাতেও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

উঠোনে আগুন জ্বলছে। জংলী কাঠের আগুন। পরিবারের এবং গাঁয়ের মাতব্বরবা সেই আগুনের চারপাশে জড গোল হয়ে বসে ধূমপান করছে। চারপাশে ঘরের আড়াল থাকায় এখানে হাওয়া ঢোকে না, ঠাণ্ডাটা কম। মেয়েরা কেউ এই আলোচনায় নেই। তারা বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ঘরে কান পেতেছে। মানে সভায় ঢুকে শরীর থেকে কম্বলটা খুলল। আগুনের তাতে চমৎকার গরম ছড়াচ্ছে। মেজভাই তাকে দেখে বলল, 'এই যে, মানে এসে গিয়েছে। আয় মানে, এখানে বস।' এত আদর করে তাকে কখনও ডাকেনি মেজভাই। মানে একবার সমবেত মাতব্বরদের দিকে তাকাল, তারপর আগুনের সামনে গিয়ে বসল।

মেজভাই বলল, 'বড়া দাজু, আপনি কথা শুরু করুন।'

বড়া দাজু হলেন এই গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। চার কুড়ির ওপর বয়স। মানে চোখ তুলে দেখল বড়াভাবীর বাবা কিংবা ভাই এই আলোচনা সভায় নেই। ওরা কখন চলে গিয়েছে তা সে জানে না। বড়া দাজু বললেন, 'এ বড় খুশীর কথা, খুশীর কথা। ভগবান আমাদের পেট ভরানোর মতো জমি বেশী দেননি। যা দিয়েছেন তাই আমরা যত্ন করে রাখতে চাই। পাহাড়ের নিচের মানুষদের অনেক জমি, সেখানে ভগবান অনেক জল দেন, খুব ফসল ফলে। আমাদের মেহনত করতে হয় অনেক বেশী কিন্তু তাও পেট ভরে না। সেই জমি যদি ভাগ হয়ে যায়, কেউ

তার অংশ নিয়ে চলে যায় তাহলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এসব কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মানে?'

মানে মাথা নাড়ল, সে বুঝতে পারছে।

'ভালো। তোমরা চার ভাই। তোমাদের বড়াভাই-এর মতো মাটির মানুষ আমি দেখিনি। ভালো মানুষদের ভগবান খুব দ্রুত টেনে নিয়ে যান তাঁর কাছে। তোমার মেজভাই অত্যন্ত বিচক্ষণ। খুব ঠাণ্ডামাথার মানুষ। তোমার সেজভাই-এর ওপর ভগবান করুণা করেননি। জন্ম থেকেই সে হাঁটতেও পারে না, কথা বলতে পারে না। বড় কষ্ট তার। আর ছোটভাই হিসেবে তোমার জন্যে আমরা গর্ব করি। কি সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়েছেন ভগবান তোমাকে। সেজভাই-এর সব খামতি তোমার মধ্যে তিনি পূরণ করে দিয়েছেন। এখন কথা হলো, তোমার বড়াভাই মারা যাওয়ার পর তোমার বড়াভাবী কি করবেন! তার বয়স মাত্র দুই কুড়ি চার। এখনও তাকে যৌবন ছেড়ে যায়নি। কোনো সন্তান নেই। সে আবার বিবাহ করতে পারে। তার বাপ আজ এসেছিল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যাওয়ার সময় সে নিয়ে যাবে জমির ওপর তার দাবি, স্বামীর অংশ। বুঝতেই পারছ তোমাদের সংসারের ওপর কি আঘাত নেমে এসেছিল। তোমাদের এমন অর্থ নেই যে অংশটা বড়াভাবীর কাছ থেকে কিনে নেবে। ওরা তো ছাড়বেই না। কিন্তু আমাদের আইনে, ধর্মে যে বিধান আছে তা সবাই মানতে বাধ্য। বিধানটা হলো যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রীকে বিবাহ করবে তার সবচেয়ে বড় অবিবাহিত দেওর। সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে তার পরের ভাই। যদি কোনো ভাই অবিবাহিত না থাকে তাহলে জেঠা বা কাকার ছেলেদের সঙ্গে ওই বিবাহ হতে পারে।'

বড়া দাজু নিঃশ্বাস ফেলল, 'কিন্তু তোমার বড়াভাবী এসব বিধান শুনতে চাইছিল না। তোমার মেজভাই বিবাহিত অতএব সেজভাই-এর এই পবিত্র অধিকার ভোগ করার কথা। সে অবিবাহিত। কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বড়াভাবী। আমাদের বিধানে অবশ্য এ ব্যাপারে সমর্থন করা আছে। এখন একমাত্র তুমিই অবিবাহিত এবং তোমাদের জমি এবং বড়াভাই-এর প্রতি সম্মান দেবার সুযোগ পেয়েছ। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

মানে শূন্য চোখে আগুনের দিকে তাকাল। বড়াভাবীকে বিয়ে করতে হবে তাকে? আজ সকাল থেকে এই ভয়টা তাকে টোকা মেরে যাচ্ছিল। এখন আগুনের সামনে বসে তার শীত আরও বেড়ে গেল। বড়াভাবীর মাথার চুলে পাক ধরেছে। খুব কাছে গেলে সেই দুই একটা বেরিয়ে আসা সাদা চুলকে দেখা যায়। শরীর বেশ ভারী। বুক দুটো পাথরের মতো সান্দাকফু পাহাড়কে কেটে বসিয়ে দেওয়া। সে যখন জন্মেছিল তখন বড়াভাবীর বয়স এক কুড়ি সাত। মানের কোনো দিকে মন ছিল না। সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে চাইল। সে বিয়ে করবে একটা পনের ষোল বছরের মেয়েকে যার এই শীতেও নাকের ডগায় টলটলে ঘাম জমে। একটা বুড়ি মোষের সঙ্গে এরা কেন তাকে জুতে দিচ্ছে? ওই বুড়ি যদ্দিন মারা না যাবে তদ্দিন সে বিয়ে করতে পারবে না। যদি দু'কুড়ি বছর পর বুড়ি মারা যায় তাহলে সে নিজেও বুড়ো হয়ে যাবে। আর তখন কে তাকে বিয়ে করবে। মানের শরীরে কম্পন এলো।

আর এই সময় বড়া দাজু বলল, 'মানে, তুমি রাজী?'

সে কিছু বলার আগেই মেজভাই উঠে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ। ও রাজী। আমি মানেকে জানি। ওর মতো শান্ত ভাল ছেলের দাদা বলে আমি গর্বিত। ও কখনও আদেশ অমান্য করে না। তাছাড়া এই জমিকে ও প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। এবারে ও সারা মরসুম আমার সঙ্গে চাষ করেছে। এর ওপরে আরও একটা কথা আছে। আমাদের বড়াদাদার বিধবা বলেছে যে এই পরিবারের কাউকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে মানেকেই করবে। অন্য কাউকে নয়। মানে তার পছন্দের সম্মান রাখবে। মানে, ভাই আমার, হ্যাঁ কি না?'

মেজদাদার কথাগুলো হঠাৎ বিবশ করে দিল মানেকে। সে সম্মোহিতের মতো ঘাড় নাড়তেই

সমবেত মানুষ হর্ষধ্বনি করে উঠল। মেজভাই হাত জোড় করে বলল, 'তাহলে আর দেরী নয়। দ্বিতীয় বিবাহে তো বেশী নিয়মের দরকার হয় না। আজই কাজ সেরে ফেলা যাক।' বড়া দাজু সম্মতি দিলেন এই প্রস্তাবে।

পাহাড়ে রাত নামে সন্ধের আগেই। আর সেটা ঘন হয় বাতাসের ঝাপটা লাগলেই। নিয়মকানুন চুকে গেলে মানে চোরের মতো বসেছিল। গাঁয়ের বিভিন্ন ঘর থেকে যারা এসেছিল তারা রাতের দোহাই দিয়ে ফিরে যাওয়ার আগে শুনল এর পরের পূর্ণিমায় খাওয়াদাওয়া হবে। শেষ লোক যে গেল তার নাম পৃরণ। জাতবজ্জাত লোকটা। হাতে কাঁচা পয়সা আছে। জমির ধার ধারে না, মানেভঞ্জন দার্জিলিং-এ গিয়ে টুরিস্টবাবুদের গাইড হয়। যাওয়ার আগে সে কানে কানে বলে গেল, তোর বউ-এর খাঁই খুব। শরীরটা যেন চোরাবালি। চট করে ডুবে যাস না যেন। তোকে আমার হিংসে হচ্ছে রে।'

শেষ কথাগুলো যে একদম বুক থেকে বলা তাতে সন্দেহ নেই। তার ডবল বয়সের এই লোকটা এতদিন তাকে পাত্তাই দিত না অথচ আজ এমন ভঙ্গীতে বলে গেল যেন কতকালের বন্ধু। শালার যে বড়াভাবীর ওপর নজর ছিল তা এই গ্রামের কার না জানতে বাকী আছে। মানে ভাবল। বিয়ের পর বউকে সে-রাতের মতো সরিয়ে নেয় না কেউ, কিন্তু বড়াভাবী নিজেই উঠে গেছে তার নিজের ঘরে যেখানে সে বড়াভাইয়ের সঙ্গে শুতো।

মানের নিজের কোনো ঘর নেই। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে বুড়িদাদির ঘরে তার রাত কাটতো। সে ঘরে নিশ্চয়ই এখন রাত কাটানো যাবে না। মানে বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই তাকে দেখতে পেল মেজভাই, 'আই, কোথায় যাচ্ছিস?'

ঘুরতে।'

মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এই ঠাণ্ডায় কেউ বাইরে যায়!' তারপর কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল মেজভাই আজ তুই আমার বুকে শান্তি এনে দিয়েছিস মানে। এই জমির অংশ চলে গেলে আমাদের পরিবারটা বাঁচত না। ওই পৃরণ শালা জমিটা কিনবার জন্যে ঘুরঘুর করছিল। তুই বাঁচিয়েছিস। যাক, এখন এই তুই ওকে বড়াভাবী বলে ভাববি না, নিজের বউ-এর মতো দেখবি। প্রয়োজনে কড়া হবি। যা ঘরে যা।

কোন ঘরে?'

বড়াদাদার ঘরে।

না। ওই ঘরে আমি শোব না। বড়াভাই আমার বাপের মতো।'

মেজভাই হকচকিয়ে গেল, তাহলে? আমাদের আর একটা নতুন ঘর তুলতে যে সময় লাগবে।

লাগুক। তাতে আমার কি? আমি চললাম বুড়ির চালায়।'

বুড়ির চালা? ওখানে তো হাওয়া ঢোকে।

ঢুকুক। আমার কম্বল আছে।' কথাটা বলে হন হন করে হাঁটতে লাগল মানে। তার খুব রাগ হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটাই এমন হুটহাট করে ঘটে গেল যেন সে একটা পুতুল।

ক্রোধ মানুষের অন্য অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করে দেয়। মানে জানলই না ঠাণ্ডার কামড় কতখানি। চালায় ঢোকার পর সে প্রথম ঠাণ্ডা টের পেল। কম্বলের তলায় শরীরটা কনকন করছে। চালাটা নোংরা নয়। বোধহয় বাচ্চারা এখানে খেলা করে বলেই বেশী ধুলো জমেনি। ধুলো জমলে নাকে গন্ধ আসতো। ফাঁক ফোকর দিয়ে বাতাস আসছে। একটা দেওয়াল ঘেঁষে বাঁশের খুটির ওপর বাঁশ পেতে খাট করা। কোনো বিছানাপত্র নেই। দরজা একটা আছে বটে তবে সেটা ঠাণ্ডা বাঁচানোর জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে নয়। একটা আলো সঙ্গে রাখলে ভাল হতো। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় যে উত্তেজনাটা বুকে ছোবল মারছিল এখন সেটার মাজা

ভেঙেছে। অন্ধকারেরও নিজস্ব একটা আলো থাকে। চোখ সয়ে নিয়ে সেই আলোটাকে আবিষ্কার করে। মানে সেই আলোর ফাঁক-ফোঁকরগুলো ভর্তি করতে চাইল। প্রায় মিনিট দশেকের চেষ্টায় বাতাস ঢোকা বন্ধ হল। কিন্তু এটা অত্যন্ত সাময়িক প্রতিরোধ। একটু ঝড় উঠলে বা বরফ পড়লেই যে-কে সে-ই হবে।

বাঁশের মাচাটা কনকন করছে ঠাণ্ডায়। আর একটা কম্বল আনলে হতো। বাবুরা পাহাড়ে বেড়াতে যায় এক ধরনের থলি নিয়ে। শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিলে আর ঠাণ্ডা লাগে না। সেরকম একটা হলে বেশ হতো। কম্বল মুড়ি দিল মানে। এই চালাটা কারও নয়। জমিটায় পাথর বলে কোনো মালিক নেই। এই চালাটাই সারিয়ে নিলে কেমন হয়। বড়া দাজুর কাছে অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য গাঁয়ের লোকেরা পাঁচটা ওজর দেখাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শরীরটায় ঠাণ্ডা কিছুতেই যাচ্ছে না। মানে উঠল। ঘরের কোণায় কয়েকটা মোটা কাঠ দেখেছিল। সেগুলো জড়ো করে কয়েকটা কুঁচো কাঠে দেশলাই ঠুকল সে। যদিও এই কাঠে রস নেই তবু ধরানো খুব মুশকিল। ফুঁ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত আগুনের দেখা পেল। তারপর সেটাকে লালন করতে করতে আরও একটু বাড়ল। দুটো হাত সেঁকে নিল মানে। আর তার পরেই চোখে পড়ল একটা নেড়ি জুল জুল করে তাকে দেখছে মাচার নিচে বসে। এটার বোধ হয় এটাই আস্তানা এখন। তাড়াতে গিয়েও মন পাল্টালো সে। থাক বেচারা। আগুনটা মাঝখানে বাড়ছে। বেশ তাত ছড়াচ্ছে। চালায় একটা লালচে আভা কাঁপছে। আবার কম্বলটাকে টেনে নিল সে। মোটা কাঠের গুঁড়িটায় আগুন ধরছে। সারারাত জ্বলবে নিশ্চয়ই। শরীরে আর তেমন ঠাণ্ডা ভাব নেই। শুধু বাঁশের খাঁজগুলো পিঠে লাগছে। চোখ বন্ধ করল মানে। আজ তার বিয়ে হয়ে গেল। কত সোজা ব্যাপার যেন। অথচ সে বিয়ে করতে পারত একটা ডাঁসা মেয়েকে। ওই আজ যারা কলসী মাথায় করে জল নিয়ে এসেছিল তাদের সবচেয়ে চুপচাপ মেয়েটাকে। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। নিজের শরীরে যে যৌবনের ফুলকি জন্মেছে সেটা কিছুদিন থেকেই বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু—। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতেই দরজায় শব্দ হল। কেউ যেন শব্দটা ইচ্ছে করেই করল। দরজাটা খুলল এবং বন্ধ হল। তারপরেই চাপা গলায় প্রশ্ন, 'এখানে এসে শোওয়া হয়েছে যে?'

মানে সাড়া দিল না। বড়াভাবীর বলার ধরন এই রকম। সে যখন বাড়ন্ত হল, হাত পায়ের গুলি শক্ত হল তখন থেকেই ওইরকম ঠোকরানো কথাবার্তা।

'আজকের রাতে কেউ আলাদা শোয় নাকি?'

'আমি এখানেই শোব।' চোখ না খুলে বলল মানে।

'এখানেই শোব? ই-ই! শোব বললেই হল! শুতে দিচ্ছে কে? এই খোলা মাঠের মধ্যে আমি শুতে পারব না। ওঠ, ঘরে চল। লোকে বলবে কি!' শেষ বাক্যটা এমন নরম গলায় যে চোখ না খুলে পারল না মানে। আর খুলতেই সে চমকে উঠল।

বিয়ের আসরে বড়াভাবীকে সে দেখতে পায়নি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা ছিল তার। ঘোমটার ফাঁকে চিবুকের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সে দিকেও নজর দিতে ইচ্ছে করেনি। কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি সে ওদিকে তাকাতে। কিন্তু একি সাজ সেজেছে বড়াভাবী! গায়ে কম্বল জড়ানো বটে কিন্তু মাথার চুল খুব কায়দা করে বাঁধা, মুখে পাউডার, খোঁপায় ফুল, আর দুহাত ভরতি নানান রঙের চুড়ি। কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে। প্রতিদিনের আটপৌরে গন্ধটা একটুও শরীরে নেই।

বড়াভাবী ততক্ষণে মাচায় এসে বসেছে। বসে বলল,'আমার অবশ্য ওই বাড়িতে থাকতে একদম ইচ্ছে করে না। আমি তো বাপের বাড়িতে চলে যাব ঠিকই করেছিলাম। ওখানে কত ছেলে আমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। শুধু ওখানে কেন, এই গ্রামে নেই নাকি?

যেমন ধব পূবণ। সে বলেছিল তুমি বাপেব বাড়িতে চলে যাও আমি তোমাকে সাদী কবে ফেব এই গ্রামে নিযে আসব। কিন্তু লোকটা ধান্দাবাজ, একসঙ্গে পাঁচটা মেযেব পেছনে ঘোবে। তাবপব যখন তোমাব মেজভাই আমাব হাতে পাযে ধবল, বলল, জমি বাঁচাও, বিধান মানো, আমাব বাপটাও যখন তাই বোঝালো, তখন আমি বললাম মবে গেলেও ওই বদ্দি নুলো দেওবটাকে বিযে কবতে পাবব না। বিযে যদি কবতেই হয তো তোমাকে।' কথাটা বলে হাত বাড়িযে মানেব চিবুক ধবে নেড়ে দিযে মদিব হাসল সে, 'তবতাজা জোযান, যত বযস হবে তত গাছেব মতো মজবুত হবে। এই বকম জোযান না হলে সুখ হবে কি কবে বল। তাই বাজী হযে গেলাম। চল, ওঠ, ঘবে যাই।' দুহাত দুপাশে ছড়িযে হাই তুলল বড়াভাবী।

'আমি এখানেই থাকব।' মিন মিন কবে বলল মানে।

এখানে কেন? এই নোংবা জাযগায আমি থাকতে পাবব না ফোঁস কবে উঠল গলাব স্বব।

'বড়াভাবী, তুমি আমাকে মাপ কবে দাও।'

'ব-ড়া-ভা-বী।' হি হি কবে হেসে উঠল, যেন এব চেযে হাসিব কথা সে জীবনে শোনেনি, 'আমি আজ থেকে তোমাব বউ, তুমি আমাব সম্পত্তি। ওসব বলে খববদাব ডাকবে না।

দুচোখ বড় কবে তাব বক্ত দেখাল যেন সে। 'আমাব নাম নিমা। তাই বলবে।'

মানে ঢোঁক গিলল, 'ওই ঘব বড়াভাই-এব। ওখানে গেলে—।

'ও এই কথা। দূব পাগল। তোমাদেব বড়াভাই একটা মানুষ ছিল নাকি। একটা পিঁপড়েব ক্ষমতাও ওব চেযে বেশী ছিল। যে পুরুষ বউকে সুখ দিতে পাবে না সে আবাব পুরুষ নাকি? তাব জন্যে মন কেমন কবাব কোনো দবকাব নেই। চল।' এবাব হাত ধবে টানল নিমা।

হঠাৎ ভেঙে পড়ল মানে, 'আমাব মন মানছে না।

'কেন? মন মানছে না কেন? আমি কি খাবাপ? গ্রামেব সব ছোঁড়া বুড়ো আমায পেলে বর্তে যায তা জানো?' গর্জে উঠল নিমা নাকি অন্য মতলব। কোনো বাচ্চা মেযেব কাছে ফেঁসে গেছ এব মধ্যে। ডাগব ছাগল পেলে বাক্ষুসিবা তো ছাড়ে না। সত্যি বল?'

'না, আমি ওসবেব মধ্যে নেই।'

'নেই তো? ভাল। শোন, তোমায একটা কথা বলি। ওই যে হাড়জিবজিবে বাচ্চা মেযেবা, ওবা কোনো কম্মেব নয। এক-হাঁটু ঝোবায স্নান কবতে কি মজা লাগে? স্নানেব জন্যে চাই ডুব জল, ইচ্ছে মতন সাঁতাব দেওয়া যায যেখানে। কথাটা মনে থাকবে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মানে, 'তা হোক তবু আজ আমি এখানে থাকি।'

কিছুক্ষণ কথা না বলে নিমা ওব দিকে তাকিযে থাকল। যেন মতলবটা বুঝতে চাইল। আগুনটা এখন জবব জ্বলছে। তাব লাল আভায নিমাব মুখটা বহস্যময দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে দবজাব কাছে গেল। বাইবে মুখ বাড়িযে সঙ্গে সঙ্গে সবিযে নিল, 'আই বাপ, কি ঠাণ্ডা।'

তাবপব দবজাটা বন্ধ কবে দেবাব চেষ্টা কবল কিছু সময, 'এটা তো বন্ধই হয না। না হোক, এত ঠাণ্ডায আব কে আসবে। সবো কম্বলটা পেতে দিই ওই মাচাব ওপবে। একটা নিচে আব একটা গাযে দেব। তুমি ততক্ষণে আগুনটা আবও জোবদাব কবে দাও। তাহলে বাতটা গবমে গবমে কাটবে।' চোখ মটকে হাসল নিমা।

হুকুম পালন কবতে করতে বড়াভাবী, না, নিমাব সুবৃহৎ নিতম্ব দেখে মানে আবও জুবুথবু হযে যেতে লাগল। এই মেযেমানুষটাকে খুড়ি, জেঠি এবং বড়াভাবী ছাড়া অন্যকিছু ভাবা যায না। এখন ওব মতলব এই চালাতেই বাত কাটানো। মানে পকেট থেকে একটা বিড়ি বেব কবে আগুনে ধবিযে নিল। তাবপব চোখ বন্ধ কবে ভাবতে লাগল তাব কি কবা উচিত। ভেবে কূল পাচ্ছিল না সে।

'উঃ কি ঠাণ্ডা রে বাবা। আমাকে সুখটানটা দাও তো।'

মানে চোখ তুলে দেখল একটা সাদা পাইথন তার সামনে নড়ছে। ওটা যে নিটোল হাত যার কোথাও আবরণ নেই, কম্বলের তলায় শোওয়া শরীরটা থেকে বেরিয়ে এসে তাব সামনে প্রত্যাশায় আঙুল নাড়ছে তা বুঝতে সময় লাগল। সে সম্মোহিতের মতো বিড়িটা এগিয়ে দিতেই লাল ফুটকিটা টিপের মতো আর একটা ঠোঁটে আটকে গেল যেন। তারপর ভুল করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বিড়ির শেষ অস্তিত্বটাকে আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে ডাকল, 'এই, এসো।'

মানে এবার আবিষ্কার করল বড়াভাবী কিংবা নিমা যে কি না এখন থেকে তার বউ সমস্ত কাপড়জামা ওপাশে ছেড়ে রেখে কম্বলের তলায় শুয়ে আড় ভাঙছে আর সেই ভঙ্গিমায় কম্বল সরে যাওয়ায় আগুনের রঙ লাগছে খোলা চামড়ায়।

'এসো, এসো না!'

জঙ্গলে আগুনের হাত শক্তিশালী হলে বাতাস তার বন্ধু হয়ে যায়। কোনো ঝরনার সাধ্য নেই সেই আগুন নেবায়। এই নিস্তব্ধ চরাচরে, বাইরে যখন ধাবালো বাতাস বইছে শীতের ছুরি মুখে, কোথাও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই তখন আগুনের বুকে কাঠের জোড়গুলো ফাটছিল নিঃশব্দে।

এত ক্লান্তি এই জীবনে আসেনি মানের। একটা দেশলাই কাঠি যখন একগাদা শুকনো কাঠের ওপর পড়ে তখন আগুনের চেহারাটা বদলে যায়, কাঠিটাই পুড়ে মবে। ভোরের আগে হাতে পায়ে ধরেছিল নিমা। বারংবার ক্ষমা চেয়েছিল, নিষ্কৃতি চেয়েছিল এই রাত্রের জন্য। একটা পনেরো বছরের উদ্দামতার কাছে হার মেনেছিল সে। জ্বলে ওঠার পর মানে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। সেই নিঃশ্বাসে সমুদ্র শুষে নেওয়ার পর তাকে দেওয়ার কিছু ছিল না নিমার। পরাজিতা অথচ ভীষণ সুখী দেখাচ্ছিল তাকে। এখন চালার মাঝখানে জ্বালানো নিবন্ত আগুনে শিশুর মতো তার ঘুমন্ত মুখটা দেখে উঠে দাঁড়াল মানে। ক্লান্তি শরীরে, কিন্তু ঘুম আসছে না।

সমস্ত শরীর কম্বলে মুড়ে দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই ঠাণ্ডা চাবুক কষালো। মানে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার শরীরে একটুও শক্তি নেই। কিছুদিন আগে তার এইরকম অবস্থা হয়েছিল। ওদের জমির পাশে যেখানে পাহাড়ের শুরু সেখানে খানিকটা সমান জায়গা আছে। সারাদিন কোদাল নিয়ে মাটি কুপিয়েছিল সে। অনেকটা জমি কোপানোর পর যে আনন্দ তা টুক করে চলে গেল বিকেলবেলায়। কোদালের ফলা ঠং করে বাজল পাথরে। জমির তলায় পাথরের আস্তরণ। তখন যে ক্লান্তি শরীরে এসেছিল এটা সেইরকম। কোথায় যাচ্ছিল খেয়াল নেই, পাতলা অন্ধকারে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ ও মাটির গন্ধ পেল। তারপর মুখ তুলে দেখল সামনের আকাশে লালের ঘোর লেগেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শরীরে রঙ পাল্টাচ্ছে। আর সে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শূন্য চাষের জমির সামনে।

এই ফসলকাটা হয়ে যাওয়া ক্ষেত আর কোনোকালে বাড়বে না। উবু হয়ে বসে ভাঙ্গা মাটিতে হাত রাখল মানে। বড়াভাবী কিংবা নিমা অথবা তার বউয়ের মা হবার বয়স ফুরতে আর বেশি দেরি নেই। অথচ সে বাপ হতে পারে আরও দুকুড়ি বছর। তদ্দিন যদি বড়াভাবী কিংবা নিমা অথবা তার বউ বেঁচে থাকে তাহলে তার বংশধর আসবে না। না এলে সংসার বাড়বে না। বড়াভাই ছেলেমেয়ে রেখে যায়নি। সেজভাই পঙ্গু, অথর্ব। সে-প্রশ্নই নেই। চারভাই-এর এই জমিটা আর কিছুকাল পরেই মেজভাই-এর দুই ছেলের হয়ে যাবে। চার থেকে দুই-এ'। কাল রাত্রে সোহাগের সময় মেয়েছেলেটা বলেই ফেলল সে আর বাচ্চা চায় না তাতে যৌবন মরে যায়। এ থেকে আর একটা রহস্যের আড়াল সরলো। বড়াভাই-এর কি সবটাই দোষ ছিল?

মানে আরও কয়েক পা হাঁটল। সেই পাহাড় কেটে সমান করা জমিটার সামনে ও এখন। এই

জমি কেউ ছোঁয় না, কারো লোভ নেই। সারাদিন কুপিয়ে যখন সে এর তলায় পাথরের আস্তরণ পেয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল হতাশায় তখন গ্রামের মানুষ হেসেছিল। এই অচাষযোগ্য জমির ওপর কারও লোভ নেই, তাই মমতাও নেই। মানে নিজেদের চাষযোগ্য জমিটার দিকে তাকাল। মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করে সে ওই জমিটাকেই শুধু বাঁচায়নি, জমির অনেক দায়ও বাঁচিয়ে দিল। এখন থেকে ফসল খাবার মুখ কমবে এই পরিবারে।

হাত বাড়িয়ে পাথুরে জমির মাটি স্পর্শ করল সে। শিশিরে কাদা কাদা হয়ে আছে। এই মাটি ফসল ফলাবে না, তাই কারো আকাঙ্ক্ষা নেই, ভালবাসা নেই এর ওপর। কিন্তু এর তলায় যে পাথরের আস্তরণ তার সীমা কতদূর। পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে নিশ্চয়ই চলে যায় নি। ওই পাথরের আস্তবণেব নিচে নিশ্চয়ই নরম মাটি আছে উর্বর হয়ে। একবার যদি পাথরের আস্তরণটা তুলে ফেলা যায়—মানে রোমাঞ্চিত হলো। পাওয়া যায়? একথা কেউ তাকে বলেনি।

দূরে কুয়াশায় ঢাকা বুড়ির চালাটার দিকে তাকিয়ে সে রোমাঞ্চিত হলো। সামান্য মাটি খুঁড়ে সে পাথরটাকে আবিষ্কার করেছিল কিন্তু আরও খুঁড়লে যদি উর্বর মাটি মেলে? কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বলেছে পাথরের শক্তিও সীমিত। তাহলে?

জ্যা-মুক্ত তীরের মতো মানে ছুটল তাদেব বসতবাড়ির দিকে, একটা কোদাল খুঁজতে।

ঠাকুর, থাকবি কতক্ষণ

চেয়ারে বসে দুলছিল দ্বিজদাস। সেই ভোররাত থেকে জোর খাটুনি গেছে আজ, এখন সামনের শো-কেসগুলো ভর্তি, চট করে দেখলে সাজানো বাগান মনে হয়। বাইরে তাকাল ও, বিকেল হতে একটু দেরী আছে। রোদের তেজ মরেছে। দ্বিজদাসের এই দোকান 'সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' বসে ভূটানের পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায়। নড়ে চড়ে বসল দ্বিজদাস। হাতলছাড়া চেয়ার, দ্বিজদাসের হাতল থাকলে বসতে অসুবিধে হয়। বড় চর্বি জমে যাচ্ছে শরীরে। আঙ্গুল দিয়ে বুকের তলায় খাঁজ ধরে না। এই শালা মিষ্টির গন্ধে শরীর ফুলছে। কথাটা ভাবতেই নরেশের দিকে নজর পড়ল ওর। খেঁকুরে চেহারা, অথচ দিনরাত মিষ্টি বানাচ্ছে ও। কার যে কি হয়। খালি গা, এই শীত আসা সময়টাও গায়ে কাপড় রাখতে পারে না। ওপরেব দিকে তাকাল সে। কাঠের সিলিং-এর ওপরে মৃদু পায়ের শব্দ ঘোরাফেরা করছে। সাজগোজ হচ্ছে বোধ হয়। সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিকান ঠাকুর দেখতে যাবেন। দ্বিজদাস যার কাছে হাতি—শ্বেতহস্তী। মুখ ঝামটা দিয়ে দু বছর আগে যে বলত, 'সার্কাসে নাম লেখাইনি তো যে সাদা হাতী বুকে তুলবো।'

সকাল থেকেই ঢাক বাজছে পুজোমণ্ডপে। বোল পালটালো দুপুর থেকে। সীতাদেবী সকন্যা গিয়েছিলেন বরণ করতে। তারপর থেকেই ঢাক বলছে, ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। একঘেয়ে বেজে যাচ্ছে ঢাক দুটো। এই স্বর্গছেঁড়ার পুরনো ঢাকি। এখনও মাইক ঢুকতে দেয়নি শ্যামাকাকারা। আশেপাশের জায়গাগুলোর মধ্যে স্বর্গছেঁড়ার পুজোর নামডাক বেশী। পুজোটা বনেদী।

ঠিক এই সময় দ্বিজদাস দেখতে পেল হারু ঘোষ রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসছে। সোজা হয়ে বসল ও। শালা এদিকে আবার আসে কেন? সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকাকাদের মুখ মনে পড়ে গেল ওর। আজ সকালেই দল বেঁধে এসেছিল ওরা।

হারু ঘোষ এক লাফে দোকানে উঠে এল। তারপর চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দ্বিজদাসের দিকে হাত বাড়াল, 'দেশলাইটা দিন তো।'

পা থেকে মাথা অবধি চিড়বিড় করে উঠল। ভীষণ বাড় বেড়ে গেছে তো আজকাল। কিন্তু ততক্ষণে ওর হাত চলে গেছে ড্রয়ারের মধ্যে। সিগারেট খায় না নিজে, কিন্তু পেছনের দেওয়ালে রাখা গণেশের সামনে দুবেলা ধূপ জ্বালতে হয়। দ্বিজদাসের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেট ধরাল হারু। তারপর সামনের টেবিলে একটা পা ভাঁজ করে বসল, 'আজ সকালে ওরা এসেছিল কেন?'

'কারা?' চমকে উঠল দ্বিজদাস। শালারা খবর পায় কি করে!

'শ্যামাকাকাদের গুষ্টি। আমাকে তাড়াতে বলল?'

'হুঁ।' মাথা নাড়ল দ্বিজদাস, 'গেলেই তো হয়।'

'বাড়িটা কার? ভাড়া দিই কাকে? ওদের বলে দিতে কি হয়েছিল সেখানে গিয়ে কথা বলতে। সে হিম্মত তো কোন শালার নেই।' ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়ল হারু, 'সব শালার কেচ্ছা জানি আমি। ট্যাক্সি ড্রাইভার রতনা সাক্ষী দেবে। এখন এসেছে সতীত্ব মারাতে। যাক, আপনাকে সাফ বলে দিচ্ছি, এসব ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আজ বিকেলে ওদের ঠাণ্ডা করবো আমরা।' যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল ও। তবে এবার ভেতর দিকে। দোকানের পেছন দিকেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। একটু পরেই হাসির আওয়াজ শুনতে পেল দ্বিজদাস। সীতা না রমলা? রমলা সীতার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট। কিন্তু এখন গলার স্বরে পার্থক্য বোঝা যায় না। পেছন থেকে দেখলে দ্বিজদাসই মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলে। ছেলেবেলায় রমলা বলত, আমি মায়ের মেয়ে। এখন বলে সীতা ঘোষের মেয়ে। না, হাসিটা তাঁরই, রমলা না। তিনিই হাসছেন।

শ্যামাকাকারা বলে গেছে হারু ঘোষকে নোটিস দিতে। সামনের পয়লা থেকে ঘর খালি করে দেয় যেন। স্বর্গছেঁড়ার তেরাস্তার মোড়ে এই দোকান, দোকানের উপর কাঠের বাড়ি, পেছনে বাগান আর বাড়ি—দ্বিজদাসের বাবা ধর্মদাস ঘোষ করে গিয়েছিলেন। আর কি জানি কেন, করার আগে বুড়োর কি ভীমরতি হয়েছিল, ভালবেসে বউমাকে সব লিখে দিয়ে গিয়েছেন। তখন অবশ্য বউ মাথায় ঘোমটা দিত, হারু ঘোষ আসেনি স্বর্গছেঁড়ায়।

এই স্বর্গছেঁড়ায় জন্মেছে দ্বিজদাস। জন্ম অবধি জায়গাটাকে ও একটু একটু করে বাড়তে দেখেছে নিজের মত। ধর্মদাসের আমলে সন্ধ্যের পর তেরাস্তার মোড়ে আসত না কেউ। পাশের খুঁটিমারির জঙ্গলে তো এখনও হাতি আসে, খাস টাইগার দেখা যেত তখন। রাস্তাই ছিল না বলতে গেলে। একটু একটু করে সব হল। পাশের জঙ্গলের কাঠ কেটে তক্তা বানাতে মিল বসল, মিলিটারিদের ক্যান্টনমেন্ট বসছে কয়েক ক্রোশ জমি জুড়ে বিনাগুড়িতে। ব্যস, স্বর্গছেঁড়ায় হুড়মুড় করে লোক ঢুকতে লাগল। সেলুন, দর্জির দোকান এমন কি রেডিও সারাই। সন্ধ্যের পর জমজমাট। আর এই তেরাস্তার মোড়ে আগে যেখানে ভবানী মাস্টারের ভাঙ্গা ঘর ছিল সেটাই ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দোকান করতে এল এই হারু ঘোষ। ফটোর দোকান। জলপাইগুড়ির ফটোর দোকানে কাজ শিখে এই প্রথম নিজে ব্যবসা শুরু করেছে। শুনে তো অবাক দ্বিজদাস। স্বর্গছেঁড়ায় ফটো তুলবে কে? সব তো মদিসিয়া কুলিকামিন। জন্ম থেকে চা বাগানে খাটে। আর সীতাদেবী তখন মাথায় ঘোমটা দিতেন জরিপাড়ের। অবশ্যই বাইরে বেরুলে। মা মেয়েতে ছবি তুলিয়ে এলেন প্রথম দিনই। সেই হল কাল। পেছনের বাগানঘরটা খালি পড়ে ছিল। মাসিক দশ টাকা ভাড়া নিয়ে চলে এল হারু ঘোষ। সেদিনটা স্পষ্ট মনে আছে দ্বিজদাসের।

শতবঞ্জিতে বাঁধা বিছানা আব একটা এয়াবব্যাগ হাতে নিযে দোকানে ঢুকেছিল হাক। তাবপব সেগুলো মাটিতে বেখে প্রায় পেন্নাম কবতে এসেছিল হাত বাড়িযে। 'হাঁ হাঁ কবছ কি'—প্রায ছিটকে উঠেছিল দ্বিজদাস। তখনও এত চর্বি জমেনি শবীবে।

বউদিব শবীবে বড মাযা। ওই ছোট দোকানঘবে কি থাকা যায বলুন। উনি তো অবাক। ও আমাব নাম হাক—ঘোষ—ছবি তুলি। তা আপনাদেব বাগানঘবটা বউদি আমায ভাড়া দিযেছেন। উনিই তো এই সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডাবেব মালিক—না?' মুখ কাঁচুমাচু কবে বলেছিল ছোকবা।

বিস্ময়ে চোখ দুটো বসচেপা বসগোল্লা হযে গিযেছিল দ্বিজদাসেব। ভাড়া দিযে দিল ঘব আব তাকে জানালো না। তাও আবাব এই লপেটা ফটোগ্রাফাবকে। ততক্ষণে দশটা টাকা পকেট থেকে বেব কবে হাক এগিযে ধবেছে, 'নিন অ্যাডভান্স।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো দ্বিজদাস, 'যে ভাড়া দিযেছে তাকেই দেবেন।'

'ও।' কিছুক্ষণ তাকিযে থেকে সযত্নে টাকাটা ভাঁজ কবে পকেটে বাখল হাক। তাবপব বোঁচকা দুটো দু-হাতে নিযে ভেতবে চলে গেল সটান। যেন চৌদ্দপুরুষেব বিছানা এটা। হাঁটাটা এত ফুটানিমাবা। হাঁক শুনেছিল দ্বিজদাস 'বউদি এসে গেলাম, এবাব চা খাব একটু।'

হাক ঘোষেব বযস পঁচিশেব নিচেই। পনেব বছব আগে দ্বিজদাস ওবকম চেহাবাব ছিল। ছিমছাম চেহাবাব দ্বিজদাস এট্টুসখানি বউ সীতাকে নিযে ধর্মদাস জলপাইগুড়ি থেকে ছবি তুলিযে বাঁধিযে এনেছিল। বাত্তিব বেলায ঘবে ঢুকে দ্বিজদাস দেখে ছবিব কাচেব ওপব সীতাব কপাল জুড়ে গোল সিঁদুবেব টিপ। নিচে লাল চন্দন দিযে লেখা পতি পবম গুরু। আব তখন বাত হত সন্ধে' থেকেই। ইলেকট্রিক আসেনি তখনও স্বর্গছেঁড়ায। সাতটাব মধ্যে খাওযা-দাওযা চুকিযে দবজায় খিল দিত সীতা —কিছুতে হ্যাবিকেন নেভাবে না। তাবপব সেই বছব না ঘুবতেই বমলা হযে গেল। বমলা এসে সীতাকে সুন্দব কবে তুলছে দিন দিন। মেযেছেলেব অমন সুন্দব উপুড় কবা কড়াই-এব মত পিঠ দেখতে চাইলে সীতাদেবীকে দেখতে হয। ফুড ইনসপেক্টব এসে দোকানেব মালিকেব নাম উচ্চাবণ কবেছিল—সীতাদেবী। আব তাবপব থেকে কখন কেমন কবে সীতাদেবী হযে গেছে—দ্বিজদাস এখন বউকে সীতাদেবী বলে ভাবে। ডাকাডাকি চুকে গেছে অনেক দিন। কথাবার্তা হয কি হয না। তেমন দবকাব পড়লে বমলা আসে। তবে বোজেব হিসেব—মানে এই দোকানেব বিক্রিবাটাব টাকা বাত্তিবে গিযে দিযে আসে ও নিজেই। বাত দশটাব সময দোকান বন্ধ কবে পেছনেব সিঁড়ি দিযে ওপবে ওঠে দ্বিজদাস। বেডিওতে খবব হয তখন। হিসেবেব কাগজ আব টাকাটা গাটাবে বেঁধে টেবিলেব ওপব বেখে বাবান্দা পেবিযে নিজেব ঘবে চলে যায সে। কাঠেব বাঁড়িতে দ্বিজদাসেব পাযেব শব্দ শবীবে ভাবে মচ মচ কবে। বুড়ো বাপ মবাব আগে এ নিযম কবে গিযেছিল—'যা কিছু বিক্রি হবে তা এই বউমাকে দেবে বোজ। লক্ষ্মী বাঁধা থাক লক্ষ্মীব কাছে। খবচা বাখবে নিজেব কাছে—লাভ বউমা জমা করবেন।' সীতাদেবী এসে নাকি সব কিছু সোনা কবে দিযেছে—বুড়োব এবকম ধারণা ছিল। তা একদম—কি যে সব হয।

ঠাকুব থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুব যাবি বিসর্জন—দশ আঙুলে টেবিলে বোল তুলল দ্বিজদাস। পেটে বায়ু হচ্ছে আজকাল। এক জায়গায বসে থাকা, একদম নড়াচড়া নেই। বায়নাব কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাল একবাব। মোট দু হাজার চাবশো ত্রিশ টাকাব বাযনা আছে। মাল নিতে আসবেন বাবুরা ঠাকুব জলে পড়লেই। আব তখন খুচবো বিক্রি অনেক সময বাযনাকে ছাড়িয়ে যায়। নিঃশ্বাস ফেলার জো থাকে না তখন। অবশ্য নরেশ দশ হাতে সব ম্যানেজ কববে নিশ্চিত। তবু শিরদাঁড়া খাড়া রাখতে হবে দ্বিজদাসকে।

রোদের তেজ কমছে। একটু একটু হাওয়া ছাড়ছে উত্তর দিক থেকে। শিশুর দাঁতেব মত হিম

মেশানো তাতে। ভূটানের পাহাড়গুলোর মাথায় মাথায় কুয়াশা চাঙড় বাধছে। নতুন জামাপরা বাচ্চাগুলো হই-চই করছে মোড়ে। কিন্তু ওরা কেউ নেই এখন। ভাল করে দেখল দ্বিজদাস, হারু ঘোষের দল আজ তেমাথায় আড্ডা দিচ্ছে না। হঠাৎ একটা জিপের আওয়াজ কানে এলো। দ্বিজদাস দেখল পাদানিতে একটা ঠ্যাঙ বের করে বসে বড়বাবু আসছেন। সাত মাইল দূরে হৃদয়পুরে থানা। দ্বিজদাস তাড়াতাড়িতে চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা ফতুয়া উল্টো করে পরতে পরতে সামলে নিল। শালা পেটের কাছে বোতামটা কখন ফস হয়ে গেছে। অনেকখানি সাদা চামড়া লোম নিয়ে উদোম হয়ে থাকে।

শব্দ করে জিপটা এসে থামল দোকানের সামনে। কোনরকমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিজদাস হাতজোড় করল, 'আরে কি সৌভাগ্য, বড়বাবু যে, আসুন আসুন।' মাথা থেকে টুপি খুললেন বড়বাবু, তারপর চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললেন খবর টবর কেমন?

একটু চুপসে গেল দ্বিজদাস। কি খবর, কিসের খবর! দোকানের পেছনে ভিয়েনের পাশে রেশন দোকান থেকে ব্ল্যাকে আনা এক মণ চিনি পড়ে আছে যে। কি আশ্চর্য লোকটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান হয়। মাথা দোলাল ও, 'ভাল আপনার আশীর্বাদে—

'কি সব মাস্তান ফাস্তান নাকি এসেছে—তারা কোথায়? পোঁদের চামড়া তুলে ঢাক বানাবো— বলে দেবেন সব ব'টাকে। কে এক হারু ঘোস নাকি আছে - সে কি করে?' বড়বাবু জিপে বসেই চোখ কোচকালেন। পাশে শব্দ হতেই দ্বিজদাস দেখল নরেশ একটা প্লেটে চারটে আট আনা সাইজের কমলাভোগ আর চামচ নিয়ে দাঁড়িয়ে। চুমো খেতে ইচ্ছে হলো শুঁটকোটাকে, শালার বুদ্ধি রাবণের মাথার মত মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। চট করে প্লেটটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বড়বাবুর সামনে ধরল সে, ফটো তোলে

'ফটো তোলে?' নধর মিষ্টিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি বিঁধিয়ে মিষ্টি তুললেন বড়বাবু, রস টপ টপ করে পড়ছে। কাঠির ডগায় মিষ্টিটাকে নাচিয়ে মুখে পুরে চোখ বন্ধ করে বললেন 'লীলা করেন বলুন।' মিষ্টির জন্য কথাগুলো জড়িয়ে গেল। প্লেট ধরে থাকল দ্বিজদাস। বড়বাবু এক এক করে তুলে নিচ্ছিলেন এমন সময় কাণ্ডটা ঘটে গেল হঠাৎ। কোত্থেকে একটা কাক ছোঁ মেরে শেষ মিষ্টিটা তুলে নিয়ে গেল আচমকা। তার ডানার স্পর্শে কিংবা ঘাবড়ে গিয়ে দ্বিজদাসের হাত থেকে প্লেটটা মাটিতে উপুড় হয়ে থাকল ভয়ে ভয়ে কাকটার দিকে তাকাল দ্বিজদাস। ওরই দোকানের সাইনবোর্ডের ওপর বসে মিষ্টি ঠোকরাচ্ছে সেটা। আর তখনই একটা হই হই হাসির শব্দ কানে এল ওর। কে হাসে? কোন দোকান থেকে। কিছুই হয়নি এমন ভান করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বড়বাবু বললেন 'গলাটা কার, চেনেন?' ঘাড় নাড়ল দ্বিজদাস।

'কি চেনেন তাহলে, রাবিশ।' বলে ড্রাইভারকে ইশারা করলেন বড়বাবু। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জিপটা চলে গেল শ্যামাকাকাদের বাড়ির দিকে।

ঠিক বুঝতে পারছিল না দ্বিজদাস, বড়বাবু এলেন কেন? শালা কাকটাও শত্রুতা করবার সময় পেল না! ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। বোল তুললো সে দশ আঙ্গুলে চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করল ও। হবে হবে, আজ শালাদের চামড়া ছাড়াবে আহা হো হো। খুব আনন্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। চোখ খুলতেই দেখল রমলা দাঁড়িয়ে সামনে। থতমত হয়ে গেল ও। মেয়েটা দোকানে কেন? বেশ লম্বা হয়েছে তো। ঠিক মায়ের মত চুলের গোছা। 'কিছু চাই মা?' আদুরে গলায় বলল দ্বিজদাস।

মাথা নাড়ল রমলা, 'না, মা বলল দুটো টাকা বিক্রীর খাতায় জমা করতে? চারটে কমলাভোগ।' বলে গটগট করে ভেতরে চলে গেল। রমলার পেছন দিকে তাকাতে কেমন কান্না পেয়ে গেল দ্বিজদাসের।

টুকটাক গোলমাল চলছিল অনেক দিনই। ধর্মদাস বেঁচে থাকতেই। তখন বদমায়েসী করত অন্যভাবে। রাত্তিরে হিসেব চুকিয়ে ওপরে উঠে ঘরে গিয়ে দেখত সীতাদেবী শুয়ে আছেন। গরমকালে এখানে বেশ গরম পড়ে। ছোট রমলা মায়ের গা ঘেঁষে শুতো। জায়গা কম বলে পাশের খাটে দ্বিজদাস। বড় গরম সীতাদেবীর। রাত্তির বেলা শোবার সময় শুধু তলার জামা পরে শুতো। কুতুকুতু চোখে দেখত নিজের খাটে শুয়ে দ্বিজদাস। হ্যারিকেন জ্বলতো ঘরে। তারপরে এক সময় উঠে গিয়ে চুপি চুপি সীতাদেবীর পাশে বসত। শরীর তখন মোটা হতে আরম্ভ করেছে। উত্তেজনায় হাঁপ ধরত বুকে। ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকতো সীতাদেবী। কোন রকমে হাতটা ছোট জামার উপর রেখেছে কি না রেখেছে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলো রমলা। চিমটি কেটে মেয়েকে তুলে দিত সীতাদেবী। তারপর উঠে বসে কোলে তুলে নিতো মেয়েকে, 'আহা কেঁদো না, কেঁদো না—বাবা এসেছে দ্যাখো, তোমাকে আদর করবে বলে এসেছে—আহা হা—' সুর করে করে বলত তখন। গলাটা থাকত বেশ উঁচুতে—অন্য ঘরে ধর্মদাসের কানে যেতে অসুবিধে হতো না কথাগুলো। চুপচাপ ফিরে আসতো দ্বিজদাস নিজের খাটে। খুব জোরজারি করলে মুখ ঝামটা দিত সীতাদেবী। 'সার্কাসে নাম লেখাইনি তো যে বুকে সাদা হাতি তুলবো।'

ধর্মদাস মারা যেতে প্রায়ই জলপাইগুড়ি যেত সীতাদেবী রমলাকে নিয়ে। বাপের বাড়ি। তখন লোকজনের মুখে শুনতো সে আজ রূপশ্রী কাল আলোছায়া—সীতাদেবী সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। ফিরে আসতো নতুন নতুন সাজগোজ নিয়ে। এই স্বর্গছেঁড়ায় সীতাদেবীর মত স্টাইলিস্ট মেয়ে একটাও নেই। বড়বাবু একবার পুজোর সময় দেখে দ্বিজদাসকে বলেছিলেন, 'আপনার ওয়াইফ তো মশাই বেশ মডার্ন।' আর তখন থেকে খোঁজ নিতে শুরু করেছিল ও আসল ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই কেউ আছে পেছনে, সীতাদেবী যাকে নিয়ে মজেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কারো হদিস পায়নি ও। চরিত্রের এই দিকটা পুজোর বাসনের মত পরিষ্কার সীতাদেবীর। তখন একদিন ধরে বলেছিল ও, 'কেন এমন করছ—আমি কি করেছি তোমার?' মুখ ঝামটা দিয়েছিল সীতাদেবী, 'আঃ প্লে করো না তো। আমার কাছে একদম ভিড়বে না বলে দিচ্ছি। ক্ষ্যামতা না থাকলে পুরুষমানুষ ভেড়ার যুগ্যি—মাথায় কি সিঙ্গাড়ার পুর পোরা যে বোঝ না।' আর তখন মনে মনে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিল দ্বিজদাস। শরীরটা যত মেদে ভরে যাচ্ছে ততই সব কিছুতেই হাঁপ ধরে যায়। সীতাদেবীর কথাটা এতটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে—চর্বি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুতির তলায় আন্ডারওয়ার পরার দরকার হয় না আজকাল। অবশ্য দোকানে ওর সাইজ কিনতেও পাওয়া যায় না ছাই।

শেষ পর্যন্ত এই হারু ঘোষ এল। যেন এর আসার জন্যেই সীতাদেবী এত বছর ধরে এত সব কাণ্ড করেছে। এর আসার জন্যেই যেন ছিপছিপে দ্বিজদাসের এখন হাঁটতে কষ্ট হয়। সব কানে আসে ওর—তেমাথায় দোকান, কান খাড়া রাখলেই সব সেঁদোয়। প্রথম প্রথম ছোকরাগুলো বলত রমলা নাকি হারু ঘোষের লভে পড়েছে। হারুকে ঘর জামাই করবে সীতাদেবী। তারপর শোনা গেল সীতাদেবী স্বয়ং নাকি জলপাইগুড়িতে গিয়ে হারু ঘোষের সঙ্গে একা সিনেমা দেখেছেন। রমলা ছিল না সঙ্গে। দুপুরে রমলা যখন স্কুলে যায়; দোকান বন্ধ করে খেতে আসে হারু ঘোষ। খেয়ে সীতাদেবীর বিছানায় গড়ায়। আর এই সব কথা যত ছড়াতে লাগল ভেতরে ভেতরে তত খুশী হল দ্বিজদাস। এইবার লোকে থুতু দেবে সীতাদেবীর মুখে। আঙুল তুলে দেখাবে, পুজোমণ্ডপের কাজ করতে দেবে না—বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবে না কেউ। এককালে স্বর্গছেঁড়ায় এসব নিয়ম ছিল। আর তখন এই দ্বিজদাসের পা ধরে কাঁদতে হবে সীতাদেবীকে—সে দৃশ্য বুকের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল দ্বিজদাস। কিন্তু এই চেনা স্বর্গছেঁড়াটা কখন যে এমন পাল্টে গেছে এটা জানা ছিল না ওর। বাইরে থেকে হু-হু করে আসা লোকজন

এই কথাগুলো ক'দিন আচার খাওয়ার মত ভোগ করল। বেমালুম চাপা পড়ে গেল সব। কেউ আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সীতাদেবী সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে—হাসে সবাই। এখন কালেভদ্রে হারুর সঙ্গে দেখা হয়। অথচ দুজনেই একই বাড়িতে আছে।

ক'দিন আগে যখন ফটোর দোকানে কেচ্ছাটা হয়ে গেল তখন দ্বিজদাস ভেবেছিল এবার সীতাদেবীর ছানি কাটবে। বানারহাটের দুটো মেয়ে নাকি এসেছিল ছবি তুলতে। দোকানে বসে দ্বিজদাস তাদের দেখেনি। ছবি তোলার সময় হারু ঘোষ ওদের গায়ে হাত দিয়েছে—সেই নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি। কিন্তু সবার চেয়ে হারু ঘোষের গলা ছিল ওপরে। মেয়ে দুটো যত চেঁচায় হারু তার চেয়ে বেশী। শেষ পর্যন্ত পাঁচজন গিয়ে থামিয়ে দিল। এই পাঁচজন আবার হারুরই সাকরেদ। রাত্রে বাড়ি এলে সীতাদেবী হারুকে বলেছিল, 'মেয়ে দুটোর চেহারা দেখেই বোঝা যায় কী চিজ—একটু ভাল রকম শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল।' কুয়োর জলে মুখ ধুতে ধুতে নিজের কানে শুনেছে দ্বিজদাস। শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছে। ইদানীং যত উঠতি মেয়ের দল ভীড় জমায় ফটোর দোকানে। শাড়ি পরব পরব—কি ছবি তোলা চাই। তাজমহলে আঁকা পর্দার সামনে বসিয়ে হারু নাকি ছবি তোলে। চিবুকে হাত দিয়ে মুখ ঠিক করে দেয়। এই শ্যামাকাকার ছেলে নতুন বিয়ে করে বউকে নিয়ে ছবি তুলতে গিয়েছিল ওখানে, তখন নাকি দুবার শাটার টিপেছিল হারু। শ্যামাকাকার সন্দেহ দুবার ছবি তুলেছে ও, প্রথমবার দুজনের, দ্বিতীয়বার ছেলেকে বাদ দিয়ে শুধু বউয়ের—বুঝতে দেয়নি ছেলেকে।

দোকানে ভীড় বাড়ছে। মিষ্টি বিক্রী শুরু হয়ে গেল। ড্যাং ড্যা ড্যা ড্যাং ড্যাং—বানারহাটের ঠাকুর লরিতে চেপে এসে গেল। রাস্তায় নেমে পড়েছে লোকজন। ভাসানের ঘাটে চলছে সবাই। বিরাট মেলা বসে ঘাটে। ভেঁপু বাজিয়ে তেচাকার সাইকেল রিকশাগুলো ছুটোছুটি করছে এখন। স্বর্গছেঁড়ার ঠাকুর এখনও মণ্ডপে—ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। মাথার ওপরে কোন শব্দ নেই কেন? সাজগোছ হয়ে গেলে তো এবার বেরিয়ে পড়ার কথা। কাঠের সিলিং-এর দিকে একবার তাকিয়ে বিক্রীর পয়সা গুনতে লাগল দ্বিজদাস। 'হাত চালাও হে নরেশ, বিসর্জন হলো বলে।' চেঁচিয়ে বলল ও, যেন ওপরের ঘরে তেনার কানে যায়। শ্যামাকাকারা আজ তৈরী। এই স্বর্গছেঁড়া নিজেদের হাতে করে গড়েছেন শ্যামাকাকারা। সেখানে এই সব ভুঁইফোড় ছোকরারা যা ইচ্ছে করবে তা হতে দেওয়া যায় না। সকালে শ্যামাকাকা বলছিলেন রেঞ্জার সাহেবের মেয়ে আর পোস্ট অফিসের একটা ছোকরাকে নিয়ে হারু গিয়েছিল খুঁটিমারীর জঙ্গলে ছবি তুলতে। কয়েকটা মদেসিয়া নাকি দেখেছে। বিশ্রী বিশ্রী ছবি সব সিনেমার মত। আজ রাত্রে হারুর দোকান তল্লাসী করা হবে।

এইটে শোনার পর কেমন ভাল লাগছিল না দ্বিজদাসের। সে জানে ছোকরার ডার্করুমে তার কি ছবি আছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরোয়। রেঞ্জার সাহেব এসেছিলেন শ্যামাকাকার সঙ্গে। পোস্ট অফিসের ছোকরাকেও আজ ছাড়া হবে না। গত বছর ভাসানের দিন ওরা মদ খেয়ে মেলায় কার গায়ে হাত দিয়েছিল। এবার সেই রকম একটা কিছু করলেই হয়। হবে, কারণ কাল হারু এক বেলা সামচি গিয়েছিল এয়ারব্যাগ নিয়ে। সামচিতে মদের কারখানায় সস্তায় সব পাওয়া যায়—এ খবর পেয়ে গেছেন শ্যামাকাকারা।

নড়েচড়ে বসল দ্বিজদাস। ঢাক বাজছে জোরে। স্বর্গছেঁড়ার ঠাকুর মণ্ডপ ছেড়ে বের হল। ডাকের সাজ—মা মা আবার এসো। মনে মনে বলল দ্বিজদাস। তেমাথায় এসে গেল ঠাকুর। মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হয়। সবার সামনে শ্যামাকাকারা হেঁটে যাচ্ছেন। ঠাকুর যাবি বিসর্জন—মা দুর্গা যেন ছলছল চোখ করে দ্বিজদাসকে দেখে গেলেন। পেছন পেছন ঢাকি চলে যেতেই তেমাথা চুপচাপ হয়ে গেল। রাজ্যের লোক গিয়েছে ভাসানের ঘাটে। এখনও ঠাকুর আসছে আশেপাশের বাগানগুলো থেকে।

এই সময় দ্বিজদাস উঠে দাঁড়াল। ওপরে সাড়াশব্দ নেই কেন? যাবে না নাকি? এরকম তো হয় না। বুকের ভিতর ছটফট করছে দ্বিজদাসের। একবার গিয়ে দেখে এলে হয়। আহা ভাসানের ঘাটে যদি ও থাকতে পারতো! কিন্তু এখন এই দোকান ছেড়ে যাবে কি করে ও।

সময় চলে যাচ্ছে। ভূটানের পাহাড়গুলো আকাশের নীলে মিশে গেছে এখন। সন্ধের অন্ধকার আসতে না আসতেই জলঢাকা থেকে আসা বিদ্যুৎ রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এমন সময় সেই পার্থিব শব্দ কানে এল দ্বিজদাসের। ভাসানের ঘাটে হই হই শব্দ। কি হল? উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে ওর। দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল অনেকে ছুটে আসছে। কি হয়েছে হে? চিৎকার করল দ্বিজদাস। মারামারি—জোর মারামারি বেধে গেছে। বড়বাবুর জিপটা এতক্ষণ কোথায় ছিল, সাঁ করে মোড় ঘুরে ঘাটের দিকে চলে গেল। ছেলে বুড়ো বাচ্চা মেয়ে সব পালিয়ে আসছে ঘাট থেকে। ফণী পিওনকে দেখে কাছে ডাকল দ্বিজদাস, 'কি ব্যাপার হে?'

'শ্যামাবাবুর মাথা ফেটেছে। ওদের তিনজন শুয়েছে। একটা লাঠি আছে আপনার কাছে, লাঠি?' উত্তেজনায় কাঁপছিল ফণী পিওন।

আর তারপরেই দেখতে পেল দ্বিজদাস। বিরাট একটা ভিড় এগিয়ে আসছে তেমাথার দিকে। ভিড়টার মধ্যিখানে বড়বাবুর জিপ। সেই সঙ্গে চিৎকার চলছে সমানে। ভীড়ের মুখগুলো দেখল ও—আঃ, সব চেনামুখ। হারু ঘোষ অ্যান্ড পার্টির কেউ নেই এর মধ্যে। ঐ তো রেঞ্জার সাহেব, দাশু রায়, স্কুলের মাস্টারমশাইরা। জিপটা ঠিক তেমাথায় এসে দাঁড়াতেই শ্যামাকাকা নেমে দাঁড়ালেন। দ্বিজদাস দেখল কপালে ছেঁড়া কাপড় ব্যান্ডেজ করে বাঁধা। তার একটা পাশ লাল হয়ে আছে। শ্যামাকাকা পাশের একজনকে কি বলতে সে ছুটে গেল রিকশা স্ট্যান্ডে। সমস্ত তেমাথা গিজ গিজ করছে লোক। এমন কি ওর এই মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতেও লোক দাঁড়িয়ে। বৃত্তের মত ফিরে দাঁড়িয়ে সবাই জিপটাকে লক্ষ্য করছে। একটা রিকশাকে টানতে টানতে হাজির করা হল জিপটার পাশে। সবাই চুপচাপ দেখছে। আশেপাশের চা-বাগানের যারা ভাসানে এসেছিল তারাও আছে ভিড়ের মধ্যে।

হঠাৎ শ্যামাকাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিপে বসা বড়বাবুর দিকে জোড়হাত করলেন 'হুজুর, সমবেত স্বর্গছেঁড়ার মানুষজনের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আবেদন করছি হারামজাদাটাকে একবার রিকশার ওপরে দাঁড়াতে দিন। সবাই একটু দেখুক।' বড়বাবু কি বলতে শ্যামাকাকা নিচু গলায় উত্তর দিলেন। তারপর হঠাৎ দেখা গেল হারু ঘোষ জিপের পেছন থেকে নেমে আসছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে দ্বিজদাস দেখল হারু ঘোষের জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকবো টুকরো হয়ে গেছে। গেঞ্জি ছিঁড়ে পেট দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। একটা চোখ ফুলে ঢেকে গেছে। কিন্তু শালা হাঁটছে দেখো— যেন শাজাহান। কারো দিকে না তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে এসে রিকশায় উঠে দাঁড়াল হারু ঘোষ। আর কি আশ্চর্য, রিকশায় উঠেই পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফস করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ।

আর সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা হই-হই করে উঠল। অথচ কিছুই হয়নি এমন ভাব করে সিগারেট টানতে লাগল হারু। হ্যা হ্যা করে হাসছে অন্য বাগানের লোক। দাশু রায় আর পারলেন না, ছুটে গিয়ে চড় মারলেন হারুর গালে। রিকশায় দাঁড়িয়েছিল বলে মাথাটা সরিয়ে নিল ও সময়মত। চড়টা কাজে লাগল না বলে আর একজন এগিয়ে এল। কে যেন চিৎকার করল, 'বেচন হাজামকে ডেকে ওর মাথা কামিয়ে দিন!' ওদিকে হারুর ওপর অনেকগুলো হাত নামা ওঠা করছে। ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঢাকের বোলের তালে তালে শরীর দুলিয়ে দ্বিজদাস কি মনে হতেই হাত বাড়িয়ে নরেশকে ডাকল। নরেশ আসতেই দ্বিজদাস উত্তেজনায় দুলতে দুলতে ফিস ফিস করে বলল, 'ছুটে যা, গিয়ে শালাকে এক থাপ্পড় মারবি বাঁ চোখে। ওটা

ফোলেনি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল নরেশ। তারপর কাঠের দোতলার দিকে দেখল। 'যা, আমি তোর মনিব আমি বলছি।' বুকে হঠাৎ সাহস এসে গেল দ্বিজদাসের। দাবড়ানি দিয়ে ঠেলে পাঠাল নরেশকে। শুঁটকো শরীর নিয়ে ভিড় ঠেলে ছুটে গেল নরেশ রিকশার দিকে। 'মার মার'—মনে মনে চেঁচাচ্ছিল দ্বিজদাস। হাতের নাগাল পাচ্ছে না নরেশ। শালা যা বেঁটে। দু হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে হারু। সমানে কিল চড় পড়ছে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়ছে না। লাফিয়ে লাফিয়ে বুড়ো নরেশ হাত চালাল, কিন্তু নাগাল পেল না। সারা শরীর দুলিয়ে হা হা করে উঠল দ্বিজদাস। যেন ও নিজেই মারতে পারছে না।

কি করবে বুঝতে না পেরে দৌড়ে চলে এল নরেশ, 'হাত পাচ্ছি না, দাদাবাবু যে বড় লম্বা।'

'দাদাবাবু!' সারা শরীর জ্বলে গেল দ্বিজদাসের। বাঁ পায়ের ছেঁড়া চটিটাকে ছুঁড়ে দিল ও। 'নে, শালাকে জুতোপেটা কর, আমার জুতো দিয়ে, আমি দেখব। না পারলে তোর একদিন কি আমার।' বেচন হাজামকে কে যেন ধরে আনছে। চোঁ চোঁ করে ছুটে গেল নরেশ। রিকশার কাছে ভিড়ের ফাঁক গলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে দ্বিজদাসের—আহা! হাত তুলল জুতো নিয়ে নরেশ, এই পড়ল হারুর গালে, ওকি, ধরে ফেলেছে যে শালা।জুতোসুদ্ধ হাত ধরে ফেলেছে। ততক্ষণে ওকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে বেচন হাজামের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে এল নরেশ, 'ধরে ফেলল, ধরে ফেলল যে হাতটা। আমি কি করব।' কাঁদো কাঁদো হল নরেশ।

'আমার জুতো, জুতো কোথায় ফেললি হারামজাদা, নিয়ে আয়, আমার জুতো নিয়ে আয়—যা।' চিৎকার করে উঠল দ্বিজদাস।

আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে ওপরের জানলা খুলে গেল। নরেশের ঘাড় ধরেছিল দ্বিজদাস, থমকে গেল। জানলা খোলার শব্দ হতেই আচমকা চুপ মেরে গেল তেমাথা। সবাই মুখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে ওপরে। দ্বিজদাসের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল হঠাৎ। আর তারপরেই গলাটা কানে এল, 'নরেশবাবুকে বলো ছেঁড়া জুতো আর আনতে হবে না। তুমি ভেতরে এসো।' শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা। সঙ্গে সঙ্গে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল নরেশ। গিয়ে শো-কেসের পেছনে বসে হাঁপাতে লাগল।

অসহায়ের মত দ্বিজদাস দাঁড়িয়ে রইল খানিক, তারপর পা টেনে টেনে ভেতরে এল। সারা শরীরে কুল কুল করে ঘাম দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর। তেমাথার জনতা এখন হারু ঘোষকে নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিজদাস চোখ তুলে দেখল পেছনের দরজার সিঁড়ি বেয়ে একজোড়া পা, হাঁটু, কোমর বুক শেষে মুখ নেমে এল। সীতাদেবীর মাথায় জরির পাড়। মুখ নিচু করতে করতে দ্বিজদাস শুনতে পেল, 'এই বয়সে এত উত্তেজনা তোমার মানায়—ছিঃ।'

ভাসানের ঘাটে দুর্গাঠাকুর এতক্ষণে জলে নামলেন।

তৃতীয় নয়ন

পলাশপুরে আমার বাবা কাজ করতেন। ও অঞ্চলের সমস্ত চা-বাগানগুলোর মধ্যে পলাশপুরের বেশ নামডাক ছিল তখন। উৎপাদন ও আয়তনের প্রখ্যাতি ছাড়াও পলাশপুর চা-বাগানের বাবুদের কোয়ার্টারেই প্রথম বিজলীবাতি জ্বলেছিল। ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আঙরাভাসা ঝরনার তীব্র স্রোতে হুইল বসিয়ে ডায়নামো চালিয়ে অ্যাটকিন্স সাহেব এই বিজলীবাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা পাঁশুটে আলো জ্বলতো কোয়ার্টারগুলোতে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার আয়ু যেত দপ করে ফুরিয়ে। তবু তারই জন্যে আশেপাশের চা-বাগানগুলো ঈর্ষা করতো পলাশপুরকে। 'আমার বাবা ঐ ফ্যাক্টরী দেখাশোনা করতেন।

জলপাইগুড়িতে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। আমার ঠাকুরদা পলাশপুর থেকে রিটায়ার করে ওখানে বাড়ি করেছিলেন। আমি আর দিদিভাই ঠাকুরদার কাছেই থাকতাম। দিদিভাই সেকেন্ড ক্লাশে পড়তো বলে ঠাকুরদা কালীপুজোর ঠিক একদিন আগে আমাদের পলাশপুরে যাবার অনুমতি দিতেন। ঠাকুরদা ছিলেন বেশ রাশভারী। চাকুরিকালে তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো। তিনি বলতেন ম্যাট্রিক পাশ করলেই দিদিভাইকে বিদায় করে দেবেন। বিরাট তিস্তার চরটা ঠাকুরদার প্রকাণ্ড ছাতির তলায় মাথা গুঁজে হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে আসতাম আমি আর দিদিভাই। পেছনে স্যুটকেস কাঁধে লাটুকাকু। অনেকদিনের পুরনো চাকর বলে ওকে আমরা কাকু বলতাম। তখন তিস্তার জল নেই বললেই হয়। মাঝে একটা পা-পাতা ডোবানো জলের শীর্ণস্রোত বইলেও রুপোলী বালির চরটা ধু ধু করত। মাঝে মাঝে কাশবনের মধ্য দিয়ে পথ হয়ে গেছে হেঁটে হেঁটে। আর বিকট শব্দ করে বার্নিশ-কাছারী যাতায়াত করতো ভাঙাচোরা-ট্যাক্সিগুলো প্যাসেঞ্জার নিয়ে। কেন জানি না, ওগুলোকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হতো না। ঠাকুরদা ওগুলোকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। বলতেন, 'হেঁটে গেলে স্বাস্থ্য ভাল হয়।'

বার্নিশে এসে ঠাকুরদা আমাদের বাসে উঠিয়ে দিতেন। বাসে ওঠার আগে আমরা তাঁকে প্রণাম করতাম। আমাদের মাথায় হাত দিয়ে কি একটা মন্ত্র যেন তিনি পড়তেন। বাস ছাড়ার আগে ঠাকুরদা কন্ডাক্টরকে বারবার করে বলে দিতেন, কোথায় আমাদের নামিয়ে দিতে হবে। বাস ছাড়ার পর স্পষ্ট দেখতাম তাঁর চোখ ছলছল করছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতাম, আমরা যতক্ষণ না চোখের আড়ালে যাচ্ছি ততক্ষণে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে বিমর্ষ মুখে লাটুকাকু।

দুধারের শাল দেওদার আর আম-কাঁঠালের সারির মধ্যে কালো ফিতের মত তেল-তেলে পীচের রাস্তাটা ধরে বাস ছুটতো। দিদিভাই বসে থাকত খুব গম্ভীরভাবে। আর মাঝে মাঝে আমাকে বলত, 'বাইরে হাত রেখো না অন্তু।' গাড়ি থামলেই কন্ডাক্টর চেঁচাতো. ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি-গয়েরকাটা-বীরপাড়া। আর আমি সময় দেখতাম, পলাশপুরে পৌঁছোতে কত দেরি।

সবুজ গালিচার মত ছাঁটা চা-গাছগুলোর মধ্যে নীল রঙের জমিতে সাদা রঙে 'পলাশপুর টি এস্টেট' লেখা সাইনবোর্ডটা চোখে পড়তেই বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠত। চেঁচিয়ে বাসটা থামাতেই চোখে পড়ত মা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। পীচের রাস্তাটা, যেটা আসাম অবধি

গিয়েছে, সেখান থেকে আমাদের কোয়ার্টারের বারান্দা প্রায় আধ ফার্লং। আমি স্যুটকেসটা মাটিতে রেখে, দিদিভাইকে পেছনে ফেলে এক লাফে একটা পাথরের সিঁড়ি টপকে দু'পাশের পাতাবাহার গাছগুলোর মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাকে প্রণাম করতাম। আমার হাঁপানো দেখে মা যখন হেসে বলতেন, 'বোকা ছেলে, দৌড়ে আসতে হয়?'—তখন মায়ের বুকে মুখ ডুবিয়ে থাকতে ভীষণ ভালো লাগত। অথচ দিদিভাই, আসত মৃদু পায়ে। মাকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করত, 'চিঠি পেয়েছিলে আমার?' সেকেন্ড ক্লাসে উঠতে আমার তখন দু'বছর বাকী ছিল।

আর ঠিক তখনই ওদের দেখতে পেতাম। বাস থামতেই ওরা ছুটে এসেছে। আমার বুকের ভেতরে একটা চাপা আনন্দ পাক দিয়ে উঠত। দিদিভাই বলত, 'এখন যেও না অন্তু, হাতমুখ ধোবে চল।' আমি করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকাতাম। তখন মা কি সুন্দর করে হাসতেন। দিদিভাই-এর চাইতে মাকে আমার অনেক বেশী ভাল লাগত। দিদিভাইটা যে কবে ম্যাট্রিক পাশ করবে।

দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে আমরা মাঠের মধ্যিখানে চলে এলাম। সেই ঝাঁকড়া চাঁপা-ফুলের গাছটার তলায় টিনের ছাউনি দিয়ে মণ্ডপ করা হয়ে গেছে। তিনদিকের অর্ধেক টিন দিয়ে ঘিরে দিয়ে গেছে বাগানের কুলি। বুড়ি মাংরার মা তখন মণ্ডপের মাটি গোবর দিয়ে নিকোচ্ছিল। মাঝখানে ইঁট আর লাল মাটিতে ঠাকুর বসাবার বেদীর জায়গা করা হয়েছে। একটা মাটিতে গোবরে মেশা গন্ধ আসছিল নাকে আর সেই সঙ্গে মিষ্টি চাঁপার বাস। ওপরের গাছটার ডালগুলো সোনা হয়ে গেছে ফুলে।

'ঠাকুর গড়া হয়ে গেছে রে?' আমি মণ্ডপটা দেখতে দেখতে বললাম।

'ধুস্!' মন্টু বলল, 'শ্রীচরণদা সবে এখন মাথা লাগাচ্ছে।'

'ডাকিনী যোগিনী?' আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল।

'ওদের মাথা লাগানো হয়ে গেছে। শ্রীচরণদাটা না কি বদমাস, সেই কবে মাটি লেপে গিয়েছিল আর আজ এসেছে মাথা লাগাতে। মাথা ছাড়া ঠাকুরকে দেখতে কী খারাপই না লাগছিল!' হাঁটতে হাঁটতে বিশু বলল।

আমরা এই চা বাগানের ছেলেরা সোনাদের কোয়ার্টারের দিকে হাঁটছিলাম। শ্রীচরণদা ওখানে প্রতিমা গড়ছেন। সোনাদের কোয়ার্টারের সামনে একফালি জমিতে চালাঘর করে শ্রীচরণদা প্রতিমা তৈরি করেন।

'তোরা এতক্ষণ ওখানে ছিলি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ রে। তোকে গাড়ি থেকে নামতে দেখতে তো গেলাম। জানিস, সোনা বলছিল যে, তুই এবার আসবি না।' ঝুনু বললো।

'কেন, আসবো না কেন?' আমি তো অবাক।

'তুই নাকি জলপাইগুড়িতে থেকে খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছিস, এবারে ফার্স্ট হবি। তা আমি বললাম, অন্তু না এসে পারেই না। তাহলে আরতি দেবে কে?' ঝুনুর কথা শুনে আমার এতো আনন্দ হলো যে আমি 'এই, রেডি গেট সেট গো' বলে দৌড়তে লাগলাম।

সবার আগে সোনাদের কোয়ার্টারের তারের বেড়াটার সামনে গিয়ে দেখলাম শ্রীচরণদা একটা চ্যাপ্টা কাঠি দিয়ে ঠাকুরের গলার ভাঁজ করছেন একটা লম্বা টুলে চড়ে। জিব লাগানো হয়ে গেছে। শ্রীচরণদার কুঁজো সাকরেদটা ডাকিনী-যোগিনীর তদারকে ব্যস্ত ছিল। প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজো পেরিয়ে শ্রীচরণদা আমাদের চা-বাগানে আসেন। সোনাদের বাড়ির সামনে এই এক চিলতে উঠোনে টিনের চালাঘর করে পোয়াল দড়ি দিয়ে ঠাকুর বানাতে বসে যান। হোক না

যেদিন ইচ্ছে বাবুদের কালীপুজো কমিটির মিটিং, শ্রীচরণদা জানেন বায়না তাঁর বাঁধা। এক একদিন এক এক বাড়িতে খেয়ে শ্রীচরণদা আপন অধিকার নিজেই জাহির করে বেড়ান বাগানময়। ডিউটিতে যাবার সময় বাবুরা সাইকেল থামিয়ে হয়ত বলে যান, 'শ্রীচরণ, এবার যেন ঠাকুরের চোখ সুন্দর হয়, গতবারটা যা টেড়া করেছিলে!' সঙ্গে সঙ্গে মাটিমাখা হাত দুটো কপালে তুলে জিব কাটেন শ্রীচরণদা, 'তা কখনো হতি পারে না বাবুমশায়, মা আমার পাপ নেবেন গো!' তারপর প্রতিমাকে মাটি মাখিয়ে শ্রীচরণদা সেই যে উধাও হলেন আর দেখাই নেই। সমস্ত চা-বাগানের মানুষকে দারুণ উদ্বিগ্ন করে রেখে শ্রীচরণদা তখন আশেপাশের বাগানগুলোর প্রতিমা গড়ছেন। আর কালীপুজোর আগের দিন সকালে এসে একগাল হেসে হলদে ছোপ ধরা দাঁতগুলো বের করে বলবেন, 'এলাম গো।'

ওদের আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এই চা-বাগানের সব ছোট ছেলেমেয়ে আর মহিলারা টুলে বেঞ্চিতে বসে আছে। সোনাদের কোয়ার্টাবের এই বাবান্দাটা এখন সাময়িকভাবে সবার আকর্ষণ। আতর মাসীমা, সোনার মা, বসেছিলেন একটা বেতের চেয়াবে। আমাকে দেখেই ডাকলেন, 'আয় অন্তু, ভেতরে আয়। তোর ঠাকুরমার বাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।' বলে তারের গেটটা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

'এই যে, ছোট কত্তা এসে গেছেন দেখছি।' আমাকে দেখে শ্রীচরণদা হাত থামালেন। 'বড় কত্তার শরীব ভালো তো?' উত্তরে আমি ঘাড় নাড়লাম। শ্রীচবণদা যেবার প্রথম ঠাকুর গড়ার বায়না পান সেবার ঠাকুবদা ছিলেন পুজো কমিটিব সেক্রেটারী। ঠাকুবের প্রসাদ দিয়ে সেবারই আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল। শ্রীচরণদা ঠাকুবদাকে বলতেন 'বড কত্তা', আব সেই সুবাদে আমি ছোট কত্তা।

আসলে আমার এখন কী যে ভালই না লাগছিল! এই চেনা পরিবেশ, জন্ম ইস্তক যা আমি দেখে আসছি, জলপাইগুড়ি থেকে এখানে এসে এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার বুকের ভেতরে একটা আনন্দ চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছিল, প্রতি বছরের মত সোনাদের কালো বঙেব লম্বা কানওয়ালা কুকুরটা গন্ধরাজ গাছটার তলায় বাঁধা আছে। আমাকে দেখে লেজটা নাড়ছে সেটা। কানে এলো, আতরমাসীমা ঝুনুর মাকে বলছেন, 'ছোঁড়াটা বড হলে ওব বাপেব মত লম্বা হবে।' ঝুনুমাসীমা জবাবে যেন বললেন, 'শহরে থেকে খুব শান্ত হয়ে গেছে, বেশ মিষ্টি মুখটা।'

কথাগুলো শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। বিশু, ঝুনু, মন্টুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হলো, গতবার জলপাইগুড়ি যাবার সময় আমি কৌটোতে করে একমুঠো মাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। জলপাইগুড়ি বাড়ির উঠোনে সেই মাটি রেখে দিয়ে রোজ একবার করে দেখতাম আর চা-বাগানের কথা ভাবতাম। তখন মনে হতো আমি বিশুদের কাছেই আছি। এক রাত্রে এমন বৃষ্টি হলো যে পরদিন সেই মাটিটাকে আলাদা করে চিনতে পারিনি আর।

বারান্দার এক কোণে মোড়ায় একটা খয়েরী ফ্রক পবে দুই বিনুনি ঝুলিয়ে সোনা বসেছিলো হাতের চেটোয় গাল রেখে। ড্যাবডেবে চোখে আমাকে দেখছিল ও। সোনার গাল দুটো যেমন ফর্সা তেমনি ফোলা। আমবা ওকে একা পেলেই 'রসগোল্লা, রসগোল্লা' বলে খ্যাপাতাম। আর ও কিছুক্ষণ রেগে-মেগে শেষে ভ্যাঁ করে গলা ছেড়ে কাঁদত।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে কখন হলো বুঝতে পাবিনি। সোনাদের বারান্দার এধারে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে তারের শিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। চালাঘরের এদিকে কোন লাইন নেই ইলেকট্রিকের। সাইকেলের ঘন্টাগুলো তখন বাজতে শুরু করেছে আধো-অন্ধকার মাঠেব মধ্যে। বাবুরা সব অফিস থেকে ফিরতে শুরু করেছেন। ফ্যাক্টরীটা আমাদের কোয়ার্টারগুলো থেকে

কোয়ার্টার মাইল দূরে। আমরা এতক্ষণ উবু হয়ে বসে ঠাকুরগড়া দেখছিলাম। মাটির কাজ শেষ। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই দূরে মাঠের ওপাশে চা-বাগানের রাস্তায় পাতলা অন্ধকারে সাইকেলের লাইট জ্বেলে বাবাকে আসতে দেখে আমি তারের গেটটা খুলে ছুটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। এতক্ষণে আমার শীত-শীত করছিল। গরম জামা গায়ে না দেখলে বাবা ভীষণ রাগ করবেন মায়ের ওপর।

বাবা বাড়িতে একটা ছোটখাটো পোলট্রি ফার্ম করেছিলেন। ভাল জাতের কয়েকটা লেগহর্ন মুরগি ছাড়াও কাঁঠালগাছের তলায় হাঁসের ঘর ছিল, বাড়ির পেছনে আঙরাভাসা ঝরনার ধারে আমাদের খড়ের ছাউনি দেওয়া গোয়ালঘরে চারটে ভাগলপুরী গরু সারা বছর ধরে দুধ দিত। কালীপুজোর আগের দিন সেই দুধ জমিয়ে এক কড়াই ভর্তি নলেন গুড়ের পায়েস হত। লাল রঙা সেই পায়েস থেকে অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ বেরোত। বাড়ি ফিরেই দেখতাম, মা আর দিদিভাই উঠোনের তুলসীতলায়, বারান্দায়, কাঁঠাল-তলায়, খিড়কি দুয়ারে চৌদ্দপিদিম দিচ্ছেন। চৌদ্দপিদিম দিলে ভূতপেত্নী আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পাবে না। তারপর মা আমাদের বাটি ভর্তি করে পায়েস খাওয়াতেন। শীতকালে সেই প্রথম আমাদের পায়েস খাওয়া।

বাবার গলা পেলেই আমার বুক দুরুদুরু করে উঠত। যা ভয় করতাম ঠিক তাই। বাবা আমাকে ডেকে পাঠাতেন। এই সময়টাই ছিল সব চাইতে মারাত্মক। বাবা আমাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যেতেন। কেন গত পরীক্ষায় আমি অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছি, কেন ঠাকুমাকে বিরক্তি করি, কেন সন্ধের আগে বাড়ি ফিরি না—এই সব। আমি কোন উত্তর দিতে না পেরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আর দিদিভাই তখন বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ যোগান দিত। বাবার সঙ্গে দিদিভাই-এর ব্যবহার ছিল সহজ। মাকেই বরং ও ভয় করতো। আমার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। বাবার প্রশ্নে আমি যখন নাজেহাল হয়ে পড়েছি তখনই রান্নাঘর থেকে মা আমাকে পায়েস খেতে ডাকতেন। ডাকটা আমার কানে অমৃত বর্ষণ করত।

একটু বাদেই সোনাদের কোয়ার্টারের সামনে থেকে কাঁসর বাজার শব্দ আসত। ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মণ্ডপে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ইচ্ছে হত মণ্ডপে ছুটে যেতে। তাই পা টিপে টিপে, বাইরের ঘরে রেডিওর পাশের সোফায় বসে কাগজপঠনরত বাবার সামনে দিয়ে মুখটাকে খুব নিরীহ করে, যেন বাড়ির বারান্দায় একটু দাঁড়াচ্ছি এমনি ভঙ্গী করে যেই হাঁটতাম অমনি বাবার গম্ভীর গলা কানে আসতো, 'ফুলহাতা সোয়েটারটা পরে যাও।পায়ে মোজা নেই কেন? ঠাণ্ডা না লাগালে আর চলছে না?'

একটা লম্বা টুলে হ্যাজাকটা রাখায় মণ্ডপটা ঝলমল করছে। বেদীতে ঠাকুরকে বসানো হয়েছে। কি বিশ্রী লাগছিল হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় ঠাকুরকে দেখতে। ভাঁজে ভাঁজে মাটিতে যেন ফাটল ধরেছে একটু। ঠাকুরের গায়ে কোথাও রঙ নেই একটুও। মন্টু বলল, 'শ্রীচরণদা না এই মাত্র আমাদের বাড়িতে খেতে গেল!'

সোনাকে নিয়ে আতরমাসীমা এইমাত্র এলেন। এ চা-বাগানের একমাত্র পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে মেয়েদের নেতৃত্ব করেন আতরমাসীমা। সোনাকে দেখলাম একটা ভারী শাল গায়ে জড়িয়ে এসেছে। দেখেই বুঝতে পারছিলাম ওটা আতরমাসীমার শাল। মণ্ডপের তিনদিকের অর্ধেক খোলা জায়গাগুলোতে সুনীতদারা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছিল যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া না আসে। আজ সারা রাত জেগে সুনীতদারা মণ্ডপ সাজাবে। বিনুমাস্টার একটা কাগজে ডেকোরেশনের একটা প্ল্যান এঁকে বাদলদাকে বোঝাচ্ছিলেন। বিনুমাস্টার এখানকার জুনিয়র স্কুলে সংস্কৃত পড়ান, সেই সঙ্গে ড্রয়িংও। অনেকগুলো বাঁশ আর লাল নীল কাগজ আনা হয়েছে মণ্ডপে। বড়রা, মানে এই বাগানের ডাক্তারবাবু, টাইপবাবু, পাতিবাবু, মালবাবুরা সব গলাবন্ধ

সোয়েটার অথবা চাদর আর মাথায় বাঁদরটুপি পরে গল্প করছিলেন একধারে। ঝুনুর বাবা, এই বাগানের ডাক্তারবাবু, পুজোর দিন পাঁঠা বলি দিয়ে থাকেন। উনি বললেন, সারা জীবনে এক কোপে উনি একশ' আঠাশটা পাঁঠা বলি দিয়েছেন। এক কোপে না কাটলে নাকি মা অসন্তুষ্ট হন। মন্টুর বাবা বললেন, 'আপনি মশাই রক্ষক আবার ভক্ষকও। ডাক্তারি করে মানুষ বাঁচান আবার এক কোপে পাঁঠাও বলি দেন।' ঝুনুর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। লোকে বলে, উনি নাকি শক্তিসাধনা, না কি বলে, করেন। এর মধ্যে দিদিভাইকে নিয়ে মা একবার ঘুরে গেছেন। মাকে লালপেড়ে শাড়িটা পরায় কি সুন্দর লাগছিল! দিদিভাই এসেছিল মুখে বুজ মেখে সাদা রঙের ওপর কালো নকশা তোলা কার্ডিগান পরে। দিদিভাইকে এখানে ঠিক মানাচ্ছিল না। কেমন শহুরে শহুরে লাগছিল ওকে। ও বোধহয় তাই চেয়েছিল। চা-বাগানের অন্যান্য মেয়েরা দিদিভাইকে কেমন চোখে যেন দেখছিল। সুনীতদারা সব কাজ থামিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়ে, স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম দিদিভাই-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। দিদিভাই এখানে বেশ ডাঁট নিয়ে থাকে। এখানকার কারোর সঙ্গে মিশতে চায় না। মা আমাকে ডেকে বললেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। বাবার নাকি আজ নাইট ডিউটি আছে। একটু বাদে মা আর দিদিভাই টর্চ জ্বেলে বাড়ি চলে গেলেন। সুনীতদা গেল মাদের পৌঁছে দিয়ে আসতে। সুনীতদা কলকাতায় কলেজে পড়ে।

আমরা, মানে আমি, বিশু, মন্টু, খোকন, ঝুনু ঠাকুরের সামনে একটা সতরঞ্চিতে বসেছিলাম। সোনাও আমাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। ও বললো, 'জানিস, এখনো সন্দেশ কেনা হয়নি পুজোর।'

আমি বললাম, 'তোর তো সন্দেশ খাওয়ার জন্যে লাল পড়ছে।'

মুখ ভেঙচে সোনা বললো, 'ইস, তুই তো অঞ্জলি দেবার সময় হাত বাড়িয়ে সন্দেশ চুরি করিস থালা থেকে, আমি দেখেছি।'

'হ্যাঁ তুই দেখেছিস!'

আমার খুব খারাপ লাগলো কথাটা। মন্টু বললো, 'জানিস, আমার না কেমন ম্যাজিক লাগে। এই এখন দেখে যাচ্ছি এইরকম, আর সকালে এসে দেখবো ঠাকুর কেমন সুন্দর প্রতিমা হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'সুনীতদাদের কি মজা, না? ওরা কেমন রাত জেগে ডেকোরেশন করতে করতে ঠাকুরের প্রতিমা হয়ে যাওয়া দ্যাখে।'

ঝুনু বললো, 'ইস, আমরা যে কবে বড় হয়ে ডেকোরেশন করব!'

আমরা আমাদের বড় না হওয়া নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আফসোস করলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এলো। 'এই আজ রাত্রে ঠাকুর রঙ করা দেখবি?'

ঝুনু মুখ বেঁকালো, 'কি করে দেখবো? মা তো আসতেই দেবে না।'

মন্টু বললো, 'বাবা বলবে, সামনে পরীক্ষা—অসুখ করবে।'

বোঝা গেল আমাদের কাউকেই বাড়ি থেকে ছাড়বে না। একমাত্র আসা যায় ভোরে। তখন শিউলি ফুল কুড়োবার নাম করে বেরোনো যায়। অবশ্য এই ব্যাপার যদিও মেয়েদের একচেটিয়া, তবুও। লক্ষ্মীপুজো আর কালীপুজোর দিন অন্ধকার থাকতেই চা-বাগানের সব মেয়েরা, আঠারো থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চা অবধি মাঠের চারটে শিউলি গাছের তলায় বসে যায় সাজি ভরে শিউলি ফুল কুড়োতে। এমন সময় বিশু, কি ভেবে হঠাৎই বললো, ও আজ রাত্রে আসবেই। রাত ঠিক বারোটার সময় ও লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বড় শিউলি গাছটার সামনে দাঁড়াবে। আমি বললাম, আমিও আসবো। আজ রাত্রে ঠাকুর রঙ করা দেখবোই! আমার মাথায় তখন ঘুরছিল, বাবা আজ নাইট ডিউটি দিতে যাবেন।

রাত দশটা নাগাদ বাবা গরম অলেস্টার, মাথায় উলের টুপি, হাঁটু অবধি মোজা পরে ডিউটিতে গেলেন সাইকেলে চড়ে তিন ব্যাটারীর টর্চ জ্বেলে। মা একটা ফ্লাস্কে কফি তৈরি করে দিয়েছেন। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। এখন মা লণ্ঠন জ্বেলে রেখেছেন। একটু আগে ঠিক দশটা বাজতেই ইলেকট্রিক আলোটা নিভে গিয়েছে। বাবা চলে যেতেই আমি খাট থেকে নেমে মায়ের খাটে উঠে এলাম। আমাকে বাবার সঙ্গে শুতে হতো, দিদিভাইকে মায়ের সঙ্গে। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কিরে ভয় লাগছে বুঝি?'

আমি ঘাড় নেড়ে মার পাশে শুয়ে পড়লাম। মা তখন লণ্ঠনের আলোয় গল্পের বই পড়ছিলেন। একটু বাদে আমি ফিসফিস করে বললাম, 'মা, আমি ঠাকুরগড়া দেখতে যাব।'

মা পড়তে পড়তে বললেন, 'ঠাকুর তো হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'না, রঙ করা হয়নি। আমি কখনো রঙ করা দেখিনি। ওরা সবাই আসবে। তুমি একবার বলো, মা?'

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, তোমাকে যেতে দেব না। এখন বাইরে হিম পড়ছে। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। তোমার বাবা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।'

কিন্তু আমি মাকে ছাড়লাম না। বারংবার কাকুতি মিনতি শুরু করলাম। ভাগ্যিস দিদিভাইটা এখন মড়ার মত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। যখন অনেক নাকি কান্না কেঁদে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি আর বিশুর কাছে মনে হচ্ছে ছোট হয়ে গেছি তখন হঠাৎ মা বললেন, 'ঠিক আছে, যাও তুমি। তবে তোমাকে কথা দিয়ে যেতে হবে।'

'কি কথা, বলো?' আমি ঝলমলে মুখে বললাম।

'তোমাকে পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করতে হবে, প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটা করে চিঠি দেবে আর একদম ঠাণ্ডা লাগাবে না।'

এ তো সামান্য, মা যদি আমাকে তিনদিন ভাত না খেতে বলতেন তবে তাতেই আমি রাজী হয়ে যেতাম। মা বললেন, 'এবার তুমি ঘুমোও। বারোটার সময় আমি তোমাকে তুলে দেব।' মড়ার মত ঘুমের ভান করে শুয়েছিলাম। বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতেই লাফিয়ে উঠলাম। মা তখনো বই পড়ছিলেন। আমাকে উঠতে দেখে হেসে বললেন, 'এই ঘুম হচ্ছিল তোমার?'

গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপর চাদর জড়িয়ে, মাফলারে কান ঢেকে ছোট টর্চটা নিয়ে যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম তখন মনে হলো আমার রক্ত বোধহয় জমে যাবে। এক একটা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে আর দাঁতগুলো ঠকঠক করে আওয়াজ তুলছে। বাইরে কি ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ির সামনে বড় শিউলি গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালাম। বিশু এখনো আসেনি। শিউলি গাছের তলার ঘাসগুলো সাদা চাদর পরেছে যেন। শিউলি ফুলগুলো গালিচার মত ছড়িয়ে আছে। মাথার ওপর টুপ টুপ করে শিউলি ঝরছিল। কান পাতলে শিশিরের শব্দ শোনা যায় পাতায় পাতায়। মাঠের ওপাশে বড় রাস্তার ওধারে মাড়োয়ারী দোকানটা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। পীচের রাস্তাটা যেটা আসাম অবধি গিয়েছে, সেখানে মাঝে মাঝে এক একটা লরি প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছিল। গাড়ির হেডলাইটে সমস্ত জায়গাটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে পরক্ষণেই অন্ধকারের গাঢ়ত্ব তুলছিল। দূরে মাঠের মধ্যিখানে মণ্ডপ থেকে একটুখানি আলো বাইরে পড়েছিল আর মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। এদিকের সব ক'টা কোয়ার্টারে অন্ধকার ডালপালা মেলে দিয়েছে। পাতাবাহার গাছগুলোর ওপাশে একটা বিরাট দেওদার গাছ আছে। ঝুনু বলেছিল, ঐ গাছে নাকি একটা সাহেব-ভূত বিরাট পা ঝুলিয়ে বসে বসে চুরুট খায়। মাঠের মধ্যে ঝাঁক ঝাঁক জ্বলন্ত জোনাকি দেখে আমার সেই চুরুটের কথা যেই মনে পড়লো অমনি গা-টা ছমছম করে উঠল। দূরে সাঁওতাল লাইনে মাদল বাজছে। ধেউদির

গান তৈরী হচ্ছে লাইনে লাইনে। ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের গান খুব অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

অন্ধকার একটু চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ দেখলাম কে যেন মাঠের পাশ ধরে দৌড়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই টর্চটা জ্বালাতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে টর্চটা নিবিয়ে ফেলে একবার ভাবলাম, তারপরে টর্চ জ্বেলে কাছে যেতেই সোনা এগিয়ে এল।

'তুই?' আমি ধাক্কাটা সামলাচ্ছিলাম, 'কি করে এলি?'

'কেন? মা-রা তো পাশের ঘরে শোয়। দিদা ঘুমাতেই আমি পা টিপে টিপে খিল খুলে চলে এলাম।' সোনা নির্বিকার।

'আতরমাসীমা ভীষণ রাগ করবেন!' আমি ওকে বোঝাতে চাইছিলাম যেন।

'ইস্, জানতেই পারবে না। আমাব দেখতে ইচ্ছে করে না বুঝি? তোরা একাই মজা করে দেখবি, না?' সোনার গলায় অভিযোগ।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সোনার গায়ে গরম কাপড়ের নামমাত্র নেই। ফুলহাতা একটা গরমের ফ্রক পরেছে ও। তাড়াতাড়িতে হয়তো পুরে আসতে পারেনি কিছু।

আমি বললাম, 'সোনা, তোর ঠাণ্ডা লাগছে?'

সোনা ঘাড় নেড়ে না করলেও বুঝতে পারছি ঠাণ্ডা ওর লাগছেই।

'বিশুটা এখনো এলো না।' আমি বললাম।

'দাঁড়া, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।'

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে যখন বিশু এলো না তখন আমরা দুজনে আস্তে আস্তে মাঠের মধ্যে দিয়ে শিশিরে পা ডুবিয়ে এগোতে লাগলাম মণ্ডপের দিকে। একটু এগোতেই গ্রামোফোনের সুর শুনতে পেলাম। রেকর্ড বাজছে, 'আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে।' এই রাত্রে, নির্জন রাত্রে গানের সুর অতিরিক্ত আওয়াজ আনছিল। রাত জাগতে হলে নাকি গ্রামোফোন বাজানো দরকার। কিন্তু কোন বাড়ি থেকে রেকর্ড দিতে চায় না বলেই এই রেকর্ডটা সুনীতদারা আমাদের বাড়ি থেকে প্রতি বছর নিয়ে যায়। মনে হচ্ছিল এই নিশুতি চতুর্দশীর রাত্রে যখন চা-বাগানের ছোট্ট পৃথিবীটা অথৈ ঘুমে সুপ্ত, যখন জোনাকিগুলো বিরাট মাঠের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত, তখন মণ্ডপের ক্ষীণ আলো এত দূরে অন্ধকারে দাঁড়ানো আমার চোখে গহন সমুদ্রের আলোকস্তম্ভের কাজ করছিল। দূরে সাঁওতাল লাইনে মাদল বাজছে আর সম্মিলিত সুরে গানের ধুয়ো অন্ধকারকে চিরে এই মাঠের বুকে এসে গানের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আমাদের কানে কনসার্টের মতন বাজছিল। পায়ে পায়ে আমরা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'কে রে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?' বিনুমাস্টার হাঁক দিলেন।

গলাটা শুনেই পাতাবাহার গাছগুলোর পাশে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। এখন আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি ভয় সঞ্চারিত হল। ওরা যদি আমাদের ওপর খুব রেগে যায়। সোনা সিঁটিয়ে আমার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে আমাদের ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। এক ঝলক বাতাস মণ্ডপের ওপরের রাশ রাশ চাঁপাফুলের গন্ধ আমাদের মাখিয়ে গেল।

'আরে সাড়া দিচ্ছে না কেন? সুনীত, দ্যাখ তো কে দাঁড়িয়ে আছে?' বিনুমাস্টার মণ্ডপের ভেতরে বাখারি চাঁচতে চাঁচতে বললেন।

সুনীতদারা সারা মণ্ডপে বাঁশের ফ্রেম করে কাগজে আঠা মাখাচ্ছিল। বিনুমাস্টারের কথায়, 'ভূতটুত হয় তো বাবা' বলে মণ্ডপের সামনে এসে চীৎকার করে ডাকলো, 'কে বাবা, সাড়া দাও, নইলে বাঁশ ছুঁড়ে মারবো।'

কথাটা শোনামাত্রই আমার মুখ দিয়ে বের হল, 'আমি।'

'আমিটা কে?'

'আমি, আমি অন্তু।'

ততক্ষণে সুনীতদা বাদলদা আমাদের কাছে এসে পড়েছে। 'আরে? তোরা? তোরা কি করছিস এখানে? দ্যাখো বিনুদা।—'

আমাদের টানতে টানতে সুনীতদা মণ্ডপের ভেতরে নিয়ে এলো। বিনুমাস্টার আমাদের দেখে চোখ কপালে তুললেন, 'কি কাণ্ড! তোরা এখানে এত রাত্রে। বদমায়েস ছেলেরা সব। যাও যাও।'

আর ততক্ষণে আমাদের নিয়ে মণ্ডপের দাদাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ছোঁড়াটার জলপাইগুড়ি গিয়ে বড্ড বোলচাল বেড়ে গিয়েছে। এমন অবাধ্য সব! আজকালকার ছেলেগুলো কাউকে মানতেই চায় না। আচ্ছা, বাড়ি থেকেই বা ছাড়ল কি করতে। বাবা-মার দায়িত্বজ্ঞান কিরকম। নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনুমাস্টার বললেন, 'যাও সুনীত, ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। তুমি সঙ্গে যাও।'

সোনা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কথাটা শুনেই ডান হাতটা দিয়ে চোখ বগড়ে ভ্যাঁ করে কান্না শুরু করল।

সোনার কান্না শুনে শ্রীচরণদা পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন, 'আহা, কাঁদ কেনে মা ঠাকুরুন। আহা, তোমরা আবার বর্কতিছ কেনে? আসিই যখন পড়িছে তবে থাকুক কেনে হেথায়।'

সোনার কান্না আরও বেড়ে গেল। বিনুমাস্টার আমাদের কিছুক্ষণ দেখে শেষে বললেন, 'আচ্ছা থাক, আর কাঁদতে হবে না। যাও, ঐ কোণায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকো। একটিবার গণ্ডগোল করলেই বাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

আমরা সুড়সুড় করে টিনের বেড়ার পাশে সতরঞ্জির ওপর গিয়ে বসলাম। ওরা আবার কাজে আড্ডায় মশগুল হয়ে গেল। ঠাকুরের গায়ে সাদা রঙ বোলানো হয়ে গেছে। কি বিশ্রীই না লাগছিল ঠাকুরকে দেখতে। বিনুমাস্টারের বাঁশ কাটার শব্দ আসছিল মণ্ডপের সামনে থেকে। একটু বাদে আমার কানের কাছে সোনা ফিসফিসিয়ে বলল, 'কেমন বোকা বানিয়ে দিলাম বল তো। না কাঁদলে ঠিক বাড়ি পাঠিয়ে দিত।'

ঠাকুরের পেছনের গ্রামোফোনে তখন বাজছিল, 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ।'

শ্রীচরণদা নীল রঙ গুলছিলেন একটা বড় বালতিতে। রঙের গন্ধ আসছিল নাকে। শ্রীচরণদার কুঁজো সাকরেদটা ঠাকুরের পায়ের নীচে শোয়া শিবের গায়ে সাদা রঙ বোলাচ্ছিল। ডাকিনীযোগিনীকে দুটো সাদা পেত্নীর মত লাগছিল দেখতে। ডেকোরেশন চলছে। একটা মন্দির হবে। ঠাকুরের বেদীটা মন্দিরের ঠিক মাঝখানে থাকে। সুনীতদা কাগজ কেটে দিচ্ছিল, বাদলদারা আঠা মাখাচ্ছিল এখন। হঠাৎ সুনীতদা উঠে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। হাঁটু গেড়ে আমাদের সামনে বসে আমার কানটা মলে দিয়ে বলল, 'আগে থেকে প্ল্যান করে আসা হয়েছে, না? খুব পেকেছ তুমি?' তারপর সোনার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তারপর সোনামণি, মাকে বলে দেবে না তো সুনীতদা সিগারেট খায়।' সোনা মাথা নেড়ে না বললো। সুনীতদা ডান হাতে সোনার ফোলা ফোলা গাল দুটো টিপে বললো 'লক্ষ্মী মেয়ে।'

সুনীতদা চলে যেতেই সোনা মুখ লাল করে বললো, 'অ-সো-ভ্যো।' আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল সুনীতদার ওপরে।

মাথার ওপরে টিনের চালে চাঁপাগাছের পাতা চুঁইয়ে শিশির পড়ছিল টপ টপ করে। সোনা আমার কাছে বসেছিল। 'তোর শীত লাগছে সোনা?' জিজ্ঞাসা করতেই ও ঘাড় নাড়লো 'হ্যাঁ।' 'আমার চাদরটা নে তুই' বলে চাদরটা খুলে এক প্রান্ত ওর পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে আর-একটা প্রান্ত আমার গায়ে জড়িয়ে দুটো মুখ সামনে এনে পায়ের তলায় গুঁজে দিলাম। একটু বাদেই চাদরের মধ্যে বেশ একটা ওম্ হলো। সোনার কাঁধের সঙ্গে আমার কাঁধ জুড়ে গিয়ে

ঠাণ্ডা আর লাগছিল না।

বাদলদা বলছিল, 'শালা আমাদের বাগানে একটাই তো পুজো, তবু ডেকোরেশনের বেলায় কী কিপ্টেমি। মাল না ছাড়লে ডেকোরেশন হয়।'

বিনুমাস্টার বললেন, 'সবাই পুজোর পর গাণ্ডেপিণ্ডে গিলতে চায় তো কি হবে।' ঠাকুরের গায়ে নীল রঙ বোলানো হলো। কুঁজো সাকরেদটা ডাকিনীযোগিনীকে নীল রঙ না বুলিয়ে মেটে রঙ করতে আরম্ভ করল। নীল রঙের পোঁচটা পড়ায় ঠাকুরকে কেমন যেন লাগছিল। একটা বড় তুলি রঙের বালতিতে ডুবিয়ে শ্রীচরণদা বড় বড় পোঁচ টানছিলেন ঠাকুরের পায়ে। মাথাটা এখনো নেড়া বলে মুখটা বিশ্রী লাগছিল। সোনা আর কাঁপছিল না। ওর আঙুল আমি ধরেছিলাম। কি ঠাণ্ডা ওর হাতটা।

'ঠাকুরের গায়ের রঙ কি বল তো?' সোনা জিজ্ঞেস করল।

'কেন, ঠাকুরের গায়ের রঙ তো নীল।' আমি বললাম।

'নীল রঙ হয়ে গেছে। মা বলতো কালোও হয়। তাই তো নাম কালী।'

'এখনো জামা পরায়নি।'

'ধ্যেৎ, ঠাকুর জামা পরে নাকি। মা বলেছে যুদ্ধ করে মানুষের হাত কেটে ঠাকুর জামা করে পরেছে।'

'শিবের বাঘছালটা কিন্তু এখনো হয়নি। ভুলে যাবে না তো।'

এখন ঠাকুরের হাতের চেটোতে, জিবে, পায়ে লাল রঙ বোলালেন শ্রীচরণদা। সুনীতদারা লাল নীল কাগজে সমস্ত মণ্ডপ জুড়ে মন্দির করে ফেলেছে। এখন আর গ্রামোফোন বাজছে না। বিনুমাস্টার রঙ তুলি সাজাচ্ছিলো। শ্রীচরণদা যখন ঠাকুরের বুকের কাছে খয়েরী রঙ বোলাচ্ছেন তখন পেছন থেকে কে যেন জিভে করে চকচক শব্দ করল। শ্রীচরণদা একবার তুলিটা থামিয়ে আবার রঙ করতে লাগলেন। সুনীতদা ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে এক হাত কোমরে রেখে সিগারেট টানতে টানতে বললো, 'শালা, শ্রীচরণদার এলেম আছে মাইরী। তুলির টানে টানে মায়ের সুরৎ খুলে যাচ্ছে।'

সামনে থেকে বিনুমাস্টার ধমকে উঠলো, এই সুনতে, মাকে শালা বলছিস কোন আক্কেলে রে?'

সুনীতদা বলল, 'এক্সকিউজ মি বিনুদা। তবে মা তো এখনো কমপ্লিট হয়নি। না আঁকা হলে তো আবার লাইফ আসে না।'

সোনা আমার হাঁটুর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠাকুর রঙ করা দেখছিল। আমার এখন ঠাকুরকে দেখতে খুব খারাপ লাগছিল। শ্রীচরণদা যত রঙ বোলাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে ঠাকুর কেমন ন্যাংটা ন্যাংটা। সাধনদা উঠে এসে সুনীতদার পাশে দাঁড়াল, 'শালা, কি করেছে মাইরী।'

সুনীতদা বলল, 'চেহারা দেখেছিস।'

বাদল কী যেন দেখে বলল, 'এ্যাবসার্ড।'

ওরা খুব চাপা গলায় কথা বলছিল যাতে বিনুমাস্টার না শুনতে পায়।

বাদলটা এক সময় বলল, 'আমাদের বাগানটা মাইরী একদম সাহারা। একটাও নেই যার দিকে তাকানো যায়।'

সাধনদা বললো, 'কেন, অন্তুর দিদি।'

সঙ্গে সঙ্গে সুনীতদা ধমকে উঠলো, 'এ্যাই।' তারপর নীচু গলায় বললো 'সোনাটা মাইরী ফিউচারে—' বলে চোখ টিপল।

'এই, আস্তে।' বাদলদা কথাটা বলে আমাদের দিকে তাকাল।

আমার খুব অবাক লাগছিল ওদের কথা শুনে। কেমন রহস্যজনক লাগছিল আমার। আমি

বুঝতে পারছিলাম না। সোনার দিকে তাকালাম। ওর নাক দিয়ে জল গড়াতেই ও টেনে নিল সেটা। সাধনদা একবার বলেছিল 'কি সেপ্!' মানে কি আদল?—আদল মানে, আকৃতি? ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সাধনদা কথাগুলো বলেছিল। তারপর সোনার দিকে। সোনাকে ঠাকুরের মত কল্পনা করে আমার খুব হাসি পেল।

সোনা বলল, 'এই হাসছিস যে!'

'এমনি', আমি বললাম।

'সুনীতদাটা না খুব অসব্যো।'

'হ্যাঁ।'

'তোর দিদির সঙ্গে ভাব আছে। চিঠি দেয়।'

'যাঃ।'

'হ্যাঁরে! আমি জানি।' সোনা কথাটা বলতেই আমার সুনীতদার ওপরে ভীষণ রাগ হতে লাগল।

'এই সোনা, তুই না বড় হলে—'

'এ্যাই!' সোনা আমাকে চিমটি কাটলো রেগে।

শ্রীচরণদা ঠাকুরের মাথায় চুল লাগালেন আঠা দিয়ে। পেছনে একটা স্টোভ জ্বলছিল বলে সোঁসোঁ আওয়াজ আসছে। বোধ হয় চা হচ্ছে। এখন বোধ হয় শেষ রাত। অন্ধকারে জোনাকি জ্বলা থেমেছে। দূরের সাঁওতাল লাইনের মাদলের শব্দ থেমে গেছে। চারপাশ কি আশ্চর্য থমথমে। শুধু মাথার ওপরে টিনের চালে শিশির পড়ছিল।

ডাকিনীযোগিনী, সাপ, শিব, শেয়াল সব রঙ করা হয়ে গেছে। সাপটাকে কি চকচকে লাগছিল। যেন জীবন্ত। বিনুমাস্টার মন্দিরের দেওয়ালে ছবি আঁকছেন, একটা মেয়ে পুজোর থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

সুনীতদারা সবাই ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরকে দেখতে দেখতে আমার ভেতরটা কেমন করছিল। এখনো চোখ আঁকা হয়নি বলে অন্ধ লাগছিল ঠাকুরকে। সোনার হাতটা ধরে বললাম, 'তোর হাতটা কি নরম।'

সোন বললো, 'তোরটাও। ছেলেদের হাত এত নরম হয় না।'

'ইস। ব্যাডমিন্টন খেলে খেলে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে বলে!'

'এখন ঠাকুরের চোখ আঁকবে।' সোনা কথাটা বলে ড্যাবড্যাবে চোখে ঠাকুরের দিকে তাকাল।

সুনীতদা একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে হ্যাজাকটা তুলে ধরলো। বিনুমাস্টাব বলল, 'এখন কেউ ডিসটার্ব করিস না যেন, চোখ আঁকায় খুব মনোযোগ দরকার হয়।'

আলোটা ওপরে তোলায় ঠাকুরের সারা গায়ে আলো ঝলমল করছিল।মুখটা খুব ভয়ঙ্কর লাগছিল না আমার। বুকের কাছটায় চোখ যেতেই আমার মনে পড়ল জিভের সেই চকচক শব্দটা। আমার কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল। সোনা বড় হলে কি কালীমার মত হবে। সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কালীর মুখ মেলাতে চাইলাম। 'এই সোনা, জিভ বার কর তো।' সোনা অবাক হয়ে জিভ বার করতেই আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। না, সোনাকে ওরকম দেখাচ্ছে না।

শ্রীচরণদা খুব ধরে ধরে দুটো চোখ আঁকলেন। সুন্দর চোখ দুটো। এবার কপালের চোখ। বিনুমাস্টার বলল, 'এবার কেউ আওয়াজ করবে না, তৃতীয় নয়ন আঁকা হবে। জ্ঞান চক্ষু। ঠাকুরে প্রাণ আসবে। সাধন, শঙ্খ বাজাবে আঁকা হলেই।' ওরা সবাই শঙ্খ, কাঁসর নিয়ে তৈরি হলো। সুনীতদা হ্যাজাকটাকে একটু ওপরে তুলে নিলো।

শ্রীচরণদার আড়ালে ঠাকুরের মুখটা ঢাকা পড়েছিল। সোনা আমার গায়ের ওপর ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করছিল। আমি এখান থেকে শুধু ঠাকুরের বুক আর উরু দেখতে পাচ্ছিলাম। আলো পড়ে চকচক করছে। দেখতে দেখতে আমার মাথার মধ্যে কেমন করতে লাগল। কান দুটো গরম হয়ে উঠল। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, শুধু আমার ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছিল। আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আর কখনো, যখন ঠাকুরকে রঙ করা হয়নি বা সকালে যখন প্রতিমা-হয়ে-যাওয়া ঠাকুরকে দেখেছি তখনও এসব কোনদিন মনে হয়নি। আমি মা কালীর বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সম্মোহিতের মত, সোনা মা কালী হয়ে গেছে কি না, দেখবার জন্য ডান হাতটা সোনার বুকেব কাছে নিয়ে গেলাম। সোনার প্রায় সমতল বুকের ওপর যখন আমার হাত তখন আচম্বিতে সোনা শব্দ করে উঠে কেঁদে ফেলল। আর তৎক্ষণাৎ শাঁখ আর কাঁসর ঘণ্টার শব্দ উঠল। কপালের চোখ আঁকা হয়ে গেছে তখন।

সোনার চীৎকারে ওরা সব ছুটে এল, 'আরে কাঁদছিস কেন, এই, এই সোনা, ভয় পেয়েছিস!' সোনা কাঁদতে কাঁদতে বাঁ হাত দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিল। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগলো হঠাৎ। একবার সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাতেই দেখলাম মা কালী খাঁড়া হাতে লাল জিভ বাব করে যেন তেড়ে আসছে। আমার মেরুদণ্ডে একটা শীতলতা জীবনে প্রথমবার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে আমি হঠাৎ সেই ভোর হয়ে আসা অন্ধকারে, আলোকিত পুজো মণ্ডপ ছেড়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর কালী-মূর্তির চোখ এড়াতে প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলাম। সমস্ত মাঠ জুড়ে থাকা ফিকে অন্ধকার যেন হঠাৎ জমাট হয়ে মা-কালীর জিভের মত আমার চোখের সামনে ঝুলছিল। কোথায় আমি পালাবো!

তিন সিংহ ধান খায়

প্রথম দর্শনে লোকটিকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হইলেও মদনমোহন তাহার বাম হস্তের ঘড়িটিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবণা পরিবর্তন করিল। সন্ন্যাসীরা ঘড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। যদিও লোকটির পরনে রক্তাম্বর আলখাল্লা বাবরি চুল এবং শ্মশ্রুল মুখ কিন্তু মদনমোহনকে লক্ষ্য করিয়া প্রসন্ন হাসি তাহার অধরে খেলিয়া গেল।

এখন ঊষাকাল। সূর্যদেব ভাল করিয়া উদিত হন নাই। আধুলি গ্রামের মানুষজনের আলস্য ভাঙ্গে নাই। এইসময চাষবাস হয় না। বৃষ্টি না হওয়ায় পথ শুষ্ক। মদনমোহন এই অপবিচিত মূর্তিটিকে দূর হইতে দেখিয়া অবাক হইতেছিল। কারণ শহর অন্তত আড়াইক্রোশ দূরে। এই লোকটি কি উদ্দেশ্যে কাঁধে ঝোলা লইয়া আধুলিতে আগমন করিল? কিন্তু হাসিব বিপক্ষে সৌজন্য দেখানই যুক্তিযুক্ত। মদনমোহন বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু বলবেন?।'

লোকটি আবার হাসিল। বড় মধুর সে হাসি। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে কহিল, 'আমি বলার কে! বলবেন তিনি যিনি চোখ দিয়েছেন দেখবার, মুখ দিয়েছেন বলবার. কান দিয়েছেন শুনবার। আর মন দিয়েছেন, মন দিয়েছেন কেন বল তো?'

মদনমোহনের কৌতুকবোধ হইতেছিল। সে রহস্য করিতে কহিল, 'বুঝবার।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি খুশীতে আটখানা হইল, 'সাবাস! বুঝবার। বোঝ হে রসিকজন যে জানে যেমন। তা ভাইটির নাম কি?'

'মদনমোহন বিশ্বাস।'

'চমৎকার নাম। কি করা হয়?'

এই বিষয়ে মদনমোহনের কিঞ্চিৎ গর্ব আছে। আধুলি গ্রামের অধিকাংশই ভাগচাষী। একমাত্র সে—শহরে নিত্য যাতায়াত করে, কারণ সরকারি আপিসের পিওনের চাকরি পাইবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছে। সে উত্তর কবিল, 'চাকরি করি। শহরে। আপনি এই ভোরে কার কাছে এসেছেন?'

'আমি কি এলাম ভাই, তিনিই আনালেন। এখন বল শিবকালীর বাড়ি কোথায়। তাকে আমার দরকার, তারও আমাকে প্রয়োজন।'

শিবকালীর নাম শুনিয়া মদনমোহনের ললাট কুঞ্চিত হইল। আজকের দিনটিতে আর কি কি অঘটন ঘটিবে তাহা ঈশ্বর জানেন নতুবা এই রকম সময়ে ওই নাম শুনিতে হয়! শিবকালী ঘোষের হস্ত সর্বদা চিৎ হইয়া থাকে। এই গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিক সে, গোলা ভর্তি ধান। অথচ বছর কয়েক আগেও শিবকালী অতি দরিদ্র ছিল। হঠাৎ কোন জাদুমন্ত্রে সে বড়লোক হইয়া গেল তাহা রহস্যময়। অন্তত লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইযাছে বলিযা মদনমোহনের অনুমান। এই কৃপণ ব্যক্তিটিকে গ্রামের মানুষ ঈর্ষা করে কিন্তু এড়াইতে পারে না। মদনমোহন আগন্তুকের দিকে নজর কবিল, 'আপনার পরিচয়?'

'আমি, আমি ঈশ্বরের সেবক।' সেই প্রসন্ন হাসি অধরে।

নতুন মানুষের কাছে মনের কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। মদনমোহন বলিল, 'এই সাতসকালে কি ওদের কেউ ঘুম থেকে উঠেছে! ওই যে বাঁক দেখছেন, ঘুরলেই একটা গেটওয়ালা সিমেন্টের বাড়ি দেখতে পাবেন।'

উষাকালে মানুষের মন শান্ত থাকে। কিন্তু শিবকালী ঘোষের হৃদয় আজ অত্যন্ত চঞ্চল। বিনিদ্র রাত্রির শেষে শিবকালী বাগানে দাঁড়াইয়া দাঁতন করিতে করিতে সেই চিন্তায় মগ্ন ছিল। পারুলবালা দুইদিন হইল হাসপাতালে পড়িয়া আছে। তাহার উদরে যন্ত্রণা দীর্ঘকালই হইত, এইবার অসহ্য বোধ হওয়ায় শিবকালী তাহাকে সদরে লইয়া যায। ডাক্তারবাবু উদরের ছবি তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন অবিলম্বে অপারেশন করিতে হইবে। আগামীকাল সকালটি এই জন্যে নির্দিষ্ট।

স্ত্রীর উপর শিবকালীর অন্যবিধ আকর্ষণ নাই। সে রূপসী নহে, কিঞ্চিৎ ক্ষীণাঙ্গীও বটে। অন্য নারীতেও সে আসক্ত নহে। এই বয়সেই নারীমাংস সম্পর্কে শিবকালী নিস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে। যদিও তাহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া একটি আক্ষেপ ছিল, ইদানীং তাহাও বিলীন হইয়াছে। দ্বিতীয়বার কোন রমণীর দাসত্ব যখন সে গ্রহণ করিবে না তখন আর আক্ষেপের কি দরকার। পারুলবালা টেবিল চেয়ার কিংবা খাটের মতই এই বাড়িতে পড়িয়া ছিল। কিন্তু গত দুইদিনে শিবকালী হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে ওই স্ত্রীলোকটিকে তাহার প্রয়োজন। নহিলে এই সংসার বিকল। গতকাল ডাক্তারের মুখে যে সংবাদ সে শুনিয়াছে তাহাতেই তাহার নিদ্রা ঘুচিয়াছে। পারুলবালার অবস্থা ভাল নহে, জীবন এবং মরণের পাল্লা দুটির শেষেরটিতে ভার বাড়িয়া যাইতেছে। এই প্রথম শিবকালীর মনে হইল ডাক্তারবাবুকে অতিরিক্ত অর্থ দান করিলে নিশ্চয়ই পারুলবালা সুস্থ হইবে।

এইসময় সে দেখিল একটি রক্তবস্ত্রধারী তাহার বাঁশের গেটে উপস্থিত হইয়া মৃদু হাস্য করিতেছে। দেবদ্বিজে কোনকালেই তাহার ভক্তি নাই, সন্ন্যাসীদের সে দুচক্ষে দেখিতে পারে না।

তিক্ত গলায় সে খিঁচাইয়া উঠিল, 'কি চাই?'

'আমার তো চাওয়ার কিছু নেই। তিনি যা চাওয়ান তাই চাই। বড় চঞ্চল তোমার মন শিবকালী।'

'আপনি আমাকে চেনেন?' আগন্তুকের দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইয়া শিবকালীর সমস্ত অঙ্গে শীতল স্রোত বহিয়া গেল।

'না। আমরা কেউ কি নিজেকেই চিনি যে অপরকে চিনব। বড় ছায়া পড়েছে রে কালো ছায়া, এই বাড়ির ওপরে।' তারপর কণ্ঠের স্বরে কঠোরতা আসিল 'অমন লক্ষ্মী মেয়েটাকে জেনেশুনে খুন করছ শিবকালী?'

'খুন? কার কথা বলছেন?'

'যাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছ। ও মরে যাবে, নির্ঘাৎ মরে যাবে।'

'কি বলছেন?' শিবকালীর মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। এক লাফে সে বাঁশের গেটের নিকট চলিয়া আসিল, 'কে আপনি? আবার বললে জিভ টেনে নেব।'

'তাতে তো বউটা বাঁচবে না বাবা। শিবকালী যে চায় সে আকাশেও হেলান দেয়। দেওয়ার ইচ্ছেটাই আসল। অপারেশন করিও না।

শিবকালী এবার হতভম্ব হইয়া পড়িল। আগন্তুক তাহার পরিবারের সমস্ত খবর রাখে। এই মানুষটি কি প্রতারক। তবে শোনা কথা কেউ কেউ নাকি--' সে সন্দেহযুক্ত কণ্ঠে কহিল 'কবার না?'

'না। তন্ত্র শরীরে লাগলেই যমদূতের বাঁধন খুলে যাবে।' এইবার আগন্তুকের ঝুলিতে হস্ত প্রবেশ করিল। দুই চক্ষু বন্ধ, অধরে কিছু নিঃশব্দ উচ্চারণ। তারপর ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়া তাহার শরীর স্থির হইল 'এই শেকড়টা নিয়ে এক্ষুণি শহরে যাও। এটাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে নিতে বল তাকে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। যদি দ্যাখো কোন যন্ত্রণা নেই কষ্ট নেই সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসো। আমি রইলাম।'

সম্মোহিতের ন্যায় শিবকালী শেকড়টি গ্রহণ করিল। মাত্র দুই ইঞ্চি লম্বা পরিচ্ছন্ন শেকড় শিবকালী বুঝিতেছিল তাহার অঙ্গে টান ধরিতেছে। ইহা কি ধরনের টান তাহার সে বারণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার বোধ হইতেছিল যে নিজের শরীরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সে হারাইতে বসিয়াছে। তবু যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তাহা সঞ্চয় করিয়া সে ঘোষণা করিল, 'ঠিক আছে আমি সদরে যাচ্ছি। যদি এসব ভাঁওতা হয় তাহলে আধুলি থেকে জন্মের মত বের হওয়া বন্ধ করে দেব। আমার নাম শিবকালী ঘোষ, আমি পিপড়ের পোঁদ টিপে মধু বের করে খাই সাবাই।'

আগন্তুকের অধরে আবার হাসি খেলিয়া গেল। বাঁশের গেট খুলিয়া তাহাকে ভেতরে প্রবেশ করিতে দিল শিবকালী। তখনও ঘাসে এবং গাছের পাতায় শিশিরবিন্দু মুক্তোর মত জ্বলিতেছে নবীন সূর্যকিরণে পৃথিবীকে চমৎকার দেখাইতেছিল। গোয়ালঘর হইতে গাভীর ডাক ভাসিয়া আসিল। এইরকম ডাক সদ্যপ্রসবা না হইলে ডাকা যায় না। শিবকালী দ্রুত গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এইসময় তাহার ডান চক্ষু অকস্মাৎ নৃত্য শুরু করিল।

মুখ ভরতি দাড়ি যার সেই লোকটিকেই নেতা বলে ভাবা অন্যায় হবে না। কারণ সে কথা কথায় বিরক্ত হচ্ছিল। তার কথার ভঙ্গীতেও সেটা স্পষ্ট। তাকে ঘিরে ছয়জন যুবক বসে আছে যুবকেরা আধুলি গ্রামের মানুষ। নেতা শহর থেকে এসেছেন, 'আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এটা তিরাশি সাল অথচ আপনাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। অদ্ভুত ব্যাপার আপনাদের গ্রামের শতকরা নিরানব্বইজন সারা বছর আধপেটা খেয়ে থাকে, শিবকালী ঘোষের

জমি চাষ করছে, এই মানুষগুলোকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা আপনারা করবেন না? তাহলে রাজনীতি করতে এলেন কেন?'

যুবকদের একজন মিনিমিনে গলায় বলল, 'আমবা চেষ্টা করছি—।'

'কি চেষ্টা করছেন?' নেতা তাঁর দাড়িতে হাত রাখলেন, 'না না এ ভাল কথা নয়। আপনারা হলেন পার্টির ক্যাডাব। আপনাদের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে—। আচ্ছা, আপনারা আমার প্রশ্নের জবাব দিন। লোকটা জোতদার?'

'হ্যাঁ।'

'বুর্জোযা?'

'হ্যাঁ।'

'মজুতদার?'

'হ্যাঁ।'

'শোষক?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যস। আর কি দরকাব? এইবকম মানুষ দেশে যত থাকবে তত সর্বহারাদের সর্বনাশ। এদেব বিরুদ্ধে লড়াই করে উৎখাত করতে হবে। আপনারা সেটা জানেন না?'

'জানি। কিন্তু মুশকিল হযেছে গ্রামের মানুষদের নিযে। তারা লোকটাকে পছন্দ কবে না, সকালে উঠে কেউ নাম উচ্চাবণ কবতে চায় না, ঘৃণাই করে আবার ওই লোকটার বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস পায না।'

'এসব পুরনো সেন্টিমেন্ট। একবার ভেঙ্গে দিলেই চুকে যাবে।'

'কিন্তু আর একটা ব্যাপার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কি ব্যাপার?'

'গ্রামের মানুষ জানে লোকটার একসময় কিছুই ছিল না। খেতে পেত না। সেই যে বাংলাদেশ থেকে ওর দুই পিসী সোনার গয়না নিয়ে এল সেটা হাতিয়েই ওর রবরবা। তা সেইসময় কংগ্রেসীরা ওকে খুব খাতির কবত।'

'করে, সেটাই স্বাভাবিক। কংগ্রেসের চরিত্র সাধারণ মানুষকে বোঝান।'

'কিন্তু লোকটা ঠিক কংগ্রেসীও ছিল না। গতবার পঞ্চায়েতে দাঁড়াবার জন্যে আমাদের পার্টি থেকেও ওকে অনুরোধ করেছিল। মুশকিল হল খবরটা গ্রামের লোক জানে। লোকটা রাজী হয়নি। শহরের নেতারা ওর বাড়িতে এসেছিল।'

নেতাকে একটু সংকুচিত মনে হল কিন্তু তাঁর মুখ দাড়িতে ঢাকা থাকায় অভিব্যক্তি বোঝা গেল না। নেতা শেষ পর্যন্ত কাঁধ নাচালেন, 'ওরকম একটু আধটু হয়ই, পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক সময় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়। মার্কস বলেছেন শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। এ আপনারা বুঝবেন না। হিটলারকে ঠেকাতে আমরা ব্রিটিশদের সমর্থন করেছি, কেন করেছি? অনেক গভীরের কথা। যাক, আমার বক্তব্য হল এই শোষকটিকে আপনারা নাজেহাল করুন। ওর জমিতে যারা চাষ করেন তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ সংগঠিত করুন। ওর লোকজন বাধা দিতে এলে সংগ্রাম শুরু করুন।'

এবার আর একজন বলল, 'শিবকালীর ছেলেমেয়ে নেই।'

'গুড। তাতে তো আরও ভাল হল। ওর মৃত্যুর পর সব সম্পত্তি এই গ্রামের জনগণের হয়ে যাবে। এতগুলো সর্বহারার মধ্যে একজন বুর্জোয়া থাকবে তা মেনে নেওয়া যায় না। শহরে সর্বহারার সংখ্যা কম, বুর্জোয়ার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণ উল্টো। লোকটার সম্পত্তির হিসাব পেয়েছেন?'

'জোতজমি এবং ধানগম নিয়ে লক্ষ টাকার মত হবে।'

'আর আপনাদের? আপনাদের পকেটে কিছু নেই, টুঁ টুঁ। তা ছাড়া লোকটার মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব নেই। আর দেবী করবেন না, আমরা আগামীকাল আবার বসব এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করতে। একটা গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি সমান করতে পারি তাহলে সমস্ত দেশ উদ্বুদ্ধ হবে।'

নেতার কথা শেষ হলে সবাই উঠে দাঁড়াল। প্রত্যেককেই খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। নেতা যা বলছেন তাতে তারা মিথ্যে কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু শিবকালীব কাছে গ্রামেব মানুষ যে ঋণগ্রস্ত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, সকালে উঠে লোকটাব নাম শুনলে হাঁড়ি ফেটে চৌচির হয়।

মদনমোহন সাইকেলে চাপিয়া সদবে যাইতেছিল। শিবকালী ঘোষেব বাড়ির সামনে আসিতেই সে ডাক শুনিতে পাইল, 'চললে কোথায়? আপিসে?' সে দেখিল শিবকালীব গেটের নিকট দাঁড়াইয়া সেই আগন্তুক হাসিতেছে।নিকটে কেহ নাই।

মদনমোহন গতি কিঞ্চিত শ্লথ কবিয়া জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি ফিবে এস। এখানে প্রসাদ নিয়ে যেও।'

মদনমোহনেব কিছুই বোধগম্য হইল না। কিসের প্রসাদ, কোথায় পাওয়া যাইবে এইসব বৃত্তান্ত অজানাই বহিল। তাহাব যথেষ্ট বিলম্ব হওয়ায় সে দ্রুত ওই স্থান অতিক্রম করিলেও হঠাৎ ঠাওব হইল প্রত্যূষে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপবিচিত ছিল এই অল্প সময়েব ব্যবধানে সে মালিকের ন্যায় কথা বলিতেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে শিবকালীব সম্মুখে একটি অভিনব দৃশ্য উদঘাটিত হইল। পারুলবালা যন্ত্রণায় ছটফট কবিতেছিল। তাহার বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নার্স শিবকালীকে কহিয়া গেল, আগামীকাল নহে ওইদিন অপরাহ্নেই অপারেশন কবিতে হইবে নইলে অবস্থা বিপজ্জনক হইতে পারে। তিনবার পত্নীর নাম উচ্চারণ কবিয়াও শিবকালী কোন সাড়া পাইল না। হঠাৎ তাহাব মনে হইল এই স্ত্রীলোকটি গত হইলে তাহাব অতিশয় দুর্দশা হইবে। অতএব যেমন করিয়া হোক ইহাকে সুস্থ কবিতেই হইবে। ডাক্তারবাবুরা যখন অপারেশন একমাত্র উপায় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তখন তাহা মানিয়া লওয়াই শ্রেয়। সে আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখে না। কিন্তু ওই সাধুবাবা তো আর মিছিমিছি তাহাব কাছে আসে নাই। বস্তুত এখন পর্যন্ত তাহাব একটি পয়সাও তিনি খসান নাই। পকেটে যে শিকড়টি আছে তাহা গোপনে পারুলবালাকে খাওয়াইলে কেমন হয়! যদি কোন সুপ্রতিক্রিয়া না দেখা দেয় তাহা হইলে যথানিয়মে অপারেশন হইতে দেওয়া মঙ্গল। শিকড়ের জন্যে যদি কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া হয় তাহাতে ভয়েব কিছু নাই কারণ অপারেশন অনিবার্য। এইসব সাতকাহন ভাবিয়া শিবকালী চারপাশে তাকাইল। পাশাপাশি বিছানায় অনেক মহিলা শুইয়া আছে। তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের ভিড় এখন। কেহই এইদিকে লক্ষ্য করিতেছে না। শিবকালী গোপনে, শিকড়টি পারুলবালাব মুখের ভিতবে গুঁজিয়া দিল। সেই মুহূর্তে বোধহয় পারুলবালার যন্ত্রণা তীব্র হওয়ায় সে শেকড়টিকে দাঁতের তলায় চাপিয়া ধরিল। শিবকালী নিম্নস্বরে কহিল, 'খেয়ে নাও, চিবিয়ে খেয়ে নাও, যন্ত্রণা কমে যাবে।'

অসহায় পারুলবালা একবার স্বামীর মুখ দর্শন কবিল তারপর পাশ ফিরিয়া শুইল। খানিকবাদেই নার্স আসিয়া কহিল, 'উনি ঘুমুচ্ছেন, এখন আর বিবক্ত করবেন না। যাওযার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।'

শিবকালী উঠিল না। একটু আগে যে মানুষ কাতর ছিল সে শিকড় মুখে দেওয়ামাত্র নিদ্রিত হইল। হঠাৎ তাহার শরীর শিহরিত হইল। সাধুবাবা কি দৈবপ্রেরিত? কিন্তু তবু সংশয় হইতেছিল। আধঘণ্টা নিদ্রা যাওয়াব পর পারুলবালা নয়ন মেলিল, 'ওমা, কখন এলে?'

শিবকালীর জিহ্বা আড়ষ্ট, 'কেমন আছ? যন্ত্রণা—।'

পারুলবালা কহিল, 'সকালে খুব ছিল, এখন—।' সে নিজের পেটে হাত বুলাইয়া কহিল, 'টাটিয়ে আছে কিন্তু ব্যথা নেই গো! কি করে হল?'

শিবকালীর হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠিয়া আসিল। সে দুই উজ্জ্বল চক্ষু মেলিয়া কহিল, 'উঠে দাঁড়াও তো, বিছানা থেকে নামো—।'

পারুলবালা কহিল, 'না পারব না। আজ দুদিন বিছানা থেকে নামিনি। মাথা ঘুরে যাবে আর যন্ত্রণাটা বাড়বে।'

শিবকালী একটু কঠোর হইল, 'নামতে বলছি, নাম।'

পারুলবালা চিরকালই এই মানুষটিকে সমীহ করে। বাংলাদেশী আত্মীয়দের স্বর্ণালঙ্কার উধাও হইবার পর সে তটস্থ হইয়া থাকে। অতএব আদেশ অমান্য করিবার সাহস রইল না। মাটিতে পা ফেলিয়া সে যেন নিজেই তাজ্জব হইয়া গেল। সামান্য ব্যথাও বোধ হইতেছে না এমনকি আড়ষ্টভাবটিও মিলাইয়া গেল। পারুলবালা স্বচ্ছন্দে খানিকক্ষণ পদচারণ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না গো, আমি ভাল হয়ে গিয়েছি।' তাহাকে শিশুর ন্যায় দেখাইতেছিল।

শিবকালী আরও কিছুক্ষণ স্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করিল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল।

ঠিক দ্বিপ্রহরে শিবকালী সস্ত্রীক আধুলিতে প্রত্যাগমন করিল। ইতিমধ্যে পারুলবালার রক্তশূন্য মুখে প্রাণের ছোঁওয়া লাগিয়াছে। তাহার চেহারা দেখিয়া ডাক্তার খুবই বিস্মিত হইয়াছিল। নানারূপ পরীক্ষা করিয়াও পারুলবালার পূর্বের রোগটিকে পাকড়াও করা যায় নাই। শেষপর্যন্ত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া শিবকালীর নিকট হইতে বন্ড লইয়া পারুলবালাকে মুক্তি দিয়াছেন। পথে স্ত্রীর নিকট সাধুবাবা এবং তাহার শিকড়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শিবকালী কহিয়াছিল, 'ভাগ্যিস তোমার গায়ে অস্ত্র ছোঁয়ায়নি, নইলে আর দেখতে হতো না।'

পারুলবালা স্বাস্থ্যের ফুর্তিতে জবাব দিয়াছিল, 'মরলে তো সুবিধে হতো, আর একটা ছুঁড়িকে জুটিয়ে আনতে। ব্যাটাছেলেদের চরিত্তির!'

দূর হইতে রক্তাম্বর দেখা যাইতেছিল। রিকশা হইতে পড়ি কি মরি করিয়া নামিয়া আসিল শিবকালী, পাগলিনীর মত প্রায় পারুলবালা। তারপর দুইজনে সাধুবাবার পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ হইল। সাধুবাবা মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, 'তাহলে অপারেশন হল না; বেঁচে গেলি, বেঁচে গেলি।'

শিবকালী আপ্লুত কণ্ঠে কহিল, 'তুমিই বাঁচালে। তোমার কৃপা।'

'আমি কে? আমি কেউ না। সবই তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু ছায়া নেমে আসল, কালো ছায়া। সর্বনাশ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।'

পারুলবালা কোনক্রমে কহিল, 'বাঁচান, আমাদের বাঁচান।'

সাধুবাবা বলিলেন, 'ওঠ। পড়ে থাকিস না, এখন তোদের দাঁড়াবার সময়।'

শিবকালী উঠিল। সাধুবাবার দুই চক্ষুর দিকে তাকাইলেই তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়। সে কহিল, 'বাঁচান, বাঁচান।'

সাধুবাবার মুখশ্রী কঠোর হইল, 'তোদের চারপাশে এখন অনেক শত্রু। এদের দূর করতে হবে। মায়ের নামগান করতে হবে। বাহাত্তর ঘণ্টার নামগান। এখানে শামিয়ানা টাঙা। তিনদিন ধরে নাম চলবে। আমি যজ্ঞ করব। তিনদিনের পর ছায়া সরে যাবে, তোদের নতুন জীবন শুরু হবে। কি, রাজী আছিস?'

পারুলবালা সোৎসাহে কহিল, 'হ্যাঁ বাবা, আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন।'

অপরাহ্ণে মদনমোহন সাইকেলে চাপিয়া আফিস হইতে ফিরিতেছিল। সেইদিনই মাহিনা পাওয়ায় তাহার পথে দাঁড়াইবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু শিবকালী ঘোষেব গৃহেব দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্তব্ধ হইয়া গেল। বিরাট শামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। কযেকজন কিষাণ পরিশ্রম করিতেছে। শিবকালী নিজে দাঁড়াইয়া তদাবক কবিতেছে। এইসময় একজন দৌড়াইয়া মদনমোহনকে খবর দিল, 'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

বাবাটি কে তাহা অনুমান কবিল মদনমোহন। নিতান্ত কৌতূহলে সে ভিতবে প্রবেশ করিতেই সাধুবাবাব দর্শন লাভ করিল। যজ্ঞেব কুণ্ড প্রস্তুত হইযাছে। তাহার নিকটে উচ্চ আসনে সাধুবাবা প্রশান্ত মুখে বসিযা কহিলেন, 'কিহে, বাড়ি ফিবছ?' মদনমোহন নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস কবিতেছিল। আজ প্রভাতে যাহাকে নিতান্তই সাধাবণ মনে হইতেছিল অপবাহ্ণে তাহাকেই মহাশক্তিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। যে শিবকালীব আঙ্গুল ফাঁক হয না সে ইহার সামনে করজোড়ে দণ্ডায়মান। মদনমোহন নীরবে মস্তক দোলাইল। সাধুবাবা কহিলেন, 'বেশ বেশ। আজ থেকে এখানে নামগান শুরু হচ্ছে।*সন্ধের পরে এসে প্রসাদ নিয়ে যেও। আর একটা কথা, এই নামগান যজ্ঞ যেমন শিবকালীব অমঙ্গল দূর কববে তেমনি গ্রামের মানুষদেব উপকার হবে। তাই যে দুবেলা এখানে প্রসাদ না নিতে আসবে সে নিজেব ক্ষতি কববে; একথা গ্রামের মানুষকে বলে দিও।'

মদনমোহনেব মনে হইল সাধুবাবা নন স্বযং মহাদেব কথা বলিতেছেন। সে পরমভক্তিভরে প্রণাম জানাইলে সাধুবাবা কহিলেন, 'যাও বাবা, সাবা দিন খাটুনি খেটে এলে, এবার একটু বিশ্রাম কবো। রাতে ঠিক এসো বাড়িব মানুষদের নিয়ে।'

মদনমোহন খানিকটা কৃতজ্ঞচিত্তে বাহিবে আসিতে আসিতে নিজেকে ধিক্কার দিল। তাঁহার দুই চক্ষু কেবলই সাধুবাবার ঘড়ির দিকে চলিযা যাইতেছিল। বড সন্দেহপবায়ণ সে। সন্দেহ মানুষকে ছোট কবিযা দেয়।

হরিনাম নয়, তাবানাম শুরু হইল বাত্রি আট ঘটিকায়। শহব হইতে চারজন বাদ্যযন্ত্র লইযা যথাসময়ে উপস্থিত হইযাছিল। ওপাশে দুইটি উনুনে প্রসাদ পাক দেওযা হইতেছে। খিচুড়ি, আলুর দম, বেগুন ভাজা আর দুইটি বসগোল্লা। যজ্ঞ হইবে বাগান্তর ঘন্টা অতিক্রান্ত হইলে। সাধুবাবা নামগানে যোগদান কবিতে করিতে মাঝে মাঝে বাহিবে আসিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন সবাই প্রসাদ ঠিকমতন পাইল কিনা। প্রথম রাত্রে মাত্র দু'শ মানুষ প্রসাদ পাইল। পার্শ্ববর্তী গৃহের মহিলাবা পারুলবালাব পার্শ্বে বসিয়া আবিষ্কাব কবিল এ পারুলবালা সে পারুলবালা নহে। সাধুবাবার শিকড মানুষটিকে মাটিব মানুষ কবিয়া দিয়াছে। এমন কি শিবকালী ঘোষও বিনীত ভঙ্গীতে প্রত্যেককে আহ্বান করিতেছিল। অধিক রাত্রে যখন কয়েকজন নামগানকারী সুব বাঁচাইয়া বাখিয়াছে তখন সাধুবাবা শিবকালীকে কহিলেন, 'বাবা শিবু, এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো। কাল তো সাতসকালে উঠতেই হবে। যাও।'

নিভৃতে আসিযা শিবকালী পারুলবালাকে কহিল, 'শবীর কেমন?'

পারুলবালা উজ্জ্বল হইল, 'খুব ভাল। কোনদিন অসুখ করেছিল বলে মনেই হয় না। ওঃ, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।' তারপর একটি প্রশান্ত হাসি অধরে রাখিযা কহিল, 'আমার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হল। আগে ভাবতাম খোকা হলে অন্নপ্রাশন করব, শামিযানা টাঙিযে লোক খাওয়াবো। সে সাধ তো পূর্ণ হচ্ছিল না। আজ হলো।'

শিবকালী কিয়ৎকাল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইযা কহিল, 'সাধুবাবা বলেছেন এসব করলে আমাব ভাল সময় আসবে। যা খরচ কবব তাব ডবল ফিরবে, কি বলো? আমারই টাকায় হাভাতেগুলো গিলবে আর আমি কিছু পাবো না—।'

পারুলবালা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল, 'ছিঃ, ওরকম কথা বলো না। যিনি আমার জীবন দিয়েছেন তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখো।'

পরদিন সকালে শিবকালীর বাড়ির সম্মুখে যেন মেলা বসিয়া গেল। আধুলির মানুষ বটেই, নিকটবর্তী অন্য গ্রামের মানুষজন এই সাধুবাবার দর্শনে উপস্থিত হইল। সাধুবাবার আদেশ কেহ যেন যজ্ঞবাড়িতে আসিয়া প্রসাদ না লইয়া না ফেরে। গৃহে যা ছিল তা গতরাত্রের আয়োজনে ব্যয় হইয়াছে। অতএব শিবকালী শহর হইতে চাল ডাল সবজি আনাইল। উনুনের সংখ্যা বাড়িল। শহর হইতে একাধিক বামুনঠাকুর আনাইতে হল। সাধুবাবার আদেশ মত পরদিবসে গ্রামের সমস্ত বাড়িতে উনুন আর জ্বলিল না। মদনমোহন স্নান করিয়া যজ্ঞবাড়িতে প্রসাদ খাইয়া আফিস কবিতে গেল। দ্বিপ্রহরে তিন হাজার মানুষ খেপে খেপে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলিতে লাগিল। তারামায়ের নামগান তখন সোচ্চার। বোধহয় দুইক্রোশ দূর হইতে তাহা শোনা যাইতেছিল। যে আসে সেই খানিকটা চেঁচাইয়া যায়। শিবকালী দুইদিনে যেন কিছুটা কৃশ হইয়াছে। দুই বেলা এখন সমস্ত দিনে বিস্তৃত হইয়াছে। যে যখন ইচ্ছা আসিলেই প্রসাদ পাইতেছে। শিবকালীর আর নামগান করিবার সময় নাই। চরকির ন্যায় তাহাকে প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে চারিধারে ছোটাছুটি করিতে হইতেছিল। মদনমোহন অতি স্বল্প মূল্যে তাহার নিকট হইতে পাঁচমণ গম ক্রয় করিল। শিবকালীর গমে প্রয়োজন নাই।

নেতা বললেন, 'দেখুন, লোকটার স্পর্ধা দেখুন। দুবেলা খাইয়ে সমস্ত গ্রামের মানুষকে কিনে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই ইলেকশনে দাঁড়াবে। এই জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে আমরা কনটেস্ট করতে পারব?'

একজন বলল. 'না, ঠিক সেরকম নয়। এক সাধুবাবা এসে বলেছে যজ্ঞ করে লোক খাওয়ালে ভাল হবে তাই—।'

'ছাড়ো! একটা না একটা ধান্দা ঠিকই আছে। এই ফাঁকে গ্রামের মানুষ লোকটার জয়গান করবে! এ্যাদ্দিন হিংসে করত, নিন্দে করত, এখন প্রশংসা করবে। যাক। আমরা কি দেখছি? দেখছি লোকটা পুঁজিপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর। টাকার গরমে পৃথিবীকে নস্যাৎ করছে। এরকম মানুষ পৃথিবীতে থাকলে বিপ্লবের ক্ষতি হবে। কারণ এরা মানুষকে ভুল পথে চালায়। এদের কাছ থেকে মানুষের কোন উপকার আসে না, এরা যা করে তা নিজের স্বার্থের জন্যে করে। এবিষয়ে কারো বক্তব্য আছে?' নেতা বাঘের মত সামনে বসা মুখগুলোর দিকে তাকালেন, 'নেই? থাকতে পারে না। কারণ আপনারা সবাই বিচক্ষণ মানুষ। সর্বহারা মানুষ। আপনারা শুনেছেন লোকটার স্ত্রীর অপারেশন অনিবার্য ছিল। ওই সাধুর শেকড় খেয়ে মহিলা ড্যাঙডেঙিয়ে চলে এলেন। এই বিজ্ঞানের যুগে কেউ একথা বিশ্বাস করবে! পুরো ব্যাপারটাই বানানো। ওর বউ-এর কিছুই হয়নি। ডাক্তারের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল। যাতে ওই সাধুবাবার কীর্তিব কথা সাতকাহন করে শোনানো যায়। গ্রামের সরল মানুষদের ব্ল্যাকমেল করছে লোকটা।'

একজন একটু উসখুস করছিল। নেতা থামতেই বলল, 'কিন্তু এত টাকা খরচ করছে কেন তাহলে?'

'এ্যাই! এ্যাই হল প্রশ্ন। হোয়াই! নিশ্চয়ই কোন ধান্দা আছে। যা খরচ করছে তার দশগুণ কামাবে। এছাড়া হতেই পারে না। কই, আমার আপনার বাড়ির কারো অসুখ হলে তাকে বাঁচাতে তো সন্ন্যাসী আসে না! গ্রামের মানুষ যখন বুঝবে তখন ওদের কিছুই করান থাকবে না। কিন্তু আমরা তো সেটা হতে দিতে পারি না। কিছু ভাবলেন আপনারা?'

একজন বলল, 'মাথায় কিছু আসছে না। এই উৎসবের পরে তো ওর ভাগচাষীদের উত্তেজিত করা মুশকিল হবে।'

নেতা বললেন, 'ঠিক। আমাদের দেশের স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে আরও কঠোর হতে হবে।

ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিন। এই সর্বহারাদের মধ্যে ওর স্থান নেই। দিন ঠিক করুন।'

একজন বলল, 'এখন তো ওর বাড়িতে হাজার হাজার মানুষ। এখন কিছু করতে গেলে পাবলিক ক্ষেপে যাবে।'

'না, না, এখন নয়। তবে খুব দেরিতেও নয়। ওদের যজ্ঞ কবে শেষ হবে?'

'পরশু রাত্রে।'

'গুড। তারপর যে যার বাড়িতে ফিরে যাবে?'

'হ্যাঁ, আর থেকে কি করবে?'

'এই ক'দিনের পরিশ্রমে শিবকালী ঘুমে নেতিয়ে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তখনই—তখনই আসল সময়।এ খবর এই ঘরের বাইরে যেন না যায়। আর অ্যাকশন পার্টিতে আপনারাই থাকবেন।' নেতা তৃপ্তিব হাসি হাসলেন। একটা বড সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।

শিবকালীর হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল। পারুলবালা তাহাকে ধবিয়া যজ্ঞের নিকট লইয়া আসিল। বিশাল অগ্নিকুণ্ড হইতে তাপ বিকিরিত হইতেছিল। সেই লেলিহান শিখার পার্শ্বে বসিয়া সাধুবাবা মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। গ্রামের সমস্ত মানুষ পরমভক্তিভরে তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিল। শিবকালীকে দেখিয়া সাধুবাবা কহিলেন, 'বাবা শিবু, আমার যজ্ঞ শেষ। তোর বাড়িতে যে গভীর কালো ছায়া নেমেছিল তাকে সরিয়ে দিয়েছি। বল, আব কোন বাসনা আছে?'

শিবকালী দুর্বল কণ্ঠে কহিল, 'বাবা, সব দিলাম তোমাকে, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো।'

সাধুবাবা হাসিলেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছে। মা, মা, মা। পাবি সব পাবি। খুব বেশী করে পাবি। তার আগে দুটো প্রশ্ন করি। কি চাস তুই?'

শিবকালীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে ওই অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাইযা যেন অনেক কিছু দেখিতে পাইল। অনেক অর্থ, অনেক জমি, শস্য, ইলেকশনের অনুরোধ, পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া, রাশি রাশি সোনা কিন্তু ও কে? ওই যে বিধবা? সাদা থান পরা; হাতে পুঁটুলি যাহাতে সোনার গহনা আছে। যে পুঁটুলি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় ওই বিধবা তাহাব কাছে পরম বিশ্বাসে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই বিধবাকে তো সে তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কেন এখন ওই অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়াইয়া সমস্ত সম্পদ আড়াল করিয়া রাখে? বারংবার চক্ষু রগড়াইয়াও শিবকালী সেই মৃত বিধবাকে সরাইতে পারিল না। তাহার এই আত্মীয়টি যেন মিটিমিটি হাসিতেছে। সে উত্তর করিতে পারিল না। তখন সাধুবাবা পারুলবালার দিকে চাহিলেন, 'তোমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কি? তাই চাও, তুমি তাই পাবে মা।'

পারুলবালা মাথার ঘোমটা আর একটু টানিল। কোনটি যে মূল্যবান তাহা সে কিছুতেই ঠাওর করিতে পারিতেছিল না। শেষ পর্যন্ত বাল্যকাল হইতে শোনা বাক্যটি তাহার স্মরণে আসিল, পতিই পরম দেবতা। স্বামীই স্ত্রীর সবচেয়ে বড সম্পদ। সে নিম্নস্বরে কহিল, 'ওঁকে সুস্থ রাখুন।'

সমবেত মানুষজন সপ্রশংস বাক্য কহিতে লাগিল। সাধুবাবা হাসিলেন, 'তথাস্তু। সাবিত্রীসমান হও মা।'

আধুলি গ্রাম এখন নিস্তব্ধ। এমন কি কুকুরেরাও এখন নিদ্রিত। যজ্ঞ শেষ হওয়ামাত্র যে যার বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছে। সাধুবাবা গরুর গাড়িতে শহরে রওনা হইয়া গিয়াছেন। যজ্ঞের শেষে ওইস্থানে থাকা নাকি তাঁহার গুরুর নিষেধ। শহর হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সাধুবাবার

অনুগামী হইয়াছে। এখন শিবকালীর গৃহের সম্মুখে ছেঁড়া কলাপাতা উড়িতেছে, অজস্র ভাঁড় এবং উচ্ছিষ্ট চারিধারে ছড়াইয়া আছে। সমস্ত পরিবেশ শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করিতেছে।

এতদিনের ক্লান্তি অদ্যরাত্রে পারুলবালাকে আজ নিষ্কৃতি দেয় নাই। ঘরের ভিতর মড়ার মত ঘুমাইতেছে সে। শিবকালীর চক্ষে কিন্তু ঘুম নাই। সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া বারান্দায় বসিল। চারিপাশে এখন রাত্রির কালো ছায়া। শিবকালী দুই হস্তে মুখ লুকাইল।

এইসময় একটা জিপ প্রায় নিঃশব্দে শিবকালী ঘোষের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। টপাটপ কয়েকজন মানুষ ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। প্রত্যেকের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা, হাতে ছুরি এবং তলোয়ার। আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে আছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছিল না। তারা সতর্ক চোখে চারধার দেখল। তারপর বাড়ির পেছনে চলে এল। খিড়কির দরজা খোলাই ছিল। আগন্তুকরা একটু অবাক হল। প্রতিরোধ নেই কেন? খবরটা ফাঁস হয়ে গেল নাকি? তারা সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকল। গোটা চারেক ঘর। কিন্তু কোন ঘরেই আসবাব পর্যন্ত নেই। সব খাঁ খাঁ করছে। একটি ঘরে পারুলবালা শুয়ে আছে। ওরা চটপট ওকে বেঁধে ফেলল। পারুলবালাকে খুন করার পরিকল্পনা ওদের নেই। তারপর সিন্দুক খুলল। বিশাল লোহার সিন্দুকের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই। আগন্তুকদের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এইসময় তারা শিবকালীকে আবিষ্কার করল। দ-এর মত বারান্দায় বসে আছে। ওরা ছুরি বের করে নিঃশব্দে শিবকালীর পেছনে এসে দাঁড়াতেই একজন থামতে ইঙ্গিত করিল। এই মানুষ কি সেই মানুষ? এমন হতশ্রী বৃদ্ধের চেহারায় ওরা শিবকালীকে কল্পনা করেনি। ওদের মনে হচ্ছিল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

দুজনকে পাহারায় রেখে বাকিরা আবার তদন্তে বের হল। গোলায় ধান নেই, গোয়ালে গরু নেই। ওরা ফিরে এসে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'গোলায় ধান নেই, কোথায় গেল? সিন্দুক খালি, মাল কোথায় গেল?'

শিবকালী ইহাদের চিনিতে পারিতেছিল না। সে মাথা নাড়িল, 'বেচে দিয়েছি। সব বেচে দিয়েছি।'

'বেচে দিয়েছ? কেন?'

'হু বাবা। বিশ হাজার লোক খেয়েছে চারদিনে। কত টাকা লাগে অ্যাঁ? যত জমি-ছিল, যত গয়না ছিল, ধান, গম ছিল। গরু বলদ ছিল সব বেচে লোক খাইয়েছি।'

'এখন কি আছে তোমার? এই বুর্জোয়া?'

'এখন শুধু এই প্রাণটা। আমার বউয়ের পরম সম্পদ।' শিবকালী চক্ষু বন্ধ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

'তুমি এরকম করলে কেন?' একজন ছুরিটা গলায় ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়িল শিবকালী, 'সবই তাঁর ইচ্ছে, সবই তাঁর ইচ্ছে! এই বসতবাটিটাও বন্ধক রেখেছি মদনমোহনের কাছে। যাও খবর নাও।'

ছুরিটা সরে গেল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকাল। কেমন অসহায় বোধ করছিল সবাই। শেষ পর্যন্ত একজন কথা বলল, 'যাঃ শালা! আর একটা সর্বহারা বাড়ল। এখন একে খুন করে কি করব?'

ওরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। বুর্জোয়া যদি সর্বহারা হয়ে যায় তাহলে? বারান্দার শীতল বাতাসে বসিয়া শিবকালী তখন আপন মনে গুনগুন্ করিতেছিল। 'সব হারিয়ে বসে আছি আয় মা এবার কাছাকাছি।'

ওরা পকেট থেকে একটা টাকা বের করে টস্ করল। তিন সিংহ শূন্যে দুটো ধানের শিষ গপগপিয়ে গিলে ফেলছিল।

[১৯৮৫/১৩৯২]

দায়

দশ দিন হয়ে গেল মাকে দ্যাখেনি জয়দেব। ঠিক হিসেব করলে অবশ্য ন'দিন। হাউলির হাসপাতাল থেকে যখন ওরা বেলেঘাটায় পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে ছিল। তাই। হাউলির হাসপাতালেই লোকে বলেছিল মা বাঁচবে না। তবু বেঁচে ছিল। ওখান থেকে যখন কোলকাতায় পাঠিয়ে দিল তখন ডাক্তারবাই বলেছিল বাঁচা মুস্কিল, বাঁচল না।

মৃত্যুর খবরটা শুনে চিৎকার করে কাঁদতে পারেনি জয়দেব। চৈত্রের মাটির মত বুকটা তখন ফেটে-ফুটে চৌচির। দশ দিন ধরে মানুষগুলোর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চোখের জল ফেলেছে যে তার চোখে মায়ের জন্য আলাদা করে জল থাকবে কি করে' শেষ পর্যন্ত পুলিসের বড়সাহেব চিঠি দিলেন, হ্যাঁ, মৃতদেহ গোলাপবালার ছেলের হাতে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। হাসপাতালের বাবুও বললেন খবর এসেছে দিয়ে দেবাই, ব্যবস্থা হচ্ছে।

তাই বসে আছে জয়দেব। ন'দিন হল মা শুয়ে আছে লাশটাকা ঘরে। আর চরকির মত ঘুরে বেড়িয়েছে জয়দেব। দেখতে ইচ্ছে করেছে খুব। জমাদারকে বললে হয়তো দেখতেও দিত। কিন্তু শুধু দেখে কি হবে" কোলকাতায় এনেও তো মাকে বাঁচানো গেল না। এমনকি একমাত্র পুত্র হয়েও দশ দিনেও মায়ের কাজ করতে পারল না।

হাউলি গ্রামের গোলাপবালার কোন শখ ছিল না। স্বামী মারা যাওয়ার পর অবশ্য ইচ্ছে ছিল ছেলেকে মানুষ করার, লেখাপড়া শেখানোর। হয়নি। ওসবে মাথা নেই ছেলের। দিনভর মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর গুলি খেলে। মারধোর করেও যখন শুধরে গেল না ছেলে তখন হাল ছেড়ে দিয়েছিল সে। তবে শখ না থাকলেও ইচ্ছে ছিল। গঙ্গা নদীর গায়ে শরীর রাখা। তা সে ইচ্ছে মিটবে না তা জানাই ছিল। হাউলি থেকে একমাত্র শ্রীধর ঘোষের বাবাই কালীঘাটের শ্মশানে যাওয়ার ভাগ্য করেছিলেন।`প্রচুর পয়সা ছিল তার। গোলাপবালার পাঁচ বাড়িতে বাসনমাজার আয় মাস ঘুরতেই ফুরিয়ে যায় তার আবার ইচ্ছে মিটবে। ছেলের বয়স যখন সতের হল তখন দিনরাত সে গালমন্দ শুরু করল। যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়ার জন্যে। কোন বদগুণ নেই, আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতই তবু কেন যে কাজ করতে ইচ্ছে করে না ওর' আর এসব ভাবতে ভাবতে গোলাপবালা একদিন ভোরে কাজে যাবার সময় চৌমাথায় লরি চাপা পড়ল।

ঘুমুচ্ছিল জয়দেব। খবর পেয়ে দৌড়ে চৌমাথায় গিয়ে সে জমে গেল। মেলা বসে গেছে সেখানে। বৈকুণ্ঠ ডাক্তারের দাওয়ায় গোলাপবালা শুয়ে আছে। রক্তের বান ডেকেছে পা থেকে। খুব জোরে ছুটছিল লরিটা' টাল সামলাতে না পেরে পাশের মাঠে নেমে পড়ার মুখে গোলাপবালাকে ঠেলে দেয়। দেওয়ার সময় পা দুটোয় চাকার ঘষ্টানি লাগে। হাউমাউ করে কেঁদেছিল জয়দেব। এ সংসারে মা ছাড়া কেউ নেই তার। ইদানীং যতই গালমন্দ করুক, রাত্তিরে মায়ের শরীর ছুঁয়ে না শুলে জয়দেবের ঘুম আসে না। গোলাপবালার শুকনো দেহটা থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ বের হয়।

বৈকুণ্ঠ ডাক্তার রক্ত বন্ধ করতে পারেনি। রিক্সায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল সবাই। হাউলির হাসপাতালে সবাই টাটকা ওষুধ নিতে যায়। রাত কাটালে অসুখ সারে না বলে একটা বদনাম আছে। কিন্তু রাত কাটল গোলাপবালারও তবে ডাক্তারবাবু বললেন অবিলম্বে কোলকাতার বেলেঘাটায় নিয়ে যাও। ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেছে গোলাপবালার। হাত পা বেকতে শুরু

করেছে এর মধ্যেই।

লরিটা কিন্তু হাওয়া হয়ে গিয়েছিল গোলাপবালাকে শুইয়ে দিয়ে। যারা দেখেছিল তারা বলল চৌধুরীবাবুদের লরি। চৌধুরীবাবু বললেন, 'অত্যন্ত অন্যায়, অবশ্যই অন্যায় হয়েছে। খবর পেয়েই আমি ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। তা শোন খোকা, তোমার এখন প্রধান কর্তব্য মাকে বাঁচিয়ে আনা। চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়। যা লাগে আমি দেব। পাঁচজনে কুপরামর্শ দেবে সেসব কানে নিও না। কি বললে? শরীর বেঁকেছে? বেলেঘাটায় নিয়ে যেতে হবে। সে তো অনেক দূর। তা হোক, বাঁচাতে হবে নিশ্চয়ই। নীলকণ্ঠকে বলে দিচ্ছি, সে টেম্পো করে পৌঁছে দেবে।' পকেটে বিশ টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন চৌধুরীবাবু কাজ চালানোর জন্যে। অতটা পথ মাকে কিভাবে তারা নিয়ে এসেছিল ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। পা কাটা শরীরটাকে সোজা রাখাই মুশকিল ছিল।

কোলকাতা শহর প্রথম দেখল জয়দেব। একদম সিনেমার মত। কিন্তু চোখ দুটো তখন এমন ঘোলাটে যে কিছুই নজর হল না। রাত কাটল না গোলাপবালার। নীলকণ্ঠদার সঙ্গে সঙ্গীবা ফিরে গিয়েছিল পৌঁছে দিয়েই। হাসপাতালের সামনে রাত জেগে ভোরে খবর পেল জয়দেব, গোলাপবালা নেই। ধ্বক করে উঠেছিল বুক। মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। কিন্তু হাউমাউ করে কান্নাটা গলা অবধি এসে থমকে যাচ্ছিল। মা নেই! এ সংসারে সে এখন একা, একদম একা। মাথার ভেতরটা তখন ফাঁকা, সাদা দেখছে চারধার। ঠিক তখনই হাসপাতালের বাবু ডেকে পাঠালো।

ভরতির সময় বলা হয়েছিল এ্যাক্সিডেন্ট কেস। কিন্তু হাউলি থানা জানাচ্ছে সেখানে কোন এ্যাক্সিডেন্টই হয়নি গত সাতদিনে। তাহলে?

কথাটা মাথায় ঢুকল না প্রথমে। চৌমাথার সবাই দেখেছে চৌধুরীবাবুদের লরি মাকে শুইয়ে দিল আর থানা থেকে খবর দিল কিছু জানে না' জয়দেবের বিড়বিড়ানিকে পাত্তা দিল না হাপসাতালের বাবু। বলল, 'এখন বডি ছাড়া যাবে না। এ্যাক্সিডেন্ট কেস অথচ এ্যাক্সিডেন্টই হয়নি। মার্ডার-ফার্ডারও তো হতে পারে। লোকাল থানা থেকে বডি আটকাতে বলেছে। তোকে খুঁজতে এখনই সেপাই আসবে। অসাড় হয়ে গেল জয়দেব। মার্ডার কথাটার মানে সে জানে। লোকটা বলে কি? নিজের মাকে সে খুন করবে? হাসপাতালের বাবু বোঝালো, এমনও হতে পারে পুলিস ভুল করেছে। মানুষমাত্রই ভুল করে। কিন্তু সেটা যে ভুল তা প্রমাণ করা দরকার। না হলে দোষ না করেও অনেকে সারা জীবন জেলে পচে মরে। এখন পুলিস যদি প্রমাণ করতে পারে অন্য কোন লোভে সে নিজের মাকে খুন করেছে তাহলে জজসাহেব ছেড়ে কথা বলবে? তার চেয়ে জয়দেব এখন চুপচাপ হাউলিতে ফিরে যাক। গিয়ে সেখানকার থানা থেকে ধরে কয়ে যদি সত্যি কথাটা লিখিয়ে আনতে পারে তবেই ঝামেলা মিটবে না হলে নির্ঘাৎ হাজতবাস। এ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ হলেই করোনারের কাছে যাবে, সে অনেক হ্যাপা। হাউলি থেকে ঘুরে না আসা পর্যন্ত লাসকাটা ঘরে থাক গোলাপবালা, কোন চিন্তা নেই।

চোরের মত হাউলিতে পালিয়ে এল জয়দেব। চৌমাথায় নেমে দেখল কোন পরিবর্তন নেই। লরিটা যে মাকে মেরে ফেলল তা যেন কেউ মনেই রাখেনি। জীবন স্বাভাবিক সর্বত্র। বৈকুণ্ঠ ডাক্তার চুক চুক শব্দ করল, 'বউ গেলে বউ পাবি রে, গর্ভধারিণী কি আর ফিরে আসে! তা বাছা, কাছা নিস নি এখনো?'

জয়দেবের কান্না পেল, চোখে জল এল না। সমস্যার কথা বলল। শুনে বৈকুণ্ঠ ডাক্তার বলল, 'থানায় যা, বড়বাবুকে ধর। না, ধরে লাভ নেই। কেউ তো ডায়েরী করেনি। পুলিস এলে সাক্ষী দেবে না কেউ। তবু যা, যেতে হয়।'

বড়বাবু কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'কি বললি লরি চাপা পড়েছে? নাম কি? অ। কবে? দুদিন হল! কেউ বলেনি তো। ও হ্যাঁ, আমি তো তাই রিপোর্ট পাঠালাম, এ্যাক্সিডেন্ট

হয়নি। এ্যা, টেঁসে গেছে। যা বাব্বা। ঝামেলা বাড়ল। ও বিধু, এদিকে এসো হে, এ ছোঁড়াকে নিয়ে একবার স্পটটা ঘুরে এসো তো।'

বিধুবাবু, ছোট দারোগা, সব শুনছিল। সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে চলতে বলল, 'এ সব করে কি লাভ? চৌধুরীদের সঙ্গে কেস লড়তে পারবি? লড়লে তোর মায়ের প্রাণ ফিরে পাবি? সাক্ষী দেবে কেউ? নান। বরং চৌধুরীবাবু যদি বলে তুই করেছিস কাজটা তো সবাই বলবে তাই ঠিক। তার চাইতে মাথা ঠাণ্ডা কর। যে যায় সে আর ফিরে আসে না। যারা থাকে তাদের সঙ্গে ঝামেলা করে কি লাভ? এক কাজ কর, সোজা চৌধুরীবাবুর কাছে চল, একটা বিহিত হবে।' লোকটা বেশ ভাল মানুষের গলায় কথা বলল। একটা কিছু বিহিত করা দরকার বুঝতে পারছিল জয়দেব। মাকে মেরেছে চৌধুরীবাবুর লরি, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারে নিশ্চয়ই। ছোট দারোগাবাবু বলল, 'অনেকে অনেক কুমতলব দেবে একদম শুনবি না। ক্ষতিপূরণ, মামলা করা এসব বলবে। আরে যারা বলবে তারাই দেখবি প্রয়োজনের সময় হাওয়া হয়ে গেছে।'

চৌধুরীবাবু বললেন, 'চলে গেল মেয়েছেলেটা' আহা, কে যেন বলছিল ভারী ভাল বাসন মাজতো। কি করবি ছোঁড়া, মা তো আর কারো চিরকাল থাকে না।' চুক চুক শব্দ করলেন তিনি বৈকুণ্ঠ ডাক্তারের মত।

ছোট দারোগাবাবু বলল, 'ও একটা বিপদে পড়েছে স্যার।'

চৌধুরীবাবু বললেন, 'বিপদই বটে, মাতৃদায় বলে কথা।'

ছোট দারোগাবাবু বলল, 'সে তো ঠিকই। কিন্তু আমরা তো কোন খবর পাইনি, মানে ডায়েরী করেনি কেউ। তাই হাসপাতালকে বলেছি এ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। তাই শুনে ইনজুরি কেস বলে হাসপাতাল বলছে বডি ছাড়বে না। এ বেচারাকে টানা-হ্যাচড়া করবে, এই আর কি।'

চৌধুরীবাবু চোখ কপালে তুললেন, 'সেকি কথা, বডি ছাড়বে না? আমাদের হাউলির মেয়েছেলেকে আটকে রাখবে?'

ছোট দারোগাবাবু বলল, 'মানে দাহ করতে দেবে না।'

চৌধুরীবাবু বললেন, 'ভারী অন্যায়। তা তোমরা আমায় একটু জিজ্ঞেস করলে পারতে কি রিপোর্ট দেবে। বলতে পারতে গাছ ফাচ থেকে পড়ে গেছে, চুকে যেত।'

ছোটবাবু বলল, 'না স্যার, ওই পা দেখলেই বোঝা যায় রান-ওভার কেস, পড়লে ওরকম হয় না।'

চৌধুরীবাবু বললেন, 'তা রান-ওভারই লিখতে। হাজারটা গাড়ি ছুটছে রাস্তা দিয়ে। যে কেউ মেরে পালিয়ে যেতে পারত, তোমরা সব কেস ধরতে পারো। তাই লিখে দাও।'

ছোট দারোগাবাবু বলল, 'তা হয় না আর। মানে একবার লিখলে আর পালটানোটা আইনসম্মত, মানে অসম্মানের ব্যাপার।'

চৌধুরীবাবু বললেন, 'বাজে কথা রাখো তো। ভুল সংশোধন মানে রেক্টিফিকেশন কথাটা ডিকসনারীতে আছে কেন। সময় নিয়ে লেখ, আজই লিখতে হবে তার কোন মানে নেই।'

পরদিন ফিরে এল জয়দেব কোলকাতায়। ছোট দারোগাবাবু বলেছেন কোন চিন্তা নেই। ভুল স্বীকার করে তিনি রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। হাসপাতালে এসে খবরটা দেবার আগেই সিপাই তার হাত ধরল। জয়দেব যত বোঝায় কে শোনে কার কথা। ক'দিন লকআপে থেকে শেষে ছাড়া পেয়েছে আজ। হাউলি থেকে রিপোর্ট এসেছে গোলাপবালা গাড়িচাপা পড়েছিল। চালক গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে ধরা যায়নি।

চৌধুরীবাবু সেবার দিয়েছিলেন বিশ, এবার একশ। বলেছিলেন, 'মায়ের কাজ করে ফিরে আয় হাউলিতে, আমি তো আছি, কোন চিন্তা নেই তোর।'

সেই টাকাটা এখনও আস্ত আছে। থানার সেপাই দুটো টাকা নিয়েছিল মাত্র কিন্তু এখনও

তার পকেটে একশ দু'-তিন টাকা রয়ে গেছে। হাসপাতালের বাবু বলেছে দশ টাকা দিতে হবে পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট নিয়ে যাতে কোন ঝামেলা না হয় সেই জন্যে।

একটা ঝিমুনি এসেছিল। শরীর আর সোজা রাখতে পারছে না। জয়দেব চোখ মেলে দেখল বেলা গড়িয়ে আসছে। হাসপাতালের বাবু বলেছিল সময় হলেই ডাকবে, ডাকছে না কেন? জয়দেব উঠল।

বাবুর সামনে বেজায় ভীড়। লোকগুলো খুব চেঁচাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ওদের খুব তাড়াতাড়ি আছে। বাবুও যেন ওদের খুসী করার জন্যে খুব চেষ্টা করছেন। ওই ভীড় ঠেলে নিজের কথা বলার সাহস পেল না জয়দেব। চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ওদের কাণ্ড। এই কয়দিনে লকআপে বসে সে অনেক দেখেছে। দশ দিন আগের প্রথম কোলকাতায় আসার সঙ্গে এখনকার দেখার কোন মিল নেই। কে বুঝতে পারছিল এই লোকগুলো খুব বড়লোক। তাদের কেউ আজ সকালে মারা গেছে। ডেডবডি পাওয়ার ব্যাপারে কোন দেরী ওরা সহ্য করতে পারছে না। এই নিয়ে কত রকমের চোখরাঙানি চলতে চলতে হঠাৎ সব শান্ত হয়ে গেল। কেউ মারা গেছে অথচ ওদের ভাবভঙ্গীতে সেটা একদম বোঝা যাচ্ছে না। কাজ হাসিল করে ওরা চলে গেলে বাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। কিন্তু তাকে একটুও বিরক্ত দেখাচ্ছিল না।

জয়দেবকে দেখতে পেয়ে বাবু চিনতে পারল, 'আয়। এবার তোর কাজটা করে দিই। 'উঃ, বড়লোকের ছেলে মরলে হাজার ঝামেলা।' জয়দেব দেখল কাগজের আড়ালে বাবু কিছু লুকোল। তারপর খসখস করে কিছু লিখে বলল, 'দে।' জয়দেব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল বাবু হাসল, 'কথাটা মনে নেই?' মনে ছিল। দশটা টাকা দিতেই একটা কাগজ তৈরী হয়ে গেল বাবু বলল, 'ব্যাস। আর কোন ঝামেলা নেই। যা, এখন মনের সুখে তোর মাকে দাহ কর। আমি এখনই অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। মর্গে চলে যা।'

বেলেঘাটায় লাশকাটা ঘর নেই। শেয়ালদার কাছে সেটা। ক'দিন ঘুরে ঘুরে পথ চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু চেনা হলেও পথ হাঁটতে ভারী ভয় করে জয়দেবের। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় গাড়িগুলো গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। খিদে পেয়েছে খুব। হাসপাতালের সামনে ফুটে-বসা দোকান থেকে আলুবদম রুটি খেয়ে নিল সে। কোলকাতায় খুব সস্তায় নানান রকম খাবার পাওয়া যায়।

লাশকাটা ঘরের অফিস থেকে অনুমতি পাওয়া গেল। জয়দেব মাকে নেবার জন্যে এগিয়ে যেতেই দেখল খুব ধুমধাম করে গাড়ি সাজিয়ে সেই বাবুগুলো হরিধ্বনি দিতে দিতে একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে ওদের বাড়ির ছেলেরও ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। কিন্তু কেউ কাঁদছে না কেন? কেন অমন চিৎকার করে হরিধ্বনি দিচ্ছে।

মৃতদেহ চলে গেলে ওদের দেখতে পেল জয়দেব। গোল হয়ে টাকা গুণছে। এদের চেহারা হাউলির হাসপাতালের লোকগুলোর মতনই। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করার পর জয়দেবকে দেখতে পেল ওরা। চেহারায় মালুম হল নেহাৎই সে ফালতু পার্টি। গা করল না ওরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে জয়দেব বুড়ো মতন একজনকে ধরল।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কদ্দিনের মড়া?'

'মা। দশ দিন হল মারা গেছে।'

'দশ দিনের মড়া? ওরে বাব্বা, গলে পচে ফুটবল হয়ে গেছে। দাঁড়াও অর্ডারটা নিয় আসি।' অফিস ঘরের দিকে লোকটা চলে যেতে জয়দেব হতভম্ব হয়ে গেল। মা পচে গেছে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মড়া বাসি হলে শরীরে পচন আসে। একবার হাউলির নদীতে একটা পচা মড়া ভেসে এসেছিল। কি দুর্গন্ধ! মা কি সেরকম হয়ে গেছে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হল জয়দেবের। মায়ের যে ছবিটা মনের মধ্যে খোদাই হয়ে আছে সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকল।

লোকটা ফিরে এসে বলল 'বাসচাপা কেস। পা দুটো নেই? বাইশ নম্বর। দশটা টাকা বের করো।'

'দশ টাকা? কিসের জন্যে?'

খুব কম করে বললাম তোমার চেহারা দেখে। আমরা পেয়ে থাকি।'

কেন?'

আঃ এ তো খুব ফ্যাচাং করে। ঘর থেকে ওটাকে টেনে বের করতে হবে না? যা গন্ধ তাতে দশ টাকা তো বহুৎ কম বলেছি। এই একটু আগে যারা মড়া নিয়ে গেল তারা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেল। হেঁ হেঁ। বউনি হয়ে গেছে বলে তোমায় কম বলছি।' লোকটা ফোকলা দাঁতে হাসল।

মায়ের শরীরটাকে বাইরে বের করে দেবে বলে লোকটা টাকা চাইছে? এই কাজটার জন্যে নিশ্চয়ই ও মাইনে পায়! মাথা গরম হয়ে গেল ওর। কোলকাতায় আসার পর ক্রমশ ওর মনে হচ্ছিল চারধারে শুধু শকুনের মেলা। সুযোগ পেলেই এরা ঠোকর মারে। সে মাথা নাড়ল, না আমার টাকা অত সস্তা না। গরীব মানুষ দেখেও তোমাদের মায়া হয় না?

হয়। সেইজন্যেই দশটা টাকা চাইলাম। ঠিক আছে বলছ যখন পাঁচটাই দাও।

মাথা নাড়ল জয়দেব। না, এ কাজে সে টাকা দেবে না। তার পকেটে এখন মাত্র বিরানব্বই টাকা আছে। সামনে কত খরচ। মাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে দাহ করতে হবে। কোলকাতার রীতিনীতি সে কিছুই জানে না।

লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসল 'তাহলে যাও, নিজের মাকে নিজেই বের করে আনো। কত ধানে কত চাল টের পাবে বাছাধন।'

জেদ চেপে গেল জয়দেবের। তাই করবে সে। মায়ের শরীরটা তো পাখীর মত হালকা। সে নিজেই কোলে করে বের করে নিয়ে আসবে। ছেলে হয়ে সে এটুকু করতে পারবে না! লোকটা মিটিমিটি হাসছে এখন। বলল, 'ওই ঘর, দেখবে পায়ে লকেট ঝোলানো আছে তাতে নম্বর লেখা। ও হ্যাঁ, তোমার মায়ের তো আবার পা নেই, হাতে লাগানো হয়েছে। বাইশ নম্বর। দেখো আবার অন্য মড়া বার করে এনো না।' লোকটার হাসি যেন থামছিল না।

জেদে মানুষ অন্ধ হয়। পঙ্গু পাহাড় ডিঙোয়। জয়দেব সোজা বারান্দায় উঠে গেল। ও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোকটা আরো দু'তিন জনকে ডেকে তাকে দেখিয়ে হাসছে। রাগে মাথা ঝিমঝিম করছিল।

দরজা ঠেলতেই ভক করে একটা চিমসে অথচ তীব্র গন্ধ নাকে এল। যেন কেউ তাকে আচমকা ধাক্কা দিয়ে ছিটকে সরিয়ে দিচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে ঘরে ঢুকে পড়তেই গন্ধটা তীব্র হয়ে ঢেউয়ের মত তাকে জড়িয়ে ধরল। প্রাণপণে নিজেকে ঠিক রাখতে চেষ্টা করে চোখ চাইল জয়দেব। সামনে সার সার শরীর পড়ে আছে। ফুলে ফেঁপে বেঢপ শরীর। মুখ দেখে কিছুই চেনা যায় না। সবাইকে এক দেখায়। চকিতে পায়ের কথা মনে পড়তেই গোলাপবালার শরীরটাকে সে দেখতে পেল। ওকি তার মা? সেই শীর্ণ গোলাপবালা? এক পা এগোতে গিয়েই মাথা ঘুরে গেল জয়দেবের। পেটের ভেতরটা গোলাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সামনের একটি মৃতদেহের বীভৎস মুখের দিকে তাকাতেই তার মনে হল সে পড়ে যাবে, চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছে। হঠাৎ পেছন থেকে একটা আকর্ষণ অনুভব করল সে। কেউ যেন তাকে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। চারধারে আলো, নির্মল বাতাস, জয়দেব ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে লাগল। কটি আলুরদমগুলো সবেগে বেরিয়ে এল পেট থেকে। সমস্ত শরীরে ঘাম, ঝিমঝিমে অবস্থা। সেই মুহূর্তেও কানে এল কারা খ্যা খ্যা করে হাসছে। চোখ তুলল সে কোন রকমে। ওর মাথার ওপর নীল আকাশ। ফুরফুরে হাওয়ায় ঘাম শুকোচ্ছে। চেতনা ফিরে এলেও বোধ কেমন অস্বচ্ছ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। বুড়োটা জিজ্ঞেস করল, 'মাতৃদর্শন হল?'

'একদম বিশ্বরূপ দর্শন।' আর একজন টিপ্পনী কাটল।

'যাকে যা মানায় তাকে তাই করতে দেওয়া উচিত। এ হল বাবা বিধাতার নিয়ম। চল্লিশ বছর শুধু শুধু এখানকার বাতাস শুঁকলাম! আমি না ঢুকলে তো তুমি মায়ের পাশে শুয়ে থাকতে এতক্ষণ! আবার তেজ কত! নাকি আমার মা আনব। আজব। আরে প্রাণ গেলে সব মানুষই মড়া হয়ে যায়। দাও পাঁচটা টাকা।'

একটুও প্রতিবাদ করল না জয়দেব। পকেট থেকে টাকাটা বের করে মাটিতে রাখল। উবু হয়ে বসেছিল সে, শরীর এখনও অবসন্ন। লোকটা টাকাটা নিতেই আর একজন বলল, 'বডি তো বের করে দিচ্ছ, শ্মশানে নিয়ে যাবে কে? এ ছোঁড়ার সঙ্গে তো আর লোকজন দেখি না।'

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে আর কেউ নেই?'

ঘাড় নাড়ল জয়দেব, না।

'তাহলে পোড়াতে নিয়ে যাবে কি করে! যা বাবাঃ। ডেডবডি বের করে রাখলে তো এখানে কেউ টিকতে পারবে না। কি করা যায় বল তো?' সঙ্গীদের দিকে তাকাল লোকটা। এই মুহূর্তে তাকে খুব নরম দেখাচ্ছিল।

জয়দেবকে ঘিরে ওরা কিছুক্ষণ আলোচনা করল। তারপর একজন এসে শুধোল, 'পকেটে টাকা পয়সা আছে?'

জয়দেব তাকাল। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কত?'

'পঞ্চাশ।'

'কেন?'

'তাহলে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

বুড়ো লোকটা এবার বুঝিয়ে বলল। কাছাকাছি শ্মশান বলতে নিমতলা ঘাট। তা সেখানে তো আর জয়দেব একা নিয়ে যেতে পারবে না মাকে। ও রকম পচা ধনুষ্টঙ্কারের মৃতদেহকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে দেবেও না পাবলিক। একটাই উপায় আছে গাড়ি ভাড়া করা। ওদের জানাশোনা একটা টেম্পো আছে, তার ড্রাইভারকে ধরে কয়ে রাজী করানো যেতে পারে। তা যত কমই হোক টেম্পোওয়ালা পঞ্চাশ টাকার নীচে রাজী হবে না, ওই রেট।

জয়দেব তখন কিছুই ভাবতে পারছিল না। খুব দ্রুত হাঁটতো মা। তর তর করে। পাখীর মত হালকা শরীর নিয়ে খাটতে পারত খুব। তার কি চেহারা হয়েছে এখন। জয়দেবের মনে হল আর বেশীক্ষণ মায়ের শরীরটা পৃথিবীতে রাখলে তার পাপ বেড়ে যাবে। পকেটে যে টাকা আছে তার বিনিময়ে—! সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বুড়ো লোকটা সঙ্গীকে টেম্পোর সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়ে কোমর থেকে গামছা খুলে মুখে জড়িয়ে নিল। তারপর সদর্পে লাশটাকা ঘরে ঢুকে গেল। উবু হয়ে বসে তাকিয়েছিল জয়দেব। খানিক বাদেই দেখতে পেল বুড়ো দড়ি বেঁধে গোলাপবালাকে টেনে বের করে আনছে বাইরে। দরজা বন্ধ করে দড়িটা খুলে নিয়ে বুড়ো এগিয়ে এসে বলল, 'শরীরে আর কিছু নেই।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল জয়দেব। আচমকা একটা কটু গন্ধ নাকে লাগল। এত কটু যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। খোলা আকাশের নীচে বলে কোন রকমে সে সামলে নিল। তারপর এক পা এক পা করে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে গোলাপবালা। নগ্ন শরীরে কোন রকমে একটা কাপড় জড়ানো। মুখ চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু পা দুটো মুড়িয়ে কাটা। সেই কাটা জায়গাটা বীভৎস দেখাচ্ছে। চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে, চামড়া ফুলে যাওয়ার জন্যেই টানটান হয়ে গিয়ে কেমন সাদাটে ভাব এসে গেছে। মুখ হাঁ হয়ে থাকায় ভাল করে তাকানো যাচ্ছে না। একি গোলাপবালা? তার মা? নরম ছোট্ট শরীরে যার মায়াময় গন্ধ বের হতো। জয়দেবের সমস্ত শরীর পাক দিচ্ছিল। সে অবিশ্বাস নিয়ে আর একবার তাকাতেই বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা

দেখতে পেল। গোলাপবালার ওই আঙুলটা কাটা ছিল, এরও আছে।

জয়দেব কখন নিজের অজান্তে গোলাপবালার কাছ থেকে সরে এসেছে সে নিজেই জানে না। দশ দিন ধরে যে টানাপোড়েন চলছিল বুকের মধ্যে তা যেন হঠাৎই থমকে গেল। এই চেহারা দেখার পর সে যেন কিছুতেই জীবন্ত গোলাপবালাকে স্মরণ করতে পারছে না। বুড়ো বলল, 'মানুষের শরীর মাটির চাইতেও কমজোরী। ক'দিনেই দ্যাখো গলে হেজে গেল। অথচ ওই শরীরে তুমি দশ মাস শুয়েছিলে। যেই প্রাণ ফুড়ুৎ হয়ে গেল অমনি ভালবাসা মরে গেল। তা যাক, এখন কথা হল একে তুমি নিয়ে যাবে কি করে, যা গন্ধ ছড়াচ্ছে!'

এই সময় ঘটাং ঘটাং করে একটা টেম্পো এসে হাজির হল। টেম্পোওয়ালা চিমড়ে ধরনের, মাথায় একগাছিও চুল নেই। গাড়ি থেকে নেমেই চিৎকার করে উঠল, 'ওরে বাপ, কি দুর্গন্ধ। না না আমি পারব না নিয়ে যেতে, ওরে ব্বাস, অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসছে, ওয়াক্।'

বুড়ো ছুটলো। টেম্পোওয়ালার কাছে গিয়ে হাত পা নেড়ে জয়দেবকে দেখিয়ে কিসব বলতে লাগল। টেম্পোওয়ালা তখনও মাথা নেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'সত্তর টাকার নীচে আমি নিতে পারব না। ও মড়া নিয়ে গেলে গাড়ি ধুতে হবে।'

বুড়ো ছুটে এল জয়দেবের কাছে, 'শুনলে তো কথা। আমি বলি কি ওতেই রাজী হয়ে যাও। মাতৃদায় বলে কথা।'

জয়দেবের মনে হল বুড়ো নিশ্চয়ই এককালে তার আত্মীয় ছিল। এত ঝামেলা লোকটা যে তার জন্যে সামলাচ্ছে তাই সে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। তার পকেটে এখন সাতাশি টাকা রয়েছে। সত্তর যদি চলে যায় তাহলে দাহ খরচ কিসে হবে? বুড়ো বলল, 'শ্মশান হল যাওয়ার রাস্তা। একবার সেখানে পৌঁছে গেলে কেউ কি পড়ে থাকে? কিন্তু এই গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গেলে পাবলিক তোমাদের ঢিল মারবে। দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি। পাঁচটা টাকা ছাড়ো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেঁড়া কাপড়ে প্রায় মুড়ে দিল বুড়োটা। তারপর একটা বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে দিল শরীরে। দিয়ে বলল, 'গন্ধ লাগছে আর?' জয়দেব বুঝল আর একটা চড়া গন্ধ নাকে আসছে। ওষুধ ওষুধ। বুড়ো যখন শরীরটাকে টেম্পোয় তুলে দিল তখন ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'রস গড়াচ্ছে নাকি? তাহলে কাগজ পেতে শোওয়াও।'

বুড়ো বলল, 'রাখো, বললে তো গাড়ি ধুয়ে ফেলবে।'

ড্রাইভার জয়দেবকে বলল, 'এ্যাই, তুমি বডির পাশে গিয়ে বস। পাবলিক প্যাঁদালে তুমি বুঝবে। তাছাড়া মড়া ছুঁয়ে থাকতে হয়।'

গাড়ি ছাড়ার আগে ড্রাইভার বুড়োর সঙ্গে কিছু কথা আলাদা বলে এলে বুড়ো বলল, 'যাও বাছা, মায়ের কাজ করো। বল হরি, হরিবোল।'

কোলকাতা শহরের ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। মায়ের শরীর ছুঁয়ে বসেছিল জয়দেব। এখন দুটো গন্ধ পাশাপাশি নাকে ঠেকছে। সে মায়ের শরীরটাকে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু চুলগুলো বাইরে বেরিয়ে আছে। আঙুলে চুল স্পর্শ করতেই অদ্ভুত অনুভূতি হল। ছেলেবেলায় মা ঘুমুলে এই চুলে মুখ ডুবিয়ে থাকতো, ঘুম ভেঙে গেলে মা চেঁচাতো। নারকোল তেলের গন্ধটা অদ্ভুত মিষ্টি লাগতো তখন। এখন চুলগুলো লালচে, খসখসে।

ঘাড় ঘুরিয়ে জয়দেব ট্রাম-বাস দেখল। এবং তখনই চোখে দু'পাশের মানুষজন নাক চাপা দিচ্ছে। ড্রাইভার খুব তাড়াতাড়ি চালাবার চেষ্টা করলেও লোকজনের মুখে বিরক্তিটা চোখ এড়াল না। যেন কোলকাতা শহরকে অপবিত্র করছে গোলাপবালা। পাশে দাঁড়ানো একটা বাসের যাত্রীরা চিৎকার করে গালাগালি শুরু করল নাক টিপে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল জয়দেব। লোকগুলো যদি তাকে মারে! ছেলে হয়ে সে মায়ের শরীরটাকে কেন পচতে দিল।

গোলাপবালার ওপর তার ক্রমশ রাগ হতে লাগল। কি পাপ করেছে সে যে মরে গিয়েও মা তাকে এমন যন্ত্রণা দিচ্ছে। প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তো মা আর এই শরীরটায় নেই। আকাশ থেকে নিশ্চয়ই মজা দেখছে এখন। টেম্পোটা লাফিয়ে উঠতেই গোলাপবালার শরীরটা নড়ে উঠল। চমকে উঠল জয়দেব। তাবপর আঁকড়ে ধরল দেহটাকে। তারপর চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। মায়ের বড় শখ ছিল কোলকাতা দেখার, কালীঘাট দেখার। মা, আমরা গাড়ি করে কোলকাতার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। চোখ বন্ধ থাকায় জয়দেব টের পেল না যে সে চিৎপুর পেরিয়ে যাচ্ছে।

শ্মশান তো নয়, মেলা বসে গেছে চারধারে। টেম্পোওয়ালা পুরো টাকা গুণে নিয়ে চলে যাওয়ার পর ওদের ঘিরে ভীড় জমে গিয়েছিল। সবাই নাকে হাত চেপে কি দেখতে চায়। একজন বলল, 'কদ্দিন? ওরে, বাবা, দশ দিনের মড়া পোড়াতে গেলে তো কাঠে কুলোবে না, টায়ার লাগবে। কাগজপত্র সব ঠিকঠাক আছে? তো যাও অফিসে লিখিয়ে এসো।'

হাসপাতালের কাগজে কাজ হল। নাম লেখানোর সময় পকেট খালি হয়ে গেল জয়দেবের। সে ফিরে এসে দেখল ভীড়টা বেড়েছে। সবাই যেন একটা আজব জিনিস দেখছে নাক চাপা দিয়ে। কি করে হল, কোথায় হল, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জয়দেব নাজেহাল। তার মনে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে ততই মঙ্গল।

প্রায় দেড়শ টাকা লাগবে। অঙ্কটা শুনে জয়দেবের কোনই বিকার হল না। সে যখন জানাল তার পকেটে পয়সা নেই তখন ভীড় ফাঁকা হয়ে গেল আচমকা। ঘন ঘন মৃতদেহ আসছে হরিধ্বনি দিতে দিতে, তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল ওরা। মায়ের পাশে উবু হয়ে বসে থাকল জয়দেব। ওষুধের গন্ধটা কেটে গেছে এতক্ষণে। পচা গন্ধটা তীব্র হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এখন সেটা নাকে একটুও ঠেকছে না, কখন যেন অভ্যাস হয়ে গেছে গন্ধটা। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন, মাথা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল।

'এ্যাই শালা, এমন মড়া নিয়ে এসেছিস বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছিস। শালা গন্ধে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে; মালের নেশাও ঝুল হয়ে গেল। এ্যাই, পোড়াচ্ছিস না কেন?'

ধমক শুনে চোখ মেলল জয়দেব। মুখগুলোকে চিনতে পারল সে। এদের সে বেলেঘাটায় দেখেছে, লাশকাটা ঘরে দেখেছে। কি বলবে সে বুঝতে পারল না। জড়ানো গলায় সামনে দাঁড়ানো একজন বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে পুড়িয়ে ফেল, কে হয় তোর?'

'মা।'

'মার্ডার কেস? বয়স কত ছিল?'

কথাটা শুনেই কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল জয়দেবের। কিন্তু লোকগুলোর জামাকাপড় দেখে সে চোখ সরিয়ে নিল। এরা এত বড়লোক, এদের সঙ্গে কি কথা বলতে পারে সে! আবার মুখ নামিয়ে নিল সে।

জড়ানো গলায় বলল, 'মুখে বাক্য নেই যে! পচা মড়া নিয়ে শোক করলে চলবে? না, না, এখানে মড়া রেখে গন্ধ ছড়ালে চলবে না। দশ মিনিট টাইম দিলাম। শালা গন্ধে আমাদেরটা না উঠে বসে!'

লোকজন আর কাছে ঘেঁষছে না। সন্ধে ঘনিয়ে এল। জয়দেব বুঝে উঠছিল না সে কি করবে। মা তুমি এমনি করে প্রতিশোধ নিচ্ছ তখন কথা শুনতাম না বলে! ঝিমুনিটা বেড়ে যাচ্ছিল, শুতে ইচ্ছে করছিল খুব।

'সত্যি সত্যি টাকা নেই?'

গলাটা শুনে তাকাল জয়দেব। মুখে পাকা দাড়ি, চোখ লাল একজন দাঁত খুঁটতে খুঁটতে ওকে জিজ্ঞাসা করছে। জয়দেব ঘাড় নাড়ল, 'নেই।'

'তাহলে কি করে পোড়াবি?'

'জানি না, যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে।'

'আমি যদি পুড়িয়ে দিই কি দিবি?'

জয়দেব ভেবে পেল না কি দিতে পাবে! কেউ যদি দয়া করে তাহলে হাউলিতে গিয়ে সে টাকা যোগাড় করে আনতে পারে। কিন্তু এখন?

'একটু চালাকি করতে হবে। এতদিনের মড়াকে ইলেক্‌ট্রিকে শোওয়ানো নিষেধ আছে। কিন্তু সে আমি বুঝব। এখন বল কি দিবি?'

গলা শুকিয়ে গেছে জয়দেবের, কোন বকমে বলল, 'কিছুই নেই আমার।'

'আছে, আছে।' খপ করে তার কনুই-এব ওপরটা ধরল লোকটা। দুটো আঙুল দিয়ে রুপোর তাবিজটা নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, 'এটা খোল।'

হাঁ হয়ে গেল জয়দেব। সমস্ত শরীর অসাড়। তাবিচটা চাইছে লোকটা? বাবাব থানে মানত কবে জমানো টাকা দিয়ে তাবিচটা বানিয়ে দিয়েছিল গোলাপবালা। খুব বড় ফাঁড়া আছে ছেলের, বার বার কবে বলে দিয়েছিল এটা যেন কখনও হাত থেকে না খোলে। কত দাম এর? গোলাপবালা বলল, 'জামার তলায় ঢেকে বাখবি, রুপোব এখন খুব দাম।'

'কিরে দিবি? কবচ হাতে বেঁধে কি হবে যদি মায়ের শবীর পচে' ছেলেব কাজ কর। তোকে দেখে মায়া হল বলে এলাম।'

টাইট হয়ে গিয়েছিল চেনটা। অনেক কষ্টে খুলল জয়দেব। লোকটা একবাব আকাশে ছুঁড়ে লুফে নিল ফের। তারপর বলল, 'আমি ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎকার করে তোকে গালাগাল করব। দুটো একটা চড়ও মারব। তুই চুপ করে মার খাবি। বুঝলি? নে, নিয়ে আয় ওটাকে। জলদি।'

বিদ্যুৎ বয়ে গেল শরীরে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জয়দেব। দুহাতে গোলাপবালাকে তুলে নিতে গিয়ে শরীব টলল। মাগো, কি ভারী হয়ে গেছ তুমি। হাতের মুঠোয় কি বকম অনুভূতি লাগছে। কোন রকমে সামলে নিয়ে সে লোকটিব পেছন পেছন চলতে লাগল। আশেপাশে যারা ছিল তারা অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। একটা মেশিনের মত জিনিসেব সামনে গিয়ে লোকটা সুইচ টিপতেই জয়দেব দেখতে পেল লম্বা মতন শোওযাব জাযগা বেবিযে এসেছে। চাপা গলায় লোকটা বলল, 'শুইয়ে দে এখানে চটপট।'

গোলাপবালাকে সেই জায়গায় নামিয়ে দিতেই সটাং কবে ভেতরে চলে গেল। আব সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিল, 'কেন মিথ্যে কথা বললি: কেন বললি অমুক বাবুর নাম। হায় হায় কাকে ঢোকাতে কাকে ঢোকালাম।' চড লাথি চালাতে লাগল লোকটা, 'তোর জন্যে আমার চাকরী যাবে, হায় ভগবান।' মাটিতে শুয়ে পড়েছিল জয়দেব মারের চোটে। ভীড় জমে গেছে চারধারে। নানান লোক নানান কথা বলছে। একজন গালাগালি দিচ্ছে লোকটাকে, সে কি করে এমন ভুল করল! হই হট্টগোল চরমে। ওকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে সুপারিশ করছে অনেকে। শ্মশানের বাবু এই মারে কি সেই মারে। যার হাতে মেশিনের দায়িত্ব সেই লোকটা ওকে অবশ্য আড়াল করে দাঁড়িয়ে ওকেই গালাগালি দিচ্ছে। এই সময় একটা গলা শোনা গেল, 'কি আরম্ভ হয়েছে। শ্মশানের মত শান্তির জায়গাতে এ সব করতে ভাল লাগে। কত খরচ লাগছে বল দিয়ে দিচ্ছি।'

শ্মশানের বাবু বলল 'আপনি মহৎ লোক কিন্তু কাজটা অন্যায় কবেছে। আপনাব মাতৃশোক তাই এ কথা বলছেন।'

আধঘণ্টাটাক পরে লোকটা তাকে ডাকল। শরীর থেকে রক্ত বেরিয়েছে, প্রচণ্ড ব্যথা, জয়দেব উঠে বসল। লোকটা বলল, 'এদিকে আয়। বেঁচে গেলি। মায়ের দায় বলে কথা।'

জয়দেব দেখল এখন ভীড় নেই। দু-একজন ওর দিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে। সে

কোন রকমে টলতে টলতে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা মেশিনের তলা থেকে ছাই মেশানো কিছু একটা ভাঁড়ে তুলে বলল, 'নে তোর মায়ের পঞ্চাত্মা। পাশেই মা গঙ্গা, দিয়ে ঋণমুক্ত হ।' জয়দেব ভাঁড়টাকে দেখল। মায়ের শরীরটা এখন ওইটুকু। লোকটা হাসল, 'কেমন হল বল এখন আর পচা গন্ধ পাচ্ছিস ওই থেকে?'

নিজের অজান্তে ভাঁড়টাকে নাকের কাছে এনে মাথা নেড়ে না বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জয়দেব। হঠাৎ যেন কটু গন্ধটাকে টের পেল সে। তবে এবার গন্ধটা আসছে তার নিজের শরীরের ভেতর থেকে, সারাজীবন যে গন্ধটাকে বয়ে বেড়াতে হবে তাকে। ভাঁড়টাকে গঙ্গায় ছুঁড়ে দিলেও যে দায় ঘুচবে না।

[১৯৮১/১৩৮৮]

দিয়ে যাওয়া

মেঝেতে পাতা বিছানায় শোয়া বিজনের একদম অভ্যেস নেই, গায়ে পিঠে খুব বেদনা হয়ে যায়। অথচ এই ঘরে যে ছোট ডিভানটা রয়েছে তাতে দুজনের কুলোবে না। আর একটা খাট কিনতে হবে, বাইরের লোকজন এলে মুশকিলে পড়তে হয়। অবশ্য এর আগে এমন কেউ আসেনি যে নিজেদের শোয়ার খাট ছেড়ে দিয়ে ওদের বাইরের ঘরের মেঝেতে শুতে হয়েছে। বিজন মুখ ফিরিয়ে দীপাকে দেখল, শোয়ার ভঙ্গীতে মনে হচ্ছে ওর কোন অসুবিধে হচ্ছে না। যেন এইরকম শক্ত মেঝেতে শুতে ও আজন্ম অভ্যস্ত। দীপা কি অদ্ভুতভাবে সবকিছু মানিয়ে নিতে পারে। ওর বিয়ের আগের স্বাচ্ছন্দ্য আর এখনকার অভাবটভাবগুলোর মধ্যে যেন কোন ফাঁকা জায়গা নেই। যেসব মেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করে তাদের মনের জোর বোধ হয় খুব জোরালো হয়ে যায়।

এতদিন যে কথাটা মনে হয়নি, ওদের এই দু'ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে এখন। মাত্র বছর দেড়েক ওদের বিয়ে হয়েছে, এখনও ভাল করে ঘরদোর সাজানো হয়নি। জিনিসপত্রে ঘর জুড়ে আছে, কিন্তু তবু সেই দেশলাই বাক্সের উপমাটাই বার বার মনে আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠল বিজন, বড্ড গরম হচ্ছে। এ-ঘরে ফ্যান নেই। ওদের যাবতীয় সম্পত্তি পাশের ঘরে, ওদের শোয়ার ঘরে। আলো না জ্বেলে ভেতরের বারান্দায় এল ও। দরজা খোলার সময় শব্দ বাঁচাতে গিয়েও জোর শব্দ হল। মাঝরাত্রে শব্দগুলোর প্রাণশক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে যায়। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেতে খেতে মনে হল পাশের ঘরেও ফ্যান ঘুরছে না। চিরকাল হাত পাখা চালিয়ে ফ্যানের হাওয়া দাদুর একদম সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় দেখেছে, ঘুমোতে ঘুমোতে দাদুর একটা হাত পাখাটাকে ঠিক নেড়ে যেত। কি মনে হল, বিজন ওদের শোয়ার ঘরে উঁকি দিল। দরজা বন্ধ করেননি দাদু। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরটা বেশ দেখা যায়। ও-পাশের জানলা দিয়ে ফিকে চাঁদের আলো ওদের খাটের বাজুতে এসে পড়েছে। সাদা ধপধপে বিছানায় দুই পা সোজা করে দাদু শুয়ে আছেন। দাদুর গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা, এই নব্বুই বছরেও রঙটা মরেনি। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে গিয়ে কি রূপময় লাগছে এই মুহূর্তে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে এল বিজন। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ও বুঝতে পারল দীপা জেগে আছে। বিজন বলল, 'ঘুমোওনি?'

পাশ ফিরে শুয়ে দীপা বলল, 'বড্ড গরম, ঘাড় গলা একদম জবজব করছে।'

বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতড়ে একটা সিগারেট বের কবল বিজন। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে চট করে ঘুম আসতে চায় না। এই সময় সিগাবেট খেতে মন্দ লাগে না। দেশলাইটা জ্বালতেই অন্ধকার ছিটকে সরে গিয়ে আবাব ছুটে এল। শুযে শুযে সিগাবেটে টান দিয়ে বিজন বলল, 'তোমাব খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'ধ্যুৎ, দাদুর জন্যে তো আলাদা করে কিছু কবতে হচ্ছে না। প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এখন দেখছি একদম মাটির মানুষ।' তারপব একটু চুপ কবে থেকে আদুরে গলায় বলল, 'এই, আমাকে একটা টান দাও!'

হাত সরিয়ে নিল বিজন, 'না, তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে। বাঙালী মেযেব সিগাবেট খাওয়া কি!' তাবপব আবার কি ভেবে দীপার হাতে সিগাবেটটা দিযে দিল ও। মাঝে মাঝে দীপার মাথায় এরকম ভূত চাপে। টেবিল থেকে সিগারেটেব প্যাকেটটা দিযে যেতে বললে নিজেই ধবিয়ে এনে দেয। এ নিযে অনেক ঠাট্টা কবেছে বিজন। ব্যাপাবটা সবটাই মজা দীপাব কাছে। দীপাব কাছ থেকে সিগারেটটা ফেরত নিতে নিতে বিজন বলল, 'এসময তোমাব পেটে নিকোটিন যাওয়া ঠিক নয়, বুঝলে!'

'কেন?'

'পেটের ভিতর যিনি আছেন তিনি অসুস্থ হযে পডতে পাবেন।' সঙ্গে সঙ্গে বিজনেব কোমবে প্রচণ্ড চিমটি কাটল দীপা। প্রায চীৎকাব কবে উঠেছিল বিজন, দীপা চাপা গলায় বলল, 'বদমাস!'

খানিকবাদে দীপা বলল, 'আমাদেব এই সতুবদ্যিটা একদম বোগাস, সামান্য কাটা ঘাযেব জন্যে ইঞ্জেকশন দিতে চায়, বোঝ!' ওদেব পাডাব ডাক্তাব এস. কে. বায়কে দীপা ঠাট্টা কবে সতুবদ্যি বলে। সামান্য জ্বরজারি হলেও ইঞ্জেকশন ছাড়া কথা বলে না। অল্প পযসায় চট করে অসুখ সেরে যায় বলে রুগী উপচে পড়ে। বেশীব ভাগই গরীব গেরস্ত মানুষ। সেই সতুবদ্যির কাছে দাদুকে নিয়ে গিযেছিল দীপা। দিন সাতেক আগে দাদুব বাঁ হাতের আঙুলেব ফাঁকে ঘা-টাকে আবিষ্কার করেছিল ও। দাদু বলেছেন, বেশ কদিন থেকেই ওটা হয়েছে, সারছে না কিছুতেই। দীপা দু-একটা মলম দিয়ে কমাতে না পেরে আজ সতুবদ্যিব কাছে নিযে গিয়েছিল। সতুবদ্যি সব দেখেশুনে একটা ইঞ্জেকশানের কোর্স কমপ্লিট কবতে বলেছিল। দীপা আপত্তি করায় একজন স্কিন স্পেসালিস্টকে দেখাতে বলেছে। বিজন অবশ্য এতটা গুরুত্ব দিতে রাজী নয় ব্যাপারটাকে। কিন্তু দীপার আবার ডাক্তার দেখানো ব্যারাম আছে। সামান্যতেই ফটফট করে। ও-ই ফোন কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে ডক্টর নাগের সঙ্গে। চাঁদনিতে বসেন ভদ্রলোক, দীপার বাবার বন্ধু, ফিসটিস কম নেবেন বোধ হয়। অবশ্য দাদুর জন্য খরচা করতে ও পিছু-পা নয়। উনি এসেছেন আজ ন'দিন হল। প্রথমদিন বাজাবে গিয়ে ও খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। এমনিতে ওদের সংসারে আলু পেঁয়াজ আর আড়াই 'শ মাছ কিনলে দিব্যি চলে যায়। বেশী রান্নাবান্নার ঝামেলা করতে চায় না দীপা। কলকাতার মেয়েরা বিয়ের আগে বড় একটা হেঁসেলের ধারে ঘেঁষেও না। দাদু আসছেন খবর পেয়ে তো ওর নাড়ী ছেড়ে যাবার মত অবস্থা। অবশ্য দাদু মাছ মাংস ডিম খান না। এই নব্বুই বছর বয়সে ওঁর গলার খাদ্যনালী ছোট হয়ে এসেছে। শক্ত কিছু খেতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে। একদম গলানো ভাত ডাল আর একটা সেদ্ধ হলেই চলে যায়, তবে দুধটা চাই। ছেলেবেলায় দাদুকে রোজ শীতকালে এক জামবাটি পায়েস খেতে দেখেছে বিজন। এখানে অবশ্য জামবাটি নেই। শ্যামবাজার থেকে কিনে আনা

কাচের বাটিতে পাতলা করে পায়েস রেঁধে দেয় দীপা বিজনের কথামত, খেয়ে বুড়োর কি ফুর্তি।

এই সময়ে দীপার এতটা খাটুনি উচিত নয়। কিন্তু দাদু যখন নিজে থেকেই এখানে আসার কথা লিখলেন তখন দীপাই যেন বেশী খুশী হয়েছিল। ওদের এই বিয়েটা বিজনের বাড়ির লোক সহজ চোখে নেননি। এমন কি বিজনের বাবাও অমত করেছিলেন প্রথমটায়। একমাত্র এই ঠাকুর্দার চাপে সবাইকে মেনে নিতে হয়েছে। মেনে নেননি কেউ। নিলে ছেলের সংসার গুছিয়ে দিতে কেউ না কেউ আসতোই। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার দূরত্ব আর কতটুকু? কিন্তু এই দেড় বছরে ওরা কেউ আসেননি বিজনের কাছে। মনে মনে একটা দুঃখ ছিল ওর। বোধ হয় দীপা ব্যাপারটার জন্যে নিজেকে দায়ী করতো, মুখ ফুটে বিজনকে অবশ্য বলেনি। তা সেই দাদু আসছেন শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিল ওরা। ওদের এই কলকাতার বাড়িতে দাদুর আসা মানে ওদের সব অভাব পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এই ফ্ল্যাটটা দোতলায়। যোগাযোগ ছিল বলে খুব সস্তায় পেয়ে গিয়েছিল বিজন। দক্ষিণ খোলা এই ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনেই ছোট একটা পার্ক আছে। মোটামুটি ওদের পক্ষে স্বর্গই বলা যায়। দাদু যেদিন কলকাতায় এলেন বিজন একাই যেতে চেয়েছিল স্টেশনে। দীপা বাড়িতে থাকলে দাদুর খাবার-দাবার জল গরম রাখতে পারবে। কিন্তু দীপা শোনেনি সে কথা। জোর করে সেই ভোর রাত্রে প্রায় প্রথম ট্রাম ধরে স্টেশনে ছুটেছিল। অত ভোরে কখনো বেরোন হয় না। বেশ লাগছিল ট্রামে যেতে যেতে। কলকাতার চেহারাটা ভোরবেলায় একদম অন্যরকম হয়ে যায়। যদিও বিজন দাদুর চিঠিতে জেনেছিল উনি একাই আসছেন তবু ঠিক বিশ্বাস করেনি। এখন শিলিগুড়ি থেকে এক রাত্রেই কলকাতা চলে আসা যায়—কিন্তু দাদুর এই বয়সে একা আসাটা ভাবা যায় না। ট্রেনটা যখন এল প্ল্যাটফর্মে ঠিক তখনি ওরা দাদুকে দেখতে পেল। দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন ওদের দেখে। বয়সে শরীর প্রায় কুঁজো হয়ে এসেছে কিন্তু ট্রেন থামা মাত্রই যেভাবে নেমে এলেন তাতে বয়সটাকে বোঝা যায় না। ওরা প্রণাম করতেই দুই হাত বাড়িয়ে ওদের আঁকড়ে ধরলেন দাদু, তারপর চোখ বন্ধ করে বুক ভরতি বাতাসটাকে ছেড়ে দিলেন আরামে। দাদু একা এসেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল বিজন, তার আগেই দাদু বললেন, 'জোর করে চলে এলাম দিদিমণি, তুমি আমাকে দুটো ভাতে ভাত খাওয়াতে পারবে তো?' তারপর বিজনের দিকে বুড়ো আঙুল নেড়ে দীপাকে বললেন, 'একে আমার বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না বাপু!' বিজন দাদুর কাঁধ থেকে কাপড়ের ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। পরে দেখেছে গোটা তিনেক কাপড় আর দুটো লং ক্লথের পাঞ্জাবি, দুটো গেঞ্জি, একটা ব্রাহ্মী তেল, একটা চিরুনি নিয়ে দাদু সটান চলে এসেছেন। এতক্ষণ লাঠিটা কনুইতে ঝোলানো ছিল, এবার এক হাতে লাঠি অন্য হাতে বিজনকে ধরে উনি স্টেশন পেরিয়ে এলেন। ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, 'তোমাদের কলকাতার যা গল্প শুনি—আমি থাকতে পারবো তো?' তারপর হেসে বললেন, 'তা তোমাদের ঘরের মধ্যে তো আর কলকাতা ঢোকেনি—কি বল?'

দীপা বড় বড় চোখ মেলে দাদুকে দেখছিল। বিয়ের পর ওরা যখন বউভাতে শিলিগুড়ি গিয়েছিল তখন দাদুর সঙ্গে খুব বেশী কথা হয়নি। ওদের শিলিগুড়ির বাড়িতে দাদুর সঙ্গে কাকারা থাকেন। বিজনের বাবা দাদুর বড় ছেলে, সারাজীবন রেলে চাকরী করে যাচ্ছেন। এখন রিটায়ার করার মুখে গৌহাটিতে পোস্টেড্। ছেলের বউভাতে বিজনের মাকে নিয়ে যেন কদিন শিলিগুড়িতে বেড়িয়ে গেলেন। যা কিছু আয়োজন সব দাদুই ভার নিয়েছিলেন। দাদু রিটায়ার করেছেন প্রায় তিরিশ বছর হল। সারাজীবন চাকরী করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তা তিরিশ বছর থাকতে পারে না। কিছু শেয়ার কেনা ছিল চা-বাগানে—তার সামান্য ডিভিডেন্ড আর খানেক পেন্সনের টাকায় দাদুর চলতে হয়। কাকারাই সংসার চালান কিন্তু বিজন দেখেছে ওর

কিছু ব্যাপার হলে দাদু কোথা থেকে টাকা এনে দবাজ হাতে খরচা করেন। প্রায় চার বছর বয়সে দাদুর সঙ্গে শিলিগুড়ির নতুন বাড়িতে চলে আসে ও। বাবা-মাকে ছেড়ে সেই চার বছর বয়স থেকে প্রতি মুহূর্তে ওর মানসিকতায় দাদু জড়িয়ে ছিলেন। নিজেব ছেলেদের বদলির চাকরীর জন্য বোর্ডিং-এ রেখে মানুষ করেছেন কিন্তু নাতিকে কখনো চোখেব আড়াল হতে দেননি। বউভাতের দিন সবার সামনে দীপাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কখনো বোকা হবে না, ওকে চোখে চোখে বাখবে, যেমন আমি রেখেছিলাম। এখন থেকে বিজুর দায়িত্ব তোমার ওপর।'

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দাদু বললেন, 'ওরে বাবা, তোমরা দোতলায় থাক নাকি! আমার যে উঠতে বড অসুবিধে হবে।'

দীপা বলেছিল, 'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

দাদু বললেন, 'তা ধরো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার নিজেব শবীবেই তো রক্ত নেই বাপু। মেয়েমানুষের শরীরে রক্ত না থাকলে সন্তান জড়ভরত হয়ে যায়।' লজ্জায় মাথা নিচু করেছিল দীপা। আড় চোখে বিজনেব দিকে তাকিয়েছিল, দাদুর চোখে কি এর মধ্যেই ও ধরা পড়ে গেছে! বিজন দাদুকে দেখছিল। ঠিক সেই রকম আছেন। একটুও পাল্টাননি। সোজা কথা একদম মুখের ওপর সোজা বলে দেওযাব জন্য আত্মীয়স্বজনের কাছে এই মানুষটি বড় অপ্রিয়।

দোতলায় উঠতে বেশ কয়েকবার দাঁড়াতে হল। ওদেব ফ্ল্যাটে ঢুকে দীপা দাদুকে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেল। 'আপনি আগে বিশ্রাম করুন, তাবপর জামাকাপড় ছাড়বেন।'

শোয়াব ঘরে ঢুকে দাদু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেওয়ালে বিজনের ছোটবেলার একটা ছবি ছিল। দাদুর হাত ধরে হাঁটছে। ছবিটা দেখে দাদু চোখ বড় কবলেন, 'ওরে বাবা, আমার ছবি দেখছি এখানে!' তারপব আস্তে আস্তে বললেন, 'দ্যাখো দিদিমণি, বিজুব মুখটা কেমন পাল্টে গেছে, আমি কিন্তু একই রকম আছি—কি বল?' ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল বিজন কথাটা শুনে। হঠাৎ, কি সহজে, সেই ছেলেবেলাটা ওব বুকের মধ্যে একছুটে চলে এসে সমস্ত শরীরে একটা কান্নার কাঁপুনি ছড়িয়ে দিল। বিজন পা টিপে-টিপে বসার ঘরে চলে এসেছিল।

মাঝরাত্তিরে অন্ধকার বেশ চোখ-সওয়া হয়ে যায়। যদিও এ-ঘরে চাঁদের আলো এখনও আসেনি তবু মুখ ঘুরিয়ে বিজন দীপার মুখ দেখতে পেল। এর মধ্যে কোন ফাঁকে ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। বেচারার খুব খাটুনি যাচ্ছে। এখন দুপুরবেলায় একদম ঘুমোয় না, শুধু দাদুর সঙ্গে বকবক করবে! বুড়োদের এমনিতে ঘুমটুম কম হয় কিন্তু এ-সময় দীপার তো ঘুমনো উচিত। অবশ্য হিসেবমত এখনও প্রায় সাড়ে চার মাস দেরী আছে। এর মধ্যে দুবার চেক-আপ করিয়ে এনেছে বিজন। সব ঠিক আছে, শুধু রক্তাল্পতার অভিযোগ। একগাদা ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার, খেলে তো কাজ হবে! বিজন আর ওকে ডাকলো না। আর ক'ঘণ্টা পরেই তো ভোর হবে। তখন এমনিতেই বেচারার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দরজায় শব্দ করেন দাদু! আজন্ম দেখে আসছে ও ব্যাপারটা। ছেলেবেলায়, ভোর রাত্রে দাদু ওকে বিছানা থেকে টেনে তুলতেন। ঘুমে চোখ এঁটে থাকতো, তাতেই জলেব ঝাপটা দিতে বলতেন। শীত গ্রীষ্ম বলে কিছু ছিল না। প্রচণ্ড শীতের ভোরে মাথায় বাঁদুরে-টুপি সারা শবীর পশমে জড়িয়ে দাদুর হাত ধরে ওকে দৌড়তে হতো। দাদু এতো জোরে হাঁটতেন যে না দৌড়ালে তাল রাখতে পারতো না বিজন। তখনও আবছা অন্ধকার জড়ো হয়ে থাকতো গাছের মাথায়। মহানন্দার ধার দিয়ে দাদু ওকে নিয়ে চলে যেতেন সেই পিলখানা অবধি। যেই সূর্য উঠলো, আকাশ সোনায় সোনায় ভরে গেল, ব্যাস, দাদু থেকে গেলেন। দু'হাত জড়ো করে তিনবার জয়গুরু বলে প্রণাম করতেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে নদী দেখতো বিজন। সেই ভোরবেলার ঠাণ্ডা বাতাসে নদীর ওপর দিয়ে একরাশ মায়াময় কুয়াশা গড়িয়ে গড়িয়ে যেত। সূর্যের আলো পড়তেই জলের শরীর থেকে

ধোঁয়ার সুতো মাথা চাড়া দিয়ে যেন আকাশটাকে ধরতে চাইত। সমস্ত বাল্যকাল এইভাবে সকালগুলো কেটেছে। যেদিন বৃষ্টি হতো সেদিন খুব খুশী হতো বিজন। বৃষ্টির ভোরে দাদু তাকে ডাকতেন না। বিরাট ছাতাটা মাথায় নিয়ে গামবুট পরে একাই বেরিয়ে পড়তেন উনি। সূর্য ওঠার আগেই যদি বৃষ্টি থেমে যায়! আর মনে মনে প্রার্থনা করত বিজন যেন রোজ রোজ ভোরে বৃষ্টি হয়।

কলকাতায় এসে প্রথম ভোরেই এইসব স্মৃতি বিজনের মনে পড়ে গেল। ভোরবেলায় দরজায় শব্দ শুনে দীপার ঘুম ভেঙেছিল আগে। বিজনকে ঠেলে তুলতে ও দরজা খুলে দেখল দাদু দাঁড়িয়ে আছেন। সাজগোজ হয়ে গেছে, হাতে লাঠিটা। দীপা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় যাচ্ছেন দাদু?'

'একটু বেড়িয়ে আসি ভাই। দরজা খোলা থাকবে কিনা, তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাতে হল।'

বিজন বলল, 'এখানে তো কাছে পিঠে নদী নেই, গঙ্গা তো অনেকটা দূরে।'

'নদীর কি দরকার হয় সবসময়?' দাদু হাসলেন।

'না, তবে আপনি কি একা-একা হাঁটতে পারবেন, রাস্তা-ঘাট খোঁড়া, গাড়ি-ঘোড়া আছে।' বিজনের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না কলকাতায় দাদুর এই মর্নিং-ওয়াকের ব্যাপারটা।

কিন্তু এর মধ্যেই দীপা চট করে শাড়ি পাল্টে চলে এসেছে, এসে দাদুর হাত ধরল, 'চলুন, আমরা ঘুরে আসি।'

দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'হুম, আমার চেয়ে তোমার এতে উপকার হবে বেশী, বুঝলে?'

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় অন্ধকারে ঠুকঠুক করে দাদুকে নিয়ে নামতে নামতে ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ দীপা চেঁচিয়ে বলল, 'এই, হিটারে জল গরম করে রেখো, আমি এসে চা করবো।'

কথাটা কানে আসতেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল বিজন। এমনিতে এটা কিছু নয়। সংসারের অনেক কাজে ও দীপাকে সাহায্য করে। কিন্তু দাদুর সামনে একথা দীপা না বললেই পারতো। বেচারা জানে না ওদের বাল্যকালে বাড়ির পুরুষরা এইসব কাজ করলে তাদের স্ত্রৈণ বলা হতো। বিস্ময়ে বিজন দেখল, কথাটা শুনেও দাদু পিছন ফিরে ওকে দেখলেন না। বরং দীপার সঙ্গে গল্প করতে করতে নেমে গেলেন। লজ্জা পাওয়ার জন্য নিজেকে নির্বোধ বলে মনে হলো বিজনের, এবার।

এখন প্রতিদিন ভোরে দীপা দাদুর সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছে। ভোর পাঁচটায় দাদু এসে দরজায় শব্দ করলেই দীপা তড়াক করে উঠে পড়ে। ওরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করে বিজন। কিন্তু একা একা শুয়ে ঘুমোনোর অভ্যেসটা এই দেড় বছরে কেমন করে যে চলে গেছে—কিছুতেই ঘুম আসে না। আশ্চর্য, দাদু এখন ওকে মর্নিং ওয়াকে সঙ্গী হতে বলেন না।

পরদিন অফিসে যাবার আগে দাদুকে ডাক্তার নাগের কাছে নিয়ে যাওয়া নিয়ে দীপার সঙ্গে কথা বলে নিল বিজন। ওর অফিস ধর্মতলায়। সেখান থেকে এত দূরে ফিরে এসে আবার চাঁদনিচকে ফিরে যেতে প্রচুর সময় লেগে যাবে। তার চাইতে বরং দীপা যদি ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে চলে যায় তাহলে অফিস থেকে পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে সরাসরি চেম্বারে চলে যেতে পারে। অন্যসময় হলে দীপা রাগ করতো। বলতো, সব ঝক্কি বিজন ওর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ঝগড়া-ঝাঁটির সময় বলেই ফেলে, 'তুমি খুব স্বার্থপর'। কিন্তু এখন প্রস্তাবে ও দ্বিমত করল না। ঠিক হল ডাক্তারের কাছ হয়ে ওরা কালীঘাট মন্দিরে যাবে। দাদুকে টুকটাক করে কলকাতা দেখানো হচ্ছে। আজ এই সুযোগে কালীঘাট হয়ে যাবে। আর এখন বিজন হঠাৎ আবিষ্কার করল, এতো বছর ও কলকাতায় আছে কখনও কালীঘাট যাবার কথা মনে আসেনি। মানুষ

নিজের হাতের তালুর দিকে সবচেয়ে কম সময় তাকায়।

অফিস থেকে বেরিয়ে বিজন চৌরঙ্গীটা হেঁটে এল। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দূরত্বটা এতো সামান্য যে মিনিট দশেকের মধ্যে ও চাঁদনিতে পৌঁছে গেল। জায়গাটায় ভিড়ভাট্টা বেশী। ফলওয়ালাগুলো রাস্তা জুড়ে চিৎকার করছে। হকারদের জ্বালায় নিশ্চিন্তে ফুটপাথ ধরে হাঁটা মুশকিল। নম্বর মিলিয়ে একটা গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে দাঁড়াল ও। দোতলায় যাবার সিঁড়ির পাশে অনেকগুলো নেমপ্লেটের মধ্যে ডক্টর নাগের নাম দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল বিজন। দীপারা নিশ্চয়ই এখনো আসেনি। ট্যাক্সি পেলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই অবশ্য আসার কথা। বিজন সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে সতর্ক চোখ রেখে সিগারেট ধরাল। সারা গায়ে অদ্ভুত ধরনের পাঁচড়ার মত ঘা নিয়ে এক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেলেন। নিশ্চয়ই ডক্টর নাগের কাছে এসেছেন। হঠাৎ ও খুব বিরক্ত হয়ে পড়ল দীপার ওপর। খামোকা একটা বুড়ো লোককে নিয়ে এইসব চর্মরোগগ্রস্ত রোগীর সঙ্গে বসাতে চাইছে দীপা। রোগ রোগ বাতিকটা বোধ হয় ওর মা ওকে দিয়েছেন। শাশুড়ীর কথা মনে করলেই নিম্নাঙ্গে বাত, পেটে আমাশা, উইন্ড এবং অম্বল, রক্তচাপের হ্রাসবৃদ্ধি মনে পড়ে। বিজন নিজে ডাক্তারদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। কিন্তু ও দেখেছে, এই কলকাতার সবরকম বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে চেনে এমন লোকের অভাব নেই। সেখানে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে শুনতে হয়, 'সেকি ডক্টর মিত্রকে চেনেন না! কলকাতায় ওব চেয়ে বড গাইনি কেউ নেই।' অথবা, 'ডাঃ সেনের নাম শোনেননি? কি বললেন, ইন্ডিয়ার টপ হার্ট স্পেসালিস্ট।' মেয়েলি কোন অসুখ অথবা বুকের ব্যামো না থাকলে কেন যে ওদের চিনতে হবে বুঝতে পারে না বিজন। এই ব্যাপাবে দীপা অবশ্য খবরাখবর রাখে। টপাটপ ডাক্তারদের নাম বলে দিতে পারে।

খানিকবাদেই ওরা এসে গেল। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে দিয়ে দাদুব হাত ধরে বিজন গাড়িবারান্দার তলায় চলে এল। চারপাশে এত লোকের চিৎকার, দ্রুত চলাফেরা, রিকশাওয়ালাদের ঘন্টির শব্দ—দাদু কেমন বোকা হয়ে গেছেন। দীপা বলল, 'কতক্ষণ এসেছ?' বিজন বলল,'মিনিট পাঁচেক। তুমি ঐ সিঁড়িটা দিয়ে এগিয়ে যাও, আমি দাদুকে নিয়ে আসছি।'

সিঁড়িটা প্রায় খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। এক পা করে উঠে দাদুকে দাঁড়াতে হচ্ছে। উঠতে উঠতে বললেন, 'এইসব বাড়িগুলো কবেকার বিজু?'

সিমেন্ট ওঠা সিঁড়ির ধাপে চোখ রেখে বিজন হাসল, 'ক্লাইভেব আমলের হবে!'

'কিন্তু দেখছ কি শক্ত গাঁথুনি। এরা সিঁড়িতে আলো দেয় না কেন?' দাদু এক হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে অন্য হাতে বিজনকে নিয়ে উঠছিলেন। বিজন উত্তর দিল না। কলকাতায় অনেক কিছু স্বাভাবিক ঘটনা আছে যা প্রথম চোখে মেনে নেওয়া যায় না। কলকাতায় প্রথম পড়তে এসে হোস্টেলের ঘরে ছয়জনকে শুতে হবে ভেবে ওর কান্না এসে গিয়েছিল। শিলিগুড়ির স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে এরকম অভ্যাস ওর ছিল না। এখন তো এটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

ওপরে উঠে বিরাট চাতাল, তাক ঘিরে ইউ-শেপে ঘরগুলো সাজানো। ডক্টর নাগের চেম্বারটা দেখতে পেল বিজন। বেশ ভিড় এই সন্ধ্যেবেলায়। ওদের দেখে দীপা এগিয়ে এল, 'আপনি একটু বসুন দাদু। একজন পেসেন্ট ভেতরে আছেন, তারপরেই আপনাকে ডাকবে।'

বিজন দেখল বসার ঘরটা বেশ বড়। অনেক চেয়ার ছড়ানো। মাঝখানে একটা কাঠের গোল টেবিলে কিছু ইংরেজী হিন্দী পত্রিকা রাখা আছে। কাগজের রঙ দেখে বোঝা যায় ওগুলো কয়েকমাস আগে ছাপা হয়েছে। ভিজিটার্স তো রোজ পাল্টাচ্ছে তাই পত্রিকাগুলো পুরোন হয় না।

একটা সোফার অর্ধেকটা খালি পেয়ে দাদুকে নিয়ে বসল বিজন। ভেতরে ডাক্তারের চেম্বার। সুইং ডোরটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দীপা। আর কেউ ঢোকার আগেই ও চান্স নেবে। আশেপাশে

তাকিয়ে বিজনের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। এই ঘরের অর্ধেক মানুষ সুস্থ নয়। গায়ের চামড়ায় নানা রকম রোগ কিলবিল করছে। ওর সামনের চেয়ারে এক ভদ্রলোক মুখ নামিয়ে কাগজ পড়ছেন। বিজন লক্ষ্য করল ভদ্রলোকের ঘাড়, গলা কাঁঠালের মত উঁচু উঁচু হয়ে আছে। অস্বস্তিটা ক্রমশ বাড়তে লাগল বিজনের। এই সব স্কিন ডিজিস কি সংক্রামক নয়? এই যে চেয়ারে ও বসছে সেখানে একটু আগে যদি এই ধরনের রোগগ্রস্ত কেউ বসে থাকেন তবে বিজনের তো তা হতে পারে।

হঠাৎ দাদু বললেন,. 'বিজু তুমি ডাক্তার হলে পারতে।'

অন্যমনস্ক ছিল বিজন, ঘাড ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছেন?'

সেই সময় ভেতরের দরজা খুলে এক মহিলা আর পুরুষ বেরিয়ে এলেন। দীপা বলল, 'এসো।' বলে কাউকে কিছু না বলতে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটু গুঞ্জন উঠল ঘরে, হয়তো যাঁরা আগে এসেছেন তাঁরাই বিরক্ত হলেন। বিজনের অস্বস্তি হচ্ছিল, দীপা মাঝে মাঝে এমন সব ব্যাপার করে ফেলে। অবশ্য এখানে যাঁরা অপেক্ষা করছেন তাঁরা দাদুর মত নব্বুই পেরোননি। সে হিসেবে নিশ্চয়ই দাদুকে ওঁরা ক্ষমা করে দিতে পারেন।

চেম্বারে ঢুকে বিজন ডক্টর নাগকে দেখতে পেল। বয়স হয়েছে নিশ্চয়ই সত্তরের কাছাকাছি। সাদা হাফ হাতা জামা, মুখটা হাসি হাসি। দীপা এগিয়ে এসে দাদুকে ধরে চেয়ারে বসালো, মুখোমুখি। দুপাশে আরো দুটো চেয়ারে বিজনরা বসল। দীপা বলল, 'আমাদের দাদু।'

ডক্টর নাগ হাতজোড় করে নমস্কার করতে দাদু ঝুঁকে পড়ে সেটার সম্মান দিলেন। এই একটা ব্যাপারে দেখেছে বিজন, মাঝে মাঝে ওর বিবক্তিও লেগেছে, সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে, দাদু কোন সম্মানীয় মানুষ অথবা ব্রাহ্মণ কেউ হলে তা তার বয়স যাই হোক না কেন নমস্কার করার সময় প্রায় ঝুঁকে পড়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এক সময় মনে হতো এটা এক ধরনের ক্রীতদাস-মনোবৃত্তি। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ রাজত্বে থেকে চরিত্রের মধ্যে এসে গেছে। এখন ডক্টব নাগকে প্রায় প্রণামেব ধরনে নমস্কার করাটা ওর ভাল লাগল না। ডক্টর নাগ বললেন 'বলুন, কি হয়েছে আপনার?' কথা বলার সময় এক ধরনের স্নেহ ঝরে পড়ে, কানে বেশ আরাম দেয়।

দাদু হাতটা সামনে নিয়ে এলেন। বিজন এইবার দেখল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দীপা ব্যান্ডেজ দিয়ে আঙুলের ফাঁকটা ঢেকে দিয়েছে। ডক্টব নাগ দীপাকে ইঙ্গিত করতে দীপা হাতটা টেনে নিয়ে ব্যান্ডেজটা খুব সতর্ক হাতে খুলে নিল। টেবিল-ল্যাম্পের মুখটা ঘুরিযে আলোটা হাতের ওপর ফেললেন ডক্টর নাগ। তারপর মনোযোগ দিয়ে দুই আঙুলের মাঝখানের ঘা-টা দেখতে লাগলেন। বিজন এই চড়া আলোয় দাদুর হাতের চামড়া-শিরা দেখছিল। পোস্টঅফিসের সীলের মত সময় তার চিহ্ন দিয়ে ঘিরে ফেলেছে দাদুকে। হঠাৎ ডক্টর নাগ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত বয়স হল আপনার?'

দাদু বললেন. 'এইট্টিন এইট্টিফোরে জন্ম আমার।'

মুখ তুলে তাকালেন ডক্টর নাগ, 'শরীর তো দেখছি বেশ ভালো।' তারপর একটা লম্বাটে বাক্স খুলে সূঁচের মত জিনিস বের করলেন 'হাতটাকে ছড়িয়ে দিন তো, আঙুলগুলো স্প্রেড করুন—হ্যাঁ।' তারপর সেই সূঁচটাকে ঘায়ের কাছাকাছি চামড়ার ওপর ফোটাতে লাগলেন, 'লাগছে?

দাদু চোখ বন্ধ করে কিছুটা ভেবে বললেন, 'না তো।'

আরো জোরে বিদ্ধ করে প্রায় ফিসফিসিয়ে ডক্টর নাগ বললেন, 'এবার?'

দাদুর হাতটা সামান্য নড়ে উঠল, 'এবার যেন লাগছে, কিন্তু আরো লাগা উচিত ছিল।' ডক্টর নাগ সোজা হয়ে বসে দাদুর মুখের দিকে তাকালেন খানিক, তারপর উঠে এসে

টেবিলল্যাম্পটাকে দাদুর মুখের ওপর ঘুরিয়ে দিলেন। বিজনের হঠাৎ মনে হল, কোন নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যে যেন লাইটম্যান ফোকাস ফেলল। ডক্টর নাগ দাদুর জিভ দেখলেন, ঝুঁকে পড়ে নাক আব কান দেখলেন। তারপর দাদুর অজান্তে কানের লতিতে সেই সূঁচটা সামান্য ফুটিয়ে দিলেন। বিজন দেখল দাদুর শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটলো না।

পাশের বেসিনে হাত ধুয়ে এসে ডক্টর নাগ সিগারেট ধরালেন। এবার টেবিলল্যাম্পটা তার সামনে মুখ ফেরানো। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেন ডক্টর নাগ। বিজনের মনে হলো ওঁকে কেমন অন্যরকম লাগছে। দীপার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন ভদ্রলোক। তারপর প্রেসক্রিপশন-প্যাডটা টেনে নিয়ে অনেক ভেবে চিন্তে লিখে গেলেন। বিজন লক্ষ্য করেনি দীপা কখন ব্যাগ থেকে টাকা বের করে হাতে বেখেছিল, এখন ও টাকাটা টেবিলেব ওপব বেখে একটা পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে দিল। ডক্টব নাগের হাবভাবে বিজন একদম স্বস্তি পাচ্ছিল না। দাদুর দিকে ও তাকাল। ও দেখল দাদু মুখ তুলে দেওয়ালে টাঙানো বামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রেসক্রিপশনটা দীপার দিকে ভাঁজ করে এগিয়ে দিয়ে ডক্টব নাগ বললেন, 'অফ হ্যান্ড বলা মুশকিল, আপনারা ওকে ইমিডিয়েটলি একবাব ট্রপিক্যালে নিয়ে যান। ওবা কাবেক্ট ডায়োগনিসিস করবে। তবে, আমার মনে হয় ওবা আমাকেই সমর্থন কবৰে।' তারপব দাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো বাইরে থাকেন, না? তা যে ওষুধ আর ইঞ্জেকশন দিলাম এগুলো নিয়মিত ব্যবহার করুন, ঠিক হয়ে যাবে। তবে কলকাতায় আর বেশিদিন থাকা বোধহয় উচিত হবে না। বাইরের জল হাওয়া শরীরকে অনেকখানি হেল্প করে।'

হঠাৎ বিজন দেখল দীপাব হাত থর থর কবে কাঁপছে। ওব মুখ সাদা হযে গেছে হঠাৎ, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ও, নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। দাদুও লক্ষ্য কবছেন ব্যাপারটা। বিজন কিছু বলার আগেই জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কি হযেছে দিদিমণি?'

হঠাৎ দীপা একদম শান্ত হয়ে গেল, বিজনের দিকে একবার তাকিয়ে দাদুকে বলল, 'কিছু না, আপনি এবার চলুন, অনেকে অপেক্ষা করছে।'

ওরা উঠে, বাইবে বেবিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাব কি হয়েছে? ডাক্তাব কি বললেন?'

'তেমন কিছু নয়।' দীপা মুখ ফিরিয়ে নিল।

নিচেব ফুটপাথে আসতেই ওরা আকস্মিকভাবে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। কোন পেসেন্ট হয়তো এইমাত্র এল ট্যাক্সিটায়। দাদুকে নিয়ে দীপা পেছনে বসল, বিজন সামনে। ট্যাক্সিওয়ালা কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করায় দাদু বললো, 'বাড়ি ফিবে চল বিজু, কালীঘাট না হয় অন্যদিন হবে।'

বিজন ঘুরে বসে হাত বাড়াল দীপার দিকে, 'প্রেসক্রিপশনটা দাও।' ব্যাগ খুলে প্রেসক্রিপশনটা নিস্পৃহের মত এগিয়ে দিল দীপা। বিজন সামনের দিকে ফিরে বসে ড্যাশবোর্ডের আলোয় কাগজের ভাঁজ খুলে ধরল। ডাক্তাররা যে কেন হাতের লেখাগুলো ভাল করে না। ও আজ অবধি যত হাতের লেখা দেখেছে তাব মধ্যে বোধহয় ডক্টর নাগের হাতের লেখাই সবচেয়ে খারাপ। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে ও মুখ তুলে তাকাতেই বোম্বাইয়ের একজন নায়িকাকে খুব লাস্য মাখানো চোখে ওর দিকে তাকাতে দেখল। সিনেমা হলের সামনে লোক গিজগিজ করছে! সামনে সারিবদ্ধ গাড়ি। সিনেমা হলের আলোয় প্রেসক্রিপশনটা পড়তে লাগল বিজন।

মুহূর্তে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল ওর। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা হিমস্রোত চলকে চলকে উঠল যেন। শব্দ দুটোর ওপর চোখ রেখে ওর চোখ ফেটে জল এসে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট

চেপে বিজন পাথরের মত বসে রইল। এখন ট্যাক্সিটা চলছে। ধর্মতলা স্ট্রীটের দু'পাশের জনতা দোকানপাট বিজনের চোখে কোন কিছুর ছায়া পড়ছিল না। শুধু বুকের মধ্যে শব্দ দুটো ক্রমশ ওজন বাড়িয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। প্রেসক্রিপশনটা আবার একবার দেখে ভাঁজ করে ফেলল বিজন। ডক্টর নাগ তাঁর স্নেহময় গলার শব্দ দুটো কিভাবে উচ্চারণ করতেন? কেমন লাগতো শুনতে—ড্রাই লেপ্রসি!

এই সময় দাদুর গলা শুনতে পেল বিজন, 'প্রেসক্রিপশনে কি লিখেছে বিজু?' বিজন মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। ড্রাইভারের সামনে রাখা আয়নায় ও হঠাৎ দাদুকে দেখতে পেল। দুটো হাতে লাঠিটা মুঠোয় ধরে তার ওপর গাল চেপে দাদু আয়নাটার দিকে চেয়ে বিজনের মুখ দেখছেন। চোখাচোখি হতে চোখ সরিয়ে নিল বিজন। দাদু বললেন, 'কুষ্ঠ হলে শুনেছি শরীরের সাড় চলে যায়, তবে কি আমার কুষ্ঠ হয়েছে?'

দাদুর গলার স্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল বিজন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বাচ্চা ছেলের মত হু হু করে কেঁদে ফেলল ও।

অনেকক্ষণ দাদু কিছু কথা বললেন না। কান্না একটু সামলালে বিজন শুনতে পেল, 'দিদিমণি, আমার কান নাক কি ফুলে গেছে মনে হচ্ছে, লালচে লালচে লাগছে?'

কোনরকমে দীপা বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে না।'

শরীরটা সিটের ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে দাদু আপন মনে বললেন, 'এই এতোগুলো বছর বেঁচে থাকলাম কি এই জন্যে।'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিজন দেখল দাদু বেশ সোজা হয়ে লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। পেছনে দীপা। এর আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অন্তত উনি দীপার হাত ধরতেন, নইলে হাঁটু কাঁপে, কিন্তু এখন তাঁকে আরো শক্ত মনে হল।

ওপরে এসে বিজন শোবার ঘরে ঢুকলো না। দীপা এসে বলল, 'দাদু একটু একা থাকতে চাইছেন। আর রাত্রে শুধু দুধ খেতে চাইছেন।'

বিজন কিছু বলল না। দীপা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাথরুমে চলে গেল। ওর যাওয়ার ধরনটা ভাল লাগল না বিজনের।

বিজন জানালার পাশে বসে সিগারেট ধরাল। এখান থেকে সামনের পার্কের একটা কোণ দেখা যায়। ইলেকট্রিক আলোর তলায় বসে একটা ফুচকাওয়ালা ভিড় জমিয়ে বিক্রি করে যাচ্ছে। কয়েকজন পরিচিত-মুখ বৃদ্ধ বেঞ্চিতে বসে। বাচ্চারা যে যার বাড়িতে ফিরে গেছে। পার্কটা এখন একদম শান্ত, চুপচাপ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঝাপসা হয়ে গেল পার্কটা, ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল লাঠি হাতে দাদু দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন আর সাত বছরের ছোট্ট বিজন দৌড়ে দৌড়ে তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে চাইছে। দাদুর কথা মনে হলেই এই ছবিটা ওর সামনে চলে আসে। আরো ছোটবেলায়, দাদুর গায়ের গন্ধ না পেলে ওর ঘুম আসতো না। মানুষ তার ছেলেবেলার কোন সময় অবধি স্মৃতিতে রাখতে পারে? বিজন খুব ঝাপসাভাবে একটা দৃশ্য দেখে, সে দাদুর কোলে বসে আছে, সামনে থালায় অনেক কিছু সাজানো। দাদু হেসে উঠে বললেন, 'ও কলম ধরেছে, তার মানে লেখক হবে, রবি ঠাকুর হবে।' এটা কি ওর অন্নপ্রাশনের ঘটনা? তা কি মনে রাখা যায়? কিন্তু ও জানে দাদুর সামনে দাঁড়ালে দাদু ওর মনের প্রত্যেকটা স্তর চিনতে পারেন। যেমন—চোখ বন্ধ করে কোন রাজমিস্ত্রী নিজের হাতে গড়া চারতলা বাড়ির প্রতিটি ইট চিনে নিতে পারবে! দীপাকে বিয়ে করার সময় এই মানুষটি তার বিরাট হাত দিয়ে সমস্ত বাধা আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন।

কুষ্ঠ হলে মানুষ মারা যায়? নিশ্চয়ই যেত কখনো। কিন্তু এখন, এখন তো কত ওষুধ বেরিয়েছে। ওর মনে আছে একবার দাদুর সঙ্গে বর্ষাকালে তিস্তা পেরুচ্ছিল বিজন। নৌকোয়

গাদাগাদি করে মানুষ বসে। মাথার ওপর বর্ষার মেঘ ঝুলে আছে। ভিজে হাওয়ার দাপটে ছুটন্ত ঢেউগুলোর ফাঁক দিয়ে নৌকো নিয়ে যাচ্ছিল মাঝি। যাত্রীরা কেউ কথা বলছিল না। মাঝে মাঝে বুড়ো হালের মাঝি আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠছিল, 'তিস্তা মাইকি জয়!' টলমলে নৌকোয় দাদুর কোমর জড়িয়ে বসেছিল বিজন। বুকের মধ্যে শিরশিরানি ভয়। হঠাৎ নৌকোটা খুব বড় একটা ঢেউ-এর মাথায় চড়ে বসে প্রায় কাত হয়ে পড়ল। অনেকখানি জল ছিটকে এল ওদের গায়ে। গেল গেল চিৎকারের সঙ্গে বিজন দেখল একটা লোক তাদের পিছন থেকে ঝুপ করে জলে পড়ে গেল আর একটু হলেই নৌকোর তলায় চলে যেত সে, দাদু চকিতে হাত বাড়িয়ে তার জামা ধরে ফেললেন। তারপর অনেক কষ্টে যখন তাকে ওপরে টেনে আনলেন দাদু, তখন শিউরে উঠেছিল বিজন। লোকটার নাক কান গলে গেছে। মাথায় চুল নেই। আঙ্গুল না থাকায় নৌকো ধরে বসতে পারে নি। ওর মনে পড়ল নৌকোতে ওঠার সময় সে ঘোমটা দিয়ে বসে ছিল। বোধ হয় কাউকে নিজের চেহারা দেখাতে চায় নি। আর দাদু যখন তাকে টেনে তুলেছিলেন তখন কেউ তার সাহায্যে হাত বাড়াতে চায় নি। তিস্তার জলে হাত ধুয়ে দাদু বলেছিলেন, 'মহাপাপের ফল কি এত তাড়াতাড়ি মেটানো যায়!'

কথাটার মানে তখন বোঝেনি বিজন। এখন এই সন্ধ্যেবেলায় পার্কেব ওপাশে বাড়িগুলোর মাথায় আসা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেই লোকটাকে পবিষ্কাব মনে পড়ে গেল। এখন ও জানে কুষ্ঠ কোন মহাপাপের ফল নয়। কিন্তু দাদু তখন কথাটা কি বিশ্বাসে বলেছিলেন? এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা শরীর নিয়ে যারা স্বচ্ছন্দে ঘুবে বেড়াতে পারে না তারা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী। কিন্তু যে কোন ব্যতিক্রমের পেছনেই তো কারণ থাকে। দাদু কি তাকেই মহাপাপ বলেছিলেন? ও হঠাৎ দেখতে পেল দাদু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাদুব দিকে তাকিযে ও চোখ দু'হাতে ঢেকে ফেলছে। ওঁর নাক নেই, কান নেই, হাতের আঙ্গুল খসে গেছে। ঠোঁটের আড়াল না থাকায় দাঁতগুলো বীভৎস লাগছে, দাদু বলছেন, 'চলো হে, সূর্য প্রণাম করে আসি।'

খুট করে আলোটা জ্বলে উঠতে চমকে উঠল বিজন। দীপা ঘরে এসেছে কখন, 'অন্ধকারে বসে আছ?'

বিজন দেখল, দীপার চেহারাটা একদম পালটে গেছে এই কয় ঘণ্টায়। এবং এতক্ষণ পরে এই প্রথম দীপার পেটের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাড়া খেল ও। ডক্টব নাগ প্রেসক্রিপশনে আন্ডার লাইন কবে লিখেছেন, 'একদম সংক্রামক নয়!' কিন্তু—। কিছু কি বলা যায়?

খুব আস্তে বিজন বলল, 'কি যে হয়ে গেল!'

দীপা বলল, 'একা বসে থেকো না। দাদু না চাইলেও তোমার ও-ঘবে যাওযা উচিত। আমি ওঁর দুধ নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিজেকে শক্ত কর।'

দীপা চলে গেলে বিজন দাদুর ঘরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল জানালার ধারে চেয়ারে দাদু বসে আছেন। মুখ বাইরের দিকে ফেরানো। পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন, 'কে বিজু, এসো। না, না, বিজু তুমি খাটে বসো না।'

প্রায় একটা চাপা আর্তনাদ করল বিজন, 'দাদু!'

'আমি চলে গেলে এই ঘর হোয়াটওয়াশ করে নিলে ভাল করবে। বিছানার চাদর-টাদরগুলো ফেলে দিলে ভালই, নইলে লাইজলে ধুয়ে নিও। ধোপাব বাড়ি দিও না। আব কাল সকালে গিয়ে শিলিগুড়ির টিকিট কিনে এনো। ট্রেনে না পাও প্লেনে। আমি টাকা দেব।' দাদু খুব স্পষ্ট গলায় কথাগুলো বলে গেলেন।

'কালই চলে যাবেন?' কথাটা বলতে গিয়ে বিজন চমকে উঠল। ও কি মনে মনে দাদুর চলে যাওয়া চাইছে। নইলে প্রশ্নটা করার সময় হঠাৎ এক ধরনের স্বস্তি চলকে উঠল যেন ওর মনে? নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ ছোট মনে হল ওর।

দাদু ওর মুখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ। এই মুহূর্তে আমার শিলিগুড়িতে যাওয়া প্রয়োজন।'

'কিন্তু ডাক্তার তো আপনাকে ট্রপিক্যালে দেখাতে বলেছে। ওখানে দেখানোর আগে আপনার অসুখটা সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।' বিজন বলল।

দাদু হাসলেন, 'ধরো তোমার ট্রপিক্যাল পরীক্ষা করে বলল এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের লেপ্রসি, ভীষণ সংক্রামক, তুমি কি করবে?'

বিজন কোন উত্তর দিল না। দাদু আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। এই কয়েক ঘন্টায় মানুষটার চেহারা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। ওদের বংশে নাকি এতো দীর্ঘ সময় কেউ বাঁচে নি। বোটানিকসের সেই গাছটার মত হয়ে গেল ব্যাপারটা। মূল শেকড় থেকে যে কাণ্ড বেরুল তার অজস্র শাখা এবং তা থেকে প্রশাখা—সবাই মাটিতে শিকড় নামিযে দিয়ে মজুবত হল। এখন মূল শেকড়ে যখন ঘুণ ধরল, শুকিয়ে গেল, তখন তাকে চেনা গেল না, প্রয়োজন হল না।

হঠাৎ দাদু বললো, 'বিজু, আমার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

উত্তর দিতে পারল না বিজন। এ কথা জোর করে চেঁচিয়ে বলা যায় না।

'দ্যাখো, আমার এই শরীরটার বয়স তো অনেকদিন নব্বুই পেরিয়ে গেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে আমি আমার শরীরটার কত বকম চেহাবা দেখলাম। নিজের শরীরের জন্য এক সময় ভীষণ মায়া হতো। তারপর রোদ জল ঝড়ে এই শরীরটার ওপর শ্যাওলা পড়তে দেখলাম। তা সেটা বোধ হয় ষাট বছর বয়স হবে। দেখলাম শরীরের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। হাতের গুলিগুলো কেমন ঢিলে হয়ে গেল। তখন তুমি সেই চার বছরের বিজু। কচি কচি হাত পা, গাল টিপলেই রক্ত ছুটে আসে। তোমাকে বুকে নিয়ে যখন ঘুমোতাম তখন নিজের শরীরটার কথা মনে থাকতো না আর। তোমাকে আমি একটু একটু করে বড় করে তুললাম। নিজের কথা মনে থাকলো না আর। অতীতের কথা ভাবলেই তো বর্তমানের জন্য কষ্ট হয়। আমার নিজের দশ বারো বছরের চেহারাটার কথা মনে এলেই তোমার দিকে তাকাতাম। তুমি তো আমার শরীরের আদল পেয়েছ। আমার আফসোস থাকতো না। শুনেছি সাধক যাঁরা, তাঁরা নিজের শরীর ছেড়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে ঘুরে বেড়ান। আমার তো সে ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু মনে মনে তোমার যৌবনকে আমার বলে ভাবতে একটুও কষ্ট হতো না। এটা যে কি ধরনের তৃপ্তি তুমি বুঝবে না। এখন, এই শরীরের জন্যে আমার একটুও কষ্ট নেই। আমি তো বড় জোর দু'তিন বছর বাঁচতাম। এই জীর্ণ শরীরটার কুষ্ঠ হোক আর নাই হোক কি এসে যায় তাতে। তুমি তো সুস্থ হযে বেঁচে আছ, বিজু তুমি বেঁচে থাকা মানেই আমার বেঁচে থাকা!' এক নাগাড়ে বলা কথাগুলো শেষ দিকে যেন ভারী হয়ে আসতে লাগল। দাদু যেন ওজন বইতে না পেরে হাঁপাচ্ছিলেন। তারপর আবার বললেন, 'মনে করে কাল টিকিট নিয়ে এসো। শিলিগুড়িতে না গেলে আমি একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না।' বিজন দেখল দীপা এক গ্লাস দুধ আর মিষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল না বিজন।

মেঝেতে পাতা বিছানায় শোয়া এখন কোন ব্যাপার নয়, বিজন মড়ার মত পড়েছিল। আজ রাত্রে ওর খাওয়া হয়নি তেমন, খাবার ইচ্ছেটাই শরীরে ছিল না। দীপা কি করছে কে জানে। এখন রাত অনেকটা হবে। দীপা ওর দিকে পাশ ফিরে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। বিজন জানে দীপা ঘুমোয় নি। দাদুর ব্যাপার নিয়ে দীপা কোন কথা বলছে না। অবশ্য আলাদা করে বলার মত সময়ও পায় নি। বেচারা যে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে এটা বোঝা যায়। আজ রাত্রে দাদুর ঘা-টা ড্রেস করে মলম লাগিয়ে দেওয়া হল না। রোজ দীপাই করতো। এমনিতেই ওর ঘেন্নাপিত্তি কম। আজ কি ওর খেয়াল হয়নি না সাহস পায় নি!

হঠাৎ দীপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কি হবে?'

বিজন এইবকম প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল, 'ধুৎ, একটা ডাক্তার কোন টেস্ট না করেই বলে দিল লেপ্রসি আর তাই সত্যি হয়ে গেল—এটা কি সম্ভব! কত পরীক্ষা করে তবে বোঝা যায়, ডাক্তারটাকে আমার ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু দাদু তো একদম নার্ভাস হলেন না। এমনকি আবাব পবীক্ষা করাবাব কোন আগ্রহ নেই। আমার হঠাৎ মনে হল উনি জানতেন।' দীপা বলল!

'কি যা তা বলছ', বিজন প্রতিবাদ করল, 'জেনে শুনে কি উনি আমার কাছে আসবেন।'

দীপা কোন উত্তর দিল না প্রথমটায়, তাবপব বলল, 'আমাব বাড়িব লোকেরা কি ভাববে কে জানে। ডাক্তার নাগ কি না বলে ছাড়বেন!'

এই ব্যাপারটা ভাবেনি বিজন। দীপাব আত্মীয়স্বজন এমনকি বিজনের নিজের বাড়ির লোকেদেব কি প্রতিক্রিয়া হবে। দাদুকে কি কাকারা একঘরে করে দেবে? না কি কোন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।'

বিজন বলল, 'ডাক্তাব তো বলেছে সংক্রামক নয়।'

'কেউ বিশ্বাস করে!' চট কবে জবাব দিল দীপা, 'আমাব জন্যে নয়, এই পেটেবটাব জন্যে ভয় হচ্ছে গো।'

'তুমি তো খুব শক্ত মেয়ে, এতো ভয় পাও কেন,' বিজন নিজেব সঙ্গে যেন কথা বলল।

'নিজের জন্যে আমি ভয পাই না।'

'দাদু কালই চলে যেতে চাইছেন।'

'আমি আব পারছি না।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'এ বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও, এখানে থাকাব সাহস আমাব নেই।'

বিজন এক হাত বাড়িয়ে দীপাকে জড়িযে ধরল। কেমন ঠাণ্ডা দীপাব শরীর।

'দীপা, তুমি খুব ভাল মেয়ে. প্লীজ, দাদু যেন না বুঝতে পারেন কিছু।'

হঠাৎ দীপা বলল, 'আচ্ছা, দাদু এটাকে এতো স্বাভাবিকভাবে নিলেন কেন?'

বিজন বলল, 'একটা বযসে এলে মানুষ সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে নেয়।'

অন্ধকাবে মাথা নাড়ল দীপা, 'আমাব মনে হল দাদু যেন জানতেন। কিছু মনে করো না, তোমাদেব বংশে কি কারো কখনো এ বকম হযেছিল।'

'আমাদের বংশে?' কথাটা বলে পাথরেব মত হযে গেল বিজন। সমস্ত শরীর নিবক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। দীপা কি এটাকে বংশানুক্রমিক রোগ বলে ভাবছে? কোনদিন কারো মুখে তো এই বোগের কথা শোনেনি। এই রোগ বক্তের সঙ্গে মিশে থাকে! দীপার পেটে যে এসেছে তার কথা এই জন্যে ভাবছে দীপা?

'বিজু, তুমি বেঁচে থাকা মানেই আমার বেঁচে থাকা।' কথাটা হঠাৎ মনের মধ্যে ছুটে এল। বাড়িব লোকে বলতো দাদুর সব কিছু নাকি ও পেয়েছে। সব কিছু?

দীপার শরীরের ওপর নিঃসাড়ে পড়ে থাকা হাতটা সরিয়ে আনল বিজন। তারপব জানালা দিয়ে চুঁইয়ে আসা জ্যোৎস্নায় চোখ রেখে বলল, 'আমি জানি না।' তারপর জুড়ে দিল, 'এই প্রথম শুনলাম।'

চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বিজন বুঝল দীপা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর জন্যে খুব কষ্ট হলো বিজনের। বেচারা এখনও ছেলেমানুষ। এই অবস্থায় পড়লে হয় তো বিজনও একই প্রশ্ন করতো। কাল দাদু চলে গেলে ঘরদোর লাইজলে ধুয়ে নিতে হবে। হেসে ফেলল বিজন, মানুষের মন কিভাবে ধুয়ে মুছে সাফ করা যায়।

শেষ পর্যন্ত ঘুম এল না ওব। বিজন জানালায় উঠে বসে সিগারেট ধরাল। জ্যোৎস্নার রঙ ফিকে হয়ে আসছে। সামনের পার্কটায় একটা ভিখিরি গোছের লোক কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে

আছে। এখন কোথাও কোন শব্দ নেই। কলকাতা মাঝে মাঝে কেমন শান্ত হয়ে যায়। দীপাব দিকে তাকাল ও। ঝাপসা অন্ধকারে ওকে একটা বাচ্চা মেয়ের মত দেখাচ্ছে। ঘুম এল না বিজনের। দীপার ঘুমন্ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ গায়ে মেখে মেখে হাওয়ারা এবার বিজনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া আসা শুরু করল।

মাঝরাত্তির পেরোলে শব্দরা বড় শক্তিশালী হয়। খুট্ শব্দটা যত সতর্কেই হোক না কেন, বিজনের কান এড়াল না। কিন্তু এখন তো ঠিক মাঝ রাত্তির নয়। বসে বসে ঢুলুনি এসেছিল বিজনের, শব্দটা শুনে চটকা ভেঙ্গে বাইরে তাকাল। আকাশের চেহারাটা দুহাতের মুঠোয় আদব করে ধরে রাখার মতন। দীপা এখনও ঘুমোচ্ছে সেই একই ভঙ্গিমায়। বিজন উঠে সন্তর্পণে দরজা খুলল। চোর-ফোর আসতে পারে।

বাইরে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়াল ও। পাশের ঘরের দরজা সন্তর্পণে বন্ধ করছেন দাদু। এই ঝাপসা অন্ধকারেও ওঁর সাদা পাঞ্জাবি দেখা যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াতেই বিজনের সঙ্গে চোখাচোখি হল ওঁর। লাঠিটা মাটি থেকে সামান্য ওপরে তুলে এগিয়ে এলেন কয়েক পা, 'তোমার এখানে লাস্ট মর্নিং ওয়াকটা করেই আসি, কি বল?'

বিজন ভাবতে পারে নি আজ, কালকের ঐ ঘটনার পব দাদু এত সহজে মর্নিং ওয়াক কবতে বেরুতে পাবেন। ও অবাক হয়ে তাকাতে গিয়ে লাস্ট শব্দটার কথা ভাবল। দাদু আজ চলে যাবেন বলে কি লাস্ট মর্নিং ওয়াকের কথা বললেন? নাকি. আত্মহত্যাব —নিজেকে শেষ করে দেবেন বলে এমন চোরের মত বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিজন বলল, 'এখনো তো ভোর হয়নি।'

'দেরীও নেই। তুমি আমাকে রাত চিনিও না।' বাইরের দরজাব কাছে এগিয়ে দাঁড়ালেন দাদু. 'দিদিমণিকে আজ আব কষ্ট দিও না। আমি একাই ঘুরে আসি।'

দাদুকে দরজা খুলে সিঁড়িতে দাঁড়াতে দেখে বিজন বাইরে বেবিয়ে এল।

বাইরে থেকে দরজাটা ভাল কবে বন্ধ কবে দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, 'আমি আপনাব সঙ্গে যাব!'

'সেকি! দবজা খোলা রইল, দিদিমণি একা থাকবে—'

'কিছু হবে না।'

'তা ছাড়া তোমার অভ্যেস নেই—।'

চলুন।' দাদুর কনুই ধরল বিজন।

এখন সিঁড়িতে বেশ অন্ধকাব। অত্যন্ত সাবধানে পাযে পায়ে দাদুকে নিচে নামিয়ে আনল বিজন।

রাস্তায় এখন ঠাণ্ডা হাওযা বইছে। চারধারের বাড়িগুলো ভীষণ বকম চুপচাপ। পার্কের ঘাসে ইলেকট্রিক আলো ক্যাটকেটে হলদে নিয়ে মুখ থুবড়ে আছে। এতো ভোরে অনেকদিন ওঠা অভ্যেস নেই ওর। অবশ্য আজকে ঠিক ওঠা বলা যায় না।

দাদু বললেন, 'এসো, এই রাস্তায় পায়চারি করি।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বিজন, 'দাদু আজ নদীর ধারে যাব।'

'নদী!' বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকালেন, 'সে কত দূর।'

'বেশীদূর না। আমি অবশ্য কোনদিন যাই নি।' বিজন দাদুকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পালাপার্বণের দিন এই রাস্তা দিয়ে মেয়েদের গঙ্গাস্নানে যেতে দেখেছে ও।

বিজন সামনে হেঁটে যাচ্ছে, পেছনে লাঠি হাতে দাদু। ফুটপাথে লাঠির শব্দ উঠছে। এই নির্জন শেষরাত্রে শব্দটা শুনতে শুনতে বিজন হাঁটছিল। বড় রাস্তায় এসে একটা রিকশাওয়ালাকে দেখতে পেল বিজন। কেমন হেলতে দুলতে যাচ্ছে। যাওয়া আসার কড়ারে ওর রিকশা নিল ও।

বাড়ি ফিরে ভাড়া দেবে।

দিনের প্রথম সওয়ারী নিয়ে রিকশা ছুটছিল গঙ্গার দিকে। রাস্তায় এখন দু'-একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের চুবড়িটা এখনও উপুড় করা। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিজনের বুকের মধ্যে হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই আকাশটাকে অনেকদিন দেখেনি ও। সেই বাল্যকালে অথবা কৈশোরে মহানন্দার ধার দিয়ে দাদুর পেছন পেছন ছুটে যেতে যেতে ঐ আকাশটাকে দেখতে পেত ও।

গঙ্গার পাড়ে এসে ওরা রিকশা থেকে নামল। দাদু বললেন, 'বাঃ।' একবুক শান্তির মত এপার ওপার জুড়ে থাকা জলেরা ঢেউ তুলে তুলে যায়। বিজন দেখল দাদু বেশ শক্ত মানুষের মত লাঠি দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন নদীর পাড ধরে। বিজন তাল রাখতে পারছিল না। সেই ছোটবেলায় যেমনটি হতো। আকাশ রঙ পাল্টে যাচ্ছে এখন। পুব দিকটা সদ্য জন্মানো বাচ্চার মত লাল হাতের মুঠো খুলছে। খানিক বাদেই মুঠো মুঠো সোনা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবে আকাশময়। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে দাদু দাঁড়িয়ে গেলেন পুবমুখো। বিজন জানে এখন সূর্যস্তোত্র পাঠ করবেন উনি।

বিজন দেখল, নদীব শরীর থেকে এখন ধোঁযারা সুতোর মত উঠে যাচ্ছে না আকাশের দিকে যেমনটি মহানন্দায় হতো। হযতো সব নদীব চবিত্র সমান নয অথবা এখন সেই ঋতু নয়। হঠাৎ ও শুনল দাদু ডাকছেন, 'বিজু।' দু'হাতের মুঠোয় লাঠিটাকে ধরে দাদু বললেন, 'দেখছ, রাতটা কেমন খসে খসে পড়ছে। আমরা বলি ভোর হচ্ছে। আমার শরীর যদি খসে খসে পড়ে তখন তুমি কি বলবে বিজু! বড ভাব জমে যাচ্ছে ভাই। এই এতোগুলো বছবেব ভাব। তবু তো অভিজ্ঞতার শেষ হয না। তোমাকে আমি কিছুই দিতে পাবি নি, আমার এতগুলো বছব শুধু তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমায় তো কেউ দেয়নি।'

সোনাব কড়াইটাব এখন উপুড় হযে যাবার সময় হয়েছে। জলের ওপর কচি কলাপাতাব ছায়া মাখামাখি হতে শুরু হল। দাদু বললেন 'গাযে মুখে বোদ মাখো বিজু, এই বোদে কখনো ঘাম হয না।'

নিরুদ্দেশ—প্রাপ্তি—হারানো

চারদিন অতিক্রান্ত হবার পর সেন বাড়ির আবহাওয়ায় টান লাগল। মাধুরী নিচু গলায় শাশুড়িকে জানাল, 'মা, বাবাকে ওঁর খবর নিতে বলবেন?'

'কেন, কদিন হল?' ফুল তুলতে তুলতে শোভনা প্রশ্ন করলেন।

'চারদিন।'

'সেকি!' ও তো দুদিনেই ফিরে আসে। তোমাকে কিছু বলে যায় নি?'

নীরবে মাথা নাড়ল মাধুরী। শোভনা আড়চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন। অনেক খুঁজে খতিয়ে এই মেয়েকে এনেছিলেন তিনি বেআক্কেলে ছেলেটাকে বাঁধবার জন্যে। এরকম সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না, ব্যবহারটিও ভারী মিষ্টি। কিন্তু কিছুই হয়নি। সেই মাঝরাতে টলতে

টলতে বাড়ি ফেরা, চিৎকার চেঁচামেচি, অবিরত শহরের মানুষের নালিশ এবং পুলিশের শাসানি একটুও বন্ধ হয়নি। না, ঠিক হল না। মাস ছয়েক হল, বিয়ের দুমাস পর থেকেই, চিৎকার চেঁচামেচিটা শোনা যাচ্ছে না। কখন বাড়িতে আসছে কখন বের হচ্ছে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

শোভনা বললেন, 'ঠিক আছে যাও, আমি দেখছি।' মাধুরী ফিরে গেল। মেয়েটার শরীরে ঈশ্বর সব দিয়েছেন' শোভনার নিজের যৌবনের দিনেও এত পাননি। অথচ ছেলেটা এসব চোখ মেলে দেখল না। ভাগ্যিস ওর বাপ নেই, মায়ের অবস্থা ভাল নয়। নইলে এই মেয়েকে একমাসও ধরে রাখা যেত না!

ঠাকুরঘরে বসেও শোভনার অস্বস্তি হচ্ছিল। চারদিন উধাও হয়নি কখনও ছেলেটা। যখন পেটে কিছু থাকে না তখন খুব ভাল ব্যবহার, অমন ছেলে হয় না। স্বর্ণকমল অত্যন্ত সুদর্শন দীর্ঘদেহ, গলা খুলে হাসতে জানে। কিন্তু কতক্ষণ? ঘুমের সময় বাদ দিলে বড় জোর ঘণ্টা চারেক। তবে ইদানীং একটা কালচে ছায়া পড়ছে শরীরে। তিরিশ বছরেই অত্যাচারের চিহ্নগুলো শরীরে ফুটছে। কোন কিছুতেই পাল্টানো গেল না তাকে।

যে নিজে সুন্দর তার কেন সুন্দর পছন্দ হয় না বুঝতে পারেন না শোভনা। যা কিছু কুৎসিত, কুরুচির ছাপ যাতে তার দিকেই ঢলে ছেলেটা। ডাক্তার অনিল সেনের ছেলে দল বেঁধে মারপিট করছে, বাড়ির যুবতী কুশ্রী ঝি-এর সঙ্গে রসিকতা করছে কি করে তার কোন কারণ খুঁজে পান না শোভনা। সেই ছেলে চারদিন উধাও হয়ে আছে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নামলেন শোভনা। এখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যাওয়ার সময়। সকালে এই সময় যা কিছু কথা সারতে হয়। শহরের সবচেয়ে দামী এবং ব্যস্ত ডাক্তার অনিল সেন। নিচে নেমে দেখলেন ডাক্তারবাবুর জামা-কাপড় পরা হয়ে গেছে। চিরকালই সাহেব মানুষ, নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসেন। স্ত্রীকে দেখে বললেন, 'দাগটা কেমন আছে?'

শোভনা মাথা নাড়লেন, 'তোমার ওষুধে কমবে না।'

'দেখি।' হাত বাড়ালেন ডাক্তার। মাসখানেক হল শোভনার ডান বাজুতে একটা সাদাকালো মেশা দাগ জন্মেছে। প্রথমে ভেবেছিলেন শ্বেতী কিন্তু একটু একটু করে বোঝা গেল তা নয়। ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছেন, অথচ কাজ হচ্ছে না তেমন।

শোভনা হাত নাড়লেন, 'ও এমন কিছু না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ডাক্তর বললেন, 'আবার কি হল?'

শোভনার গলায় উদ্বেগ, 'তুমি খোকার খবর নাও।'

'খোকা, কি হয়েছে তার?' ডাক্তারের গলায় বিস্ময়।

'চারদিন বাড়ি ফেরেনি।'

'কিছু বলে যায় নি?'

'না। বলে গেলে তোমায় বিরক্ত করতাম না।'

'বউমা কি বলছে?'

'এ অবস্থায় একটা মেয়ে কি বলতে পারে?'

'আমি বুঝি না, সত্যি বুঝতে পারি না। স্বামী মাতলামি করছে, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশছে, দিনরাত বেশ্যাবাড়িতে পড়ে থাকছে আর স্ত্রী হয়ে বউমা এসব সহ্য করছে কি করে? ওর তো ইতিমধ্যেই ডিভোর্স নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।'

'আমরা কি করে সহ্য করছি?' শোভনা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

'তোমার জন্যে। নইলে আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করতাম।'

'করনি যখন, তখন এটুকু কর।'

'কি করব?'

'ওর একটু খোঁজ নাও।'

'চমৎকার! আমি যত গুণ্ডা বদমাশ মাতালদের কাছে গিয়ে বলব ও মশাই আমার পুত্ররত্নটিকে দেখেছেন? অসম্ভব! তোমার ছোট ছেলেকে পাঠাও।'

অনিল সেনের এই কথাগুলো শোভনাকে হজম করতে হল। তিনি স্বামীর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। বেরিয়ে যাওয়ার আগে নিজেই যেন নিজেকে শোনালেন অনিল ডাক্তার, 'চিন্তা করে কোন লাভ নেই। ও ছেলেব কোন ক্ষতি হবে না। আরে বাবা যারা খুনখারাপি করে তারাই তো ওর বন্ধু। যাবে কোথায়, পেটে টান পড়লেই ফিরবে।'

শোভনা দোতলায় কোণার ঘরে চলে এলেন। ছোটছেলে অরুণদীপ্তি বিছানায় উপুড হয়ে তার কলেজের পড়া করছিল। ফরসা, দাদার মতনই লম্বা অত্যন্ত রোগা শরীর। ছাত্র হিসেবে এই জেলার প্রথম সারির। শোভনার একমাত্র গর্বের কারণ। শোভনাকে দেখে অরুণদীপ্তি উঠে বসল, 'কিছু বলবে মা?'

'তোকে একটা কাজ করতে হবে বাবা। স্বর্ণ চারদিন বাড়ি ফেরেনি। এরকম কখনও করে না। তোব বাবাকে বললাম তিনি আমলই দিলেন না। তুই একটু খোঁজ নিবি?'

'কোথায় খোঁজ নেব? দাদা কোথায় যায় আমি জানি না।'

শোভনা এই নিরীহ ছেলেটির দিকে আদরের চোখে তাকালেন। বাড়ল কিন্তু বড হল না। ওর দাদা এই বয়সেই পেতলে একটা দাঁত বাঁধিয়ে বাড়িতে অশান্তির ঝড তুলেছিল। শোভনা বললেন, 'ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজ খবর নে। বড় হয়েছিস, নিজের বিচার বিবেচনা নেই? ছোট্ট একটা শহরে সে কোথায় থাকতে পারে খুঁজে দ্যাখ।'

স্বর্ণকমলকে অরুণদীপ্তি ইদানীং এড়িয়ে চলে। তার দাদা গুণ্ডা বদমাসদের বন্ধু, দিনরাত মদ খায়, এই তথ্যগুলো তাকে ভীষণ হেয় করে। স্বর্ণকমলের ভাই এই পরিচয় তাকে পীড়িত করে। শোভনা চলে যাওয়ার পর সে খুব বিরক্ত মনে পোশাক পাল্টে বের হতেই মাধুরীকে দেখতে পেল। এই সুন্দরী সুশীলা বউদিটির প্রতি সে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ বোধ করে। প্রায়শই নিজেকে অমল এবং মাধুরীকে চারুলতা হিসেবে কল্পনা করে। কিন্তু স্বর্ণকমল ভূপতি? কস্মিনকালেও নয়।

অরুণদীপ্তি এগিয়ে গেল, 'বউদি?'

মাধুরী মুখ ফিরিয়ে হাসল, 'ওমা, পড়া হয়ে গেল?'

'হল কোথায়? মাতৃদেবীর আদেশ হয়েছে রামচন্দ্রকে খুঁজতে যেতে হবে।' অরুণদীপ্তি মাধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল। এই শহরে এত সুন্দরী মেয়ে সে আর একটিও দেখতে পায়নি। তাকালেই মন নরম হয়ে যায়, বুকের ভেতরটা কেমন লাগে। মাধুরী মুখ নামিয়েছিল, অরুণদীপ্তি শুধালো, 'দাদা কোথায় যেতে পারে বলতো?' নীরবে মাথা নাড়ল মাধুরী, সে জানে না।

'ঠিক আছে, তুমি চিন্তা করো না, আমি দাদাকে ধরে এনে দিচ্ছি।' বউদির জন্যে কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুশী হল অরুণদীপ্তি। স্বর্ণকমলের ওপর তার যা কিছু বীতরাগ তা মাধুরীকে দেখলেই উবে যায়।

পাড়াতেই স্বর্ণকমলের এক বাল্যবন্ধু থাকে। স্থানীয় স্কুলের মাস্টার। অরুণদীপ্তির তার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাকে দেখে মাস্টারমশাই বললেন, 'কি খবর অরুণ?'

'আমার দাদাকে দেখেছেন?'

'কে, স্বর্ণ? না তো! কি হয়েছে ওর?'

'জানি না। চারদিন বাড়িতে ফেরেনি।'

'ও। তা আমার সঙ্গে তো ইদানীং যোগাযোগ নেই। মানে তুমি বুঝতেই পারছ ওর জীবন আর আমারটা আলাদা। তুমি থানায় খবর নাও।'

'থানা?' অরুণদীপ্তি চমকে উঠল, 'বাবাকে না জানিয়ে থানায় যাব?'

'ও, মেসোমশাই জানেন না বুঝি? তাহলে এক কাজ করো। রঞ্জিতকে চেন?'

'রঞ্জিত!'

'ওই যে চৌমাথায় যে লন্ড্রিটা আছে তার মালিক। তোমার দাদার এখন খুব বন্ধু। ওর কাছে চলে যাও, ও জানতে পারে।'

সাইকেল চালিয়ে রঞ্জিতের লন্ড্রিতে চলে এল অরুণদীপ্তি। দোকানটা সবে খুলেছে। বড় গোঁফ মোটাসোটা লোকটাই রঞ্জিত। আসা যাওয়ার পথে দেখেছে অরুণদীপ্তি। সে দোকানে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

'আমি স্বর্ণকমল সেনের ভাই।'

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতের কপালে ভাঁজ পড়ল। মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল, 'ও।'

'আমার দাদাকে আপনি দেখেছেন?'

'আমি? না তো। কেন?'

অরুণদীপ্তি হতাশ হল, 'দাদা ক'দিন বাড়ি ফেরেনি তাই।'

'না ভাই, আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি।'

'আচ্ছা, দাদা কোথায় যেতে পারে বলতে পাবেন?'

রঞ্জিত দুমুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'তোমরা কিছু জানো না?'

'না।'

'তাহলে আমার মুখে নাই বা শুনলে। ঠিক আছে, দেখা পেলে পাঠিয়ে দেব।'

অরুণদীপ্তি বুঝল এখানে দাদার খবর পাওয়া যাবে না। লোকটা যেন তাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে। সে মাথা নিচু করে রাস্তায় নেমে সাইকেলটা ধরে হাঁটতে লাগল। এবার কার কাছে যাওয়া যায়? কোন সূত্র যোগাড় না করে বাড়িতে ফিরলে খুব অসম্মানের ব্যাপার হবে। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ও মানুষ দেখছিল। এখন অফিসের সময় রিক্সা এবং সাইকেলের মিছিল শুরু হয়ে গেছে। কি করা যায় বুঝতে পারছিল না অরুণদীপ্তি। এই সময় একটা রিক্সা এসে সামনে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক ভাড়া মিটিয়ে চলে গেলে রিক্সাওয়ালা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কি খোকাবাবু, এখানে?'

বিরক্ত হল অরুণদীপ্তি, 'এমনি।'

রিক্সাওয়ালাটা অনিল সেনের কাছে ওষুধ নিতে আসে প্রায়ই। সেইসূত্রে বোধহয় ওকে চেনে।

হঠাৎ ওর মনে হল প্রায় রাতেই দাদা নেশা করে রিক্সায় চেপে বাড়ি ফেরে। সে রিক্সাওয়ালাকে ডাকল, 'শোন।'

রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা নিয়েই সামনে এগিয়ে এল। অরুণদীপ্তি একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কাল পরশু তুমি আমার দাদাকে দেখেছ?'

'স্বর্ণবাবু! না ক'দিন তো দাদাকে দেখিনি।'

'আচ্ছা, তুমি কি রাত্রে দাদাকে কখনো এনেছ?'

রিক্সাওয়ালা হাসল, 'হ্যাঁ বাবু, অনেকবার।'

'দাদা কোত্থেকে রিক্সায় উঠত?'

রিক্সাওয়ালার মুখ কুঁকড়ে গেল। বোধহয় কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

অরুণদীপ্তি সেটা লক্ষ্য করে আশ্বাস দিল, 'তুমি নির্ভয়ে বলো। দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কোথায় নেশা করত জানলে খোঁজ করতে পারি।'

এবার রিক্সাওয়ালা বলল, 'সে বড় খারাপ জায়গা বাবু।'

'আমাকে নিয়ে যেতে পারো?'

'আপনি যাবেন! পাড়াটা ভাল না।'

অরুণদীপ্তির রোখ চেপে গেল। সে দুগ্ধপোষ্য নাকি! কড়া গলায় বলল, 'দিনদুপুরে গেলে আমার কি হবে। তোমাকে বলছি দাদাকে দরকার। চলো, আমি যাব।'

রিক্সাওয়ালা তখনও কিন্তু কিন্তু করছিল, 'ডাক্তারবাবু জানলে—' অবশ্য শহরের অনেকেই জানে স্বর্ণবাবুকে ওখানেই পাওয়া যায়। বেশ চলুন তবে।'

খালি রিক্সার পেছনে পেছনে অরুণদীপ্তি সাইকেল চালিয়ে শহরের এক প্রান্তে চলে এল। এদিকে একটা বড় বাজার আছে। ভীষণ ঘিঞ্জি এলাকা। বাজার পেরিয়ে একটা গলির মুখে এসে রিক্সাওয়ালা তার গাড়ি থামাল, 'স্বর্ণবাবু এই গলি থেকে বের হয়।'

অত্যন্ত নোংরা রাস্তা। পাশেই নর্দমা। সেখানে শুয়োরের পাল চরছে। দু'তিনজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক এই বেলায় ব্যাগ হাতে বাজারে যাচ্ছে। অরুণদীপ্তি বন্ধুদের মুখে এই গলির কথা শুনেছে। শহরের গণিকাদের বাস এখানে। তারা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং এই অঞ্চলে কোন ভদ্রসন্তান পথ ভুলেও পা দেয় না।

'ওখানে মদের দোকান আছে?' অরুণদীপ্তির অস্বস্তি হচ্ছিল।

'হ্যাঁ খোকাবাবু, হরি শা'র দোকান আছে। তারপর কি ভেবে বলল, 'এক কাজ করুন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি খোঁজ নিচ্ছি, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনার একা যাওয়া ঠিক নয়। গলিটা খারাপ।'

রিক্সাওয়ালার পেছন পেছন অরুণদীপ্তি গলিতে ঢুকল। দুধারে চাপা চাপা ঘর। তার বারান্দায় বসে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা গল্প করছে। অরুণদীপ্তির মনে হল এত কুৎসিত চেহারার মেয়েকে সে একসঙ্গে কখনও দেখেনি। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে নাগর মুখ তুলে চাও।' আর একটি কণ্ঠ খিলখিলিয়ে উঠল, 'কচি ছাগল।'

রিক্সাওয়ালা চাপা গলায় বলল, 'এসব কথায় কান দেবেন না ছোটবাবু দিলেই পেয়ে বসবে।'

অরুণদীপ্তির মুখে রক্ত জমছে, খুব রাগ এবং ঘেন্না লাগছিল তার। দাদা এই জায়গায় মদ খেতে আসে? আশ্চর্য! ওরা নিশ্চয়ই দাদার সঙ্গেও এইসব কথা বলে।

হরি শা-এর দোকান ঠিক মাঝখানে। তবে সবে দোকান খুলেছে। রিক্সাওয়ালা তাকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে চলে গেল। অরুণদীপ্তি দেখল চারপাশে খুব জোরে রেডিও বাজছে, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে এবং তারই মধ্যে একটি বালিকা অশ্লীল পোশাক পরে নেচে নিল কয়েক পাক।

রিক্সাওয়ালা বলল, 'ছোটবাবু, স্বর্ণবাবু চারদিন মাল কেনেনি এখান থেকে।'

অরুণদীপ্তি হতাশ হয়ে পড়ল, 'তাহলে!'

রিক্সাওয়াল বলল, 'এরা সব স্বর্ণবাবুকে খুব ভয় পায়। মিথ্যে কথা বলবে না। আপনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলে সব জানতে পারবেন, হরি শা'র ছেলে তাই বলল।'

'কাকে?'

'এখানে পদ্মা বলে একটা মেয়েছেলে থাকে দুটো ঘর নিয়ে। একটা ঘরে নাকি স্বর্ণবাবু থাকতো।'

লোকে বলে, তুমি বুঝতেই পারছ ছোটবাবু। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার একটা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাতে হবে। তোমাকে ঘরটা চিনিয়ে দিচ্ছি চল। রিক্সাটা সেখানে সরিয়ে রেখে লোকটা তাকে নিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। সরু ময়লা গলি। কোথায় খুব ঝগড়া বেধেছে।

টিনের চাল আর কাঠের দেওয়াল দেওয়া দুটো ঘর দেখিয়ে রিক্সাওয়ালা বলল, 'এখানে পদ্মা থাকে। তুমি কথা সেরে চলে যেও। এসব জায়গায় বেশীক্ষণ থেকো না।'

রিক্সাওয়ালা চলে যেতে অরুণদীপ্তি নাকে রুমাল দিল। বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে। একটা বুড়োমতন রোগা লোক দাওয়ায় বসে ছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

অরুণদীপ্তি রুমাল সরাল না, 'এখানে পদ্মা বলে কেউ থাকে?'

'থাকে। কিন্তু এখন ঘরে বসাবে না।' বুড়ো মুখ ফেরালো।

'মানে?'

'সাতসকালে বাচ্চা ছেলে ঘরে নেওয়ার মেয়ে পদ্মা নয়। তাছাড়া ওর মেজাজ খুব খারাপ আছে, অন্য ঘর দ্যাখো।'

এবার বুঝতে পারল অরুণদীপ্তি এবং বোঝা মাত্র সে সঙ্কুচিত হল। এবং সেটা এড়াতে বেশ রাগত গলায় বলল, 'আমার ওঁর সঙ্গে দরকার আছে। ডাকুন ওঁকে।'

বুড়ো একটু অবাক চোখে তাকে দেখল। তারপর বসে বসেই চিৎকার করল, 'ও পদ্মা, পদ্মা, তোকে ডাকে দ্যাখ।'

একটু পরেই একটি থ্যাবড়ামুখো স্ত্রীলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ত্রিশের নিচে নয় বয়স, মোটাসোটা কিন্তু বুক এবং পাছা অত্যন্ত ভারী, গায়ের রঙ বেশ কালো। প্রথম দেখায় খুবই বিরক্তিকর মনে হয় এবং একটু বোকা বোকা দেখায়।

'কি চাই? ওমা, এ-যে দেখছি দুধের দাঁত পড়েনি। এই বুড়ো, তোকে বলিনি এখন আমাকে বিরক্ত করবি না।' কোমরে হাত রেখে খেঁচিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি।

'আপনি কি পদ্মা?' সাহস করে বলল অরুণদীপ্তি।

'হ্যাঁ। নামও জানা আছে দেখছি।'

'আপনি স্বর্ণকমল সেনকে চেনেন?'

এবার দুটো চোখ যেন মাংসের আড়ালে চলে গেল, 'চিনি।'

উনি আছেন?'

'কে আপনি?'

'আমি ওঁর ভাই।'

সঙ্গে সঙ্গে আঁচলটা পিঠে জড়ালো পদ্মা, 'ও। কিছু মনে করবেন না ভাই, আমি মানে, আসুন আসুন।'

'না দাদা আছে কিনা তাই বলুন।'

'পাঁচ মিনিটের জন্যে আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে খারাপ ভাববে। আপনি স্বর্ণবাবুর ঘরেই বসবেন। দয়া করে আসুন।' পদ্মা এতবার অনুনয় করতে লাগল যে এড়াতে পারল না অরুণদীপ্তি, পাশের ঘরের দরজা খুলে একটা তক্তপোষ পরিষ্কার করে পদ্মা বলল. 'এখানে তো কোন ছিরিছাঁদ নেই ভাই, কষ্ট করে বসতে হবে। আমার কি সৌভাগ্য।'

অরুণদীপ্তি দেখল এই তক্তপোষ এবং একটা বালিশ ছাড়া ঘরে কিছু নেই। নেই বললে ভুল হবে, অনেকগুলো খালি মদের বোতল পড়ে আছে। এইটে তার দাদার ঘর? দাদা এখানে ভাড়া নিয়েছিল? এই স্ত্রীলোকটি? অরুণদীপ্তির শরীর গুলিয়ে উঠল। বউদির শরীরের ছায়া এর থেকে ঢের সুন্দর। দাদা এই প্রায় কুৎসিত স্ত্রীলোকটির সঙ্গে থাকতো? ঘিনঘিন ভাবটা বেড়ে গেল তার। আর ওই স্ত্রীলোকটি এমন ভাবে খাতির করছে যেন সে তার পরমাত্মীয়। অরুণদীপ্তি জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা আছেন?'

মাথা নাড়ল পদ্মা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে ফেরেনি, না?'

'ফিরলে আমি এখানে আসবো কেন? কোথায় গিয়েছেন জানেন?'

হঠাৎ আঁচলের কোণা মুখে গুঁজে পদ্মা যেন কান্না চাপল, 'আমার কথা শুনল না!'

'কি কথা?'

'ওরা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বর্ডার থেকে কিসব জিনিস আসবে, অনেক টাকার ব্যাপার। আমার খুব ভয় করছে।' পদ্মার গলার স্বরে কান্নার টোকা।

'কারা ডাকতে এসেছিল?' অরুণদীপ্তি অবাক হয়ে গেল।

'চারজন। ওর পবিচিত। নাম বলতে পারব না। ওরা আমাকে কেটে ফেলবে। তবে স্বর্ণবাবুর যদি কিছু হয় তাহলে আমি ছেড়ে দেব না।'

'দাদা এই ঘরে থাকতো?'

'হ্যাঁ। সারাদিন এখানে শুয়ে মদ খেত। আমার কাজে বাধা দিত না।'

অরুণদীপ্তি ভেবে পাচ্ছিল না বাড়ি ফিরে দাদার এইসব ঘটনা বউদিকে বলতে পারবে কিনা! সে উঠল, 'দাদা যদি ফেরেন তাহলে বাড়িতে যেতে বলবেন।'

পদ্মা বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। আমিই তো জোর করে রোজ ওকে বাড়ি পাঠাতাম।'

অরুণদীপ্তি বেরিয়ে আসছিল, পদ্মা বলল, "'আপনি প্রথম এলেন, একটু মিষ্টি খেয়ে যাবেন?'

অরুণদীপ্তি জবাব দিল না। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে তত ভাল।

ফাঁকা রাস্তায় প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে অরুণদীপ্তি ব্যাপারটা আর একবার খতিয়ে দেখল। মাধুরীব মত অমন সুন্দরী বউকে ছেড়ে দাদা ওই পাড়ায় ঘর নিয়ে মদ গিলতো? আর পদ্মার বেঢপ স্বাস্থ্য ছাড়া আর সব যে কোন ঝি-এর চেয়েও অস্বস্তিকব। দাদা তাই নিয়ে পড়ে থাকতো। মেয়েছেলেটা অবশ্য তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে, যেন স্বর্ণবাবুর আত্মীয় ওরও নিকটজন! এসব কথা বাড়িতে বলা চলবে না। কিন্তু দাদা কোথায় গিয়েছে? পদ্মা বলল চারজন লোক দাদাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। দাদা কি স্মাগলিংও করত? হয়তো। কারণ দাদার কোন বোজগার ছিল না এবং বাড়ি থেকেও পয়সা নিত না। বিয়ের সময় দাদা ব্যবসা করছিল কিন্তু বিয়ের পরেই সেটা তুলে দেয়। অন্যপথে টাকা না এলে দাদা খরচ চালাতো কি করে? ওই পাড়ায় বাড়ি ভাড়া মদ খাওয়ার তো খরচ আছে।

এলোমেলা কিছুক্ষণ সাইকেল চালিয়ে অরুণদীপ্তি হাসপাতালের সামনে এসে পড়ল। আচ্ছা, দাদার যদি কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে? উঁহু, তাহলে ওরা খবর পেত। স্বর্ণ সেনকে এই শহরের প্রত্যেকটা মানুষ চেনে। তাছাড়া বাবার তো বিরাট পরিচয়। অতবড ডাক্তার এই শহরে দ্বিতীয়টি নেই। অরুণদীপ্তির মনে পড়ে ছেলেবেলায় সে দাদাকে অন্যরকম দেখেছে। খুব ভাল ফুটবল খেলত, হই হই করত সর্বক্ষণ। সেই দাদা বড় হয়ে যা কিছু সুন্দর তা থেকে এমন দূরে সরে গেল কি করে!

বাড়ি ফিরে আসার সময় ওর মনে পড়ল পদ্মা সেই চারটে লোকের নাম বলেনি। বললে লোকগুলো নাকি পদ্মাকে মেরে ফেলবে! লোকগুলো কে? কথাটা বাবাকে বলা দরকার। কিন্তু বাবাকে সে সবসময় এড়িয়ে যায়। অত রাশভরী এবং রাগী মানুষ বলে ছেলেবেলা থেকেই একটা দূরত্ব থেকে গেছে। কি করা যায়?

শোভনা ছোট ছেলের মুখে শুনলেন কোন খবর পাওয়া যায়নি। মুখ ভার হয়ে গেল তাঁর। অরুণদীপ্তি আর বউদির সামনে গেল না। খেয়ে দেয়ে কলেজ যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় অনিল সেন বাড়ি ফিরলেন, 'দারোগাকে বলে এলাম খোঁজ খবর নিতে। আর বলতে গিয়ে যা শুনে এলাম তাতে আর এই শহরে থাকা যাবে না।'

শোভনা চকিতে চারপাশে তাকিয়ে নিলেন, 'আস্তে বল, কি শুনলে?'

'তোমার ছেলে বেশ্যাবাড়িতে বসে মদ খেতো। এর আগেও এক আধবার এই ধরনের কথা কানে এসেছিল, বিশ্বাস করিনি। আজ খোদ দারোগার মুখে শুনলাম।' চোখ বন্ধ করে চেয়ারে

বসে রইলেন ডাক্তার অনিল সেন।

'যা শুনেছ শুনেছ, এই নিয়ে চেঁচামেচি করো না। বউমার কানে না যায়!'

'কার ওপর চেঁচামেচি করব? ঘরের সুন্দরী বউদের চিরকালই বেশ্যারা হারিয়ে দেয়, না? ঠিক আছে, তোমরা সরে যাও, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' অনিল সেন হাত নাড়লেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো শুনে অরুণদীপ্তির বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। যাক, কোন কথা তাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না।

বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে অরুণদীপ্তি থানায় গেল। সারাটা দুপুর ওই চারটে লোকের কথা মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। পুলিশ যদি পদ্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে নিশ্চয়ই একটা সূত্র পাওয়া যাবে। সে ঠিক করেছিল চুপিচুপি দারোগাবাবুকে খবরটা দিয়ে আসবে। এর আগে কখনও সে থানায় ঢোকেনি। চারধারে পুলিশ এবং বিচিত্র চেহারার লোকজন।

স্লিপ পাঠিয়ে শুনল দারোগাবাবু খুব ব্যস্ত, এখনই বের হবেন। কিন্তু তার ডাক এল। ঘরে ঢুকে দেখল কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দারোবাবু কথা বলছেন। তাকে দেখে কথা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ডাক্তাব সেনের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'কি দরকার বলুন? আমি খুব ব্যস্ত। আপনার দাদার ব্যাপার তো? কিছু মনে করবেন না, উনি এই শহরে নেই জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। শুধু ডাক্তার সেন খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ তাই—।' দারোগাবাবু জানালেন।

একজন অফিসার মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বললেন, 'স্যার, ওই ডেডবডিগুলোর কথা বলবেন বলছিলেন ডাক্তারবাবুকে—।'

'ও হ্যাঁ। গত তিনদিন আমরা দুটো বেওয়ারিশ ডেডবডি পেয়েছি। আমার লোক আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। আপনারা দেখতে পারেন।'

ডেডবডি?' অরুণদীপ্তি কেঁদে উঠল।

'হ্যাঁ। একটা নেপালির। নিশ্চয়ই আপনার দাদা নন। অন্যটি মনে হচ্ছে বুড়ো মানুষের। তবে ডিসফিগারড। মাথার চুল সাদা।'

অরুণদীপ্তি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, 'আমার দাদা বুড়ো নয়।'

'জানি। তাই গা করিনি। এটা আমাদের রুটিন চেক।' দারোগাবাবু বললেন।

'আমি একবার দেখব দারোগাবাবু!' মেয়েলি গলা শুনে চমকে উঠল অরুণদীপ্তি। সে দেখল ঘরের এক কোণায় বেঞ্চিতে বসে আছে পদ্মা। মাথায় ঘোমটা। ও যে এই ঘরে আছে তা সে লক্ষ্যই করেনি এতক্ষণ।

'আঃ, তখন থেকে নাকে কাঁদছে। ল্যাংটো ব্যাটাছেলে না দেখলে নোলা শুকোচ্ছে না! স্বর্ণবাবু কোথায় গিয়েছে তুমি জান না?'

'না বাবু, আমি তো বারবার বলছি, আমায় কিছু বলে যায়নি সে।'

'ওষুধ খাবে নাকি?'

'আমি সত্যিকথা বলছি বাবু। উনি শুধু আমার ওখানে থাকতেন, আর কিছু না।'

'নেকি! লীলা করতেন নীল মাখতেন না। ঠিক আছে যাও, কিন্তু ডাকলেই যেন পাই। আর মিথ্যে কথা বলেছ, জানলে চামড়া ছাড়িয়ে নেব।' দারোগাবাবু টুপিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ভাই, আপনার বাবাকে বলবেন আমরা চেষ্টা করছি।'

অরুণদীপ্তি বলতে গেল যে এই মেয়েছেলেটা চারটে লোকের খবর জানে, ওকে চাপ দিন। কিন্তু তার আগে পদ্মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'দারোগাবাবু, আমাকে একবার মড়া দেখতে দেবেন?'

দারোগা বললেন, 'আশ্চর্য! ও-দুটোর সঙ্গে স্বর্ণবাবুর কোন মিল নেই তবু দেখতে চাইছ কেন? আব তোমার চেয়ে ওর ভাইকে দেখালে বেশী কাজ হবে!'

'ওই যে আজ বললেন পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?'

'পাহাড়ের কাছেই তো বর্ডাব।'

'হ্যাঁ।'

'স্বর্ণবাবু কিছুদিন আগে বর্ডাবেব কথা বলছিলেন।'

'আই সি। এতক্ষণ বলনি কেন?'

'অনেক কথাই তো বলত। সব মনে বাখা যায়?'

দারোগাবাবু বললেন, 'কিন্তু এই লোকটা তো বুড়ো! আপনি কি দেখবেন?' প্রশ্নটা অরুণদীপ্তিকে। অরুণদীপ্তি বলল, 'যদি বুড়োমানুষ হয় তাহলে দেখে কি করব? তাছাড়া আমার দাদার চুল সাদা ছিল না।'

এই সময় বাইরে হইচই শুরু হল। দারোগাবাবু অফিসারদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে অরুণদীপ্তি আব দাঁড়াল না। এই মুহূর্তে দারোগাকে ওসব কথা বলা যাবে না। পদ্মাকে যখন পুলিশ এখানে এনেছে তখন কাল সকালেই বললে চলবে। সে হন হন করে বারান্দা ডিঙ্গিয়ে সাইকেলে উঠল। পদ্মার সঙ্গে কথা বলাব প্রবৃত্তি তাব ছিল না।

অনিল সেনেব বাড়িব পেছনে সুন্দব বাগান এবং পুকুরঘাট আছে। অপরাহ্ণের ম্লান ছায়ায় সেই ঘাটে বসে জলেব শবীব দেখছিল মাধুরী। দুদিন না বলে কয়ে যে উধাও হয়ে গিয়েছে সে চাবদিন হতে পাবে। তবু চাবদিন তাই সে শাশুড়িকে জানিয়েছিল। স্বর্ণকমল কখন আসে কখন যায় এবাড়িব কেউ খবব বাখে না। বেশীরভাগ দিন বাড়িতে খায় না, থাকলে ঘর ছেড়ে বের হয় না। অনেক কান্নাকাটি অনেক চেঁচামেচিব পব এখন সম্পর্কটা থিতিয়ে বয়েছে। স্বর্ণকমল সেদিন নেশাব ঘোবে বলেছিল, 'কেন পড়ে আছ বুঝি না। চেহারা ভাল স্বাস্থ্য ভাল। ডিভোর্স চাও দিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি কি দোষ কবলাম?' মাধুরী স্পষ্ট শুধিয়েছিল।

'কিছু না। সুন্দবী মেয়ে আমার সহ্য হয় না। পুতুল পুতুল লাগে।'

'তাহলে বিয়ে করলে কেন?'

'এই কেন'র উত্তর যদি জানতাম! ডাক্তার অনিল সেনকে জিজ্ঞাসা কর কেন আমি বিয়ে করেছি। তাছাড়া, তোমাকে দেখলে আমাব একটুও উত্তেজনা আসে না।'

মাধুরী কিছুই দেখছিল না। একটা অবশ-অনুভূতি সর্বাঙ্গে নিয়ে বসেছিল। আট মাস তো হয়ে গেল। এবার বাপের বাড়ি চলে গিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেই হয়। লোকটা তো তাই চাইছে। আর এখন যদি সে মুক্ত হয় তাহলে—! মাধুরী দুহাতের বেড়ে চিবুক রাখল। না, পুরুষদের অভাব হবে না তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে। এই আটমাসে লোকটার ওপর তার একটুও মায়া পড়েনি। নিজের কাছেই অবাক লাগে, সে এখনও কুমারী রয়ে গেল! মাধুরী সিদ্ধান্ত নিল। এবার লোকটা ফিরলে কথা বলে ছেদ টানতে হবে। তার বিয়ের আগে তো কৃপাপ্রার্থীর অভাব ছিল না, তাহলে নিজেকে সে বঞ্চিত করবে কেন? মাধুরী দেখল, কি একটা পুকুরে পড়ল। শব্দ হল, ঢেউ কাঁপুনি ছড়াল এবং একসময় মিলিয়ে গেল। বাঃ, চমৎকার।

'কি ভাবছ বউদি?'

মাধুরী চমকে মুখ তুলল। তারপর হেসে বলল—'আমার ভাগ্যটার কথা।'

'দূর! ওসব ভেবে কি হবে। ওঠো তো!' অরুণদীপ্তি তাগাদা দিল।

'কেন?'

'এক জায়গায় বসে থাকতে হবে না। দাদা দাদার মত আছে তুমি তোমার মত থাকো না। চল, হাঁটি।' অরুণদীপ্তি হাত বাড়াল।

'কী নিয়ে থাকব অরুণ!'

'কত কি আছে পৃথিবীতে।'

'ছেড়ে দাও এসব কথা। কোন খবর আসেনি না?'

'না।'

'খবর না আসা পর্যন্ত আমি যেতেও পারছি না।'

'যাবে, কোথায় যাবে?'

'তোমাদের বাড়িতে আমার সংসার করা হল না অরুণ। তোমার দাদা আমাকে ডিভোর্স দিতে চাইছেন। এভাবে তো কোন মানুষ থাকতে পারে না। ভেবেছিলাম একবছর দেখব। কিন্তু না, ও ফিরে এলেই আমি চলে যাব।'

এই সময় একটি চাকর বাগানে এসে দাঁড়াল, 'ছোটবাবু, আপনাকে ডাকছে।'

'কে?'

'একটা মেয়েছেলে। নাম জানি না।'

অরুণদীপ্তি অনুমান করতে পারছিল না। হন হন করে সে সামনের গেটে পৌঁছে হোঁচট খেল। পদ্মা দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে সেই বুড়োটা। রাগে মাথায় আগুন জ্বললো। সে চকিতে পেছন ফিরল, না, কেউ নেই। কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই? এখানে কেন?'

পদ্মা যেন সেসব গায়েই মাখল না। তার গলা কাঁপছে, 'আমি মড়া দেখে এলাম।'

'তা আমাদের কি?'

'আমার মনে হচ্ছে,' ডুকরে উঠল পদ্মা, 'মনে হচ্ছে ওটা স্বর্ণবাবুর শরীর।'

'কি যা-তা বলছ?' চিৎকাব করল অরুণদীপ্তি, 'দারোগা বলল লোকটা বুড়ো!'

ঘনঘন মাথা নাড়ল পদ্মা। তার চোখ জলে বন্ধ, ঠোঁট টিপে রেখেছে। অরুণদীপ্তি আবার আড়চোখে বাড়ির দিকে তাকাল। মা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ওখান থেকে যদিও কোন কথা শুনতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকটির পরিচয় জানতে চাইবেন। হঠাৎ পদ্মা বলল, 'আপনারা একবার দেখুন। আমি প্রায় নিশ্চিত যে উনিই স্বর্ণবাবু। তবু মানুষের তো ভুল হয়।'

'দারোগা বলেছিল লোকটার চুল সাদা। দাদার তো কালো চুল।'

'উঁহু, উনি মাথায় রং মাখতেন। একটু পাকতে আরম্ভ করলেই রঙ মাখা শুরু করেছিলেন। আপনার মা বউদিকে জিজ্ঞাসা করুন।' পদ্মা তখনও কেঁদে যাচ্ছিল। আর বুড়োটা মাঝে মাঝে বলছিল, 'কাঁদিস না পদ্মা, কাঁদিস না।'

অরুণদীপ্তি ভেতরে ভেতরে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। দাদার মাথার চুল সাদা ছিল? এক বাড়ির ছেলে হয়ে সে জানতো না। হঠাৎ এই স্ত্রীলেকটিকে ঈর্ষা করতে আরম্ভ কবল। এবং সেই কারণেই ক্রোধ প্রকাশ করতে পারল অরুণদীপ্তি, 'কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তুমি?'

'বাঃ, আমি কাঁদব না? আমি তো কিছুই চাইনি, একটু কাঁদতে পারব না। আপনি আর দেরি করবেন না। আমি পুলিশকে বলে এসেছি। আপনি গিয়ে একবার দেখুন, আপনার বউদি যদি যায় খুব ভাল হয়। আপনারা যদি চিনতে পারেন তাহলে আমি ওই চারজনকে ছাড়ব না। একবার শুধু বলে দিন ওটা স্বর্ণবাবুর শরীর তাহলেই আমি বদলা নেব।' হিস হিস শব্দ করল পদ্মা।

এবার নাড়া খেল অরুণদীপ্তি। সেই চারজনের প্রসঙ্গ মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল,

'এদের কথা তুমি পুলিশকে বলেছ?'

'মাথা খারাপ। সঙ্গে সঙ্গে ওরা পিছলে বেরিয়ে যাবে। আপনি আসুন, আমি ওখানেই যাচ্ছি।' পদ্মা ফিরে গেল বুড়োকে নিয়ে।

কিছুক্ষণ কি করবে বুঝতে পারল না অরুণদীপ্তি। পেছনে ফিরলেই মা তাকে ইশারায় ডাকবেনই। না, নিজের চোখে দেখবে সে। নিজের দাদাকে সে ভাল চেনে। কে কি বলল আর সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে হবে! বরং ফিরে এসে মাকে গল্পটা বলা যাবে। অরুণদীপ্তি গেট খুলে বেরিয়ে এল।

নদীর পাশে মর্গ। অরুণদীপ্তি পৌঁছে দেখল পদ্মারা তার আগে এসে গিয়েছে। একজন পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অরুণদীপ্তি তার সাহায্যে মৃতদেহের কাছে পৌঁছোলো। উৎকট পচা গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। তখন মর্গে মাত্র দুটো মৃতদেহ। নাকে রুমাল দিয়ে তাদের সামনে পৌঁছে অরুণদীপ্তি দেখল পদ্মাও তার সঙ্গ নিয়েছে। ডোমটা দেখাল। একটি নেপালির তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দ্বিতীয়টির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠল যেন। উঃ, কি ভয়ানক!

লোকটার চোখ দুটো নেই। দুটো ঠোঁট কেটে নেওয়া হয়েছে। বুকের কাছে বিশাল ক্ষত। হাত এবং পা, কবজি এবং গোড়ালির ওপর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। থাই-এর কাছেও ক্ষত। সমস্ত শরীর বেঢপ ফুলে নীলচে কালো হয়ে রয়েছে। দুবার তাকালেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে। এবং চুল সাদা কিন্তু একটা কালচে ভাব আছে। অরুণদীপ্তি মাথা নাড়ল, না এ তার দাদা নয়। দাদার শরীরের আকৃতির সঙ্গে মিলছে না। নাক কান তো সব মানুষের এরকম হতে পারে। সে মাথা নাড়ল।

সেটা দেখে পদ্মা বলল, 'যাতে কেউ চিনতে না পারে তাই ওরকমই কেটে দিয়েছে। স্বর্ণবাবুর বুক আর থাই-তে জরুল ছিল, সেখানটাই কেটেছে।'

মাথা নাড়ল আবার অরুণদীপ্তি, 'এ আমার দাদা নয়।'

'দাঁত দেখুন, ভেতরের দাঁত, পেতলে বাঁধানো।' চাপা গলায় বলল পদ্মা।

ডোম হাঁ-মুখ দেখার ব্যবস্থা করে দিলে অরুণদীপ্তি চমকে উঠল। হ্যাঁ, পেতলের দাঁত এবং পেতলের ওপর এস লেখা, খুব সূক্ষ্মভাবে। তার মাথাটা ঘুরে গেল। কোনরকমে সামলে নিয়ে বাইরে এল। পুলিশটা জিজ্ঞাসা করল, 'কি, চিনতে পারলেন?'

মাথা নাড়ল অরুণদীপ্তি। না। তারপর প্রায় দৌড়ে বড় রাস্তায় চলে এসে রিক্সা নিল।

মায়ের ঘরে ঢুকল অরুণদীপ্তি। তার শরীর টলছিল। চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন শোভনা। তারপর উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি, 'কি হয়েছে?'

'দাদা!'

'মর্গে। ওরা দাদাকে মেরে ফেলেছে!'

'কোথায়?' শোভনার মুখে উদ্বেগ। বুঝতে পারছিলেন খবরটা ভাল নয়।

একটা আর্তনাদ ছিটকে এল শোভনার গলা থেকে, 'কি বললি?'

বিছানায় বসে দুহাতে মুখ ঢাকল অরুণদীপ্তি। তার শরীর কাঁপছিল।

'কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।' শোভনা ছেলের দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন।

অরুণদীপ্তির সময় লাগল। স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। তারপর এক এক করে সে সমস্ত ঘটনা উগরে গেল। শেষ হওয়ামাত্র শোভনা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'তুই দেখেছিস পেতলের ওপর এস লেখা?'

মাথা নাড়ল অরুণদীপ্তি, 'হ্যাঁ।'

'আর শরীর? হাত পা মুখ?'

'চেনা যাচ্ছে না, কিচ্ছু চেনা যাচ্ছে না।'

'পেতলে এস লিখে কেউ তা দাঁতে বসিয়ে দিতে পারে, পারে না?'

অরুণদীপ্তি চমকে উঠল; 'কেন বসাবে?'

'যারা খুন করেছে লোকটাকে তারা লুকোতে চাইবে। আবার এও তো হতে পারে, আর একটা লোকের পেতলের দাঁতে এস লেখা ছিল। একটা পেতল দিয়ে মানুষ চেনা যায়? না. আমি বিশ্বাস করি না। যে ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি তার শরীর একবার দেখলেই আমি চিনতে পারব। আমি না দেখা পর্যন্ত তুই কাউকে এসব কথা বলবি না।' শোভনার কণ্ঠ কঠোর।

পরদিন ভোরে দারোগাবাবু এলেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনাদের খুব কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন উপায় নেই। যে লোকটিকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না তার সম্পর্কে গতকাল একটি স্ত্রীলোক দাবী করেছিল স্বর্ণবাবু বলে। আমরা আমল দিইনি।'

'স্ত্রীলোক?' অনিল সেনের চোখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। বাজারের মেয়ে। কিন্তু আজ সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। খুনী ধরা পড়েনি। মনে হচ্ছে সে চিনতে পেরেছে বলেই খুনী তাকে বাঁচিয়ে রাখেনি।'

'একটা বাজারের মেয়ের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'আপনার নয়! স্বর্ণবাবুর তো সুনাম ছিল না। বডি যদি স্বর্ণবাবুর হয় তাহলে কেস খুব জটিল হয়ে যাবে। সমস্ত শহরের লোক জেনে গিয়েছে। এখন আপনারা একবার যদি আইডেন্টিফাই করে দেন তাহলে মেয়েটির খুনী সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করতে পারি।' দারোগাবাবু জানালেন।

অনিল সেনের চোয়াল ঝুলে পড়েছিল। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো স্বর্ণকে চেনেন আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না?'

'না। কারণ ওর হাত পা চোখ ঠোঁট সব কেটে দেওয়া হয়েছে। শরীরের রঙ পাল্টে গেছে, চুল সাদা এবং অনেক ক্ষত।'

'চুল সাদা? আমার ছেলের চুল সাদা ছিল না।'

'আমরা তাই জানি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কাল বলেছে স্বর্ণবাবু চুল রঙ করত। আজ আমি সেটা দেখে প্রমাণ পেয়েছি। আমার মনে হয় একমাত্র আপনার স্ত্রী এবং বউমা ছাড়া আর কারো পক্ষে এই অবস্থায় ওকে চেনা মুস্কিল?' দারোগাবাবু বললেন।

অনিল সেন এবার প্রতিবাদ করলেন, 'আমার বাড়ির মেয়েরা যার তার মড়া দেখতে যাবে? অসম্ভব!'

ঠিক তখনই শোভনা এলেন, 'আমি যাব।'

'তুমি যাবে?' অনিল সেন চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ। ভুল বোঝাবুঝির শেষ হওয়া উচিত। বউমাকে আমি বলেছি, সে-ও যাবে।'

অনিল সেন হতাশ গলায় বললেন, 'যা হয় করো, আমার আর মুখ দেখানোর উপায় রইল না। তবে ওটা যদি স্বর্ণ হয় তাহলে বউমা বেঁচে গেল, এটুকুই লাভ।'

'সমস্ত শহর মর্গের সামনে ভেঙ্গে পড়েছে বললে খুব বেশী বলা হবে না। স্বর্ণকমল সেনের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে পাহাড়ে! এই শহরের এককালের টেরর স্বর্ণকে কেউ খুন করেছে কিন্তু চেনা যাচ্ছে না ভাল করে। শহরের এক বেশ্যা যে কিনা স্বর্ণর রক্ষিতা ছিল সে চিনতে পেরেছে বলেই খুন হয়ে গেছে। রহস্যের গন্ধ এতটা প্রবল যে সবাই ভিড় করে এসেছে খবর পেয়ে। এই অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে শোভনা বউমা আর ছোট ছেলেকে নিয়ে মর্গের সামনে নামলেন। সাদা ফুলতোলা শাড়ি আব কাজকরা জামা, মাথায় ঘোমটা মাধুরীকে দেখছিল সবাই। শোভনার পোশাকেও রুচির ছাপ রয়েছে। চারপাশে গুঞ্জন শুরু হল। দারোগাবাবু ওঁদের নিয়ে

দবজার সামনে এলেন! 'আপনারা একটু শক্ত থাকবেন। বডি পচছে। খুব দুর্গন্ধ। একসঙ্গে যাবেন?'

শোভনা বললেন, 'আমি আগে যাব। আমি না চিনতে পারলে বউমা যাবে।'

দারোগা একটু ইতস্তত করে রাজী হলেন। ডোম নিয়ে গেল ঘরে। শিউরে উঠলেন শোভনা। ভগবান, মানুষ এত নির্দয় হয়? কিন্তু একি স্বর্ণ! শরীরের যেসব জায়গায় ক্ষত সেখানেই চিহ্নগুলো ছিল। ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখ ভাঙ্গা ছিল, সেটাও এখন প্রমাণ করা যাবে না। চিনতে না পেরে এই দুর্গন্ধটাকেও সহ্য কবে ফেললেন শোভনা। ডোমকে বললেন, 'ওদের ডাকো।'

মাধুরী এল। মুখে আঁচল চেপে। ফ্যাল ফ্যাল করে দেহটাকে দেখল। এই প্রথম একটি নগ্ন পুরুষের দেহ দেখল সে। স্বর্ণকমল কখনও তাব সামনে নগ্ন হয়নি। দারোগা জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে পারছেন? ওর চুল সাদা ছিল?'

একদিন চুলের গোড়া সাদা দেখেছিল মাধুবী, পরদিনই কালো। বাইরে রঙ কবে আসতেন। কিন্তু এত সাদা? সে জিজ্ঞাসা করল, 'দাঁত দেখব? মনে হয দাঁতটা বাঁধানো ছিল।'

'ও হ্যাঁ। কাল স্ত্রীলোকটি তাই বলেছিল বটে। আমার খেয়াল ছিল না।' দারোগার নির্দেশে ডোম দাঁত দেখাল। দুটো দাঁত নেই। কিন্তু কোন পেতল দেখা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন শোভনা, 'না, এ আমার ছেলে নয়।'

দারোগা ডোমের দিকে ফিরে প্রশ্ন কারলেন, 'পেতলের দাঁত কোথায়?'

ডোম মাথা নাড়ল, 'হামি জানেনা সাব।'

দারোগা বিড়বিড় করলেন, 'কি আশ্চর্য! স্ত্রীলোকটি বলল একটা পেতলেব দাঁত আছে আর এখন দুটো দাঁত উধাও।' তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাত্রে কেউ এখানে ঢুকেছিল?'

ডোম সজোরে প্রতিবাদ করল, 'নেহি সাব।'

শোভনা পুত্রবধূকে নিয়ে দবজার দিকে এগোচ্ছিলেন। দারোগা তাঁকে আবার অনুরোধ করল, 'মিসেস সেন, ভাল করে দেখুন, আর কোন চিহ্ন আছে কি না!'

শোভনা মাথা নাড়লেন,'কি আশ্চর্য! আমার ছেলেকে আমি চিনবো না?'

দাবোগা মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে? ইনি আপনার স্বামী নন?'

কি বলবে মাধুরী! স্বর্ণকমলকে যতটা সে দেখেছে তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? সে নিচু গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখনই খববটা ছড়িয়ে পড়েছে। মা এবং স্ত্রী বলেছে ওটা স্বর্ণকমলের শরীর নয়। নাটকটা জমল না বলে ভিড় পাতলা হল। দারোগা বললেন, 'ওই স্ত্রীলোকটির জন্যে আপনাদের বিব্রত করলাম, উপায় ছিল না। তবে ভালই হল, স্বর্ণবাবু বেঁচে আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি কেন খুন হল বুঝতে পারছি না।'

এই সময় স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ নিয়ে আসা হল মর্গে। ক্ষতবিক্ষত চেহারা: কারা যেন কুপিয়ে মেরে গেছে। শোভনা সেদিকে না তাকিয়ে পুত্রবধূকে নিয়ে রিক্সার কাছে চলে এলেন। অরুণদীপ্তি রিক্সার পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'চিনতে পারলে না?'

শোভনা মাথা নাড়লেন, 'না, তোর দাদা নয়। ওরা বলছিল পেতলের দাঁত ছিল, কিন্তু আমরা তা দেখতে পেলাম না। অত কুৎসিত শরীর তোর দাদার নয়।' কথাটা শুনে আঁতকে উঠল অরুণদীপ্তি। সেই চারজন লোক! চকিতে পদ্মার কথা মনে পড়ল। ওর মুখ দেখে শোভনা ধমক দিলেন, 'হাঁ করে কি দেখছিস? তাড়াতাড়ি বাবাকে খবর দে। এ স্বর্ণ নয়, আমাদের কিছুই হারায়নি, তিনি মাথা উঁচু করে প্র্যাকটিশে যেতে পারেন। যা।'

বিহ্বল অরুণদীপ্তি বেরিয়ে গেলে শোভনা রিক্সায় উঠলেন। হঠাৎ শোভনা আবিষ্কার করলেন

মাধুরী ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে আছে। অসহিষ্ণু গলায় তিনি ডাকলেন, 'কি দেখছ ওদিকে, উঠে এসো।'

মাধুরী নিঃস্ব গলায় বলল, 'ওই মেয়েটাকে ওরা এক ঘরে ঢোকাচ্ছে, মা।'

শোভনা বললেন, 'তাতে তোমার কি?'

মাধুরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আমার কি!'

নিস্তার নৌকো

দক্ষিণ খোলা বাড়িটা তৈরী করতে সুধাময়ের একটু বেশী খরচ পড়েছে। অধ্যাপকের পক্ষে কোলকাতা শহরের ভাড়াটে বাড়িতে থেকে নিজে তদারকি করে বাড়ি বানানো অসম্ভব। সে কারণেই বন্ধুর পরিচিত কন্ট্রাক্টরের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছিল। প্রতি রবিবার খেয়েদেয়ে ভবানীপুর থেকে সল্ট লেকে সুধাময় আর দময়ন্তী চলে আসত। ভিৎ খোঁড়া থেকে শুরু করে একটু একটু করে বাড়িটা খাড়া হচ্ছে, বাড়ির আদল নিচ্ছে। শুরুর আগে যে দ্বিধা ছিল. অনিচ্ছা ছিল সেটা কখন মরে হেজে একটা নেশার চেহারা নিযে সুধাময়কে প্রতি রবিবার এখানে টেনে আনত। দময়ন্তীর ইচ্ছে মতন বাড়ির প্লান অদলবদল হয়েছে। মেযেদের যেমন হয়, চিরকাল ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে যে সব চাপা বিরক্তি থাকে সেগুলোকে দূরে হটিয়ে নিজের আশ মতন ঘরদোরগুলোর বিলিব্যবস্থা করে নিয়েছে সে। প্লানটা পাশ করাতে সামান্য খরচা হয়েছে। এখন তো এমন অবস্থা যে বেঁচে থাকার জন্য প্রতি পায়ে ওটা করতেই হয়।

যেটুকু আইনে আটকায় সেটি ছাড়া সামনে কোন জমি নেই, তারপরই রাস্তা। গেট খুলেই গ্যারেজের প্যাসেজ। সুধাময়ের গাড়ি নেই কোনকালে তবু ওটা করতে হয়েছে দময়ন্তীর চাপে। যখন দোতলা হবে এবং একতলায় ভাড়া দেবার প্রসঙ্গ উঠবে তখন গ্যারেজ না থাকলে কোন ভাল ভাড়াটে পাওয়া যাবে না। মেয়েদের বুদ্ধি-সুদ্ধি কখন ক্বিভাবে খোলে —দময়ন্তীকে না দেখলে সুধাময়ের অজানা থাকত। তিরিশ বছর ধরে দময়ন্তীকে দেখছে সুধাময়। সেই ছোট্ট নরম শরীর এবং বোকা বোকা চাহনির মেয়েটি একটু একটু করে কখন যে রাশভারী হল, শরীরে মেদ এসে মোহ সরিয়ে মর্যাদা এনে দিল যেন এই পরিণতিতে পৌঁছবার জন্য দময়ন্তীর যাত্রা শুরু। তিরিশ বছরের দময়ন্তী সুধাময়কে দু হাতে আগলে রেখেছে। বিয়ের পর ঝিয়ের খরচ বাঁচাতে নিজেই রাতদিন খেটেছে, মেয়েদের পড়িয়েছে। অভাবের সঙ্গে রীতিমত মারামারি করে সেটাকে দরজার বাইরে রেখেছে। তারপর যখন সুধাময়ের লেখা বইটার খুব নামডাক হল, কলেজের ছেলেমেয়েরা সেটাকে পরীক্ষা পাশের একমাত্র অবলম্বন করল তখন থেকে অবস্থা ফিরল। সেই নিয়মিত হিসেবের বাইরে আসা টাকা দময়ন্তীকে ভেতরে ভেতরে নাড়াল। কোনদিন কোন চাহিদা ছিল না দময়ন্তীর। বিয়েতে পাওয়া জামাকাপড় কবে শেষ হয়েছে সুধাময় জানে না, শাড়ি গয়না তিরিশ বছরে দময়ন্তী চায়নি সুধাময়ের কাছে। প্রয়োজনে কাপড় কেনার ব্যবস্থা নিজেই করত সে, সুধাময় সংসার নিয়ে বিব্রত হননি কখনো। সেই দময়ন্তী হঠাৎ

নিজেই উদ্যোগী হয়ে কখন দরখাস্ত দাখিল করেছে এবং লটারিতে তিন কাঠা জমির মালিক হয়েছে সুধাময় খেয়াল করেনি। টাকাটা দেবার সময় সুধাময় অস্বস্তিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল। সুধাময়ের কাছে বাড়ি বানাবার কোন যুক্তি নেই। এতদিন কষ্ট করে জমানো টাকাগুলো বাড়ির পেছনে ঢাললে চাকরীর শেষের দিনগুলো চলবে কি করে? দময়ন্তী হিসেব করে দেখাল সুধাময়ের রিটায়ার করার মুখে কত টাকা জমবে এবং তার কতটা বাড়ির পেছনে যেতে পারে। যদি দোতলা শেষ করা যায় তাহলে সল্ট লেকের যা চাহিদা বাড়বে তাতে একতলা ভাড়া সুধাময়ের মাইনের কাছাকাছি চলে যাবে। অসুবিধে হবার কোন কারণ নেই।

সুধাময়ের হিসেব ভাল লাগছিল না, মোক্ষম প্রশ্নটি করল সে, কার জন্য বাড়ি বানাবে? সুধাময়ের বংশে বেশী দিন বাঁচাব উদাহরণ নেই। তা ধরা যাক এই ছাপ্পান্নর পর সে আরো বছর কুড়ি বাঁচতে পারে। আর দময়ন্তীর মেদবৃদ্ধিব পব কতগুলো রোগ স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ওষুধের সঙ্গে। অতএব সেও কুড়ি বছবেব বেশী আশা করতে পারে না। তারপর বাড়িটার কি হবে? ছেলে নেই বলে কোন আফসোস্ নেই, এবং ছেলে নেই বলে বাড়ি বানাবার প্রযোজনীয়তাও নেই। কযেক মুহূর্ত থিতিযে ছিল দময়ন্তী। কিন্তু মেয়েরা একবার জেদী হলে যুক্তি পেতে ওদেব কষ্ট হয না। দময়ন্তী বোঝাল, পবে কি হবে তাব জন্য আজ কেউ চিন্তা করে না। মরে যেতে হবে জেনেও নব্বুই বছরের বৃদ্ধ শরীব সাবাতে ওষুধ খায। অতসীর জন্য রাখা যে টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিকসড ডিপোজিট আছে সেটা পেতে আরো সাত বছর। সে সময়ের আগেও তো ওবা মাবা যেতে পাবে। অতএব যে কদিন আছে সে কদিন নিজেরাই ভোগ কবে যাবে। দুটো দিন নিজেব বাড়িতে হাত পা খেলিযে বাঁচবে। তারপর যা হবার হবে, মেয়েরা এসে ভোগ করুক।

সুধাময় দময়ন্তীকে মেযেবা উচ্চাবণ কবতে শুনে চকিতে একবাব দেখে নিলেন। দময়ন্তীর মেযেবা হল মানসী আব অতসী। মানসী আছে আম্বালায। সুখেন ওব স্বামী দময়ন্তীর আদরের জামাই। ইঞ্জিনিযাব। হ্যাঁ, সুখেন খুব ভদ্র এবং কর্তব্যজ্ঞান প্রচুব। ওদের মেয়েটাও হয়েছে ফুটফুটে। তা আম্বালা থেকে সল্ট লেকে এসে কোনকালে যে সুখেনবা বাস করবে এমন মনে হয না। দ্বিতীযটি অতসী। ঠিক এক বছব হল অতসী এ বাড়িতে ঢোকেনি। দময়ন্তী ঢুকতে দেয় নি। এম-এ পাশ কবা মেয়ে প্রেম করে বেজাতেব একটা গ্র্যাজুযেট ছেলেকে চট করে বিযে করে ফেলল যাব মাইনে চাবশোব বেশী নয— দময়ন্তী মানতে পাবেনি. এ বাড়ির একটা নিয়মই ছিল মানসী মাযেব অতসী বাপেব। তা অতসী যে এত কাণ্ড কবছে সুধাময় নিজেও টের পাননি। অথচ খববটা জানাব পর দময়ন্তী ওকেই দাযী কবেছিল। প্রশ্রয়েই এটা সম্ভব। ত্যাজ্য কন্যা কাকে বলে জানা নেই, মুখের ওপব মেযে-জামাইকে বলে দিয়েছিল দময়ন্তী ওরা যখন নিজেব ব্যবস্থা নিজেই করেছে তখন এই বাড়িতে যেন কখনও প্রবেশ না করে। অতসী কেঁদেছিল কিন্তু পাযে পড়েনি। সুধাময় ইজিচেযাবে বসে চুপচাপ দেখল সে মায়ের মত ঘাড তুলে গম্ভীব মুখে কথাগুলো শুনছিল। দময়ন্তী প্রণাম নেননি, ওবা যখন সুধামযকে প্রণাম করে গেল তখন ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল স্ত্রীকে। দময়ন্তীর এই চেহারা সে আগে কখনও দ্যাখেনি। সুধাময় নিজেও অতসীকে সমর্থন করতে পারছিল না অবশ্য। কলেজে পড়াতে গিয়ে ছেলেমেযেদেব প্রেম করতে দেখেছে, ক্লাসিক থেকে বর্তমানেব গল্প-উপন্যাসে প্রেমে ছড়াছড়ি পড়ে তৃপ্ত হযেছে। অথচ নিজের মেযের প্রেমকে সমর্থন করতে কোথায় বাধছিল। মানসীর বিযে হযেছিল সম্বন্ধ করে, খবচ বেশী হয় নি তখন, সামর্থ্যও খুব একটা ছিল না। তবে দমযন্তীর গযনার অনেকটাই বেবিয়ে গিয়েছিল। সোনার দর ছিল তখন একশ আশি নব্বুই। অতসীব জন্য সোনা কিনব কিনব করে দময়ন্তী পেরে উঠছিল না। তারপর নোটবই থেকে যখন থোক টাকা হাতে এল সোনা তখন সোনার হরিণ—লাফিয়ে সাত আটশতে চলে গেছে। ওর

বিয়ের খরচ বাবদ টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে রাখা হয়েছে যদি কখনো সোনার দর নেমে আসে! মেয়ে অবশ্য সে চিন্তা থেকে ওদের মুক্তি দিয়ে গেছে। দময়ন্তী হিসেব পাল্টে ফেলল, দোতলা করার সময় অতসীর নামে জমানো টাকাটা কাজে লাগাবে। ছেলে না থাক, একটা বাড়িকে যত্ন করে তৈরী করলে ছেলের কাজ দেবে। বড় মেয়ে মানসী যেমন থাকতে আসছে না ছোট মেয়ে অতসীও তো প্রবেশাধিকার পাবে না। তাহলে ও বাড়িতে থাকবে কে? দময়ন্তী বোঝাল, আফটার জওহরলাল হু? কিংবা ইন্দিরার পর কে? এসব প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ না পাওয়া গেলেও যেমন এক সময় সময় এসে সব ঠিক করে দিয়েছে তখন এ নিয়ে ভাববার কোন কারণ নেই।

তৃতীয় প্রশ্নটা করতে পারেনি সুধাময়। যদি দময়ন্তী আগে মারা যায় তাহলে সে একা একা কি করে থাকবে? দময়ন্তী নেই অথচ ও বেঁচে আছে চিন্তা করা যায় না। আবার উল্টোটাও হতে পারে। তখন দময়ন্তী কি করবে? মেয়েদের উৎসাহ যখন আকাশ ছোঁয়া হয় তখন—সুধাময় ঠিক করল দময়ন্তীকে যখন সারা জীবনে কিছু দেওয়া হয়নি তখন ওর এই সাধটা পূর্ণ করবে।

কিন্তু খরচটা বেশী হয়ে গেল। এখন সল্ট লেকে তেমন বাড়িঘর ওঠেনি। দুটো রুটের বাস যাতায়াত করে। বাড়ি তৈরির পর আর একটি সদ্য ওঠা বাড়ির সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে দেখা গেল প্রায় কুড়ি হাজারের মত বেশী গেছে কন্ট্রাক্টরের পকেটে। যতই পরিচিত হোক পৃথিবীতে বোধ হয় সৎ মানুষের বড় অভাব। তবে এখন বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অতসীর নামের টাকাটা অবশ্য সময় পেরোবার আগেই ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে হয়েছে এই সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য। নতুন রঙের গন্ধ, মোজায়েক করা মেঝে দেওয়ালের রঙ আর পেছনের বাড়ি তৈরীর সময় লাগানো গাছগুলোর ডাগর হয়ে বেড়ে ওঠা—সুধাময়কে বলল পৃথিবীতে যদি সুখ কোথাও থাকে তো এখানেই। অনেকদিন থেকে গৃহপ্রবেশের তোড়জোড় চলছিল। আম্বালায় চিঠি গেছে নিয়মিত। মানসীরা জানিয়েছে গৃহপ্রবেশের পরদিন ওরা উপস্থিত হবে। সুখেনের ছুটি পাওয়া অনেক কষ্টে সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তী ঠিক করলে গৃহপ্রবেশের দিন শুধু পুজোই হবে, খাওয়া দাওয়া পরের রবিবার। অর্থাৎ মানসীকে বাদ দিয়ে কিছু নয়। লিস্ট হল, সুধাময়ের কলেজের বন্ধুবান্ধব, প্রকাশক আর আত্মীয়স্বজন। খাওয়া দাওয়াতে খরচ করাতে আপত্তি ছিল সুধাময়ের। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল দময়ন্তী, এত বড় সুখ একা একা ভোগ করব? সবার সঙ্গে না মিললে সুখের কোন মানে হয়?

অতএব আজ ছাব্বিশে ফাল্গুন, বুধবার সকালে ওদের গৃহপ্রবেশ হল। টুকিটাকি জিনিস পর্যন্ত অবশ্য দময়ন্তী আগে থাকতে এই বাড়িতে তুলেছে। আজ ভাড়াটে বাড়ি চিরদিনের জন্য ছেড়ে এল। সকালে ট্যাকসীতে উঠেই দময়ন্তী বলল, বাব্বা, এতদিনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। 'পরের বাড়িতে যে আর থাকতে হবে না এটুকুই স্বস্তি। তোমার ওপর ভরসা করলে হতো না।'

সুধাময় হাসল। কথাটা সত্যি।দময়ন্তীর উদ্যোগ ছাড়া হতো না। তিনটে শোয়ার ঘর, একটা ডাইনিং স্পেশ, বিরাট রান্নাঘর এবং সেখানে যাতে দক্ষিণের বাতাস ঢোকে সেটা লক্ষ্য ছিল। ভেতরের বারান্দার দিকের ঘরটা ওদের শোয়ার ঘর বাকী দুটো মানসীরা এলে অথবা অন্য কেউ অতিথি এলে ব্যবহার করবে। সবই দময়ন্তী ঠিকঠাক করছে।বাইরের ঘরটা ড্রইং রুম। বাঁকুড়ার পুতুল থেকে আরম্ভ করে শান্তিনিকেতনী দেওয়াল মাদুর দিয়ে আগেই সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিল ঘরটা। আজ ঘরে ঢুকে শেষ কথাটা বলল দময়ন্তী, 'দুটো জিনিস দরকার।'

সুধাময় দেখছিল দরজায় রঙটা এক জায়গায় সমান পড়েনি, বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল 'কি?'

'একটা ছোট ফ্রিজ আর টিভি।'

অবাক চোখে তাকাল সুধাময়। অবশ্যই জিনিস দুটো দরকার কিন্তু এত খরচের পর দময়ন্তী

একথা উচ্চারণ করল কি করে?

'আমি এখনই কেনার কথা বলছি না।' কিন্তু ফ্রিজ থাকলে তোমাকে রোজ বাজারে যেতে হবে না। ঠেলে ঠেলে তো পাঠাতে হয়, তোমারই সুখ। আর সন্ধ্যেবেলায় তো কিছু করার থাকবে না, তখন টিভি দেখে সময় কাটাবে।' দময়ন্তী ভেবেছে বেশ।

হাসল সুধাময়। অনেকদিন পর রসিকতা করল, 'কেন সন্ধ্যেবেলায় তো এখানে কেউ দেখতে আসছে না, শিয়ালটিয়াল ডাকে, তোমার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করব।' তিরিশ বছর আগের সেই মেয়েটার মত চোখের মোচড় দিল দময়ন্তী। 'যাও কত ক্ষমতা জানা আছে, দুপা দৌড়লেই হাঁপাও। তা দুজনে মিলেই তো টিভি দেখব।'

আজ সকাল থেকে এখানে আসার পর দময়ন্তীর চেহারাটা যেন পাল্টে গেছে। ঠিকে কাজের লোকের সঙ্গে সমানে ছুটোছুটি করছে, যে পুরুতটা পুজো করতে এসেছে তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। বয়স যেন রাতারাতি থার্মোমিটারের পারার মত নেমে এসেছে। সময়, দুশ্চিন্তা এবং রোগ মানুষকে উত্তপ্ত করে বয়সের পারদ বাড়িয়ে দেয়—এই রকমের সুখ এলে সেটা নেমে আসতে পারে। প্রথম বা মধ্য যুবতীর মত লাগছে দময়ন্তীকে। অনেকদিন পর ভোরে স্নান করে সিল্কের শাড়ি পরেছে আজকাল তো রঙিন কিছু গায়ে ওঠাতই না। সে তুলনায় নবীন হতে পারছে না সুধাময়। আনন্দ নিশ্চয়ই হচ্ছে কিন্তু কোথায় যেন খচ করে উঠছে মাঝে মাঝে। নিজেকে দময়ন্তীর তুলনায় বৃদ্ধ বলে বোধ হচ্ছে।

আজ দময়ন্তী উপোস করেছে। পুজো শেষ করে খাবে। বারণ করেছিল সুধাময়। প্রতিবেশী বলতে নতুন তৈরী বাড়ির মালিক একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার। আলাপ হয়েছিল আগেই, একটু আগে তিনি ঘুরে গেলেন একবার। সুধাময় ভেতরের বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বসেছিল। দময়ন্তী এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে গেছে। আজ চা তৈরীর ঝামেলা চায় না ও। বাড়িটার একটা নাম দেওয়া দরকার। বাতাস আসে বলে সুধাময় ভেবেছিল নাম দেবে বাতাস-বাড়ি। একদম পছন্দ হয়নি দময়ন্তীর। কি নাম দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে সুধাময় ঠিক করল স্ত্রীর নামেই বাড়ির নাম থাকুক। চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ডাকল সে। খেঁকিয়ে উঠে দময়ন্তী ছুটে এল, শুনে বলল, 'মরণ। পুরুতমশাই ওদিকে পুজো করছেন আর তোমার যত আদিখ্যেতা। একদম ডাকবে না আমাকে। গৃহপ্রবেশের পুজো—একদম ইয়ার্কি নয়।'

এত বড় বাড়িতে ওরা দুই বৃদ্ধ থাকবে তিরিশ বছর আগে না হয় অন্যরকম লাগত, এখন লোকজন না হলে ভাল লাগে? অবশ্য মানসীরা কাল সকালে আসবে। কদিনের জন্য হলেও বাড়িটা জমবে। মানসীর কথা মনে হতেই সুধাময় অতসীর মুখটা দেখতে পেল। অতসী মানসীর মত সুন্দরী নয় কিন্তু বড় গম্ভীর মেয়ে, ওকে ঠিক বুঝত।এক বছর কোন খবর নেই মেয়েটার।দময়ন্তী ঘৃণাক্ষরে নাম করে না। এই যে আজ এত বড় আনন্দের দিন, মানসী আসছে সেই আম্বালা থেকে অথচ কাছেই মানিকতলা থেকে অতসী আসছে না। ওকে জানানই হয়নি এই সুখের কথাটা। মনে মনে অনেকবার ইচ্ছেটা নিঃশ্বাস নেবার জন্য নাক তুলে ভুল করে ডুব দিয়েছে ফের—সুধাময়ের যাওয়া হয়নি কখনো।যদিও দময়ন্তী ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তবু মেয়েটা তো একবার আসতে পারত। অন্তত পক্ষে ওর কলেজে গিয়ে দেখা করতে পারত। ছেলেবেলা থেকে যে অসম্ভব জেদের জন্য অতসী মায়ের কাছে মার খেত সেটা এখনও গেল না। মেয়েমানুষের এত জেদ ভাল নয়। সবাই বলে অতসী বাপের স্বভাব পেয়েছে কিন্তু জেদটা তো একদম মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া।

তবু এমন একটা হীনতা চারপাশ ছেয়ে ধেয়ে এল, সুধাময় ঠিক করল দময়ন্তী যাই বলুক না কেন একদিন অতসীর সঙ্গে দেখা করে আসবে। যে মেয়েটাকে একটু একটু করে বড় হতে দেখল, কাদার তালটাকে মানুষের ছাঁদে ফেলল দুদিন আগে একটা ছেলে এসে তাকে কতটা

পাল্টে দিতে পারে তা নিজের চোখে দেখে আসবে। মেয়ের প্রতি যে অভিমান এতটা কাল চারপাশে দেওয়াল রেখেছিল সেটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন উঠে দাঁড়াল সুধাময়। সুখের কালে মানুষকে উদার হতে হয়। ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে ডাক এল হোম শুরু হচ্ছে দময়ন্তী তাকে সঙ্গে পেতে চাইছে।

অবেলায় খাওয়া একদম সহ্য করতে পারে না দময়ন্তী। বিকেল নাগাদ অম্বল হয়ে গেল। সুধাময় অম্বল যাবার ট্যাবলেট খাওয়াল তাকে। বাড়িতে ওষুধের একটা ছোটখাটো স্টক আছে। দুপুরে ঘুম হয় নি, শুয়েছিল কিন্তু দেরীতে খাওয়ার দরুনই হোক অথবা নতুন জায়গা বলেই হোক ঘুম এল না। বিকেলটা ওরা বাগানে বসে কাটাল। চোখের সামনে সূর্য নিবতে নিবতে অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে সন্ধেটাকে টেনে আনল। সন্ধে রাত হবে। মানুষের সুখগুলো কেন সকাল বেলায় আসে না? সারাটা দিন কেমন হেসে খেলে কাটানো যায় তাহলে।

এই যে এখন ওরা দুজনে মুখোমুখি বসে আছে, কথা হচ্ছে কম। আর কথাই বা কি, একটা দিনরাতের কাজের লোক দরকার। সল্ট লেকে লোক পাওয়া যায় না। ভবানীপুরে বলে রেখেছে দময়ন্তী। বুড়ো মানুষও চলবে না, মেয়ে হলেই ভাল হয়। ছোকরা চাকর চুরিচামারি করবে এখন সল্ট লেক ফাঁকা, চোরদের সুবিধে খুব। বাচ্চা চাকরকে হাত করতে ওদের অসুবিধে হবে না। অল্পবয়সী মেয়ে রাখারও ঝামেলা। বাজারে পাঠালে কার সঙ্গে কি করবে চাপ আসবে বাড়ির ওপর। একমাত্র চল্লিশ পার হওয়া শক্ত সমর্থ ঝি চাই। সুধাময় চুপচাপ শুনছিল। বছর পনের কুড়ি আগে ঘরের মানুষের প্রতি সজাগ হয়ে যুবতী ঝি রাখত না দময়ন্তী, এখন চিন্তা বাইরের লোকের জন্য। হেসে ফেলল সে।

দময়ন্তী মুখ তুলল, 'হাসলে কেন?'

'এককালে ঝি রাখার সময় আমার কথা চিন্তা করে রাখতে না।' সুধাময় স্মৃতি ধরল। দময়ন্তীও হাসল, 'হাঁ, এককালে। পুরুষ মানুষের মন না মতি। তোমাদের বাবা বিশ্বাস করা যায় না।'

'এখন কর?' সুধাময় স্ত্রীর দিকে তাকাল।

'হুঁ। এখন তুমি তো শৈশবে। শিশুর মত সরল।'

তিরিশ বছর আগে দুজনে একরম নিভৃতে বসলে এ ধরনের কথা অবশ্যই হতো না আফসোস করে লাভ নেই। কারণ দময়ন্তী যখন বলল, কাল খুব ভোরে উঠতে হবে মানসীদের ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছাচ্ছে ভোর ভোর, ওরা নতুন বাড়ি চেনে না, ঠিকানা খুঁজে বাড়ি পাওয়া এখন সল্ট লেকে খুব সহজ নয়, অতএব সুধাময়কে স্টেশনে যেতে হবে কিন্তু কি ভাবে যাওয়া যায় সেই চিন্তায় সে তখন এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তিরিশ বছর আগের কথা আর খেয়াল থাকল না। অত ভোরে বাস ট্যাকসী পাওয়া যাবে না। এক হয়, মিনিট পনের হেঁটে ভি আই পি রোড থেকে বাস ধরা। সেটাই করতে হবে। ঠিক হল সুধাময় পাঁচটার আগেই বেরিয়ে যাবে। আজকাল সকাল বড় তাড়াতাড়ি হয়।

প্রথম রাত বলেই খাওয়া দাওয়ার বেশী ঝামেলা করেনি দময়ন্তী। সুধাময় দুধ খায় অথচ এখানে সে ব্যবস্থা এখনও হয় নি। কৌটোর দুধ দিয়ে কাজ চালাতে হল। দময়ন্তী শোয়ার আগে প্রত্যেকটা ঘর ভাল করে দেখে সবকটা দরজায় তালা দিয়ে এল। সাবধানের মার নেই কিছু।

সুধাময় শুয়েছিল, বিছানায় ভারী শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে দময়ন্তী বলল, 'একটা বেড সুইচের ব্যবস্থা কর। বারবার উঠতে ভাল লাগে না।'

নতুন বাড়ি পায়ে পায়ে প্রয়োজনগুলোর কথা মনে ঠেকছে। সুধাময়েরও কিছু কিছু পরিবর্তন দরকার। বুকসেলফটা ঠিক জায়গায় রাখা হয়নি। একটা নতুন লেখার টেবিল দরকার। দময়ন্তী উঠে বসে জামা খুলল। আটোসাঁটো হয়ে শুলে ঘুম আসে না। আপদগুলোকে পায়ের কাছে

সবিযে বেখে ওব মশাবিব কথা মনে পড়ল। ভবানীপুবে এই ঝামেলাটা ছিল না। কিন্তু সল্ট লেকেব মশা চড়ুইপাখিব মত মশাবি না থাকলে কাল সকালে সমস্ত শবীবে গোদ হযে যাবে। স্বামীব দিকে তাকিযে মেজাজ রুক্ষ হযে গেল ওব। কেমন নিশ্চিন্তে শুযে পা দুটো ওপাশ এপাশ কবছে। নিশ্চযই মশা কামড়াচ্ছে তবু উঠে টাঙানোব চেষ্টা নেই। বাগে টং হযে দুমদাম করে উঠে মশাবিটা খুলে ফ্রেম থেকে চাবটে খুঁট টাঙিযে দিল হুকে। মশাবিটা গুঁজে দেবাব প্রযোজন নেই, যাব দবকাব সে কববে। খানিকবাদেই মনে হল প্রথম দিন আজ, আজ না হয বাগাবাগি নাই বা হল। মানুষটাব স্বভাব যা তাব বাইবে যাবে কি করে। তিবিশ বছ্ব ধবে তো দেখছে দমযন্তী। কথাটা মনে হতেই মশাবিটা ভাল করে গুজে দিতে দিতে বলল, 'আমাব মত বউ পেযেছিলে বলে বতে গেলে।'

সুধাময নিঃশব্দে স্ত্রীব আচবণ দেখছিল, ভঙ্গীগুলো খুব চেনা। খুব শিগগিব ঝড় উঠবে ভাবছিল তাব বদলে এমন বাক্য শুনে অবাক হযে বলল, 'একদম সত্যি কথা।'

ঢঙ। বলে দমযন্তী ওব পাশে শুযে পড়ল। বিবাহিত জীবনেব প্রতিটি বাত, শুধু দমযন্তীব হবাব দিনগুলো ছাড়া ওবা আলাদা শোযনি। সুধামযেব একটা পবিচিত ভঙ্গী আছে শোযাব, দমযন্তীব পাশ ফিবে থাকা জঙ্ঘাব ওপব পা তুলে পাশবালিশেব মত ব্যবহাব করে ওব চুলেব ঘ্রাণ নিতে নিতে কখন ঘুম এসে যায। এত বছবে দমযন্তীবও এই ভঙ্গীটা অভ্যাস হযে গেছে। যৌবন চলে গেছে অনেকদিন শবীব আব অন্য প্রযোজনেব কথা ভাবে না। কোন শৈশবে সুধাময যেমনটি মাযেব পাশে শুযে থাকতো জড়িযে মিশিযে জীবনেব এই শেষ অপবাহ্নে এই আবামটুকু ছাডা ঘুম আসতে চায না। দমযন্তীব সঙ্গে ওব অনেক বিষযে মেলে না, প্রায ঝগড়া হয, মুখ খিঁচিযে দমযন্তী ওকে কথা শোনায কাটা কাটা কথা বলে স্ত্রীকে বিদ্ধ কবতে তখন সুধামযেব আটকায না কিন্তু বাতেব শোযাব সময এই আশ্রযটুকু তাব চাই। সুধাময জানে, দমযন্তী তাব বক্তে মিশে গেছে। আজ সাবাদিনেব খাটনিতে দমযন্তীব শবীব খুব দ্রুত শিথিল হযে আসছিল। ফিসফিস করে সুধাময জিজ্ঞাসা কবল, তুমি খুশী, দমু?' জড়ানো গলায স্বামীব বুকেব ওপব মুখটাকে সবিযে এনে দমযন্তী সুখেব জানান দিল।

অনেক বাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল সুধামযেব। দমযন্তী ডাকছে। নতুন জাযগা, চোবটোব আসতে পাবে দ্রুত উঠে স্ত্রীব দিকে তাকাল সে। মেঝেতে দাঁড়িযে আছে দমযন্তী, ওকে বসতে দেখে বলল, বাথরুমে যাব, একটু দাঁড়াবে চল।'

চট করে মেজাজ তিবিক্ষি হযে গেল সুধামযেব 'আচ্ছা জ্বালা তো, বুড়ো হযে মবতে চললে তবু বাচ্চাদেব মত ভয গেল না। দবজা খুলেই বাথরুম, যেতে হয যাও আমি দাঁড়াতে পাবব না।'

দমযন্তী তবু দাঁড়িযে, 'চলো না।'

'আঃ, ঘুমটাকে নষ্ট কবো না তো। এখানে আবশুলা কিংবা ভূত নেই। যত্ত ছেলেমানুষী।' সুধাময আবাব শুযে পড়ল। দবজা খোলাব শব্দ হল, দমযন্তী বাথরুমে চলে গেল। কখন আবাব ফিবেছে ও, বিছানায শুযেছে টেব পাযনি সুধাময। হঠাৎ উঃ আঃ শব্দে ঘুমটা চটে গেল। চোখ মেলে দেখল ঘব অন্ধকাব, দমযন্তী ছটফট কবছে। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালল সুধাময। দমযন্তীব দুটো হাত বুকেব ওপব, কপালে ঘাম। ঝুঁকে পড়ে সে জিজ্ঞাসা কবল, 'কি হযেছে, অমন কবছ কেন?'

'বুকটা কেমন কবছে।' দমযন্তী দাঁতে দাঁতে চাপল।

দু-এক মুহূর্ত তাকিযে সুধাময মাথা নাড়ল, 'অম্বলে উইন্ড ওপবে ঠেলছে। এত করে বললাম উপোস কবো না সেই অবেলায খেযে এখন মাঝ বাত্তিবে ঝামেলা। যা সয তাই কবো।' গজ গজ কবতে কবতে টেবিলেব ওপব বাখা ওষুধেব বাক্স খুলে জোযানেব আবকেব শিশিটা বেব

করল সে। চাপা দিয়ে রাখা গেলাসের জলে ঢেলে দময়ন্তীর কাছে এগিয়ে এসে সুধাময় বলল 'নাও, এটা গেলো'।

দময়ন্তী বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকাল ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে, বুকের ওঠা নামা আর হাত দুটোকে মুষ্টিবদ্ধ দেখল সুধাময় এবং এই প্রথম সে ভয় পেল। স্ত্রীর মাথার পাশে বসে ঝুঁকে পড়ে দুবার নাম ধরে ডাকল। দময়ন্তী তাকিয়ে আছে কথা বলছে না। মুহূর্তে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল সুধাময়ের। এটা যে সাধারণ অম্বল নয় কি করা যায়। দ্রুত গেলাসটাকে রেখে স্ত্রীর ওপর হুমড়ি খেয়ে বুক ম্যাসেজ করতে চেষ্টা করে বুঝতে পারল এতে কোন লাভ হবে না। এখন যেমন করেই হোক একজন ডাক্তার আনার দরকার। সল্ট লেকে এত রাত্রে ডাক্তার-- প্রতিবেশী ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল ওর। কিন্তু ভদ্রলোক প্র্যাকটিস করেন না তবু ডাক্তার তো। কিন্তু ডাকতে গেলে দময়ন্তীকে একা ফেলে যেতে হয় এসব চিন্তা করার সময় নেই এখন। সুধাময় দরজা খুলে বাইরে বেরতে যেতে ডাইনিং রুমের দরজায় হোঁচটা খেল। জায়গাটা অন্ধকার আলো জ্বেলে দেখল বাইরের ঘরে ঢোকার দরজায় তালা দেওয়া অতিরিক্ত সতর্ক হয়েছিল দময়ন্তী। এখন আশেপাশে তাকিয়ে ডাইনি টেবিলের ওপর, কোথাও চাবিটাকে খুঁজে পেল না সুধাময়। দৌড়ে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে ডাকল সে। দময়ন্তীর তখন কথা বলার অবস্থা নেই। অসহায় হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সুধাময়। নিজের বাড়ির ভেতর বন্দী হয়ে রয়েছে সে। এমন মেয়ে, চাবিটা যে সুধাময়ের প্রয়োজন হতে পারে তা খেয়াল করবে না কখনো। তালাগুলো খুব মজবুত দেখে কিনেছিল সুধাময়। ওগুলোকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা বৃথা। জমাদারের আসার পথটা মনে হতেই বাথরুমে ছুটল সে। ল্যাট্রিনের পেছনের দরজায় ভেতর থেকে খিল এবং শেকল তোলা। ছোট একটা টিনের তালা আছে অবশ্য তবে সেটা ভেঙ্গে ফেলতে অসুবিধা হল না ওর। ছোট্ট প্যাসেজ দিয়ে গ্যারেজের পাশ কাটিয়ে গেটে এসে গেল সুধাময়। দরজাটা খোলাই থাকল সেদিকে নজর দেবার সময় নেই এখন। গেটটা ছোট, তালা দেওয়া হয়নি তাই সহজেই ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যায়

এখন কত রাত কে জানে। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। তামাম সল্ট লেকে কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই। ভবানীপুরে সিগারেটের দোকান সারা রাত খোলা থাকে। বাড়ি ঘর হয়নি মানুষ নেই এখানে। সুধাময় যতটা পারে দৌড়ে দৌড়ে ডাক্তারের বাড়ির সামনে এল। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। লম্বা মাথা গেটে তালা ঝুলছে প্রায় আধ ঘণ্টা চেঁচামেচির পর ভদ্রলোককে পেল সুধাময়। ব্যাপারটা বুঝিয়ে ওকে নিয়ে আসতে আরও কিছু সময় ব্যয় হল। বাথরুমের দরজা দিয়ে ভদ্রলোক যখন দময়ন্তীর কাছে পৌঁছালেন তখন তিনি রীতিমত নার্ভাস। বোঝা যায় প্র্যাকটিস ছাড়ার পর সাধারণ বৃদ্ধের সঙ্গে ওর কোন তফাৎ নেই। তবু দময়ন্তীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার সুধাময়কে বললেন ওঁকে এখনই হাসপাতালে নেওয়া দরকার।

হাসপাতাল। সুধাময় কিছুই ভাবতে পারছিল না। সল্ট লেকের এই উপান্তে কোন গাড়ি ঘোড়া নেই। কোন বাড়িতে আছে কে জানে। যদি সম্ভব হতো দময়ন্তীকে কাঁধে করে নিয়ে যেত সে। প্রায় ভিক্ষে চাওয়ার ভঙ্গীতে সুধাময় বলল, 'সকাল অবধি কোনরকমে রাখা যায় না ডক্টর?' একটু স্বাভাবিক হয়ে গেছেন ভদ্রলোক, ব্যাগ খুলে ইঞ্জেকশন দিলেন। 'বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে, হার্ট খারাপ ছিল?'

কই না তো। সুধাময় দময়ন্তীর অনেক অসুখের মধ্যে এটা মনে করতে পারল না।

আধঘণ্টা বাদে ভোর চারটে বেজে বাইশ মিনিটে দময়ন্তী চলে গেল। যাওয়ার আগে কোন কথা বলেনি, বলার মত ক্ষমতা ফিরে পায়নি।

সুধাময় বাবু হয়ে বসেছিল দময়ন্তীর মাথার পাশে। ডাক্তার ভদ্রলোক ভোর হওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। কিছু কথা যা এই অবস্থায় বলা উচিত বলেছিলেন। শেষতম পৃথিবীটা কার

সবাই আমার আমার বলে চেঁচাই কিন্তু এটা যে ছেড়ে চলে যেতে হবে আমরা জানি না। আপনার স্ত্রী সাধ মিটিয়ে বাড়ি করলেন ভোগ করতে পারলেন না। সুধাবাবু, তার চেয়ে সব সময় যাওয়ার জন্য তৈরী থাকাই ভাল, তাতে কষ্ট হয় না। এখানে বেড়াতে এসেছিলাম ভাবলেই ভাল। তা কাউকে খবর দিতে হবে কি না বলুন?'

সুধাময় ঘাড় নেড়েছিল। একটু বাদেই মানসীরা এসে পড়বে। যা করার ওরাই করবে। ডাক্তার আবার আসবেন বলে চলে গেলেন।

সুধাময় স্ত্রীর দিকে তাকাল। ভোরবেলায় দময়ন্তী এইরকম ভঙ্গীতে ঘুমিয়ে থাকে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক, দাঁত চিকচিক করে, মুখের চেহারায় শ্রী আনে বেশ। এই নতুন বাড়িতে ভোর রাতের নির্জনে সুধাময় স্থবিরের মত বসে বসে স্ত্রীকে দেখছিল। আঙুল তুলে দময়ন্তীর গালের ওপর রাখল সে, এখনও গরম। চোখের পাতায় চুমু খেতে বড় ভাল লাগত প্রথম যৌবনে। এখন এ মুখে হাঁসের পায়ের ছাপের মত বয়স দাগ ফেলেছে প্রচুর। তবু সেগুলো বড় আদরের। বুকের ভেতর হাঁসফাঁস শুরু হল সুধাময়ের, দু হাত দিয়ে দময়ন্তীকে জড়িয়ে ধরতেই শরীর মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু কান্না আসছে না কিছুতেই, সুধাময় গলা খুলে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারছে না। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে ওর। তারপর এক সময় দময়ন্তীর কপালের ওপর শীতল হাত রেখে পাথরের মত বসে রইল সে।

ওরা এল। এর মধ্যে কখন বেলা গড়িয়েছে, চারধারে রোদে রোদ। ডাকাডাকি করে সাড়া পায়নি মানসীরা। ডাক্তার বোধহয় নজর রেখেছিলেন, বাথরুমের দরজাটা তিনিই চিনিয়ে দিলেন। আর তার পরেই কান্নাটা আছড়ে পড়ল ঘরে। দু রাত ট্রেন জার্নি করে এসে মানসী মায়ের বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদছে। সুখেন হতভম্ব। বাচ্চাটা মুখে হাত দিয়ে দাদুকে দেখছে। এই প্রথম হুঁস হল সুধাময়ের। এই কান্না ওঁর হুঁস ফিরিয়ে আনল। কি করে হল, কেন হল, এই সব প্রশ্নের উত্তর এই মুহূর্তে ওকে দিতে হচ্ছে না কিন্তু মানসীর পাগলের মত আকুলিবিকুলি দেখেও কান্না আসছে না। সুখেন স্ত্রীকে সামলালো। মেয়েরা বোধহয় খুব দ্রুত শোক সামলাতে পারে। খানিক বাদে মানসী বাবার পাশে এসে দাঁড়াল, 'বাবা—।'

সুধাময় মুখ তুলে তাকাল। মোটা হয়েছে মানসী এবং ওর তাকানোটা ঠিক দময়ন্তীর মত।

'একি হল বাবা।' কান্না চাপা গলায় বলল মানসী। চোখ বন্ধ করল সুধাময়, 'চলে গেল। আমি এখন কি করব।' মানসী বাপের বুকে হাত রাখল, তুমি ভেবো না, মা নেই কিন্তু আমি আছি।' তুমি আছ? সুধাময় চোখ খুলে দময়ন্তীকে দেখল, 'কিন্তু ও নেই আমি থাকব কি করে।'

সুখেন সবাইকে খবর দিল। সমস্ত বাড়ি ভরত্তি লোক এখন। যারা গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন খেতে আসত তারাই এসে বাড়ি ভরিয়েছে। সেই রাত থেকে এক ঠায় হয়ে বসে আছে সুধাময়, বাথরুম করতেও ওঠে নি। কিন্তু দুপুর নাগাদ ওকে ওঠাতে চাইল সবাই। আর দেরী করা যায় না।

এ ঘরের জানলা দিয়ে খোলা আকাশ, সামনের মাঠ আর রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। ছোট্ট দলটা দময়ন্তীকে কাঁধে নিয়ে চলে গেল একটু আগে। হরিধ্বনি উঠছে মাঝে মাঝে। সুধাময়ের অবস্থা দেখে ওকে শ্মশানে নিয়ে যেতে চায়নি সুখেন। মুখাগ্নি সেই করবে। মাকে তিরিশ বছরের পুরোন বেনারসিতে সাজিয়ে দিয়েছে মানসী। মাথায় সিঁদুর মেখে পূর্ণ সুখের চেহারা নিয়ে দময়ন্তী চলে যাচ্ছে। ঘাড় তুলে জানালা দিয়ে ওদের যাওয়া দেখল সুধাময়।

এই সময় মানসী ঘরে ঢুকল, 'বাবা, ওঠ। হাত মুখ ধোবে চল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সুধাময় উঠল। সমস্ত ঘর জুড়ে দময়ন্তী। কিন্তু সুধাময়ের বুক ফাঁকা চোখ শূন্য। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। মানসী স্থির নেই, ডুকরে ডুকরে উঠছে মাঝে মাঝে। ওর মেয়েটাকে ডাক্তার তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। মুখ চোখ ধুতে সাহায্য করল মানসী। বাবাকে বাইরের বারান্দায়

বসিয়ে চায়ের যোগাড় করতে গেল সেই অবস্থায়।

রোদে সল্ট লেক পুড়ছে। বাতাস বইছে গরম হয়ে। সুধাময় মনে মনে বলল, সে রকমটাই হল। যেরকমটা তার আশঙ্কা হয়েছিল। এত সহজে যদি মানুষ মরে যেতে পারে তবে পৃথিবীতে এত সমস্যা কেন? সুধাময় কেন চট করে মরতে পারছে না। আর এই সময় সেই হারটার কথা মনে পড়ল ওর। চিৎকার করে মানসীকে ডাকল সুধাময়।

মেয়ে ছুটে বাইরে এলে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না সুধাময়। হাঁপটা কমতে বলে উঠল চেঁচিয়ে, 'তাড়াতাড়ি আলমারি খোল। লকারে ছোট্ট গোল ভেলভেটের বাক্স আছে সেইটে নিয়ে এস।'

মানসী বুঝতে না পেরে বলল, 'কেন?'

ধমকে উঠল সুধাময়, 'আঃ যা বলছি করো।'

'চাবি?' মানসী অবাক হচ্ছিল।

'আলমারির ওপরে আছে।' বলেই মনে পড়ল কাল রাতের কথা। আলমারির মাথায় আর বালিসের তলায়—দময়ন্তীর চাবি রাখার এই প্রিয় দুটো জায়গার কথা কাল রাতে একদম খেয়াল ছিল না। সকালে সুখেন বালিসের তলায় চাবিটা পেয়েছে। মানসী বাক্স এনে দিলে সুধাময় হারটা বের করে দেখল। খুবই পাতলা অল্প সোনার হার। তিরিশ বছর আগের অল্প টাকার চাকরে সুধাময় ফুলশয্যার রাতে দময়ন্তীকে উপহার দিয়ে ছিল হারটা। এই গরীব গরীব দেখতে হারটা দময়ন্তীর বড় প্রিয় জিনিস। বলত আমি যদি আগে মরি তাহলে এই হারটা আমার গলায় পরিয়ে দিও শ্মশানে যাওয়ার সময়।

সুধাময় বাক্সটাকে হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পাজামার ওপরেই সার্ট পরে নিল। মানসী জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ?'

সুধাময় যেতে যেতে উত্তর দিল, 'তোমার মায়ের কাছে। এই জিনিসটা ওর পরে যাওয়ার কথা ছিল।' মানসী বাধা দিতে গিয়ে চুপ করে গেল। কাঠফাটা রোদে প্রায় দৌড়ে যাওয়া বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আর একবার কেঁদে উঠল সে।

পক্ষীকুঞ্জ ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেও ওদের চোখে পড়ল না। ঘোরের মাথায় হেঁটে এসে রোদ্দুরে গিয়ে সুধাময়ের মাথা ঘুরতে লাগল। ওপাশ থেকে আসা একটা সাইকেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানল মাথায় করে নয়, একটা টেম্পোতে মৃতদেহ নিয়ে কয়েকজনকে যেতে দেখেছে সে। তাহলে কি ওরা মাঝ পথে টেম্পো ধরে নিয়ে গেল দময়ন্তীকে। এখান থেকে নিমতলা অনেক দূর। টেম্পোতে অবশ্যই ওদের সুবিধে হবে। কিন্তু সুধাময় এখন কি করবে। কোন বাস সরাসরি নিমতলায় যায় না। শরীর কাঁপছে, পা চলছে না। এই সময় ন নম্বর বাসটাকে দেখতে পাওয়া গেল। ভর দুপুরে সল্ট লেকে যাত্রী নেই। দু হাত বাড়িয়ে সেটাকে থামিয়ে উঠে বসল সে। মানিকতলায় বাসটার শেষ, নেমে প্রথমে কি করবে ভাবতে গিয়ে অতসীর কথা মনে পড়ে গেল সুধাময়ের। বেচারা জানে না ওর মা মরে গিয়েছে। অতসী নামটা তো দময়ন্তীরই দেওয়া। কোনদিন আসা হয়নি কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। জীবদ্দশায় যা হবার হোক, মরে যাওয়ার পর মানুষের শরীরে ক্রোধ কিংবা অভিমান থাকে না। মানিকতলায় এসে অতসীকে খবরটা না দিলে বড় পাপ হয়ে যাবে। একটু দেরী হবে হয়তো কিন্তু শ্মশানে গিয়েই তো দাহ করা যায় না। মাকে শেষবার যেন দেখতে পায় অতসী. সুধাময় নির্দিষ্ট নম্বরে কড়া নাড়ল। বেশ খানিক বাদে ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে? এত জোরে কড়া নাড়ে কে?' সুধাময় দেখল একজন ঝি মত বুড়ী জানলা খুলে তাকে দেখছে। 'অতসীরা কি এ বাড়িতে থাকে?' সুধাময়ের গলা শুকিয়ে কাঠ।

'হ্যাঁ। কি চাই?'

'একটু ডেকে দাও।'

'ডাকব কি করে। সে তো হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে? কেন?' আর চমক সহ্য হচ্ছিল না সুধাময়ের।

'বাচ্চা হয়েছে, পরশু দিন। কে গা তুমি?'

পরিচয় দিতে গিয়ে থেমে গেল সুধাময়, 'কোন হাসপাতাল?'

'নীলরতন না কি বলে। শ্যালদার পাশে।'

চুপচাপ চলে এল সুধাময়। অতসী, অতুর বাচ্চা হয়েছে। সেই ছোট্ট মেয়েটা গুড়গুড় করে হাটত, যার গায়ের ঘাম-গন্ধ এখনও সুধাময় নাক টানলে পায়, তারও বাচ্চা হয়ে গেল। কে গা তুমি? ঝি-এর প্রশ্নটার উত্তরে সুধাময় যদি পরিচয় দিত তাহলে কি ও বলে উঠত কেমন বাপ গো মেয়ের খবর রাখ না?

মানিকতলার মোড়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল সুধাময়। চোখের সামনে সব সাদা লাগছে কেন? এতক্ষণ ওরা নিশ্চয়ই শ্মশানে পৌঁছে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। সেখানে পৌঁছে যদি দ্যাখে আগুন লেগেছে শরীরে তাহলে—কেঁপে উঠল সুধাময়। না, সে দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তিরিশ বছর ধরে যে শরীরটায় মুখ ডুবিয়ে একটু একটু করে তার পরিবর্তন দেখেছে আজ সেটাকে বিকৃত হতে দেখতে পারবে না। অনেকক্ষণ রকে বসে পাথর হয়ে থাকল সে। তারপর উঠে শ্লথ পায়ে ন নম্বরের দিকে এগোতেই খালি ট্রামটা চোখে পড়ল।

সুধাময় হাসপাতালের সামনে নেমে দেখল বিকেলের ছায়া মাখা রোদে প্রচুর মানুষ গেটে ভীড় করেছে। ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হতেই সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। চেনে না, কোনদিন আসেনি। জিজ্ঞাসা করে করে মেটার্নিটি ওয়ার্ডে পৌঁছে গেল সে। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল সুধাময়। কেবিনগুলোতে নেই অতসী। আবার এনকোয়ারিতে গিয়ে খোঁজ নেবার কথা ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছে এমন সময় চিৎকারটা কানে এল, 'বাবা।'

মুখ ঘুরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে বিরাট হলঘরটার দিকে তাকাল সুধাময়। অনেক খাট পাশাপাশি। একটা খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে ওটা কে? অতসী নাকি। পায়ে পায়ে কাছে আসতেই চমকে উঠল সুধাময়, অতসী যেন সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়ে গিয়েছে। গায়ের জামাকাপড় ঢলঢলে শরীর রোগা।

'বাবা, তুমি এখানে? কি চেহারা হয়েছে—' নিজের কথাটা মেয়ের মুখে শুনতে পেল সুধাময়। অতসী তখন বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নামছে। বিছানার এক পাশে টুল থেকে ছোট জামাই উঠে দাঁড়াতে দেখল সুধাময় বাচ্চা মেয়ের মত অতসী বাবার হাত ধরল, 'কে খবর দিল বাবা?'

'ভগবান।' ফিসফিস করে বলল সুধাময়।

'তুমি—তুমি, আমি জানতাম একদিন তুমি আসবে।' অভিমান ঝুরু ঝুরু ঝরছিল অতসীর গলায়।

'তুই আসতে পারলি না!' প্রথম কথা বলল সুধাময়।

জামাই এসে টুলটা এগিয়ে দিল, 'বসুন।' ঘাড় নাড়ল সুধাময়। তারপর পাশের ছোট্ট খাটটার দিকে তাকাল। দুদিনের কচি মুখ এখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। ফরসা, একমাথা কোঁকড়া চুল। ঠিক এইরকম ছিল অতসী। এই শরীরটা একদিন তিল তিল করে বড় হবে, সুখ পাবে, দুঃখ পাবে এবং একদিন দুঃখ দিয়ে দময়ন্তীর মত চলে যাবে। পকেট থেকে ভেলভেটের বাক্সটা বের করে হারটা শিশুর গলায় পরিয়ে দিতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুধাময়। এখন তার অশৌচ চলছে। এই মুহূর্তে সেই শরীরটা হয়তো দগ্ধ হয়ে গেছে। এখন কি ওকে ছোঁওয়া উচিত? হারটা মেয়ের হাতে দিল সুধাময়, 'ওটা ওকে পরিয়ে দিস।'

হাসি মুখে হারটা নিয়ে অতসী বলে উঠল 'আরে, এটা তো মায়ের হার। মা পাঠিয়ে দিল বুঝি!' ঠোঁট চেপে ঘাড় নাড়ল সুধাময়। তৃপ্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ওটা শিশুর গলায় পরিয়ে দিল অতসী। সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল শিশু, হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করে ঘুমন্ত হাসল। সেদিকে চেয়ে অতসী বলে উঠল, 'দ্যাখো দ্যাখো বাবা, আমরা দুজন বলাবলি করছিলাম তুমি দ্যাখো—হাসলে একদম ওকে তোমার মত দেখায়।'

খাটের বাজু নেই, মেয়েকে ধরে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে থর থর করে কেঁদে উঠল সুধাময়। আর কি আশ্চর্য কাল রাতের পর থেকে এই প্রথম, সমস্ত শরীর থেকে তেড়ে ফুঁড়ে জলগুলো ছুটে এল চোখের বাইরে।

সুধাময় কাঁদতে লাগল শিশুর মত। তারপর জড়ানো গলায় বলল, 'ভুল দেখছিস। ও তোর মায়ের মতন হবে। তাহলে দেখবি কোনদিন কষ্ট পাবে না।'

প্রতিপালন

'কি আশ্চর্য! তোমার ওই মিডল ক্লাস মানসিকতা এখনও গেল না!' স্বপ্না নিজের নির্লোম পায়ে ক্রিম বোলাতে বোলাতে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

নবকুমার ভি সি আর বন্ধ করে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, সিম্পলি উই কান্ট অ্যাফোর্ড ইট রাইট নাউ। তাছাড়া অ্যাম্বাসাডারটা তো কোনও ট্রাবল দিচ্ছে না।'

'তোমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে তো জায়গা ছিল, তা হলে সানি পার্কে উঠে এলে কেন? তোমার কোন পূর্বপুরুষ কালার টিভি, ভি সি আর, ফ্রিজ, কার্পেট ব্যবহার করেছেন? নবু, আজকের যুগে যে মিনিমাম নিড না মেটালে নয় তার বাইরে আমরা যাচ্ছি না।' স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। তার ধবধবে সাদা নাইটির প্রান্ত হাঁটুর সামান্য নিচে সঙ্কুচিত হওয়ায় পায়ের গোছে হাঁসের ডিমের আদল আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে নবকুমার তারিফ করল। তার বউটি যাকে বলে সত্যিকারের সুন্দরী। অবশ্য তাদের পরিবারের মেয়েরা দেখতে খারাপ নয়। কিন্তু বাঙালী মেয়েরা এত শরীর ঢেকেঢুকে রাখতে ভালবাসে যে তাদের সৌন্দর্যটাই মাঠে মারা যায়। স্বপ্নার শরীরে হাঁটলেই ছন্দ আসে। কে বলবে তেত্রিশে পড়ল ও। তেষট্টির আগে টসকাবার কোন চান্স ও নেবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে নবকুমার তড়িঘড়ি বলল, 'ডার্লিং, ইউ নো, প্রায় চার হাজার বেরিয়ে যাচ্ছে প্রতি মাসে ধার শোধ করতে। এই ফ্ল্যাটের টাকা শোধ করার পর মারুতি কিনলে হত না?'

'তুমি একটু ড্যাশি হও তো নবু। ওই বুড়ি অ্যাম্বাসাডার নিয়ে ক্লাবে যেতে আমি লজ্জায় মরে যাই। মিসেস মিত্তির ঠাট্টা করছিলেন সবার সামনে। এটাকে বিক্রি করলে আর হাজার পঞ্চাশেক লাগবে। ওয়েল, তুমি যদি না পারো—।'

'না না তা বলছি না। কিন্তু—।'

'নবু, ধরো, আমি যদি চাকরি না করতাম, ধরো আমার গোটা তিনেক বাচ্চা থাকতো তা

হলে তুমি কি করতে? ওই শ্যামবাজারেব বারোয়ারী বাড়ির এক ঘরের অন্ধকূপে বাকি জীবন কাটাতে বলতে তো?' স্বপ্না এগিয়ে এল নবকুমারের কাছে। একটা আঙুল নবকুমারের চিবুবে রেখে বলল, 'আমরা একটু আরাম করে বাঁচতে চাই, চাই না? একটা থার্ড ইনকামের ধান্দা লাগাও না! তোমার কলিগ গুপ্তাকে দেখেও শিখলে না?'

'গুপ্তা তো লেফট অ্যান্ড রাইট ঘুষ নেয়।'

'আঃ। এটাও একটা মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট। যাক, এখন তৈরি হয়ে নাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে বের হব। তুমি কি এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছ? তা হলে বলে ফেল।' স্বপ্না চলে গেল ঘর ছেড়ে। সেই যাওয়া মন ভরে দেখল নবকুমার। তার আট বছরের বিবাহিতা স্ত্রী। অথচ প্রতিদিন নতুন দেখছে বলে মনে হয়।

এজেন্সিতে ফোন করল নবকুমার, 'মেডিক্যাল চেক আপ হয়েছে এ মাসে?'

মিস্টার সেন বললেন, 'কোন প্রব্লেম নেই স্যার। ডক্টর খাসনবীশ চাব সপ্তাহ অন্তর দেখছেন। একটু আন্ডার ওয়েট, এখনও তো সময় রয়েছে।'

নবকুমার বলল, 'বড্ড অভাবী পরিবার থেকে সিলেক্ট করেছেন আপনি। গতবার যখন গিয়েছিলাম তখন রোগা লিকলিকে বাচ্চাগুলোকে দেখে স্বপ্নার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শরীরের জন্যে একদিন অফিসে অ্যাবসেন্ট হওয়াও এখন অ্যাফোর্ড করা যাচ্ছে না।'

মিস্টার সেন দুঃখিত গলায় বললেন, 'খুব দুঃখিত স্যার। তবে এখনও তো সব শ্রেণীব মানুষ যথেষ্ট আধুনিক হয়নি, তবে বছর দশেকের মধ্যে আমরা আরও একটু সচ্ছল পরিবার পাব বলে আশা করছি।'

'মাই গড!' নবকুমার চমকে উঠল, 'তখন আমার কোন প্রয়োজন থাকবে না। আচ্ছা, ডাক্তার খাসনবীশের সঙ্গে আমাদের দেখা করার কোন প্রয়োজন আছে?'

'না না স্যার। ওসব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনাদেরটা নিয়ে এটা আমাদের একশ আটত্রিশটা কেস। প্রতিটি সাকসেসফুল।'

'থ্যাঙ্কু। থ্যাঙ্কু।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছতে গিয়ে চমকে উঠল নবকুমার। ওপাশের দরজা থেকে বেড জিন্স আর হলুদ সার্ট পরে বেরিয়ে এল স্বপ্না। দু লাফে দূরত্ব ঘুচিয়ে হাত বাড়াল নবকুমার, 'ওফ্! ভেনাস কোথায় লাগে!'

স্বপ্নার ভুরু বেঁকে গেল আরও, 'যত সেকেলে উপমা। না, তুমি আমাকে এখন ছোঁবে না। ফ্রেসনেশটা মেজাজে রাখতে চাই।'

বুড়ি অ্যাম্বাসাডারটাকে গলির মুখে রেখে নবকুমার আবার বলল, 'ডার্লিং, তুমি এবার না হয় গাড়িতেই অপেক্ষা কর। আমি ওকে ডেকে আনছি বরং।'

ভারী ব্যাগটা নবকুমারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্বপ্না হাঁটতে লাগল কথার জবাব না দিয়ে। বাধ্য হয়ে সমতা রাখতে পা চালাতে হল। প্রায় বস্তি টাইপের এই গলির মানুষগুলো প্রতিবারের মত এবারও স্বপ্নাকে যেন গিলে খাচ্ছে। এই নিয়ে তিনবার হল এখানে। এই মানুষগুলো কি আন্দাজ করছে তা তারাই জানে। মিস্টার সেন যখন প্রথমবাব এখানে নিয়ে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন, 'পাঁচ পাবলিককে নিয়ে কখনও চিন্তা করবেন না।'

চার চারটে উদোম, আধা-উদোম শিশু বারান্দায় শুয়ে-বসে ছিল। ওদের দেখামাত্র চিৎকার করে প্রায় নাচতে লাগল, 'এসেছে, এসেছে, এসেছে।'

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল। স্বপ্নার নাকে ততক্ষণে রুমাল উঠে গেছে। বড় বাচ্চাটা ততক্ষণে নবকুমাবের ব্যাগ আঁকড়ে ধরতে চাইছে, 'কি এনেছ গো, দাও না গো, বড্ড খিদে লেগেছে।'

নবকুমার ব্যাগটাকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোদের মা কোথায়? ডাক তাকে।'

সেই সময় ভেতরের দরজায় নারী এসে দাঁড়াল। ওদের দেখল। তারপর নিচু স্বরে ডাকল, 'আসুন।'

আশে-পাশের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াতে ওরা ভেতরে গেল। ঘুপচি ঘর। গত মাসে একটা টেবিলফ্যানের ব্যবস্থা এজেন্সিকে বলে করিয়ে দেওয়ায় তবু স্বস্তি। একটা ছোট বেঞ্চি সামনে এগিয়ে দিতে ওরা দুটিতে পাশাপাশি বসল। স্বপ্না লক্ষ কবল নারীর কণ্ঠার হাড় বড্ড বেশি প্রকট, নবকুমারের চোখে পড়ল, নারীর মধ্যভাগ স্ফীততর।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করছ, না বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছ?'

নারী উত্তর দিল না। মাথা নিচু কবল। স্বপ্না ঝাঝিয়ে উঠল, 'এরকম করলে তো চলবে না। তোমার জন্যে আমাদের রাতের ঘুম চলে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন তোমার শরীরে রক্ত নেই। রক্ত হবার জন্যে এত সব কিনে দিচ্ছি, প্রতি মাসে পাঁচশো করে মাইনে দিচ্ছি। আর তোমার কি কোন কর্তব্য নেই?'

নারী বলল, 'মাঝে মাঝে খাই। আসলে ওরা সামনে থাকলে—।'

স্বপ্না ঠোঁট বেঁকাল। তারপর নবকুমারকে বলল, 'দেখেছ কি চেহারা হয়েছে। চোখের তলায় কালি, হাতগুলো সরু সরু! এজেন্সিকে বল না ওকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে। অন্তত এই কয় মাস!'

এই সময় একটা শুঁটকো লোক বিড়ি টানতে টানতে দরজায় এসে দাঁড়াতেই নারী তার ঘোমটা আরও বাড়িয়ে দিল। লোকটা হাতজোড় করল, 'ওগো, নমস্কার! কি ভাগ্যি। দিন আমাকে ওগুলো দিন।' নবকুমারের হাত থেকে ব্যাগটা সরিয়ে নিল সে।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এজেন্সি আপনাদের ঠিকমত টাকা দিচ্ছে তো?'

'তা দিচ্ছে। কিন্তু তাতে চলে না। রেট বড্ড কম। ওই যে আমার চার মেয়ে দেখছেন, ভাল করে খাবার দিতে পারি না ওদের মুখে। তবে আমি তো দেখছি, আমার চার মেয়ে হবার সময় ওর চেহারা এত খোলতাই হয়নি।'

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল কথাটা শুনে, স্বপ্না সেটা উপেক্ষা করে বলল, 'শোন, পেট ভরে খাবে, রাত্রে দুপুরে ঘুমাবে। এখন কিছুদিন ঘরের কাজকর্ম করতে পার। কিন্তু পরের মাসে মেডিক্যাল চেক আপে যেন ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাই। এই ব্যাগে কমপ্ল্যান, আপেল, আঙুর আছে। কাউকে না দিয়ে নিজে খাবে। বুঝলে?'

নারী ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতেই ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। স্বপ্না নিচু গলায় নবকুমারকে কিছু বলতেই সে নারীর স্বামীকে একপাশে ডাকল, 'দেখুন মশাই, কিছু হলে তো আমরা এজেন্সিকে ধরব। কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা আলাদা রাখুন। আপনি একটু যত্নটত্ন করবেন। ওজন আর রক্ত বাড়াতেই হবে ওর।'

শুঁটকো লোকটি হাত কচলালো, 'আপনারা অনর্থক চিন্তা করছেন। ফোর টাইমস এক্সপেরিয়েন্সড। কোন অসুবিধে হবে না দেখবেন।'

নবকুমার বলল, 'আর একটা কথা, উনি নার্সিংহোম থেকে না ফেরা পর্যন্ত ওঁকে আপনি কোনভাবে বিরক্ত করবেন না। বুঝতে পারছেন?'

'আমি বিরক্ত তো করি না। হ্যাঁ গো—।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। চেঁচাচ্ছেন কেন? বিরক্ত মানে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বলছি।'

'অ। কিন্তু সে সব তো চুক্তির মধ্যে ছিল না।' লোকটি মাথা নাড়তে লাগল।

'ছিল না?'

'না। সেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

'কিন্তু আমার স্ত্রীর ইচ্ছা—।'

'পূর্ণ করব। আরও পঞ্চাশ বেশি পড়বে মাসে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

গাড়িতে ওঠার পর নাক থেকে রুমাল সরাল স্বপ্না, 'এই এজেন্সিটা খুব বাজে। তোমার পছন্দের ওপর ভরসা করেই অন্যায় হয়েছিল আমার।'

নবকুমার গাড়ি চালাতে চালাতে ঢোক গিলল, 'কিন্তু, ওদের তো খুব নাম।'

'ছাই নাম। হাভাতে হাড়জিরজিরে আধবুড়িটাকে জোগাড় করেছে। গত মাসে যা দেখেছি তার চেয়েও শরীর ভেঙেছে। এইভাবে চললে নার্সিংহোমে যাওয়ার আগেই- -। তখন আমি কি করব? কাকে নিয়ে থাকব?' প্রায় ডুকরে উঠল স্বপ্না।

বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে স্বপ্নার কাঁধে রাখল গাড়ির স্পিড কমিয়ে নবকুমার, 'ওঃ, নার্ভাস হয়ো না ডার্লিং। শুনেছি আমার ঠাকুমার ঠাকুমা হাড়জিরজিরে অবস্থায় দশবার সক্ষম হয়েছিলেন।'

এক ঝটকায় সরে গেল স্বপ্না, 'ওই পেডিগ্রি বলেই তো তোমার এই অবস্থা।'

মারুতি এসে গেল। সানি পার্কের গ্যারাজ থেকে বুড়ি অ্যাম্বাসাডারটাকে চল্লিশ হাজারে বিদায় করার পরেও মাসে আরও দেড় করে আয় কমে গেল নবকুমারের। এখন সকালে চা এবং ব্রেকফাস্ট ছাড়া কিচেনের কোন ব্যবহার হয় না। দুপুরে লাঞ্চ যে যার অফিসে, রাত্রে ক্লাবে সই করে ডিনার। সামনে অবশ্য নার্সিং হোমের বিরাট খরচ আসছে। স্বপ্নার বাসনা নার্সিং হোমটা যেন খানদানি হয়। ডাক্তারের সঙ্গে সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এজেন্সিকে যে টাকা দিতে হচ্ছে নার্সিংহোম তার চেয়ে কম নিচ্ছে না। পরের মাসে স্বপ্না যায়নি। একাই ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছিল নবকুমার। নারীকে এবার একটু স্বাস্থ্যবতী মনে হয়েছিল তার। নিতম্ব এবং বুকের ভার যেন বেড়েছে। কথাটা শোনার পর স্বপ্না বলেছে, 'তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। মিস্টার সেন যা করার করবেন।' যেহেতু স্বপ্না এখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না, তাই ও নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেনি নবকুমার।

আজ রাত্রে সমস্ত হৃদয় জুড়ে কল্লোল। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না সে। নতুন ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল নবকুমার। আগামীকাল সকালে অপারেশন। ডাক্তার কোন রিস্ক নিতে চাইছেন না। নারীকে পরিচ্ছন্ন করে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে গতকাল। কিন্তু প্রসব বেদনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। স্বপ্নাও চেয়েছিল সিজার হোক। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শিশু যে কষ্ট পায় তা ওই নারীর কারণে হোক সে চাইছে না। কিন্তু নারীর শরীরে রক্তাল্পতা, রক্তচাপ প্রতিকূল বলে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ডাক্তার। এজেন্সির মিস্টার সেন অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন স্বাভাবিক প্রসবের সময় প্রসূতির ক্ষতি হলে কোন দায়িত্ব নেই কিন্তু সিজারের কারণে যদি কিছু হয় তা হলে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করতে হবে। স্বপ্না বলেছিল, 'নিজে হলে তো আমি সিজার চাইতাম। ওর বেলাতেও তাই হোক।' অতএব ডাক্তার ঝুঁকি নিচ্ছেন।

নবকুমার মাটির অনেক ওপরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ তারায় তারায় জমজমাট। কে যেন বলেছিল পূর্বপুরুষেরা উত্তরাধিকারীর জন্মের আগে তারার মত চেয়ে থাকেন। নবকুমার আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসল, আগামীকাল আমরা বাবা-মা হচ্ছি। আর সেই সময় ভেতর থেকে স্বপ্নার গলা ভেসে এল, 'নবু।'

স্বপ্নার হাতে টেলিফোন। তার পরনে দুধরঙা স্বচ্ছ নাইটি। শরীরে সামান্য মেদেরও জায়গা হয়নি। খাপ খোলা তলোয়ারের মত ঝকঝকে, আকর্ষণীয়া। স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াতেই টেলিফোনে হাত চাপা পড়ল, 'হরিবল। আমার পক্ষে বোঝানো অসম্ভব। তুমি বোঝাও।'

'কে?'

'তোমার মা। আমাদের বাচ্চা হবে খবরটা দেওয়া দরকার। আফটার অল উনি ঠাকুমা।' রিসিভারটা রেখে পাশের কটে গড়িয়ে পড়ল স্বপ্না। লোভ সামলাতে পারল না নবকুমার। একটা হাত আলতো করে স্বপ্নার কোমরের চৌহদ্দিতে ঘুরিয়ে নিয়ে পেটের ওপর রাখল। হ্যাঁ, এটুকু করতে দিতে ওর আপত্তি হয় না।

'কে বলছ? মা?' রিসিভার তুলে প্রশ্ন করল নবকুমার। 'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছ। ডাক্তার প্রেডিক্ট করেছে নাতি হবে তোমার। না না, তোমার বউমা ক্যারি করছে না। দ্যাখো ক্যারি করাটা বড় কথা নয়। আমার আর তোমার বউমার রক্ত নিয়ে ও আসছে এটাই বড় কথা। তুমি আশীর্বাদ করছ তো?' নবকুমার উত্তরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করল, 'না, না। এটা পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়। তোমার বউমার পক্ষে ক্যারি করা ফিজিক্যালি এবং ইকনমিক্যালি অসম্ভব। বাস্তবকে অস্বীকার করে কি লাভ! বাচ্চা ক্যারি করলে ওর শরীরের কমপ্লিকেশন বেড়ে যাবে। শী উইল লুজ হার ফিগার। আর অন্তত মাস ছয়েক ওকে বাড়িতে বসে থাকতে হবে। সেটাও অসম্ভব। হ্যাঁ মারুতি কিনেছি আমরা। কি বললে? না-না। ডাক্তার এবং এজেন্সি প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছে। আমার স্পার্ম, ওর ওভাম থেকেই শিশু আসছে, এ ব্যাপারে ক্যারিয়ারের কোন ভূমিকা নেই। জাস্ট ওর ওভারিতে প্লেস করে দেওয়া হয়েছে। আফটার অল উই আর পেইং ফর ইট। মা মা মা—। যাচ্চলে! লাইনটা কেটে গেল। নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল।

স্বপ্না চোখ বন্ধ করে বলল, 'দিজ ওল্ড পিপল আর রিয়েলি ক্রেজি। আধুনিক ব্যাপারগুলো ওদের মাথায় কবে ঢুকবে কে জানে।'

দারুণ সেজেছে আজ স্বপ্না। নার্সিংহোম থেকে সোজা অফিসে চলে যাবে। নবকুমারের মনে পড়ল ছেলেবেলায় মা বিয়েবাড়িতে যাওয়ার সময়েও এত সুন্দর সাজতে জানতেন না। ডাক্তার খাসনবীশ ওদের দেখামাত্র অগ্রিম অভিনন্দন জানালেন, 'যা ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, অপারেশন আটকাবে না। মিনিট চল্লিশেক অপেক্ষা করুন।'

স্বপ্না বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি হলে ভাল হয়। সাড়ে এগারটায় একটা কনফারেন্স আছে।'

এজেন্সির মালিক মিস্টার সেন এসে গেলেন, 'খুব তো চিন্তা করছিলেন। আরে আমার পছন্দ খারাপ নয়। চার চারটে বাচ্চার মা। এসব ধকল কিছুই নয়।'

ওরা নারীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। একদিন নার্সিংহোমের তোয়াজ খেয়েই যেন চেহারা পাল্টে গেছে। পেট এখন পরিপূর্ণ। মিনমিনিয়ে বলল, 'আমার তো এমনিতেই হয় কর্পোরেশনের হাসপাতালে। পেট কাটবে কেন?'

স্বপ্না বলল, কোন অসুবিধে হবে না তোমার। একদম ফিট হলে তবেই বাড়ি যাবে।'

নারী চোখ বন্ধ করল, 'এবার বড় জ্বালাচ্ছে?'

স্বপ্না চমকে জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বালাচ্ছে মানে? কে জ্বালাচ্ছে?'

নারী পেটে হাত রাখল, 'এইটে। কাল সারারাত লাথি মেরেছে।'

স্বপ্না হাসল, 'তা তো মারবেই। ফরেন ল্যান্ডে কে বেশি দিন থাকতে চায় বল। তুমি সকালে দুধটুধ খেয়েছ তো?'

ডাক্তার খাসনবীশ বললেন, 'ওসব চিন্তা করবেন না। ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে।'

স্বপ্নার বুকে ঢিপ ঢিপ, নবকুমারের হাতুড়ি পড়ছিল। অপারেশন চলছে। নবকুমারকে মিস্টার সেন বললেন, 'ওর স্বামী এসেছে। বাইরে থাকতে বলেছি।'

'ও।' নবকুমার কি বলবে ভেবে পেল না।

'আজই বাকি পেমেন্ট করে আপনাকে বিল পাঠিয়ে দেব।'

এই সময় ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, 'কনগ্রাচুলেশন। আপনাদের পুত্র হয়েছে।'

স্বপ্না সব ভুলে নবকুমারকে জড়িয়ে ধরল। নবকুমারের মনে হল এত আরাম সে কখনও পায়নি। স্বপ্না ছিটকে গেল ডাক্তারেব কাছে, 'আমার ছেলেকে দেখব ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার বললেন, 'দাঁড়ান। ওয়াশ করানো হচ্ছে। আট পাউন্ড ওজন। বিয়েলি হেলদি।'

নারীর চেতনা খুব দ্রুত ফিরে এল। সে মুখ ফিরিয়ে নার্সকে দেখতে পেয়েই ডাকল, 'আচ্ছা, আমার কি হয়েছে?'

নার্স গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'ছেলে।'

নারীর মুখে স্বর্গীয় আনন্দ ফুটে উঠল। তার শরীব মন্থন করে একটি শব্দ বেরিয়ে এল, 'আঃ।' নার্স চমকে মুখ ফেরাল, 'কি হল?'

নারী বলল, 'পর পর চারটে মেয়ে হওয়ায় সবাই আমাকে খুব বদনাম দিচ্ছিল। এবার তো ছেলে হল। হলো তো! আমার ছেলেকে নিয়ে আসুন, একটু দেখব।'

নার্স দোনমনা করল। তারপর পাশের কট থেকে শিশুটিকে তুলে এনে নারীর সামনে ধরল। অপলক নারী তাকে দেখল। তাব মুখে ঈশ্বর তখন নিজের শ্রেষ্ঠ সুখেব ছবি আঁকবার চেষ্টা করছিলেন। নার্স বলল, 'দেখা হল?'

নারী আলতো আঙুলে কোনমতে শিশুকে স্পর্শ কবে বলল, 'নাকটা আমার মত হয়েছে।'

ডক্টর খাসনবীশ বললেন, 'এভরিথিং অলরাইট, তবে আমি শিশুকে আরও দুদিন নার্সিং হোমে রাখতে চাই।'

একটু আগেই নবকুমার এবং স্বপ্না সন্তানদর্শন করে এসেছে। দুজনেই আবেগে টগবগ করছে এখন। ডাক্তারের কথাটা শুনে স্বপ্না আঁতকে উঠল, 'ওমা! কেন? নো ডক্টর, আই অ্যাম ডাইং ফর হিম। এখনই নিয়ে যাই।'

'দুটো দিন ধৈর্য ধরুন না। তদ্দিনে পৃথিবীব সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাক। কেমন দেখলেন?'

'একদম স্বপ্নাব মুখ বসানো।' নবকুমার জবাব দিল।

'মাতৃমুখী পুত্রসন্তান সুখী হয়।' ডাক্তার জবাব দিলেন।

'নাকটা কিন্তু ওর মত। ওদের বংশের যা ধাবা।' স্বপ্না বলে উঠল, 'বঙ কেমন হবে ডাক্তার? আমার খুব ভয় করছে।'

'ভয় করছে কেন?'

'মানলাম আমার আর নবুব ক্রিয়েশন কিন্তু এনভাযরনমেন্টের একটা প্রভাব আছে তো? দশমাস ওই বোগা-অশিক্ষিত মেয়েটাব শবীরে থেকে ও আবাব কোনও ব্যাড হ্যাবিট আর্ন না করে বসে।' স্বপ্না শিউরে উঠল।

ডাক্তাব হাসলেন, 'শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগে একমাত্র মা-বাবার রক্তের কাছেই ঋণগ্রস্ত থাকে। ওই দশ মাস তার স্মৃতি তো চিরদিনের মতই অন্ধকারে। যেমন ধরুন নার্সারিতে গেলে দেখতে পাবেন বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি করতে একটা টেম্পরারি বেড়েব প্রয়োজন হয়। এইটে সেই রকম। দুদিন পরে আপনাদেব সন্তান আপনারা নিয়ে যাবেন, আপনাবা যেভাবে মানুষ করতে চাইবেন তাই হবে।'

নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে আসাব মুখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। সেই শুঁটকো লোকটা বিড়ি টানছে। ওদের দাঁড়াতে দেখে এগিয়ে এল, 'সেন সাহেব বলে গেলেন ভাল আছে। আপনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

স্বপ্না বেমালুম জবাব দিল, 'না ডাক্তার নিষেধ করল। ঘুমাচ্ছে।'

'ও! ছেলে হয়েছে শুনলাম!' লোকটি হাসল।

'হ্যাঁ।' নবকুমার বলল, 'আমরা সব টাকা পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে সুস্থ হলে নিয়ে

যেও। আচ্ছা, চলি ভাই।'

'তা তো যাবেন কিন্তু এদিকে যে একটা মুস্কিল হয়ে গেল!'

'কি মুস্কিল?'

'পেট কাটতে বললেন কেন? একবার পেট কাটলে দু বছরের মধ্যে পেটে বাচ্চা নেওয়া যায় না। শুনছি সামনের বছর থেকে রেট ডাবল হয়ে যাবে। একবছর বেকার থাকব, এই ক্ষতিপূরণটা আপনারা করে দেবেন।' লোকটা হাত কচলালো।

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল। স্বপ্না বলল, 'তুমি আবার ওকে ক্যারি করাবে?'

'সেইজন্যেই তো আমরা আছি।'

'বেশ। আমি মিস্টার সেনের সঙ্গে কথা বলব।' ওরা দ্রুত মারুতিতে উঠে বসল।

লিফটম্যান একটা কিশোরীকে দিয়েছে' সে শিশুকে দেখাশোনা করবে ওরা বাড়িতে থাকলে। অফিসে বের হবার সময় মিসেস পালিতের ক্রেশে দিয়ে যাবে ওকে। ফেরার সময় নিয়ে আসবে। সমস্যা হল মিসেস পালিত দু মাসের নিচের বাচ্চাদের রাখেন না। এই দুমাস কি করা যায়? বারো বছরের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিশোরীকে স্বপ্না বারংবার জিজ্ঞাসা করেছে সে দুমাস ম্যানেজ করতে পারবে কি না। কিশোরী মাথা নেড়েছে। গ্রামের বাড়িতে সে কত শিশুকে ঘুম পাড়িয়েছে। স্বপ্না অবশ্য তাতে ভোলার পাত্রী নয়। সে ডক্টর খাসনবীশের কাছ থেকে শিশুর পরিচর্যা-পদ্ধতি বিস্তারিত লিখে নিয়ে এসেছে। শনিবার-রবিবার তার ছুটি থাকে। অতএব শনিবার সকালেই শিশুটিকে নিয়ে আসা হল।

বাড়িতে যেন উৎসব। নতুন ফ্ল্যাটে শিশুর কান্না, স্বপ্নার ব্যস্ততা, নবকুমারের খুব ভাল লাগছিল। স্বপ্না সমস্ত শরীর একটা সাদা অ্যাপ্রনে জড়িয়ে পাতলা করে বেবিফুড গুলে শিশুর মুখে বোতলটা ধরে বলল, সোনামণিটা, খেয়ে নাও।'

শিশু দুবার ঠোঁট ফোলাল, জিভ ছোঁয়াল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্না খুব নিরাশ হল। নবকুমার বলল, 'ডার্লিং, ঠিক তোমার স্বভাব পেয়েছে। তুমি যেমন খাবারের নামেই আঁতকে ওঠো—।'

স্বপ্না বলল, 'ডোন্ট বি সিলি। আমাকে ফিগার রাখতে হয়। একে তো খাওয়াতেই হবে। একটু পরে চেষ্টা করব। কি মিষ্টি দেখতে, না?'

'কোলে নিও না। তোমার শাড়ি নষ্ট করবে।'

'করুক।' স্বপ্না আরও ঝুঁকে পড়ল।

তিনটে নাগাদ ডাক্তার ছুটে এলেন। স্বপ্না উদভ্রান্ত, নবকুমার কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। শিশুটিকে দেখে ডাক্তার বললেন, 'একটু ভুল হয়ে গিয়েছে।'

দুজনেই একসঙ্গে জানতে চাইল, 'কি?'

'নার্সকে বলে দিইনি যে ওকে যেন মায়ের দুধ না খাওয়ায়। এই কদিনে সেই অভ্যেসটা হয়ে যাওয়ায় ও বেবিফুড খেতে চাইছে না।'

স্বপ্না এবং নবকুমার পরস্পরের দিকে তাকাল। এই সময় বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠতেই কিশোরী বোতলটা মুখে ধরতেই সে প্রতিবাদ করল। এখন আর ওর কান্না থামছে না।। স্বপ্না পাগলের মত ডাক্তারকে একটা রাস্তা বের করতে বলল। এত কষ্টের সন্তান যদি না খেয়ে মরে যায় তাহলে?

ডাক্তার খাসনবীশ বললেন, 'ব্রেস্ট মিল্ক আর বেবিফুড এক সঙ্গে অভ্যেস করাতে হবে। প্রথমটাকে বন্ধ করলে তখন দ্বিতীয়টাকে খেতে আপত্তি করবে না। দেখি কি করা যায়। আপনি

বরং একবার এজেন্সিকে ফোন করুন।'

নবকুমার মিস্টার সেনকে ধবল, 'একটি মেয়ে দিন যে আমাদের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারে। মানে বুকের দুধের দরকার।'

মিস্টাব সেন টেলিফোনে বললেন, 'দিনে কুড়ি টাকা দিতে হবে।'

'তাই সই।'

স্বপ্না বলল, 'বলে দাও, একটু ভদ্র-সভ্য যেন হয়।'

মিস্টার সেন শুনে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এ রেওয়াজ তো চিরকাল এদেশে আছে।'

'

দরজা খুলে শুঁটকো লোকটাকে দেখে চমকে উঠল নবকুমার, 'কি ব্যাপার?'

'বুকের দুধ দরকার, সেন সাহেব বলেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু—।'

'হাঁটাচলা করছে, সেলাই কেটে দিয়েছে যখন, তখন ওকেই নিয়ে এলাম।'

নবকুমার দেখল নারী কিছু দূরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। অগত্যা সে ভেতরে আসতে বলল। স্বপ্না জিজ্ঞাসা কবল, 'এত বড় অপারেশনের পর হাঁটা চলা কবছ?'

শুটকো বলল, 'গরিব মানুষের সব কবতে হয়।'

শিশু মাতৃদুগ্ধের স্পর্শ পেতেই আপ্লুত হল। স্বপ্না ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'নবু, অন্য ঘরে যাও।' নবকুমার দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল। স্বপ্না তাকে অনুসরণ করল, 'একে পাঠানো উচিত হয়নি। নিজের ছেলে বলে ক্লেইম করে না বসে।'

'ব্রেস্ট মিল্ক দরকার যে।' নবকুমাব বিড়বিড় কবল, 'কনসিভ না কবলে যে শরীরে মিল্ক তৈরি হয় না। নাহলে তো তুমিই—।'

'নবু!' ধমকে উঠল স্বপ্না, 'বড্ড স্ল্যাঙ বলছ তুমি আজকাল।'

শিশু ঘুমিয়ে পড়লে শুঁটকো বলল, 'এবাব আমবা উঠি।'

'আবার কখন আসবে?'

'রাত্রে তো আসা সম্ভব নয়। তাহলে তো ওকে রেখে যেতে হয়।'

'মাঝে মাঝেই দরকার হবে যে।'

'তা হবে। তবে খাওয়া-পবা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করলে চল্লিশ টাকা পড়বে।' জানিয়ে দিয়ে শুঁটকো চলে গেল।

নারীর থাকার ব্যবস্থা কবে দিল স্বপ্না। শুধু খাওয়ানোর সময় ছাড়া নারী যেন বাচ্চাব কাছে না আসে জানিয়ে দিল।

মধ্যরাত্রে শিশু কেঁদে উঠতেই নবকুমার লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল। ওপাশেব বিছানায় শোওয়া স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ও কাঁদছে।'

স্বপ্না এবং নবকুমার শিশুর পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত, শিশু কেঁদে চলেছে। স্বপ্না বলল, 'আজ পাঁচবার খেয়েছে। ওর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট পাঁচবার খাওয়াবে। এ দেখছি সর্বভুক।'

নবকুমাব বলল, 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে তাই কাঁদছে। ওকে ডাকো না।'

স্বপ্না পাশের ঘরে ঢুকে দেখল নারী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে প্রস্তাবটি নিবেদন করতেই সে মুখ ফেরাল, 'ছিবড়ে করে দিল, ছিবড়ে করে দিল।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল স্বপ্না।

'এর আগে চার চারটে আমাকে ছিবড়ে করেছে। ওদের মুখে তো বুকের দুধ ছাড়া কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এও আমাকে শেষ করবে। কিন্তু আমার তো দিনে পাঁচবার, কোটা

পূর্ণ হয়ে গেছে আজ।' নারী পাশ ফিরে শুল।
'কিন্তু ও যে কাঁদছে?' আঁতকে উঠল স্বপ্না।
'কাঁদুক।' নারী আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

[১৯৮৭/১৩৯৪]

বড় পাপ হে

. . ..

দুচোখ কুঁচকে সে দূর মাঠের দিকে তাকালো। এখন ভরদুপুর। সেই সকাল থেকে মাছ ধরার চেষ্টায় সময়টা গেছে ফালতু। শুধু চুনোপুঁটি আর পাথরঠোকরা। কদিন থেকে তক্কে তক্কে ছিল সেই মোটকা বাণ মাছটাকে ধরবেই, হারামীটা আজও সটকে গেল। ওটা নিয়ে ধোউয়ালির হাটে গেলে,এক কিলো চাল হয়ে যেত নিশ্চয়! গরম গরম কিলোটাক ভাতের সঙ্গে মাছ, আজ সকাল থেকে সে খুব মৌজে ছিল। এখন এই খানিক আগে চুনোগুলোকে বাটিতে পুরে উনুনে চাপিয়ে দিয়েছে ও। নামাবার সময় একটু নুন আর তেলের ছিটে দিলেই হবে। মাছের এই হাল দেখে ভেবে রেখেছে রোদ একটু মিয়োলেই বেরিয়ে পড়বে। নিচে, খুটিমারির জঙ্গলের ধারটায় যে বাঁশঝাড়গুলো, শালা ঘুঘু পাখির বাগান হয়ে আছে। কালকে অবশ্যি অদ্দূর যেতে হয়নি, নাথুয়ার রাস্তায় পেয়ে গিয়েছিল বাপধনকে। বুক চিতিয়ে দেখছিল শালা। সাঁই করে গুলতি ছুঁড়তেই কেলিয়ে গেল। উনুন বলতে তো তিন পাথরের বুকে গোঁজা জঙ্গুলে কাঠ। তাতেই খুরিয়ে ফিরিয়ে সেঁকে নিয়েছিল পাখিটাকে। নুন মেখে এই দাওয়ায় বসে রাত্তির বেলা চাঁদ দেখতে দেখতে ভুট্টা খাওয়ার মত খেয়ে নিয়েছিল ও। খেয়েদেয়ে বলেছিল, বড় পাপ হে, বিচার করো। কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে আজকাল, কিছু একটা কাজ করলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঐ কথাগুলো।

নোনা রায় তো ওকে আজকাল সহ্য করতে পারে না। যখন ধান কাটাতে আর লাগাতে লোকজন নিয়ে এখানে আসে ওকে বলে সামনে না আসতে। কি মুশকিল। তা নোনা রায়কে তো বেশী আসতে হয় না এখানে। এক ফসলের জমি। ধানও তেমন হয় না। এবার নাকি মকাই লাগাবে ও। এইসব জোত জমি নোনার।

আবার ভাল করে নজর করল সে। কারা যেন আসছে। কে আসবে? এখন তো ধানফানের সময় নয়। নাথুয়ার রাস্তাটা আর ফাঁকা মাঠ। লোকজনের মুখ দেখতে হলে চলে যাও ধোউয়ালির হাট। পারতপক্ষে যেতে চায় না ও। খুব যদি দরকার হয়, এই তেলটা নুনটা কিংবা মোটকা কোন মাছ-ফাছ যদি পেয়ে যায় সকাল সকাল। গেলেই লোকজন ওর দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকায়। প্রথম প্রথম কয়েকজন ভিড় করে আসতো। মেয়েছেলেগুলোন রস-রস করে তাকাতো। সে তিন চার বছর আগের কথা। ধান কাটতে এসেছিল নোনা রায় ছয়-সাতজন মদেসিয়া নিয়ে। মেয়ে মদ্দ। তাদের কেউ কেউ দেখেছে মাঝরাতে সে নাকি বলেছে, 'বড় পাপ হে, বিচার করো'। দলের একটা মেয়ে নাকি পনের বছরের বাঁজা ছিল। ফিরে গিয়েই সে পেটের দড়ি আলগা করেছে। ব্যস, রটে গেল চারধার। হাট থেকে ঘুরে এসে নোনা রায় কাতলা মাছের

মুখ করে বলল, 'খবরদার, মেয়েছেলের দিকে নজর দিয়েছো কি মেরে ছাল ছাড়াবো হারামজাদা। তোর বাপের তো কুষ্ঠ ছিল, তোরও একদিন হবে। তা আমি বলে দয়া করে থাকতে দিচ্ছি, চার মাস পাঁচিশটা করে টাকা দিই, হ্যাঁ।' তারপর হিকহিক করে হেসে বলেছিল, 'ভালো ভালো, ভূত প্রেতের সঙ্গে কথা বলিস, লোকজন আর এদিকে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।'

নোনা রায়ের বাড়ি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে কাঠডাঙ্গায়। ঐ চার মাস আনাগোনা করে। বাকী আট মাস ধু-ধু সব। এই চালা ঘরটায় থাকে ও। প্রথম প্রথম পাহারা দিত ও জায়গাজমি। এখন জানে তার দরকার নেই। লোকজন আসেই না ভয়ে! বাপটা অবশ্যি সত্যি মরেছিল মাংস পচে খসে। সেই সময় গাঁয়ের লোক, নোনা রায়ের গাঁ, একঘরে করে দিয়েছিল ওদের। মরার আগে বাপ বলেছিল, 'মেয়েছেলের কাছে যাবি না—বড় পাপ নিয়েছি হে—বিচার করো।' তারপর থেকে কিছু করলেই ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে কথাগুলো। তা নোনা রায়ের কথা শুনে ও চমকে উঠেছিল প্রথমটা। আজ অবধি কোন মেয়েছেলে বলতে পারবে না যে নজর খারাপ করেছে। সেসব দিকে ভয় নেই। শুধু পরদিন সকাল থেকে একটা অভ্যেস হয়ে গেল ওর। চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সূর্যের আলোয় হাত পা লক্ষ করে ও। টিপে টিপে কান নাক দেখে। বাপের শালা প্রথম কান নাক ফুলেছিল লাল হয়ে। বলতো সাড় নেই। ওর তো নিজের কানে চিমটি কাটলে জোর ব্যথা লাগে। তার মানে সেইদিনটা ও বাপ হয়ে যায়নি। বড় পাপ হে বিচার করো।

এই জঙ্গলে জায়গাটায় ওর একরকম চলে যায়। মোটমাট একশ টাকা বছরে পায় ও নোনার কাছ থেকে। শর্ত, হাতি এলে তাড়াতে হবে। গত বছর কলাগাছ লাগিয়েছে নোনা। কোন খবরাখবর হলে ধোউয়ালির হরেন মুদিকে খবর দিলেই নোনা পেয়ে যাবে। শালা ওকে একমুঠো ধানও দিয়ে যায় না। তা না দিক। পেট তো ওরই চাকর। আঙরাভাসায় মাছ আছে, আর ঘুঘু ডাহুক চখা এরা আছে। চলে যায় কোনরকমে। এখন কলা পাকছে। চিনিকলা। নোনা ওকে অবশ্য খেতে বলেনি, মানাও করেনি; ভাল করে পাকলে খেয়ে দেখবে একদিন।

সত্যি লোক আসছে। ভাল করে ঠাওর করল ও। মাথার উপরে সূর্য, যারা আসছে তাদের ছায়া পায়ের তলায়। একটার হাতে লাঠি, অন্য দুজন হাত ধরাধরি করে আসছে। মেয়েছেলে। তিন পা হাঁটে তো হাঁ করে বাতাস নেয়। এ শালার বুড়িরা এখানে কি করতে এলো। থু করে থুতু ফেললো ও। মানুষজন দেখলেই আজকাল গা শিরশিব করে। তারপর এরা তো শালা বুড়ি। দুপুরবেলা ঘুঘুর মত গলা হেঁকড়েই চলবে। কিন্তু পাঠালো কে, কোন্ শত্রু! চট করে সামনে থেকে সরে এল ও। আড়াল থেকে লক্ষ করলে বোঝা যাবে মতলবটা কি।

॥ ২ ॥

তিন বুড়ি ঠুকুর ঠুকুর করে কোনরকমে চালাঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই একটা ডাহুক আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। মাথার ওপর করকরে রোদ, মুখ হাত কিন্তু ঘামেনি কারো। তিনজনের যে বড় তার গায়ের চামড়া মালার মত শরীরে জড়ানো। ময়লাটে শাড়ি তিনজনের অঙ্গে। যদিও দ্বিতীয়জন বাতগ্রস্ত তবু তার শাড়ি প্রথমজনের মত অগোছালো নয়। হাঁটতে তার কষ্ট হয়েছে খুব। তৃতীয়জন বয়সে ওদের চেয়ে ছোট। কাঁচাপাকা চুল। অন্যদের মত খালিগা নয়। তবে জামাও ওকে বলা যায় না ঠিক, কারণ পিঠের দিকটা কোনরকমে গিঁট বাঁধা। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে অনেকদিন তবু পাছাটাছাগুলো ভার ভার। মিলের মধ্যে তিনজনেরই গালের ওপর মেচেতার দাগ ঘন।

ধপাস করে ওরা চালাঘরটার দাওয়ায় বসে পড়ে নিঃশ্বাস সইয়ে নিচ্ছিল। ছোটজন বলল,

এলাম গো শেষ পর্যন্ত।' গলাটা এখনও মরেনি, ধাক্কা খায় না কোথাও।

দ্বিতীয়জন বলল, মানুষজন কাউকে দেখি না কেন?' গলার স্বর খনখনে।

প্রথমজন দুই হাতের মুঠোয় লাঠি নিয়ে গাল চেপে বসেছিল, একটা লোক থাকে বললো' যে, সে ব্যাটা কোথায়?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ওরা উঠল। তৃতীয়জন উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরের মধ্যে তাকালো। আগে শুধু দাওয়াটা আর মাথার ওপর চালা ছিল একটা। এখন চাটাই দিয়ে চারটে দেওয়াল দেওয়া হয়েছে। দরজাও আছে একটা। 'কেউ নেই মনে হয়।' বলে তৃতীয়জন ঘরে ঢুকে পড়ল। একটু বাদেই তার গলা শোনা গেল, 'অ দিদি' লোক আছে গো। উনুন জ্বলে, তাতে গাদাখানেক মাছ সেদ্ধ হয় দেখি।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'মাছ? আহা—কি মাছ রে!'

বড়জন চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'দুটো নিয়ে আয় দেখি।'

ছোটজন বেরিয়ে এল খালি হাতে। 'নিয়ে আসব যে, অন্য লোকের মাছ না?'

বড়জন হিহি করে হাসল খানিক, 'তাতে কি, ব্যাটাছেলেরা তো আমাদের ছেলের মত। আশেপাশে কেউ থাকলে শুনতে পাবে এমন জোরে বলল কথাগুলো।

খিল খিল করে হাসতে চেষ্টা করল তৃতীয়জন, 'যে সে লোক নয় গো, ভূত নামায়। রাতবিরেতে কথা বলা তাঁদের সঙ্গে হ্যাঁ।'

দ্বিতীয়জন যোগান দিল, 'আবার বাঁজা মেয়ের সাধ খাওয়ার ব্যবস্থা জানে।'

তিনজনেই হো হো করে হাসল। বড়জন জোরে, দ্বিতীয় চেপে চেপে, ছোট বসিয়ে বসিয়ে ছোটর নজর পড়ল কলাগাছে কলা হয়েছে। একটা কাঁদিতে বস্তা জড়ানো। তার ফাঁক দিয়ে পেকে যাওয়া নাদুস নুদুস এক ছড়া বেরিয়ে এসেছে।

'বোতাম ছিঁড়েছে গো, আহা।' ঘাড় দোলালো সে।

দ্বিতীয়জন বুঝতে পারেনি প্রথমটা। শেষ পর্যন্ত কলা লক্ষ করে খরখরে জিভটা জলে ধুয়ে নিল, 'যা না ভাই, হাত বাড়ালেই পাবি, যা না, পেট আমার অম্বুবাচী করা মেয়েছেলের মতন হয়ে আছে।'

বড়জন বলল, 'যা না মাগী, খিদে লাগেনি তোর?'

গড়িমসি করে ছোটজন উঠল। ওপাশে কুয়ো আছে একখান। তার গা দিয়েই কলাগাছের ঝাড়। শরীর এখন ভারী, মনের চাকর নয়। হাত বাড়ালেই নাগাল হয় না। লাফাবে এমন সাহস নেই। কোথায় কোন জন শত্রুতা করার জন্য বসে আছে বলা যায় না। লম্বা শরীরের আঁকশি পেলে হতো। একটা ছোট্ট কঞ্চি পড়ে আছে দেখে তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় একটা ধমক শুনতে পেল ছোটজন, 'কলা পাড়া নিষেধ আছে।'

দাওয়ায় বসে বড়জন বলল, 'কে রে?'

দুপদাপ পা ফেলে সে সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজনই অবাক চোখে ওকে দেখছিল। ও বাবা, এ যে দেখছি বেশ মদ্দ মানুষ। দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে এমন বয়স বোঝা মুশকিল। চুল বেশ বাবরি হয়ে আছে। হাঁটু অবধি ধুতি গোটানো, উদোম গা। হাত-পা ফাটা ফাটা। বেশ রেগে গেছে দেখলেই বোঝা যায়, 'কি মনে করে এখানে? কি চাই?'

'চাই? না না, কিছু না, কিছু চাই না। এই বয়সে আর চাইবো কি বাপ। তা তুমিই বুঝি সেই।' বড়জন মাথা দুলিয়ে বলল।

'সেই মানে?' লোকটা তিন বুড়িকে দেখে নিল।

'ঐ যে ভূতের সঙ্গে কথা বলে, মেয়েছেলের বাচ্চা করে দেয়। শুনলাম যে, ধোউয়ালির হাটুরেরা বলছিল।'

ছোটজন সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে লোকটার শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, 'নাঃ অ দিদি, পাপটাপ তো ঢোকার জায়গা পায়নি মনে হয়। পেটটেট তো দেখি এখনো এয়ো হয়ে আছে।'

বড়জন বলল, 'তা পায়ের গোড়ালি দেখেছিস? কানের লতি নাকের পাটা? ঠিকঠাক বলিস বাপু, আমি আবার পানসে দেখি আজকাল।'

এতক্ষণে কথা বলল মেজো, 'না গো, ছোট ঠিকই বলেছে!'

লোকটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল গতিক দেখে, শেষ পর্যন্ত সামলে নিল, 'কে পাঠিয়েছে এখানে?'

'হাটের লোকজন।' ছোটজন বলল, 'থাকার জায়গা খুঁজছিলাম, তা বলল সবাই তোমার গুণের কথা, দেখতে এলম।'

মেজো ধমকে উঠল এবার, 'আঃ কাজের কথাটা বল না আগে। এই যে বাছা, খিদে লেগেছে বড়, মাছ রাঁধছ শুনলাম, দুটো ভাত চাপিয়ে দাও আমাদের জন্য।'

'ইস।' ভেংচে উঠল লোকটা, 'আমার কে রে! এক ফোঁটা চাল নেই ঘরে উনি খাবেন ভাত। এখানে থাকা-টাকা হবে না। একটাই ঘর।'

'তাতে কি! আমরা তো ঘাটের মড়া। ফেলিস না বাপ।' বড়জন বলল।

'ভূত দেখার বড সাধ।' ছোটজন পিনিক কাটলো।

'নোনা রায় শুনলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে আমার।' লোকটা চোখ বড় বড় করে ভয় দেখাতে গিয়ে দেখল ছোট হাসছে। 'কোন্ নোনা? কাঠভাঙ্গার সেই মিনসে! গোঁফ না উঠতেই আমার ঘরে এসেছিল গো। কি ছেলে, বুঝলে দিদি, সেদিনই আবার ওর বাপের আসার কথা! কোনরকমে সামলে সুমলে ফেরত পাঠাই। বাপটা ছিল কষাই।ছিবড়ে করে ফেলতো যেন। তা সেই নোনা নাকি!, বাঃ বাঃ!'

লোকটা হাঁ করে শুনছিলো কথাগুলো, ছোট থামতেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'বড পাপ হে, বিচার করো।'

মেজো যেন ভূত দেখলো সামনে, 'আঁ! বলে কি গো?'

ছোটজন চোখ ঠারলো, 'পাপ, পাপ করেছো গো, বিচার চায়!'

বড় মাথা দোলাল, 'শুনবো, সব শুনবো। আগে খেতেটেতে দাও। বুঝলে বাপ, পেট হল সবচেয়ে বড় পুণ্যি। সেটা মিটালে পাপের কথায় জিভে স্বাদ লাগবে।'

'এখানে খাবারটাবার নেই। চাষ-বাস হয় যার খাবার তার কাছে। আমি মাছ মাংস ধরে খাই, তোমরা বিধবা মানুষ—!' লোকটা মিনমিনে গলায় বলতে চেষ্টা করল। ওদিকে উনুনে চাপানো বাটি থেকে গন্ধ উঠছে জোর। এবার নামানো দরকার।

বড়জন শিরাঝোলা হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে বলল, 'ও বাপ, বিধবা বলো না গো। হাজার হাজার ভাতার ছিল আমার, মরে হেজে গেলেও কেউ কেউ তো এখনো দিব্যি ফুরফুরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তা বিধবা হলাম কি করে!'

লোকটা টক করে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। হায় হায়, আর একটু দেরী হলেই হয়েছিল আর কি! জল শুকিয়ে তলা করবো করবো করছে। নুন তেল ছিটিয়ে নামাতে নামাতে ও বাইরের দিকে তাকাল। ছোটজনের ছেঁড়া জামার গিঁট দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে আছে। আর দুজন চোখের আড়ালে। তাই নিজের মনেই যেন বলল, 'ও হাজার ভাতার তো বেবুশ্যেদের হয়।'

মেজোজন বলল, 'ছেলের দেখি বুদ্ধি আছে খুব। ঠিক ধরে ফেলেছে।'

কথাটা শুনেই লোকটা কাঠ হয়ে গেল। অ্যাঁ! এই তিন বুড়ি বেবুশ্যে। ধোউয়ালির লোকজন

এখানে পাঠিয়ে দিল কেন? ওকে পরীক্ষা করতে? মেয়েছেলে কাছে গেলে শরীর নষ্ট হয়, বাপ বলতো। বাপেরও শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই। তা এদের কি মেয়েছেলে বলা যায়? দুজন তো শুকিয়ে আমসি, হাড়গুলো পটাং পটাং করে। ছোটজন যার শরীর একটু ভারী সেও তো এখন আভাঙ্গা কুঁজোর মত, মুখটাই সরু তলায় মস্ত ফাঁক—জল ধরে না। তো এদের কি আর মেয়েছেলে বলা যায়? এর আগে মেলায় ও বেবুশ্যে দেখেছে। তা তাদের ঠাটঠমক আলাদা, বাপের কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে ভয়টা টনটনাতো। এরা কিন্তু সে জাতের নয়। এককালে হয়তো ছিল, লোকটা ভাবলো, এখন তো গাঁয়ের পাঁচ পুরুষ দেখা হরিবালার মত চেহারা সব। মাসী বলে ডাকা যায়। পরক্ষণেই নিজেকে ধমকে উঠল সে, কোথাকার কে, আদিখ্যেতা দেখানো মানে নিজের বাঁশ নিজে নেওয়া। মেয়েছেলে হোক না হোক, তিনটে পেট তো! ওগুলো ভরাবে কে? ঘর থেকে হাঁক ছাড়ল ও, 'এখানে সুবিধে হবে না, চলে যাওয়া হোক।'

'তাই নাকি!' ছোটজন বলল।

'রাত-বিরেতে জায়গা ভাল নয়, আর কিছু না হোক, হাতি নামে জঙ্গল থেকে।' লোকটা যেন ভয় দেখাল।

'কত হাতি মোষ দেখলাম সারাজীবন।' ঠেস লাগলো গলায়।

'তারপর নোনা রায় আছে! বড় রাগী মানুষ।' লোকটা যেন অনুনয় করছিল এবার।

'নোনার তলপেটে একটা আধুলির মত জড়ুল আছে, ও কিছু বলবে না, কী ভীতুই ছিল না দিদি কি বলবো।' ছোটজনের উদাস গলা।

যাঃ শালা। লোকটা অসহায় চোখে বাটির দিকে তাকাল। নোনা রায়ের বেবুশ্যে এরা। আবার নোনার বাপেরও। অথচ এদের কথা কোনদিন শোনেনি ও। ওর বাপ কি এদের—। খুব কৌতূহল হল ওর, 'তা এ তল্লাটে আগে দেখিনি কেন?'

'দশ বছর ছিলাম না গো, তীর্থ সারতে গিয়েছিলাম। তা দেখলাম সেখানেও একই ব্যাপার। প্রথম প্রথম ছোটটার দিকে লোকে তাকাতো। তারপর তো আমরা পুঁটলি। তাই ফিরে এলাম এখানে। জায়গাটা চিনি, মানুষজন জানি। তা বলো, এই কুড়ি ত্রিশ ক্রোশের সব বুড়োমানুষই আমাদের চেনে, হে হে।' বড়জন গলা কাঁপিয়ে কথাগুলো বলল।

খুব ভয়ে ভয়ে যেন গোপন খবর নিচ্ছে এমন গলায় সে বলল, 'আচ্ছা কাঠভাঙ্গার আর কেউ, লম্বা মতন বাবরি চুল, গলায় কম্বল ছিল—।'

মেজোজনের গলা শুনতে পেল সে, 'গলকম্বল—ও দিদি সেই লোকটা গো, তোমার কাছে একরাত বাকী রেখে গিয়েছিল, মনে পড়ছে, বাবরি চুল!'

চট করেই প্রথমজন যেন মনে করতে পারল, 'সেই কেষ্ট ঠাকুর! বাকী রেখেছে আর শোধ করেনি। তা আমাদের পয়সা মারলে নিস্তার আছে বাপ। শুনেছি কুষ্ঠ হয়ে মরেছে। চেনো নাকি বাপ? কেউ হয়টয় নাকি?'

বাটি হাতে নিয়ে লোকটা কুঁকড়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, 'আমার বাপ।'

॥ ৩ ॥

সন্ধে থেকেই খুঁটিমারি জঙ্গলের নিঃশ্বাসের মত একদল বাতাস আনাগোনা করছিল। এখন আকাশে মেঘ নেই। বুকে বাঁধিয়ে রাখার মত আকাশটার তলায় দাঁড়ালে শরীর শির শির করে। এ জায়গাটায় দিনে যতই গরম হোক রাত পড়লে কেমন শীত শীত ভাব। যেদিকে তাকাও আলোর দেখা পাওয়া যায় না। শুধু ফাঁকা মাঠের ওপর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা জোনাকিরা কিলবিল করে।

কলাগাছের ঝোপের ওপাশে একটা বড় পাথরে লোকটা বসেছিল। ওর ঠিক মাথার ওপর ছাতির মত চাঁদ ঝুলছে। লোকটা অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে আছে। ওর পেছনে চালাঘরটায় তিন বুড়ি কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে। তিন-তিনটে পেটে আধচেবানো ঘুঘুর মাংস পড়েছে রাত হলেই। রোদ মরলে ও চলে গিয়েছিল সেই বাঁশঝাড়ে। ঘণ্টাখানেক লাগেনি গোটা চারেক ঘুঘু হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু আজ পোড়ানো হয়নি সেগুলো, ছোটজন ভাঙ্গা হাঁড়িতে সেগুলো সেদ্ধ করেছে। এ অন্যরকম স্বাদ। আজ সারাদিনটাই অন্যরকম গেল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে লোকটা বাপের মুখ মনে করতে চাইল। তারই মত বাবরি চুল ছিল বাপের। লোকে বলতো বাপ বেটা দেখতে একরকম। বাপ, তুমি বাকী রেখেছিলে কেন হে বেবুশ্যের কাছে? আমার কিছু পয়সা আছে ঘরের নিচে পোঁতা, তোমার ধার শোধ করে দেব! অভ্যেসে লোকটার একটা হাত চলে গেল কানের লতিতে। টেনেটুনে দেখল। প্রথমে ছিল অন্যমনস্ক, চট করে খেয়াল হতেই অন্য লতিতে হাত দিল। সাড নেই নাকি? না, ঠিকই আছে, বেশ ব্যথা করে একটা। অন্যটার—মাথা ঝাঁকালো সে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'বড় পাপ হে, বিচার করো!' জল এসে গেল চোখে।

'আমরা এসেছি বাপ!'

চমকে ফিরে তাকালো সে। প্রথমটা ঝাপসা দেখল ও। তিনটে বাঁকা আধবাঁকা শরীর ওর ঠিক পেছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোয় তাদের সেই তেনাদের মত দেখাচ্ছে। হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল ও। দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল। তারপর চোখ বড় বড় করে দেখল তিন বুড়ি ওর দিকে কেমন মোহিনী-মুখে তাকিয়ে আছে।

'কথাবার্তায় বিঘ্ন করলাম না তো।' বড়জন ফিস ফিস করে বলল, 'উনারা রাগ করবেন না তো, ক্ষমা চেয়ে নাও বাপ। তুমি তো আমার ছেলে।'

মেজোজন বলল, 'এই শুনেই এসেছি গো তোমার কাছে। হাটুরেরা বলেছে তোমার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আছে, স্বচক্ষে দেখলাম আজ।'

ছোটজন মাথা নিচু করে বলল, 'নইলে কেউ একা একা এই বাদাড়ে থাকতে পারে!'

ওরা তিনজন পাশাপাশি মাটিতে উবু হয়ে বসল। ওদের সামনে লোকটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। কি করবে বুঝতে পারছিল না সে। বড়জন তেমনি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমরা এখানে থাকতে আসিনি বাপ। কাল ভোর ভোর চলে যাব। তোমাকে একটা কাজ করে দিতেই হবে!'

খসখসে গলায় লোকটা বলল, 'কি!'

মেজোজন বলল, 'তুমি কোন মেয়েছেলের সঙ্গে শুয়েছ গো?'

চমকে উঠল লোকটা, 'না, না। কক্ষনো না। মেয়েছেলে শরীর নষ্ট করে দেয়।'

ছোটজন বলল, 'মেয়েছেলে নিয়ে কোন কুচিন্তা—।'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'না-না।'

মাথা দোলালো তিনজন। বড়জন বলল, 'অঙ্গ দেখেই বুঝেছিলাম। তাই তো উনারা তোমাকে বেছে নিয়েছেন। তা আমাদের অনুরোধ রাখ এবার।' আমরা তিনজন তো ঘাটের মড়া, পা বাড়িয়ে বসে আছি। সারাজীবন বেবুশ্যে ছিলাম, মরতে গেলেও বেবুশ্যে। অনেক তীর্থ করলাম, লোকে যেই শোনে বেবুশ্যে, চোরা চাহনি চালায়। ছোটর যৌবন গেলেও খোলসটা যে ছাই যায়নি। তা তোমার কথা শুনে এখানে এসে তোমাকে দেখলাম। তা বাপ, মরার পর সব তো যাবে আগুনে যদি শ্যাল কুকুরে না খায়, পাপগুলোর গতিটা কি হবে! তুমি বাপ আমাদের বিচার করো। না বলো না বাপ—পিতৃঋণ না হয় শোধ করো।'

তিনজন ভিখিরীর মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল এবার। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা বসে পড়ল পাথরটার ওপর। সামনে তিন বুড়ি মাটিতে বসে। চাঁদের আলোয় সব

পড়েছে জবজব। অজান্তে হাতের আঙুল চলে গেল লতিতে। কুঁকড়ে গেল ও, হায় বাপ, এটাতেও ব্যথা লাগে না কেন? ফিস ফিস করে সে বলল, 'বড় পাপ হে—।'

'বলি তা হলে বাপ', প্রথমজন বলল, 'বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলাম। না, মিছে কথা না, কেউ আমাকে বেবুশ্যে করে নি। স্বামী মারা যাবার আগে স্বাদ পেয়েছিলাম রক্তে। তার টানে টানে চলে এলাম গো। না আফসোস করি না। ত্রিশ বছর কাজ করেছি আমি। হাজার হাজার মানুষ দেখলাম। সব এক রকম। ঘরে ঢোকার পর অবশ্য চেহারা থাকে আলাদা। এর জন্যে বিচার চাই না। আমি তো পাপ করিনি কিছু। লোককে আনন্দ দেওয়া কি পাপ? কিন্তু আমার কি হতো জানো, যেই কোন লোককে ঘরে তুলতাম ভাবতাম আমার স্বামী এসেছে। সেই স্বামী, যে বারো বছর বয়সটাকে সামলে দিয়ে চলে গেছে। এখন মনে হয় বাপ, আমি অন্যায় করেছি। সেই লোকটার আত্মাটাকে কষ্ট দিয়েছি। এটাই তো পাপ। তুমি বিচার করো বাপ, 'সে কি বলে জিজ্ঞেস করো!'

বড়জন থামতেই চারধার হঠাৎ নির্জন হয়ে গেল। লোকটার দুটো পা মাটিতে যেন আটকে গেছে। ও নড়তে পারছিল না। এই বুড়ি মেয়েছেলেটার সঙ্গে চুরি করে রাত কাটাতো ওর বাপ। এই বুড়ি ওর বাপের শরীর নষ্ট করেছে। কিন্তু বাপ কেন বাকী রেখেছিল এর কাছে। ওর মা, যে নাকি ওকে জন্ম দিয়েই কার সঙ্গে কোথায় চলে গিয়েছে, সে কি বাপকে সুখ দেয়নি! ফিস ফিস করে ও বলল, 'মা, মা—।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রথমজন টলমল গলায় বলে উঠল, 'জোরে বল বাপ, আঃ, আঃ, কি শান্তি।' হু হু করে কেঁদে ফেলল বুড়ি।

নড়েচড়ে বসল দ্বিতীয়জন, 'আমার ঠাকুরপো আমাকে রাস্তায় এনেছিল। রাস্তা থেকে নিজেই ঘরে এলাম। তা দিদির মত আমার দুঃখ হয় না বলবো না, হয়। সংসারের জন্যে আগে কষ্ট হত। এই কুকুরের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। কপাল এমন, তিন তিনবার ছেলে বিয়োবার চেষ্টা করেছি, জন্মাবার সময় কে যেন ফাঁস টেনে মেরে ফেলেছে তাদের। রাজপুত্র না হোক, আমার ছেলে হতো তো বেঁচে থাকলে। দিদি বলত, আগের জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল তারা তাই নাড়ি পৈতের মত গলায় আটকে যেত তাদের। তাতে আমি কি পেলাম বল। এ সব সুখ দুঃখ তো আছেই। একদিন দেখলাম শরীর জ্বলছে। কাউকে বললাম না। এক সন্ন্যাসীর কাছে পুজো দিতে গিয়েছিলাম, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে কোন সাধুর গল্প বললেন। মন সায় দিচ্ছিল না, তবু ভাবলাম হয়তো এটা পরীক্ষা। রাত্তিরবেলা শরীর দিয়ে তার পুজো করলাম। বললেন, এবার ছেলে বাঁচবে। তা ভোর রাতেই মনে হল অস্বস্তি হচ্ছে। সন্ন্যাসী চলে গেলে টের পেলাম পরে, বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। রাগ হয়ে গেল খুব। মায়া নেই মমতা নেই। ডাক্তার দেখালাম না, এক মাস ধরে মানুষের শরীরে সেই বিষ ছড়াতে লাগলাম। এখন মনে হয় কি পাপই করেছি আমি। কত মানুষ অন্ধ হলো, কত সংসার ভেসে গেল, সব আমার হিংসের জন্য, পাপের জন্য। এখন আমি কি জবাব দেব?'

চারধার আবার চুপচাপ। শুধু বড়জন এখনও ফুঁপিয়ে যাচ্ছে। একটা রাতের পাখি শব্দ করে ডেকে উঠল কোথাও। জোছনার সর ক্রমশ হলদে হয়ে আসছে। লোকটার মনে পড়ল বাপ বলেছিল, 'মেয়েছেলের কাছে যাবি না—বড় পাপ নিয়েছি হে।' যেন বালতিতে জল ভরা আছে, লোকেরা এসে মগে করে তুলে তুলে নিয়ে যায়।

'কিছু বলো গো, আমার বুক জ্বলে যায় পাপে!' মেজোজন যেন থাকতে পারছিল না আর।

লোকটা বলল, 'আমি জানি না, কিছু জানি না।'

'তোমাকে বলতেই হবে বাপ। যা শাস্তি হয়—। তোমার মায়ের দিব্যি।'

চমকে উঠল লোকটা। মায়ের দিব্যি। মা কেমন দেখতে? কোন ছবি নেই ওর মায়ের। বাপ

বলতো কালোকেলে ছিল না। সামনে তাকালো ও। মেজোজনের মুখ দেখল। মাংস নেই একরত্তি। বুড়ো হলে কি কঙ্কাল শুকিয়ে যায়? সব মানুষের কঙ্কাল তো একই রকম দেখতে। মাংস আর চামড়ার হেরফেরে চেহারা আলাদা আলাদা হয়। মায়ের বয়স এখন কি এর মত হবে? মা এখন কোথায়? যার সঙ্গে চলে গেছে মা সে কি রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে? ফিস ফিস করে বলল সে, 'মা গো মা—!'

সঙ্গে সঙ্গে দুই বুড়ি দুজনকে আঁকড়ে ধরল। লোকটা দুজনের কান্না শুনতে পাচ্ছিল। ছোটজন মুখ নীচু করে বসে একধারে। বড় দুজন পরস্পরকে ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা কান্না নিয়ে মাখামাখি করতে করতে চালাঘরটার দিকে কেমন আবিষ্টের মত চলে গেল। লোকটা দেখল, বড়জন লাঠিটা মাটিতে ফেলে রেখে গিয়েছে। ফিস ফিস করে বলল সে, 'বড় পাপ হে, বিচার কবো।'

খুব মৃদু কান্নার শব্দ আসছে ঘব থেকে। চাঁদ এখন ছায়া ফেলেছে লম্বা লম্বা। ডাহুকগুলো এতো রাত্রে চেঁচায় কেন? ছোটজন নড়েচড়ে বসল। তারপর সামনের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমি কোন পাপ করিনি।'

কথাটা একদম আশা করেনি লোকটা। প্রতিদিন ও নিজে কত পাপ করে তার কি শেষ আছে। এই মাছগুলোকে যখন মারে তখন মনে হয় পাপ করলাম। ঘুঘু পাখিগুলো যখন খাবি খায় তখন মনে হয় পাপ করলাম। তবে? ছোটজন বলল, 'আমার মা ছিল, এই লাইনেই, আমিও তাই করেছি। লোকে বলতো আমি নাকি উর্বশীর চেয়ে সুন্দর, বন্যার চেয়ে আমার যৌবন বেশী। লাইন পড়তো আমার ঘরের সামনে। সে সব যা দিন গেছে, আঃ। দু হাতে টাকা উড়িয়েছি, একদম আফসোস নেই এখন, কি দেখতে ছিলাম? তুমি এমন মেয়েছেলে দেখেছ যার গায়ের রঙ গমের মত, চুল খুললে শাড়ি পরতে হয় না, ভেতরের জামা পরেনি দেখে এই সেদিনও লোকে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকতো, হাঁটলে পরে ছেলেবুড়োর জিভ শুকিয়ে যেত, দেখেছ?' মুখ কাত করে প্রশ্ন করলো ছোটজন।

ঘাড় নাড়ল লোকটা। না, না।

'তাহলে আর কি দেখেছ? ভোর হবার আগে আকাশ দেখেছ কিংবা সন্ধে হব-হব আকাশ? দ্যাখোনি, তা হলে কি দেখেছ! আমি সেই রকম ছিলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে যেমন রাত হয়ে যায়, এ আমার তেমন হল যে। সব যে চলে যায়, যৌবনটা চোখের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। অথচ মন আমার মানতে চায় না কেন? কেন ইচ্ছে করে একটা পুরুষমানুষ আমাকে দেখে ভিতরে ভিতরে কাঁপুক। কেন ইচ্ছে করে পায়েব নখ থেকে মাথার চুল অবধি একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষকে ধরে রেখে থর থর করে কাঁপি? কিন্তু আমার যে-কিছুই নেই আর। শরীরের কোথাও সাড় পাই না আজকাল। মনে হয়, এটা আমার দেহ নয়। কেন যৌবন চলে গেল, শরীর থেকে তো মন বয়স গেল না?' গোখরো সাপের মত ফণা তুলে ছোটজন ওর দিকে তাকাল।

'আমি জানি না।' অসহায়ের মত বলল লোকটা। বলতে বলতে আঙুল দিয়ে দু কানের লতি স্পর্শ করল। ব্যথা লাগে না কেন? চট করে নাক ধরল ও। কি ঠাণ্ডা নাক!

'জানো না! তোমার মনের মধ্যে এমন হয় না? সত্যি বল? শরীরের সব কিছু তোমার বশ?' উঠে দাঁড়াল ছোটজন।

'জানি না।' দু হাতে মুখ ঢাকল লোকটা।

'জানো না! ছি ছি ছি! তুমি আবার পুরুষমানুষ নাকি! সাড় নেই যার শরীরে তার আবার যৌবন কিসের! আমার মনে সাড় আছে, তোমার তো তাও নেই। হায় কপাল, কার কাছে বিচার চাইতে এল ওরা। তোমার সারা শরীরে কুষ্ঠ, দগদগে ঘা, বাইরে থেকে দেখা যায় না, তাই

তোমার সাড় নেই শরীরে। ওয়াক, থু।' এক দলা থুতু মাটিতে ছিটিয়ে ছোটজন দুপদাপ পা ফেলে ঘরের দিকে চলে গেল। ভয়ে কুঁকড়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে লোকটা দেখল হাঁটার তালে তালে ছোটজনের অহঙ্কারী শরীর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে আবিষ্কার করল তার জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সারা শরীরে কোথাও যেন জল নেই, হাত পায়ে কানের লতিতে সাড় নেই একদম। বাপ বলেছিল কুষ্ঠ হলে সাড় চলে যায়! কিন্তু এই মুহূর্তে ও নিজের বাপকে হিংসে করতে শুরু করল। মিথ্যে কথা।

ছোটজনের শরীর এখনও দেখা যাচ্ছে। নেতানো জ্যোৎস্না মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানে।

হঠাৎ মুখের সামনে একটা হাত নেড়ে কিছু একটা সরিয়ে দেবার ভঙ্গী করে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হটো বাপ!'

বদরক্ত

দিনরাত ঝুপঝুপ বৃষ্টি তবু মানুষের আসা বন্ধ হচ্ছে না। সাক্ষাৎ পাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, ভক্তরা সেকথা জানেন, তবু অসময়েও আসা চাই।

দোতলার বারান্দা থেকে ওদের আসতে দেখেছিলেন রমলা। নিচের বারান্দা ভরতি হয়ে গিয়েছে, সামনেব মাঠের ত্রিপলেব তলায় এতক্ষণে নিশ্চয়ই জায়গা নেই। এত মানুষ আসছে শুধু মাকে একবার চোখে দেখবে বলে। ভারতবর্ষের যেখানেই মা যান সেখানেই এই দৃশ্য। অথচ প্রত্যেকেই তো একটা আশা নিয়ে আসে। তাদের পার্থিব কোন দুঃখ দূর করতে মায়ের আশীর্বাদ চায় ওরা। কোন মানুষকে অকারণে দুবার আসতে দ্যাখেননি রমলা। ঠিক ত্রিশবছর মায়ের সঙ্গে ঘুরছেন তিনি। কানপুরের আশ্রমে আর ক'টা দিন থাকা হয়! টে টে করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে ওই আশী বছরের মহিলার কোন ক্লান্তি নেই।

এইসময় একজন এসে খবর দিল, 'মা ডাকছেন।'

রমলা দ্রুত পায়ে দুটো ঘর পেরিয়ে মায়ের কাছে এলেন। মা তখন পা ছড়িয়ে বসে অন্নদাকে কিছু বলছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ না তুলে বললেন, 'কোথায় থাকিস? তোকে না দেখলে কিছু ভাল লাগে না!'

রমলা থমকে গেলেন। ত্রিশ বছরের সাহচর্য বলে দেয় এসবই ভনিতা। আসল কথা আসবার আগে মা এইরকম বলেন। রমলা বললেন, 'তোমার ভক্তদের দেখছিলাম।'

'কি দেখলি?'

'বৃষ্টি উপেক্ষা করেও সব আসছে তোমাকে দেখবে বলে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। কেউ অবশ্য স্বার্থ ছাড়া আসে না।'

'ওমা! তা হবে কেন? তুই কি স্বার্থ নিয়ে এসেছিস? ত্রিশ বছর ধরে তোকে দেখছি, কই কিছু চাইতে তো শুনলাম না।' মা হাসলেন।

রমলা এইসব মুহূর্তে অসহায় হয়ে পড়েন। কিন্তু তবু প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করলেন, 'চাই না মাকে? প্রতি মুহূর্তেই তো চাইছি। তোমার সঙ্গে থাকতে চাওয়া-টাই কি কম?' এইরকম কথা একমাত্র রমলাই বলতে পারেন। আশ্রমের পুরুষ এবং নারীরা কেউ মায়ের কাছে রমলার মত স্বাধীনতা পাননি। মায়ের মুখের ওপর অপ্রিয় কথা বলার ক্ষমতা একমাত্র রমলারই আছে।

মা বললেন, 'তুই আমার ছবি আঁকলি না?'

রমলা মাথা নাড়লেন, 'পারব না। তোমার ছবি আঁকার ক্ষমতা আমার নেই।'

'পাগল। আমি একটা রক্তমাংসের মানুষ, রোগ জরায় ভুগছি। আসলে আমার ছবি আঁকলে সেটা সুন্দর হবে না, তাই আঁকছিস না। ঠিক আছে, তাহলে তোর নিজের ছবি আঁক, এঁকে দেখা।' মা ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন। বেঁটেখাটো বৃদ্ধা রমলার চিবুকের কাছাকাছি।কিন্তু ওঁর চোখের দিকে তাকালেই দৃষ্টি নামাতে হয়। সারা শরীরের চামড়া এখন মালার মত জড়িয়ে আছে হাড়ে অথচ গায়ের রঙ এখনো ভোরের আলোর মত। বয়সের দাঁত মুখেও ছাপ ফেলেছে কিন্তু চুল কুচকুচে কালো। তাকালেই বুক ভরে যায়।

রমলা বিস্মিত, 'আমার ছবি?'

'হুঁ। তোরটা আঁকতে পারলেই আমারটা আঁকা হয়ে যাবে।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই সমস্ত শরীরে শিহরণ এল। রমলা বুঝতে পারছিলেন তাঁর দুগাল বেয়ে পলকেই জলের ধারা নেমেছে। অথচ মায়ের হাত শরীরে এলেই পৃথিবীটা শান্ত, 'দ্যাখো পাগলীর কাণ্ড। চোখের জল খুব সস্তা, নারে!' তারপরই গলা পাল্টে বললেন, 'এয়োস্ত্রীর চোখের জল স্বামীর অকল্যাণ করে। মুছে ফেল।'

মা চলে গেলেন। আজ সারাটা সকাল ভক্তদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে ওঁকে। প্রথম প্রথম এই সময় মায়ের সঙ্গে থাকতেন রমলা। আর মায়ের ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে যেতেন।মা আমার স্বামীর অসুখ সারিয়ে দাও, মা আমার ছেলেকে সারিয়ে দাও, অমুক যেন চাকরী পায় তুমি দেখো—এইরকম হাজারটা বায়না। মায়ের জবাব, ভাল ডাক্তার দেখাও রোগ সেরে যাবে, মন দিয়ে খোঁজ তাহলে নিশ্চয়ই কাজ জুটবে। ভক্তরা এতে সন্তুষ্ট হয় না।তাদের নিশ্চয় করে বলতে হবে। মা মুখ ফুটে যদি বলে সেরে যাবে তো ডাক্তার না দেখালেও সারবে। এই নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি। একথা শুনে মা একদিন বলেছিলেন, 'ওকথা বলছিস কেন? মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে তখন অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি যে কিছুই করতে পারি না এও তো ওরা বুঝবে না। তাই বলি, যাঁকে ডাকলে সব হবে তাঁকে ডাকো, তিনিই সব। আমি কে?'

রমলা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তবু আবার আসে কেন?'

মা মিটি মিটি হেসেছিলেন, 'মজুররা তো মালিকের দেখা পায় না তাই সর্দারকে এসে ধরে। আমাকে বোধহয় সর্দার ঠাউরেছে।'

না। মা কোন ম্যাজিক করেন না। গায়ে হাত বুলিয়ে রোগ সারান না, গরীবকে বড় লোক করে দেন না। তবু রিক্সাওয়ালা থেকে অধ্যাপক কেউ না এসে পারে না মায়ের কাছে। রমলা নিজেও তো একই বাঁধনে বাঁধা। মায়ের কাছে এলে, মাকে চোখে দেখলে বুক ভরে যায়। যেন অফুরন্ত শক্তির উৎস মা, যারা আসে তারা সেই শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করে ফিরে যায়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে মানুষের ব্যবহার পাল্টে যাচ্ছে। এই যেমন আজ হল।

মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দর্শনের জন্যে। বিশেষ একটা মঞ্চ করা হয়েছিল যাতে ভক্তরা দেখতে পায় মাকে। স্বেচ্ছাসেবীরা মাকে ঘিরে রেখেছিল যাতে ভিড়ের ঢেউ গায়ে না লাগে। মাকে দেখা মাত্র এক মুহূর্ত সবাই পাথর। তারপরই একজন কেঁদে উঠল, 'মাগো, ওঁর ক্যান্সার হয়েছে, তুমি সারিয়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বিভিন্ন চাওয়া সোচ্চার হল। চিৎকারে কান পাতা দায়।

সবাই এবার মায়ের কাছে আসতে চাইছে। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রাণপণে সেই চাপ সামলাতে চেষ্টা করছে। মা সবাইকে শান্ত হতে বলছেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। কেউ যেন ফুল ছুঁড়লো মায়ের উদ্দেশ্যে। তাই দেখে যারা ফুল এনেছিল মাকে দেবার জন্যে তারা সেগুলোকে সজোরে ছুঁড়তে লাগল মায়ের গায়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমলা দেখলেন মায়ের শরীরে সেগুলো এসে আঘাত করছে। ফুলের আঘাত যে এত তীব্র হয় ধারণা ছিল না। মা দুহাতে মুখ ঢাকছেন। রমলা ছুটে নীচে নেমে এলেন। স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা কি করছেন, মাকে ভেতরে নিয়ে আসুন।'

ততক্ষণে ফুল বোধহয় ফুরিয়ে গেছে কিন্তু কিছু একটা ছুঁড়তে হবে বলেই ঢিল ফুলের জায়গা নিল। স্বেচ্ছাসেবকরা কোনোরকমে মাকে যখন ভেতরে নিয়ে এল তখন মায়ের কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে। রমলা ছুটে কাছে এসে নিজের আঁচল চেপে ধরলেন কপালে। না, ক্ষত তেমন বড় নয়।

ওষুধ লাগিয়ে যখন মাকে ওপরের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল তখন পুলিশ এসে গিয়েছে। তারা জোর করে সরিয়ে দিয়েছে উগ্র ভক্তদের। একটু শান্ত হলে রমলা মায়ের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কখনও আসবে এখানে?'

মা বললেন, 'বাঃ কেন আসব না! ও, ওরা ওরকম করল বলে বলছিস। তা সবাই তো করেনি, কেউ কেউ করেছে।' তারপর কয়েক-মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'আজকের চিঠিগুলো পড়।'

হ্যাঁ, এটাই এখন রমলার অন্যতম কাজ। সারা পৃথিবীর ভক্তরা মাকে প্রতিদিন চিঠি লেখেন। রমলা সেগুলো মাকে পড়ে শোনান। যাকে উত্তর দেবার প্রয়োজন, তাকে কি লিখতে হবে মা বলে দেন।

চিঠির ঝাঁপি নিয়ে আসা হলে রমলার চোখ স্থির হল। ওরে ব্বাস, আজ বোধহয় শ' দুই হবে। অভ্যস্ত হাতে একটার পর একটা চিঠি পড়ে যাচ্ছেন রমলা। প্রত্যেকেই দুঃখের কথা জানিয়েছে। মাঝে মধ্যে এক আধজনের ভাল খবর। একজনের পেটের অসুখ সারছে না জেনে মা বললেন, 'লিখে দে ভেলোরে গিয়ে দেখাতে।' আর একজন মৃত্যু কামনা করে লিখেছে যে এই পৃথিবীর জ্বালা দূর করে ঈশ্বরের কাছে মা যেন যেতে তাকে সাহায্য করেন। শুনে মা বললেন, 'ওকে বল আর যেন আমাকে চিঠি না লেখে। যারা কাজ ফেলে পালিয়ে যেতে চায় তাদের আমি পছন্দ করি না।'

এইরকম একটার পর একটা চিঠি, যাতে জাগতিক দুঃখ-বেদনা মাখামাখি—মাকে পড়ে শোনাতে হয় এবং মায়ের জবাব তাদের লিখে পাঠাতে হয়। রমলা জানেন এইরকম দুতিন লাইনের উত্তর পেলেই ভক্তরা কৃতার্থ হন। আজকের চিঠি শেষ হওয়ার মুখে একটা খাম খুলে থমকে পড়লেন রমলা। মাঝে মধ্যে এই খামটি আসে। আর সেটা হাতে নিলেই বুকের মধ্যে কেমন নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। খুবই নির্লিপ্ত হবার ভান করে চিঠিটি পড়তে হয় তাকে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয় মায়ের কানে যেন তাঁর গলা অন্যরকম না শোনায়। তারপর অনেক রাত্তিরে যখন একা থাকেন তখন নিজের এই পরিবর্তনটার কথা ভাবলেই তাঁর হাসি পায়।

আজ চিঠিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরোটা পড়ব?'

মা শুয়েছিলেন চোখ বুজে, বললেন, 'কে লিখেছে?'

'ভবানীপুরের চ্যাটার্জীদের বাড়ি থেকে।'

এক মুহূর্ত সময় লাগল বোধহয় চিনে নিতে, মা বললেন, 'পড়।'

রমলা পড়ে গেলেন। প্রথমেই একটা সুখবর! বড় মেয়ে শোভা ডাক্তারি পাশ করেছে।মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া তা সম্ভব হতো না। শোভা বিদেশে যেতে চায় উচ্চশিক্ষার্থে, এ ব্যাপারে মায়ের

কি মত? মা যদি অনুমতি দেন তাহলে সামনের মাসে স্ত্রী কন্যাপুত্রদের নিয়ে কাশীতে তিনি যেতে চান প্রণাম করতে।

রমলা দেখলেন চিঠিটি কাশীর ঠিকানায় লেখা, সেখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে মানুষটার হাতের লেখা একই রকম রয়ে গেছে। পঁচিশ বছরের প্রতিটি মাস নিয়মিত মোটা টাকা পাঠান উনি, প্রতিমাসে নিজের সংসারের খবরাখবর দেন।না, আজ অবধি কোন খারাপ খবর ওর চিঠিতে পাননি রমলা। কিন্তু এত অনুরক্ত তবু পঁচিশ বছরে একবারও মাকে দর্শন করতে আসেননি মায়েরই নির্দেশ মেনে। সেই মানুষ আজ হঠাৎ দর্শনপ্রার্থী হয়েছেন কেন?

মা তেমনি চোখ বুজে শুয়ে শুধোলেন, 'কত বছর হল?'

রমলা বুঝতে পারছিলেন ওঁর মাথা নেমে আসছে, 'পঁচিশ।'

'লিখে দে, এবার আসতে পারে। সবাইকে নিয়ে আসতে হবে। তবে কানপুরে নয়, এখানেই।' মায়ের কণ্ঠে কোন তাপ-উত্তাপ নেই।

'চিঠি পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমরা বোধহয় এখানে থাকব না মা!'

'ও। তাইতো। তাহলে কাউকে দিয়ে খবর পাঠা।' মায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। ইনিও ভক্ত, মা আহত হয়েছেন জেনে ছুটে এসেছেন।

নীচে ততক্ষণে পুলিশের বড়কর্তারা এসে গেছে। মাকে ঢিল ছুঁড়ে মারা হয়েছে, এ খবর পৌঁছে গেছে মন্ত্রীমহলে। বড় বড় অফিসাররা এসে গেছেন মায়ের খোঁজ-খবর নেবার জন্যে। এখন আশ্রমের কর্তারা এঁদের সামলাবেন। রমলা উঠে এলেন বাইরে। ভিড় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি এখনও টিপটিপিয়ে পড়ছে। আকাশ ঘষা স্লেটের মত মন খারাপ করা। রমলা ধীর পায়ে নীচের অফিসঘরে এলেন। সেখানেও জটলা, সকালের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে। রমলাকে দেখে সবাই চুপ করে গেল। ইদানীং এই হয়েছে। অহর্নিশ মায়ের সঙ্গে থাকার ফলে এদেরও বোধহয় ধারণা হয়েছে ইনিও শক্তিময়ী। রমলা একজনকে ডেকে বললেন, 'এখনই ভবানীপুরের এই ঠিকানায় চলে যাও। গিয়ে বলবে মা এঁদের সবাইকে আজ সন্ধ্যেবেলায় আসতে বলেছেন।'

ছেলেটি খুব তৎপরতার সঙ্গে ঠিকানাটা লিখে নিল খামের উপর থেকে। রমলা বললেন, 'যাওয়ার সময় ভাড়াটা চেয়ে নিয়ে যেও।'

ওপরে গিয়ে চিঠির জবাব লিখতে বসে বারে বারে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলেন রমলা। অথচ এই পঁচিশ বছর মা তাকে দিব্যি ভুলিয়ে রেখেছিলেন। তবে আজ কেন এমন হচ্ছে। মানুষটা সশরীরে আসছেন বলেই? অস্বীকার করবেন না, পঁচিশ বছর আগের প্রথম কদিন ব্যাপারটা ভাবলেই বেশ হাসি পেত। মায়ের আদেশ পালন করেছি এই বোধটাই তখন বড় ছিল। কিন্তু এখন এই পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে গত কয়েক-মাস ধরে ওই চিঠিটা খুলতে গেলেই শরীরে কাঁপুনি আসছে। প্রথম প্রথম মনে হতো মাকে বলবেন এই অনুভূতির কথা। কিন্তু বলতে লজ্জা করতো। অথচ আজ তাঁর জীবনে মা ছাড়া আর কে আছে? ইংরেজীতে বি এ পাশ করে ধনী বাবার কাছ থেকে এক কথায় চলে এসেছিলেন মায়ের কাছে তিরিশ বছর আগে। বাবা বাধা দেননি! মা-মরা মেয়েটি যদি এতেই শান্তি পায় তো পাক, এইরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর! বাবা বেঁচে থাকতে প্রতিবছর দিন পনেরর জন্যে গিয়ে থাকতেন তাঁর কাছে। তিনি চলে যাওয়ার পর সে পাঠও চুকেছে।

সেবার কানপুরেই ঘটল ব্যাপারটা। মায়ের শরীর একটু খারাপ ছিল কদিন থেকে। রমলারা তখন মায়ের কাছে সর্বক্ষণ থাকার অনুমতি পেতেন না। মাঝে মাঝে মা ডেকে পাঠাতেন, দু-একটা কথা বলতেন, তাই যথেষ্ট ছিল। অসুস্থ মাকে দিদিরাই সেবা যত্ন করতেন। রমলার খুব

ইচ্ছে হতো মায়ের পাশে থাকতে।এবং সেই ইচ্ছেটা মা একদিন টের পেয়ে গেলেন। তখন রমলাকে পায় কে! এই সময় এক নবদম্পতি মাকে প্রণাম করতে এল। সদ্য বিবাহ হয়েছে ওদের। এক আত্মীয়ের অনুনয়ে মা ওদের এক মিনিটের জন্য দর্শন দিতে রাজী হয়েছেন অসুস্থ অবস্থায়। ছেলেটি অল্প ক'দিনের মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানী চলে যাবে, এও একটা কারণ ছিল।

ওরা এল। এত সুন্দর জুটি দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ছেলেটির স্বাস্থ্যের সঙ্গে লাবণ্য মিশে তাকে আরও সুন্দর করেছে। মেয়েটিকে দেখেই মনে হয়, বড় শান্ত। গায়ের রঙ একটু চাপা কিন্তু চোখদুটো বড় লক্ষ্মীময়ী। ওদের দেখে মা উঠে বসলেন। রমলা মায়ের পেছনে দুটো বালিশ সাজিয়ে দিলেন একটু আরাম দেবার জন্যে। ওরা প্রণাম করতে এগোতে মা দুহাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন, 'না, না, পায়ে হাত দিতে হবে না।'

সচরাচর মা কাউকে পায়ে হাত দিতে দেন না। ওরা দূর থেকে প্রণাম করে মাটিতে বসল পাশাপাশি। রমলার খুব সুন্দর লাগছিল ওদের দেখতে। মা কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপব খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কদ্দিন বিয়ে হয়েছে?'

ওরা চকিতে নিজেদের দেখে নিল।স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল মুখে রক্ত জমেছে ওদের।

নীচু গলায় ছেলেটি জবাব দিল, 'দশ দিন।'

'কবে বিদেশ যাচ্ছ?'

'সামনের মাসের তিন তারিখে।'

রমলা দেখলেন মায়ের চোখ অসম্ভব স্থির হয়ে গেছে। সমাধি হবার আগে মায়ের এমন অবস্থা হয়। কয়েকবার দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে রমলার। তখন মায়ের কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। মা মেয়েটিকে ডাকলেন, 'তুমি একটু আমার কাছে এসো তো!'

মেয়েটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে এল। এসে মুখ নীচু করে দাঁড়াল। মা ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ঠিকুজি কুষ্ঠি নেই?'

নীববে ঘাড নাড়ল মেয়েটি, 'না।'

মা তার গায়ে হাত বোলালেন। তারপব বললেন, 'এবার যাও। কিন্তু কাল সকালে আবার এসো। খুব জরুরী।'

ওরা চলে যাওয়ার পর মা অস্থির হয়ে পডলেন যেন। প্রশ্ন করলেও কিছু বলেন না। বারংবার তাঁর এক কথা, 'আহা কি সুন্দর ছেলেটি!' সন্ধ্যেবেলায় ওদের সেই আত্মীয়াটি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁকে দেখেই মায়ের মুখ গম্ভীর। এক ঘর লোকের সামনে বলে বসলেন, 'তোমরা কি, অ্যাঁ? ছেলের বিয়ে দিয়েছ আর কুষ্ঠি মিলিয়ে দ্যাখোনি?'

আত্মীয়াটি বিব্রত গলায় বললেন, 'না, মানে ওসব এরা কেউ—।'

'মেয়েটির ভাগ্যে বৈধব্যযোগ আছে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই সে বিধবা হবে। আহা, অমন ছেলেটি চলে যাবে ভাবলেই মন কেমন করে উঠছে।' মা তখন বেশ উত্তেজিত।

আত্মীয়াটি কথাটা শুনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। দুহাত জোড়া করে মায়ের সামনে প্রায় লুটিয়ে পড়লেন, 'মা তুমি বাঁচাও।'

'আমি বাঁচাবার কে? যিনি পারবেন তাঁকে ডাকো। আমি কি ম্যাজিক জানি। যা কপালে লেখা আছে তা মানতেই হবে। শুধু ওই ছেলেটার মুখের দিকে তাকালে—।' মায়ের গলার স্বর অন্যবকম শোনাচ্ছিল।

কথাটা শুনে রমলার বুকের ভেতরটা ডুকবে উঠেছিল। অত সুন্দর, সপ্রতিভ ছেলেটির আয়ু নেই? মা কখনো কাউকে এমন কথা বলেন না। ভবিষ্যতের কথা মায়ের মুখ থেকে অনেক চেষ্টা করেও কেউ বের করতে পারে না! কিন্তু এই ছেলেটিকে দেখার পর থেকেই মা ছটফট

করছেন। সারাদিন সুস্থির হতে পারেন নি।

রমলার তখন পঁচিশও হয়নি। গুণ বলতে ওইটুকু, সেতার বাজাতে পারেন। রাত্তিরে সব যখন চুপচাপ তখন সেতার নিয়ে বসতেন তিনি। সেরাত্রে মায়ের পায়ের কাছে বসে রইলো। মা বললেন,'কিরে , ভগবানকে ডাকবি না?'

'আজ ইচ্ছে করছে না মা।'

'তা কি হয়! রোজ রাত্রে ডাকিস আর আজ বাদ যাবে কেন?'

অদ্ভুত ব্যাপার! তাঁর সেতার বাজানোর কথা জানতে পেরে মা বলেছিলেন, সুর হচ্ছে এমন একটা সিঁড়ি যা দিয়ে তাঁর কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যাওয়া যায়। আর যে বাজায় সে যেমন তাঁর আশীর্বাদ পায় যারা সেই বাজনা শোনে তাদের মনও পবিত্র হয়ে যায়।

'আমার আজ বাজাতে ভাল লাগছে না। তুমিও তো ভাল নেই মা।'

মায়ের একজন প্রিয় শিষ্যা মাথাব কাছে বসে হাওয়া করছিলেন।

মা বললেন, 'রাখ তো পাখা, তোরা আমায় খামোকো রোগী বানাচ্ছিস।'

'তুমি সত্যিই অত ভাবছ মা ওদের জন্যে?'

মা তাঁর দিকে তাকালেন, 'দ্যাখ, ছেলেটির কোন দোষ নেই। মেয়েটিরও নয়। অথচ মেয়েটির কপালে বৈধব্যের যোগ এত প্রবল যে ছেলেটিকে যেতে হচ্ছে। সেই যে বলে না দুধও ভাল লেবুও ভাল। কিন্তু যেই এক করো অমনি ছানা হয়ে যাবে। এসব দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন করে। সবই তাঁর ইচ্ছে বলে মানতে চায় না মন!'

রমলা বললেন, 'কিছু করা যায় না মা?'

মা বললেন, 'যায়। কিন্তু কে রাজী হবে?'

রমলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করতে হবে?'

'ছেলেটিকে এমন কারো সঙ্গে বিবাহ দেওয়া দরকার যার বৈধব্যযোগ নেই আমৃত্যু। শুধু তার ভাগ্যের জোরে এই বিধিলিপি খণ্ডাতে পারে। যা তোরা যা, আমাকে একটু ঘুমুতে দে।'

কিন্তু রমলা জানেন মা সেই রাত্রে ঘুমুতে পারেননি। আর কি আশ্চর্য, রমলাও চেষ্টা করে দুচোখের পাতা জুড়তে পারেননি। ভোর বেলায় মা তাকে ডেকে পাঠালেন। ছাদে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে চেয়েছিলেন মা। রমলা গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই হাসলেন, 'হ্যাঁরে, তোর সংসারী হয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘর করার ইচ্ছে আছে!' রমলা অবাক হয়ে গেলেন! একি প্রশ্ন! তিনি তো সব ছেড়ে এসেছেন মায়ের কাছে। কারো প্রতি কোন অভিমান নয়, কোন দুঃখ বা জ্বালা তাঁকে এখানে নিয়ে আসেনি। স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন চাইলেই তো তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু তার চেয়ে এই জীবন তাঁকে টেনেছে বেশি। দুবেলা উপাসনা আর মায়ের সান্নিধ্যের চেয়ে কাম্য তাঁর কাছে কিছু নেই। আর এসব কথা তো মা জানেন। তাহলে? রমলা বললেন, 'তুমি তো জানো তাহলে এই প্রশ্ন কেন করছ?'

মা বললেন, 'ভেবে দ্যাখ, পরে যদি আফসোস হয়?'

রমলা বললেন, 'আমার আফসোস হবে কিনা তা তুমি জানো না?'

মা বললেন, 'মন না মতি। কেউ কি কখনো তার গতি বুঝতে পারে?'

'পারে। অন্তত তুমি পারো। মা, আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

মা ভোরের আকাশের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু আমি যদি তোকে বিয়ে করতে বলি?'

'মা!' এবার চমকে উঠলেন রমলা।

'কাউকে জীবন দেওয়ার মত বড় কাজ আর কি আছে। কেউ যদি হিমালয়ে পঞ্চাশ বছর সাধনা করে তার থেকে যে প্রতিদিন অসুস্থ মানুষের মুখে ওষুধ তুলে দিয়ে বাঁচায় সে বেশি পুণ্যবান। তুই না হয় সেই ওষুধটাই দিলি।' ততক্ষণে রমলা বুঝতে পেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে

ঝরঝর করে জল নামল গালে। মা হাসলেন, 'বোকা মেয়ে কাঁদছিস কেন? কাউকে জীবন দিতে পারলে তুই খুশী হবি না?'

রমলা বললেন, 'কিন্তু আমার কি হবে?'

'কিছুই হবে না! যেমন আছিস আমার কাছে তেমনি থাকবি। ধর্মের অনুষ্ঠানটা হয়ে গেলেই সে চলে যাবে। তুই ভাববি একটা উপোস করলি মাত্র। সারাজীবন সিঁদুর পরতে হবে, শাঁখা থাকবে হাতে। এটুকুই যা ভার। তাছাড়া তুই যেমন আছিস তেমন থাকবি।'

সন্ধ্যেবেলায় বিয়েটা হয়ে গেল। বাইরের কেউ ছিল না। আশ্রমের সবাই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করলেন। ওরা এসেছিল সকালে। আত্মীয়ের মুখে গতরাত্রেই খবর পেয়ে এখন উন্মাদের মত অবস্থা। মেয়েটি এসে পাগলের মত স্বামীর জীবন ভিক্ষে চাইছিল। ছেলেটি থম ধরে বসে। কোন কথা বলছে না অথচ বোঝা যাচ্ছে ওর ভেতরে ঝড় চলছে। মা যখন বললেন, 'যদি একজনের বৈধব্যযোগ আর একজনের অভিশাপ হয় তাহলে আর একজনের দীর্ঘ সধবা জীবন তার কাছে বর হয়ে দাঁড়াবে! তোমাকে পুনর্বিবাহ করতে হবে। সেই মেয়ের ভাগ্যে এই দুর্ভাগ্য কাটবে। তবে শর্ত হল একটাই। তোমাব দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে তুমি আজীবন কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না, কোন যোগাযোগ যেন না থাকে। কারণ একটি সংসারী নয় এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তাকে জড়িও না। আর মা, তুমি দুঃখ পেয়ো না। সতীন নিয়ে তোমাকে কোনদিন ঘর করতে হবে না।'

ওরা রাজী হয়ে গেল। এসব কথা পরে শুনেছেন রমলা। সে সময় তিনি অন্যঘরে বসে কাজকর্ম করছিলেন। এমন সময় সেই বউটি এসে দাঁড়াল সামনে। তারপর হঠাৎ তার পায়ের কাছে মাথা রেখে ডুকরে উঠল, 'আপনি আমার স্বামীর জীবন দিলেন, আমি, আমি—।' বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না মেয়েটি। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন রমলা, কেন তা তিনি জানেন না।

বিয়ের সময় বা পরে একটিও কথা হয়নি। সব কাজ চুকিয়ে সন্ধে নাগাদ ওরা চলে গেলে মা রমলাকে কাছে ডাকলেন, 'তুই আজ থেকে এয়োতি। ওই সিঁদুর আর শাঁখার অমর্যাদা করিস না কখনো। আর যদি পারিস আজকের কথা ভুলে যা।'

এখন মনে হয়, সত্যি কি ভুলতে পেরেছিলেন তিনি? প্রথম দিকে কি বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করত না? এমন কি, আজ মনে পড়ে, মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে মায়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ হতো। একজনের জীবন বাঁচাতে আর একজনের জীবন কেন উৎসর্গ করতে বললেন? কিন্তু পরদিন সকালে মায়ের দিকে তাকালেই লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যেত। জীবন তো একবারই উৎসর্গ করেছেন মায়ের কাছে। সেদিন যে ঘটনা ঘটল তাতে তাঁর কি! মা যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। তাঁর তো অন্য কোন কামনা ছিল না যে তা হচ্ছে না বলে আফসোস করতে হবে। তিনি যেমন আছেন তেমনি আছেন। হয়তো মা তাঁকে একসময় ভুলিয়ে দিলেন সব। ধীরে ধীরে বয়স বাড়ল। এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া জীবনে আব কোন কামনা নেই। মায়ের কাছে গেলে অথবা পুজোয় বসলে রমলা সেই স্বাদ পান।এখন একটাই বোধ, এই রক্তমাংসের শরীরটাকে বয়ে বেড়াতে হয় বলেই বহন করতে হচ্ছে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় তাঁর পায়ে। প্রতিদিন।একটু একটু করে মা তাঁকে এই শান্তি দিয়েছেন। এই আনন্দ!

তাহলে আজ এই অস্থিরতা কেন? এতবছর ধরে ওঁদের কাউকে তিনি চোখে দ্যাখেননি। চিঠি আসতো, ওঁরা ভালো আছে—জেনে কোন প্রতিক্রিয়া হতো না। মায়ের আদেশ পালন করেছেন ভদ্রলোক। একবারের জন্যও এখানে আসেননি, কোন চিঠিতে বিবাহ সম্পর্কিত কোন ইঙ্গিতও থাকতো না। অথচ প্রথম ক'দিন কি তাঁর এই আশংকা হয়নি যে যদি লোকটি এসে দাবির হাত বাড়ায় তাহলে কোন্ আইনে তিনি তা ঠেকাবেন। এখন লজ্জা হয়। ভদ্রলোক প্রায়

পঁচিশ বছর নীরব থেকে গেলেন। এইসব ভাবনা আজ হচ্ছে কেন? এখন তো তাঁর শরীরে যৌবন নেই, চুলের রঙ সাদাটে, মুখে হাঁসের পায়ের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের প্রৌঢ়ত্বের কাল শেষ হতে চলেছে। এখন কোন রকম আশংকাব কাল নেই। তবে? একসন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকা ছাড়া তো সত্যিকারের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে?

রমলা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। অথচ জিভ যেন ঘুরেফিরে সেই ক্ষতেই ফিরে আসে। সেই ঘটনার পর অনেক কথাই কানে আসতো। আড়ালে আবডালে মেয়েরা কম বলেনি। মা এটা কি করলেন! একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করা হল! ইত্যাদি। তখন হাসি পেত এসব শুনলে। মায়ের ইচ্ছায় ওই একটি সন্ধ্যা যে তাঁর জীবনে কোন ঢেউ তোলেনি এটা সূর্যের মত সত্য ছিল। নাহলে জীবনের বাকী পঁচিশটা বছর এত স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যেত না। কিন্তু এতদিন বাদে ওদের কেন আসবার ইচ্ছে হল আর মা-ই বা কেন অনুমতি দিলেন এটা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না রমলা। রমলার হাসি পেল, আশ্চর্য, এতসব মাথামুণ্ডু তিনি ভাবছেনই বা কেন? ভদ্রলোকের মুখটাও তাঁর স্মরণে নেই। শুভদৃষ্টির সময় যে এক পলক দেখা তা হাজার মুখের ছাপে কখন চাপা পড়ে গেছে।

সেদিনের চিঠি পড়ে এবং মাযেব জবান জেনে নিয়ে যখন উঠতে যাচ্ছেন তখন মা বললেন, 'আমার শরীর ভাল লাগছে না!'

রমলা চিন্তিত হয়ে পড়লেন, 'কি হয়েছে?'

'এমনি, এমন কিছু নয়!'

মা বললেন বটে, কিন্তু রমলার বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। সচবাচর মা এমন কথা বলেন না। খুব কঠিন অসুখও মা একবার চেপে ছিলেন অনেকদিন। মা অসুস্থ হয়ে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়েন বমলা।

ভারতবর্ষের এত জায়গায় ছড়িযে থাকা আশ্রমগুলো চলছে মাযেব মুখ চেয়ে। যতই মায়ের বাণী এবং নির্দেশ তাঁদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করুক না কেন মায়ের অনুপস্থিতিতে সব এলোমেলো হয়ে যেতে পারেই। রমলা জানেন মা চলে গেলে তাঁব দাঁড়াবার জায়গাও চলে যাবে। তিনি নীচু গলায় বললেন, 'ডাক্তারকে খবর দেব?'

'না, না।'

'শোন, তুমি আজ বিশ্রাম নাও, কারো সঙ্গে দেখা কবো না।'

'পাগল! কি বাড়াবাড়ি করছিস!'

কিন্তু মায়ের কাছ থেকে উঠে এসেও মনেব ভার নামল না। ঠাকুরের সামনে গিয়ে চোখ বুজে বসলেন। বারংবার প্রার্থনা করতে লাগলেন, মা যেন অসুস্থ না হন। জবা কিংবা রোগ যেন মাকে দখল না করতে পারে। মায়ের বেঁচে থাকা দরকার, আমাদেব সবার প্রয়োজনে। আর এইসব ভাবতে ভাবতে অন্য চিন্তা-ভাবনা কখন মাথা থেকে সরে গেল রমলা জানেন না। মা বলেন, মনটাকে স্থির কর, মনটাকে শূন্য কর, দেখবি তার চেয়ে শান্তি আর কিছুই নেই। পঁচিশ বছরে একটু একটু করে রমলা ওই চেষ্টাটাকে ফলবতী করেছেন, এখন প্রার্থনায় বসলে চিত্ত শূন্য হয়ে যায়।

আজও সারাদিন মানুষের অবিরাম আনাগোনা। একবার সবাই মায়ের দর্শন চায়। মাকে মাঝে মাঝেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। খুব প্রয়োজন এবং মায়ের অনুমতি ছাড়া কাউকে ওপরে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। রমলা লক্ষ্য রাখছিলেন মায়ের কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না! কিন্তু নিজেই যিনি অনন্ত রহস্য তাঁর কিনারা করতে পারবেন রমলা এমন সাধ্য কি! এইসময় সিঁড়িতে সামান্য গোলমাল হল। একজন কর্মী উঠে এসে বললেন, 'দিদি, এক ভদ্রলোক ওপরে আসতে চাইছেন, মাকে জিজ্ঞাসা করুন।'

রমলা বললেন, 'অন্যদিন আসতে বলো ভাই।'
'বলেছি, কিন্তু শুনছেন না।'
'কি দরকার?'
'বলছেন না। শুধু বললেন, মা জানেন।'
এবং এতক্ষণে রমলার মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলেন. 'উনি কি একা এসেছেন?'
'না। পুরো ফ্যামিলি।'
'ও। হ্যাঁ, মা ওঁদের আসতে বলেছেন। নিয়ে এসো।'

নিজের অজান্তেই পা দুটো ভারী হয়ে গেল রমলার। তিনি কি সরে যাবেন, অন্যঘরে, অন্য কোথাও? কিন্তু তাঁর যে এখন মায়ের কাছে থাকার কথা। হঠাৎ ওঁর খেয়াল হল কেন উনি খামোকা লজ্জা পাচ্ছেন। কারণ লজ্জা তাঁর একার পাওয়ার কথা নয়। দ্রুত পা চালিয়ে মায়ের ঘরে এসে বসলেন। সেখানে মায়ের সামনে বেশ কয়েকজন বসে। মা খোঁজ-খবব নিচ্ছেন, দু একটা কথা শুনছেন। ওঁকে দেখে বললেন, 'কোথায় ছিলি?'

উত্তর না দিয়ে ওপাশে গিয়ে বসলেন রমলা। মায়ের চোখ ঘুরে ফিরে তাঁর ওপর পড়ছে। একটু আড়ালে রাখবেন নিজেকে এমন ভেবেছিলেন, হল না।

একটু বাদেই ওঁরা এলেন। দরজার কাছে এসেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন যে ভদ্রলোক তিনি বেশ স্থূলকায়, মাথায় বিশাল টাক কিন্তু মুখে একটা শ্রী আছে। ওঁর পাশে যিনি হাঁটু গেড়ে প্রণাম করছেন তাঁর শরীর খুবই ক্ষীণা, কিন্তু মুখচোখে সুখের মোহর বসানো। কিছুটা অবাক হয়ে রমলা এঁদের দেখছিলেন। সেই অল্পবয়সী দম্পতিটিকে সময় আজ কি করে দিয়েছে। ওঁদের পেছনে যাঁরা দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। মেয়েটি হুবহু মায়েব অল্প-বয়সটার প্রতিচ্ছবি আর ছেলেটি বোধহয় বাবার। ওরা বেশ অবাক দৃষ্টিতে ঘরের মাঝখানে বসা মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের মা নীচু গলায় কিছু বলতে ওরা এবার দূর থেকে প্রণাম করল।

রমলা দেখলেন মা ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোক নীচু গলায় বললেন, 'আমি সুবোধ।'

'বুঝেছি। কেমন আছ তোমরা?'

'আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। এই আমার মেয়ে, কমলা। ও বিদেশ যেতে চাইছে পড়াশুনার জন্যে। আপনি যদি—।' রমলা দেখলেন কথা শেষ না করে ভদ্রলোকের চোখ চকিতে চারপাশে ঘুরে গেল। একটু শক্ত হলেন রমলা; না, চোখ স্থির হল না। পঁচিশ বছরে তিনি নিজে কতটা পাল্টেছেন? প্রতিদিন আয়নায় মুখ দেখলে কি তা বোঝা যায়; কিন্তু চুলগুলো তো রঙ পাল্টে ফেলছে, শাড়ি পরার ধরনও তো বদলে গেছে। দ্রুত ওঠানামা করলে বুকে হাঁপ ধরে।

মা বললেন, 'বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো। তুমি এসো আমার কাছে।' মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এল, এসে সোজাসুজি তাকাল। মা হাসলেন, 'বেশ মেয়ে। খুব ভাল। বড় ডাক্তার হয়ো। মানুষের বড় কষ্ট, তুমি তাদের আরাম দিও।'

মেয়েটি ঝুঁকে মাকে প্রণাম কবতে গেলে মা চকিতে সরে বসলেন, 'না, না, পায়ে হাত দিতে হবে না। এমনি করেছ তাই ভাল।'

মেয়েটি ফিরে গেলে ভদ্রলোক বললেন, 'মা, আমার আর একটা প্রার্থনা আছে!'
'প্রার্থনা করবে তাঁর কাছে। কি বলতে চাইছ বল!'
'আমরা দীক্ষা নিতে চাই।'
'বেশ তো নেবে, ভাল গুরু পেলে নেবে।'

'মা, আপনি ছাড়া আমি কিছু জানি না।'

মা হাসলেন, 'আমার কাছে তোমার দীক্ষা অনেক আগেই তো হয়ে গেছে। নতুন করে আর কি নেবে বাবা!'

'তবু—।'

'রোজ একবার ভগবানকে ডাকো। তাহলেই হবে। তুমি অশেষ ভাগ্যবান। আর ভাগ্যবানের বোঝা তো ভগবানই বয়।'

কিছুক্ষণ মাকে দর্শনের পর ওঁরা প্রণাম করে উঠলেন। রমলার চোখ বারংবার ছেলেটির মুখের উপর আটকে যাচ্ছিল। চুপচাপ ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখলেন। তিনি এঘরে আছেন একথা ওঁরা জানলেন না। মা যে প্রসঙ্গটি তোলেননি এই জন্যে তিনি কৃতজ্ঞ। মা অকারণে কাউকে লজ্জায় ফেলেন না।

একটু বাদে আশ্রমেরই একটি মেয়ে নিঃশব্দে এসে রমলার কানের কাছে কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মেরুদণ্ড সোজা। কি করবেন এখন? মায়ের দিকে তাকালেন। মা নির্বিকার মুখে আর একজনের কথা শুনছেন। এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি। সাক্ষাৎ করতে চাইছেন ওঁরা। কেন? মায়ের অনুমতি ছাড়া তিনি এ কাজ কি করতে পারেন? কেন পারেন না? কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তিনি কি বোঝেন না? এতদিন মায়ের কাছে থেকেও যদি তা না বুঝতে পারেন তাহলে বৃথাই তাঁর শিক্ষা।

রমলা ধীর পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক নেই। ওঁকে দেখা মাত্র মহিলা এগিয়ে এসে নত হতে গেলেন। ঝট করে দু-পা সরে গেলেন রমলা, 'একি করছেন আপনি?'

'আপনি আমার প্রণাম নেবার যোগ্য, তাই—।'

'কেন?'

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, চিনেছি। আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন। এরা বুঝি ছেলেমেয়ে? বাঃ, বেশ ভাল। রমলা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

মহিলা ছেলেমেয়েদের বললেন, 'প্রণাম কর।'

রমলা বাধা দিলেন, 'না, এখানে আমরা একজনকেই প্রণাম করি।'

মহিলা বললেন, 'আমার খুব ইচ্ছে হতো আপনার সঙ্গে দেখা করি, কথা বলি। উনি নিষেধ করতেন। বলতেন, এতে আপনাকে যন্ত্রণা দেওয়া হবে।'

রমলার গলার স্বর কি কেঁপে গেল, 'কেন?'

হঠাৎ মহিলা কেঁদে উঠলেন। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে উঠছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেলেন রমলা। খুব শান্ত গলায় বললেন, 'কাঁদছেন কেন?'

'আমি তো সব পেয়েছি, সব। কিন্তু আপনি না থাকলে তো কিছুই পেতাম না। অথচ আপনি—।' মহিলার গলা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

'আপনি অযথা উতলা হচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, এদের কথা ভাবুন এখন। উনি কোথায়?' রমলা জানেন না কি করে তিনি এত স্বাভাবিক হলেন।

'উনি এলেন না! বললেন আপনার সামনে দাঁড়াবার মুখ নেই।'

'ছিঃ। পঁচিশ বছর ধরে উনি আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা ক'জন দিতে পারে। আচ্ছা, এবার আপনারা আসুন, আমাকে যেতে হবে।'

ওরা নীচে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মাকে কিছু বলে সটান তাঁর কাছে চলে এল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'বলো।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, কারো জন্যে কারো আয়ু ফুরিয়ে যায় এবং সেই আয়ু আর একজন ফিরিয়ে দিতে পারে?'

রমলা হাসলেন, 'তুমি বিশ্বাস শব্দটা উচ্চারণ করলে। বিশ্বাসের কাছে সমস্ত যুক্তি হার মানে। তাই না?'

'কিন্তু আমি মানি না। বিজ্ঞান মানবে না।'

'হয়তো। তাতে কি এসে যায়!'

'কিন্তু ওদের এই অন্ধবিশ্বাসের কাছে নিজেকে বলি দিলেন কেন আপনি?'

খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন রমলা। তারপর কঠিন গলায় বললেন, 'তুমি তো ডাক্তারী পড়েছ। মৃতদেহ কাটাছেঁড়া কর। মৃত মানুষের বুকে ছুরি বসাও যখন, তখন কি সেটাকে খুন করা বলে? সেই কাটাছেঁড়া কি জীবিত মানুষের কাজে লাগে না? আমি মায়ের কাছে উৎসর্গিত, তাই ওসবে আমার কিছু এসে যায় না। তোমার মা দাঁড়িয়ে আছেন যাও।'

রমলা বিস্মিত মেয়েটির চোখের সামনে থেকে নিজেই সরে এলেন। হ্যাঁ. ঠিক বলেছেন তিনি। মৃতদেহ। এই শরীর মন যদি তাঁর পায়ে সমর্পিত হয় তাহলে স্থূল ভাবনা আর শরীরটা তো মৃতই হয়ে যায়।

নিজের অজান্তেই যে তিনি বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল ছিল না। রমলা দেখলেন ওরা চারজন হেঁটে যাচ্ছে। একটি সুখী পরিবার। কর্তা আগে আগে, ছেলেমেয়েরা মাঝখানে, গিন্নী পেছনে।

হঠাৎ রমলার মনে হল ওদের এই হেঁটে যাওয়া, ওই গাড়িতে ওঠা, পৃথিবীতে বেঁচে বর্তে সুখ ভোগ করা এসবই তাঁর জন্যে। ওই মহিলা শুধু শরীর দিয়েছেন ভদ্রলোককে, শরীর তো সবাই দিতে পারে। কিন্তু সেইসঙ্গে পঁচিশটা বছর আতঙ্কের সূচের ডগায় থাকতে হয়েছে তাকে। যদি ভাগীদার হাত বাড়ায়। তাই আজ কেঁদে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন। ওই পুরুষ বিবেকে জ্বলছেন নিয়ত, তাই আজ মুখোমুখী হতে ভয় পান।

আর তিনি, শরীরের স্থূলতায় নয়, ওদের হাঁটতে চলতে ফিরতে দিচ্ছেন নিজের জীবনের শক্তিতে। ওই পুরুষটির প্রতিটি মুহূর্ত তাই তাঁর কাছে ঋণগ্রস্ত, ওই সংসারের প্রতিটি সুখ তাঁর হাত থেকে পাওয়া। যা কোনদিন ওই ভদ্রমহিলা দিতে পারবেন না। বিজ্ঞানের যুক্তি তুলে ওই অল্পবয়সী মেয়েটি তা গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে, আহাম্মক! দ্রুত মায়ের কাছে চললেন রমলা। অন্যমনস্ক পা চৌকাঠে আঘাত করতেই মুখ থেকে বেদনার স্বর বের হল। সবাই চকিত এদিকে তাকিয়ে। রমলা দেখলেন বুড়ো আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে টনটন করে। একজন ছুটে যাচ্ছিল ব্যান্ডেজ ওষুধ আনতে। মা বাধা দিলেন। বললেন, 'থাক, আনতে হবে না। রক্তটা বেরিয়ে যাক। বদরক্ত।'

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সেই যে, কে যেন বলেছিলেন, 'অনেক হল, এবার মরণের পাশে শুতে চাই নিশ্চিন্তে।'

কেউ জবাব দিয়েছিল, 'এখনই। তাহলে যে মরণও গর্ভবতী হবে।'

চমকে উঠেছিলেন তিনি। ভো কাটা ঘুড়ির সুতোটাকে গুটিয়ে নেবার মত মুখ করে নিজের মনেই বলেছিলেন, 'হায়, তাহলে যে আর একটি সন্তান জন্ম নেবে। এবং নিঃসন্দেহে জানি তার নাম শয়তান।'

তিনি ঠিক জানতেন না, মরণের কাছেই তো সবাই জীবনকে গচ্ছিত রেখে যায় এবং সেই অর্থে তো মরণের বিরাট বন্ধকী কারবার। যে জানে সে জানে মরণই পারে জীবনকে ফিরিয়ে দিতে। শুধু তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাটা জানতে হয়। যেমন, এই শহর যে কিনা সেই অর্থে মৃত (যদি পাশাপাশি কোন ঝকমকে নগরকে রাখা যায়), তার কাছে আসুন। দেখবেন ফিরে যাওয়ার সময় একটা জীবনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন যদি ঠিক চাবি ঠিকঠাক ঠিক তালায় পড়ে।'

সব দেশ ঘুরে যখন পকেট আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না তখন এইরকম আহ্বান এল। পড়েই মনে হল, বাহ চমৎকার। এরকম ডাক তো অন্যদেশের ট্যুরিস্ট ব্যুরো দেয়নি কখনো। কাজের তাগিদে আমাকে পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে হয়। পাঁচ বছরে একবার। অথচ এই বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়েনি কখনও যদিও কতবার ওই শহরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছি। পকেটে যা আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তা দিয়ে দুটো রাত কোন হোটেলে থাকা যায়। তার মানে একটা বিরাট দিন হাতে থাকবে দেখবার এবং ওই যে বলেছে ঠিকঠাক তালাটা যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তাকে নিয়ে ফিরে যাওয়া হলেও হতে পারে।

কাল রাতে এই শহরে পা দিয়েছি। রাতের বেলায় সব আকাশের মোটামুটি দুই চেহারা, মেঘ থাকলে এবং না থাকলে। ঘুমুলে যেমন বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়া সমান সমান। কথাটা কথায় জড়িয়ে হোঁচট খেলো বোধহয়, সমান সমান হয়েও সমান নয়। ঘুম তো স্বপ্ন দেখায়, এইটুকুও ওর বাড়তি অহঙ্কার।

হিসেবে দেখা গেল দুরাতের হোটেল খরচ চালিয়ে সামান্যই থাকবে আমার। কি আছে এই শহরে যা আমি কোথাও দেখিনি তাই দেখে নিতে পারি। হোটেলের রিসেপশনে নামলাম ব্রেকফাস্ট খেয়ে। ঝকঝকে তকতকে আয়নায় মোড়া চারধার। যে দিকেই তাকাই নিজের পঁয়ত্রিশ বছরের মুখটাকে দেখি। মানুষের শুনেছি অনেক মুখ থাকে, আমার ক'টা?

এখানে শীত নেই এবং গরম পড়ে না বলেই নেই। এতদিন বাদে একটু হালকা হয়েছি পোশাকে। চোস্ত পাজামা আর চাপা পাঞ্জাবিতে বোধহয় এখানে আমি একক। কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না, নজর কেড়েছি এর মধ্যেই অনেকের। হোটেলের অভ্যর্থনাকারীরা এত হাসি কোত্থেকে সংগ্রহ করে কে জানে। কাল রাতেও দেখেছি, এখনও, এদের বোধহয় হাসির পুঁজি ফুরোয় না।

বললাম, 'আপনাদের ট্যুরিস্ট ব্যুরোর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ায় এই শহরে এসেছি।'

কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে ছেলেটি জবাব দিল, 'আমাদের সৌভাগ্য।'

বললাম, 'বলুন তো কি কি আছে এখানে দেখবার। আজ সারাদিনে সে-সব ঘুরে দেখে নিতে হবে।'

ছেলেটি হাসল, 'একদিনে দেখতে চান! তাহলে বেশ পরিশ্রম হবে।'

বললাম, 'তা হোক। দেখবার জন্যেই তো এসেছি।'

ছেলেটি জানাল, 'এত ছোট বড় জিনিস চারধারে ছড়িয়ে আছে যে একদিনে একা একা সব দেখে উঠতে পারবেন না। তা ছাড়া কোন জিনিসকে এমনি দেখলে একরকম, আবার তার গোপনকথা জানলে আব এক রকম হয়ে যায়। তার জন্যে আপনার একজন গাইড নেওয়া দরকার।'

গাইড! চমৎকার। জীবনের প্রতি পায়েই কেউ না কেউ আমায় গাইড করেছে। যখন করেনি তখনই হোঁচট খেয়েছি। বললাম, 'গাইড কোথায় পাব?'

'আপনি নেবেন?'

'হ্যাঁ।'

ছেলেটি টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজে তুলে এনে আমায় দিল। পনেরটা নাম পরপর, তাদের বয়স এবং দৈনিক দক্ষিণা। দক্ষিণার চেহারা দেখে আমার চোখ কপালে। এযে আমার দু-রাতের হোটেল ভাড়ার সমান। পকেটে যা আছে তা দিয়ে এদের দু'ঘণ্টার বেশী পাওয়া যাবে না, দিন তো দূরের কথা। তারপরেই মনে হল, হয়তো এখানে লিখতে হয় বলে বেশী লেখা আছে, দর করলে হয়তো আমার সাধ্যের মধ্যেই পেয়ে যাব।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদের যে কোন একজনকে পাওযা যাবে?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'কত দিতে হবে?'

'মানে?'

'নিশ্চয়ই কম হবে!'

ছেলেটি আমাকে বড বড় চোখে দেখল। যেন এ-রকম প্রস্তাব সে জীবনে শোনেনি। কথা বলছে না দেখে আমি বললাম, 'দক্ষিণাটা আমার পক্ষে বেশ বেশী।'

'দুঃখিত, এটাই ন্যায্যমূল্য।'

'বেশ। এরা ছাড়া আর একটু সস্তা দরের গাইড পাওযা যাবে না?'

'সস্তা গাইড। হায়! না, তাদেব সন্ধান আমাব জানা নেই। আপনি নিশ্চযই অন্ধ হযে থাকতে চান না!'

মাথা নেড়ে হোটেল ছেডে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি হোটেল ছেড়ে বেরিযে এলেই একদল দালাল আর ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে ছেঁকে ধরে। কিন্তু এখানে ওরা কেউ নেই। ট্যাক্সিওয়ালারা খুব নির্জীব চোখে আমাকে দেখল। রাস্তা ঝকঝকে নয় আবার নোংরাও বলা যাবে না। বাড়িঘর-দোর দেখলে মনে হচ্ছে আমি যেন হঠাৎ ভুল করে জুলিয়াস সিজারের আমলে চলে এসেছি। এমনকি রাস্তা দিয়ে যে সব মানুষ যাচ্ছে তাদের হাঁটাচলায় ব্যস্ততা নেই এবং পোশাকও মোটেই আধুনিক নয়। কিন্তু হোটেলওয়ালা অথবা ট্যাক্সিড্রাইভার তো আর পাঁচটা দেশের মতনই একই চেহারার।

চোখের সামনে অন্যরকম দৃশ্য তাই কৌতূহল বাড়ল। রাস্তায় নামলাম, ধুলো নেই কিন্তু লালচে ভাব আছে। একটা গাইডম্যাপ রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে চেয়ে আনলে হতো। কোন অলস ছোকরাকে দেখছি না। পেশাদার গাইডের চেয়ে ওরা কম কাজেব হয় না। দোকানপাটগুলো দেখে আরো অবাক হলাম। চেহারায় তো আধুনিক মোটেই নয়, এমন কি, যা সব জিনিস বিক্রী করছে তাদের এখন কোথাও বড একটা দেখা যায় না। প্রাচীন রোম কিংবা মদিনায় এইসব দোকান দেখা যেত। মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা সিনেমার সেটে এসে পড়েছি এবং একটু পরেই এখান দিয়ে ক্লিওপেট্রা চলে যাবেন। তবে একটা কথা ঠিক, লোকেরা আমায়

দেখছে। মুখ নয় পোশাকটাকে। মেয়েরা কি এই সময় খুব কম বের হয়? কারণ খুব সুশ্রী অল্পবয়সী মেয়ে চোখে পড়ছে না।

একটু বাদেই আমি দিশেহারা এবং সেই সময়েই চোখে পড়ল। ওটা কি পানশালা? এই পরিবেশে রেস্তরাঁ শব্দটাকে কেমন বেমানান মনে হচ্ছে। ওপরের সাইনবোর্ডে কিছু একটা লেখা রয়েছে যার ভাষাটা আমার কাছে অবোধ্য। লম্বা কাউন্টার; তার ওপাশে দাঁড়িয়ে পাকা আমের মত এক বৃদ্ধ স্খলিত চোখে আমাকে দেখলেন। তারপর আমার চেনা ভাষাটাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বললেন, 'কফি খাবেন?'

তেমন দরকার ছিল না কিন্তু ওই যে লম্বা টুলটায় বসতে পারার লোভে মাথা নাড়লাম। ঘর নয়, কারণ তার তিনদিক খোলা। থামের ওপরে মাথার ছাদটা আটকানো। মাঝে মাঝেই লম্বা লম্বা টুল রাখা আছে। এটা তাহলে কফির দোকান। মদের হলেই বরং বেশী মানাতো।

হুকুমটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ এবার আমার পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়েছিলেন। অনেক যত্ন করে আমার চেনা দর্জি সেখানে কাজ করেছে আকাশী সুতো দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'নতুন এসেছেন এই শহরে?'

বললাম, 'হ্যাঁ। আজ একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

হাতটা ঈষৎ নেড়ে তিনি বললেন, 'দেখুন।'

কফি এল। বড় ভাল স্বাদ। চুমুক দিয়ে বললাম 'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?'

'বলুন।'

বয়স হলে কি মানুষ এমন নিরাসক্ত হয়ে যায়?

'আমার একজন ভাল গাইড চাই। কিন্তু বেশী টাকা দিতে পারব না।'

'তা কি হয়? যে আপনাকে পথ চেনাবে তাকে আপনি উপযুক্ত সম্মান দেবেন না? তাহলে সে ভুল পথ চেনাবে, ক্ষতি তো আপনারই।'

'তা ঠিক। তবে কিনা আমার পকেটে বেশী পয়সা নেই কিন্তু ইচ্ছে আছে শহরটা দেখবার। বলছিলাম কি, আপনার জানা কোন বেকার ছেলে আছে যে এই শহরটাকে চেনে?'

'থাকবে না কেন? কিন্তু তারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা তো আপনি বুঝবেন না। ওকে ভাড়া করে কোন লাভ হবে না।'

ব্যাপারটা বুঝলাম। এখানকার খুব কম মানুষই অন্যভাষা শিখেছে। তাই যারা শিখেছে তারা তো মূল্যবান হবেই। এই সময় একটু খসখসে অথচ সুরেলা গলা কানে এল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন!'

আমি ঘাড় ঘুরিয়েই মুগ্ধ হলাম। এত সুন্দরী মেয়ে এই শহরে আছে? আহা, শহরটাই যেন সুন্দরতর হল। মেয়েটি আমার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে। বিনীত গলায় বললাম, 'ভারতবর্ষ।'

মেয়েটি এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল, তারপর খুব নিরাসক্ত গলায় বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনার সমস্যাটা জানতে পারি?'

দেখলাম, মেয়েটির কথাবলার ভঙ্গীতে বেশ শিষ্ট ভঙ্গী আছে। আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'উনি একজন গাইড চাইছেন আমাদের শহরটাকে দেখবেন বলে। কিন্তু ওর পকেটে যা আছে তাতে—!' যেন এক টুকরো ভাঙ্গা হাসি আমার সুতোটাকে কেটে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

'গাইড আপনার পক্ষে খুব দামী হয়ে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে। আমি অনেক জায়গা ঘুরে দেশে ফিরতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে এসে পড়েছি। আমাকে আবার পাঁচ বছর পরে এখানে আসতে হবে। তখন শুরু করব এই শহর

দিয়েই, যাতে টাকা পয়সা কোন সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায়।' আমি ঘোষণা করলাম।

মেয়েটি এবার চুপচাপ কফি শেষ করল। মাথায় এক রাশ সোনালী চুল, চোখদুটো আশ্চর্যভাবে গভীর। মুখের আদলে একটা নরম আনন্দ। কিন্তু তার সঙ্গে কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়া চিবুকে এবং চোখে জড়ানো। পায়ের পাতা ঢাকা এক কাপড়ের ঢিলে পোশাক মেয়েটির শরীরকে আড়াল করেছে। কোমরের কাছে একটা ফিতে সরু হয়ে এঁটে আছে, দুই কাঁধে পোশাক দুই বাঁধনে আটকানো। মেয়েটির বয়স বোঝা গেল না কিন্তু ও যে ভরা যুবতী তা বুঝতে অসুবিধে নেই।

কফি খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি রুমালে ঠোঁট মুছলো। সঙ্গের ঝুলি থেকে একটা আয়না বের করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের মুখ দেখে নিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এই শহরে আমি পঁয়ত্রিশ বছর আছি। শেষবার শহরটাকে দেখেছিলাম কুড়ি বছর বয়সে। অনেকদিন এই শহরটাকে আমার দেখা হয়নি।'

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। সেটা লক্ষ্য করেই সে বলল, 'পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে আমি জন্মেছিলাম।'

'ও।' মেয়েটি আমার সমবয়সী। অথচ কত ছোট দেখাচ্ছে ওকে।

'দেখুন, আজ আমার সারাদিনে তেমন কোন কাজ নেই। আমি যদি গাইড করি তাহলে কেমন হয়?' মেয়েটি মিটিমিটি হাসছিল।

'আপনি?'

'না না ভয় পাবেন না। আমি যখন পেশাদার গাইড নই তখন আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনার কথা শুনে মনে পড়ে গেল অনেকদিন এই শহরটাকে দেখা হয় নি, পনের বছর কম সময় নয়। আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আপনাকে সময় দেব। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?' মেয়েটি এবার কফির দাম দিচ্ছিল।

আমি বাধা দিলাম, 'দয়া করে ওটা আমাকে দিতে দিন।' তাড়াতাড়ি দুটো কফির দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। লক্ষ্য করলাম, আমার হোটেলের কফির দাম আর এই সাধারণ দোকানের কফিব একই দাম।

দাম দিতে হয়নি বলে মেয়েটি কিন্তু একটুও বিমর্ষ হয়নি। বলল, 'আজ সারাদিন যা খরচ হবে তা তাহলে আপনিই মেটাবেন?'

'সাধ্যমত চেষ্টা কবব।'

'ব্যস। তাহলে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়ে গেল।'

এইরকম সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আজ আমার সারাটা দিন কাটবে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কখন যে কার ভাগ্যে কি ঘটবে তা আগাম জানা যায় না বলেই জীবনটা এত সুন্দর রহস্যময়। ঢিলে আলখাল্লায় শরীর ঢাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারছি ওর সম্পদ সাধারণের ঈর্ষার বস্তু। লক্ষ্য করলাম ওর অনেক কুচি দেওয়া পোশাকের বাঁ দিকটা হাঁটু অবধি কাটা, বোধহয় হাঁটাচলার সুবিধার জন্যেই।

চৌমাথায় এসে মেয়েটি দাঁড়াল। 'প্রথমে আমরা ঠিক করে নিই কোথায় কোথায় যাব! উম্, হ্যাঁ চলুন, শেষ থেকে শুরু করি। তার আগে বলুন তো এই বাবদ আপনি কত ব্যয় করতে পারবেন?'

এই প্রথম আমি একটু সন্দেহের চোখে ওকে দেখলাম। সারা পৃথিবী ঘুরি আমি, ঠক জোচ্চোরদের নানান ফন্দির কথা আমার জানা আছে। যা পারি তা থেকে কমিয়ে ওকে বললাম। শুনে একটু চিন্তা করে ও রাস্তার পাশে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার গাড়িকে কাছে আসতে বলল। গাড়িগুলো অদ্ভুত। ঘোড়া এবং তার সওয়ার আগে, গাড়িটা বেশ পিছনে।

কোচোয়ানের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা শেষ করে মেয়েটি বলল, 'উঠুন।'

খুবই ছোটগাড়ি, টু-সিটার। মুখোমুখি বসতেই হাঁটুতে হাঁটু ঠেকলো। গাড়িগুলো ছোটে বেশ জোরে বোঝা যাচ্ছে। চ্যারিয়ট চ্যারিয়ট মনে হচ্ছে। এবার মেয়েটি বলল, 'আমি এই প্রথম ভারতবর্ষের মানুষকে দেখলাম।'

বললাম, 'আপনি কিন্তু চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন।'

মেয়েটি বড় চোখে তাকাল। তার ঠোঁটে টান টান হাসি, 'নইলে আপনার কথা বুঝতেই পারতাম না।'

এ চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকানো যায় না। বুকের ভেতর কখন যে টলানি শুরু হয়েছে বুঝিনি, এই মুহূর্তে ধরা পড়ল। মুখ নামিয়ে বললাম, 'আমরা কিন্তু এখনও আমাদের নাম জানি না।'

সে বলল, 'নাম? একদিনের জন্যেই তো আলাপ, বিকেল পাঁচটা অবধি। তারপর তো নাম স্মৃতি হয়ে যাবে। না মশাই, আমি আর স্মৃতির বোঝা ভারী করতে একটুও রাজী নই।'

গাড়িটা থামল একটা ছোট্ট পাহাড়ের তলায়। এদিকের পাহাড় যেমন হয়, একটাও গাছ নেই। এত নেড়া যে চোখের আরাম হয় না। দুজনে সেই পাহাড় ভেঙ্গে ওপরে উঠতে লাগলাম। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'এখানে কি দেখার আছে?'

'দেখার কি কিছু থাকে, দেখে নিতে হয়।' ও হাসল।

পাহাড়ী পথটায় মানুষের হাঁটার সুবিধে আছে কিন্তু কোন মানুষ চোখে পড়ছে না। বেশ কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে ওপরে উঠতেই গর্জন কানে এল। যত এগোচ্ছি তত সেটা বাড়ছে। এবার আর রাস্তা নেই। এ পাথর ডিঙ্গিয়ে ওই পাথরের খাঁজ ধরে এগোতে হয়। কেউ পথ না দেখালে আমি কোনকালেই এখানে আসতে পারতাম না। শেষ পাথরটার আড়াল সরতেই দৃশ্যটাকে দেখতে পেলাম। পাহাড়ের একটা গহ্বর থেকে বিশাল জলরাশি রামধনুর মত ছিটকে উঠে এসে আবার বেঁকে নীচের গহ্বরে ঢুকে গেছে। অর্ধবৃত্ত এই জলের ধারার তলায় স্বচ্ছন্দে দাঁড়ানো যায়। শব্দটি জলের ওঠা পড়ার জন্যেই হচ্ছে। এই বিশাল ধারার রঙ নীল।

আমি মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটি দেখছিলাম। পৃথিবীর কোথাও এমন সাজানো ছবি আমি দেখিনি। সাজানো কারণ, গহ্বর থেকে বেরিয়ে আর একটা গহ্বরে প্রবেশের সময় এই বিশাল ধারাটির ক্ষুদ্র অংশও বাইরে পড়ছে না। আবিষ্কার করলাম আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

মেয়েটি বলল, 'একজন মানুষ প্রতিজ্ঞা করেছিল সে মরবে না, দেবতারা যেমন মরেন না। অনেক সাধনার পর দেবতারা রাজী হলেন। তবে তাঁরা একটা শর্ত দিলেন, সুখ পেতে গেলে দুঃখকে আগে জানতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ যদি মানুষটির জানা হয়ে যায় তাহলে সে অমরত্ব পাবে। মানুষটি বলল, এ তো সোজা কথা। দুঃখ জানতে আর কষ্ট কিসের। সেদিন থেকেই সে দুঃখ জানতে লেগে গেল। পৃথিবীর সব দুঃখ জানতে জানতে লোকটির শরীর নীল হয়ে গেল। এত বিষ ধারণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। নিজের শরীরের জ্বালা নিবৃত্ত করতে সে এই পাহাড়ের গহ্বরে আশ্রয় নিল। কিন্তু পাতালও তো পৃথিবীর দুঃখ সইতে পারে না। সে মানুষটিকে ঠেলে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। স্বর্গর দিকে চলে যাচ্ছে দেখে দেবতারা বিপদে পড়লেন। স্বর্গে দুঃখ যদি একবার প্রবেশ করে—! তাঁরা তাড়াতাড়ি মানুষটাকে আবার পৃথিবীর তলায় ঢুকিয়ে দিলেন। সেই থেকে মানুষটি ওই জলের আকার নিয়ে পাতাল থেকে উঠে আসছে আবার ডুবে যাচ্ছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'সব দুঃখ জেনেও মানুষটি অমর হল না কেন?'

মেয়েটি হাসল, 'একটা দুঃখ তার জানতে বাকী ছিল। লক্ষ্য করে দেখুন একদম ওপরে অত নীলের মধ্যে একটা সাদা জলের রেখা বইছে। ওইটুকুই ওর অজানা। কিন্তু দেবতারা বললেন

তবু সে অমরত্ব পাবে। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন এই জলের ধারা বেঁচে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'না জানতে পারা দুঃখটি কি?'

মেয়েটি বলল, 'দুটো মানুষের মন অবিকল হয়েও মেলে না কেন?'

'কেন?'

মেয়েটি হাসল, 'ওটা তো আমিও জানি না। ভালবাসা মানে যদি সুখ তবে তা থেকে এত দুঃখ পায় কেন মানুষ?'

আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম নীল-জল স্পর্শ করতে কিন্তু মেয়েটি পেছন থেকে আমার হাত টেনে ধরল, 'কি করছেন?'

'ওই জলে হাত দেব।'

'পাগল! সাধ করে কি কেউ দুঃখকে ছোঁয়?'

নীচে নেমে এলাম। কেন যে এমন ভারী হয়ে গেছে মন, কিছুই ভাল লাগছে না।

মেয়েটির হাঁটুতে আমার হাঁটু, চ্যারিয়ট ছুটছে। সে এখন শূন্য চোখে বাইরে তাকিয়ে। খুব নরম এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। ইচ্ছে করছিল ওর একটা হাত দু'হাতে নিই। কিন্তু মেয়েটির শরীরের চারপাশে একটা ব্যক্তিত্বের বর্ম আছে যা ভেদ করে কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়।

রথ যেখানে এসে থামল সেটা একটা উদ্যান। মেয়েটি বলল, 'আসুন, এবার আমরা অনন্ত যৌবন দেখব।'

বিস্মিত এবং আগ্রহী হয়ে মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম। চারধারে অজস্র ফুল। পৃথিবীর সব রঙ উজাড় করে তাদের সাজানো হয়েছে। এদের অনেককেই আমি চিনি না কিন্তু ফুল কি কখনো অনাত্মীয় হয়? মেয়েটি বলল, 'এদের কোন গন্ধ নেই।'

'সেকি! এত সুন্দর তবু গন্ধ নেই?' বলতে বলতে অবিশ্বাসে গোলাপের বুকে নাক রাখলাম। না, মেয়েটি ঠিকই বলেছে।

বললাম, 'একটাও মৌমাছি কিংবা ভ্রমর দেখছি না কেন?'

মেয়েটি জবাব দিল, 'কারণ এই সুন্দর ফুলেদের বুকে মধুও নেই।'

যে ফুলের গন্ধ এবং মধু নেই সে কেমন ফুল? কিছুক্ষণ দেখলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়, চোখ সরাতে হয়। মেয়েটি হাসল, 'এই হল অনন্ত যৌবন।'

'কি রকম?'

'স্বর্গের অপ্সরীরা লুকিয়ে চুরিয়ে আসতো পৃথিবীতে। হয়তো রক্ত মাংসের মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে তাদের ভাল লাগতো। দেবতাদের তো সব আছে শুধু রক্ত মাংস নেই। তাই বোধহয় মুখ বদলাতো অপ্সরীরা। একদিন তারা ধরা পড়ে গেল। দেবতারা বললেন, 'বেশ তাই হোক, তোমরা পৃথিবীতেই থেকে যাবে।'

অপ্সরীরা বলল, 'তাই যদি হয় তাহলে আমাদের যৌবন কেড়ে নিও না।'

দেবতারা বললেন, 'অবশ্যই। তোমরা অনন্ত যৌবন পাবে।'

অপ্সরীরা এখানে এসে দেখল তাদের মানুষ-প্রেমিক প্রকৃতির নিয়মে বুড়ো হচ্ছে, মরে যাচ্ছে কিন্তু তারা একই থেকে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, প্রেমিকের ছেলেরা যুবক হয়ে আবার তাদের সঙ্গে প্রেম করছে। তখন তাদের দেবতারা এখানে এই ফুলের চেহারায় সাজিয়ে দিল। যে যৌবন অনন্ত তাতে কোন রহস্য নেই। অনেক বলেই দেওয়ার ক্ষমতা শূন্য। সে শুধুই শোভা, তাই ভ্রমর আসে না, সুবাস ছড়ায় না। এই যৌবনের অন্য নাম অভিশাপ।'

আমি হাত বাড়িয়ে একটা ফুল তুলতে গেলাম, মেয়েটি বাধা দিল, 'কি করছেন! সাধ করে কি কেউ অভিশাপ নিয়ে যায়?'

সারাদিন ধরে আমরা শহরটাকে দেখলাম। সারাদিন ধরে মনে হচ্ছিল আমি জুলিয়াস

সিজারের রাজত্বে আছি। এত কিছু আমার অজানা ছিল, হায়! দেশলাই কাঠি জ্বলতে জ্বলতে শেষপর্যন্ত আগুনের স্পর্শ লাগল আঙুলে। সময় ফুরিয়ে আসছে। আজ আমি জীবনের অন্য এক আলো দেখতে পেলাম। এখানে না এলে এ দেখা হতো না। এই মৃত শহরে এত জীবন গচ্ছিত ছিল?

মেয়েটিকে যত দেখছি তত মুগ্ধতা বাড়ছে। দুপুরে একসময় সে আলখাল্লা খুলেছিল স্বস্তি পাওয়ার জন্যে। তার তলায় পা ঢাকা ঢিলে সিল্কের জামা। সুন্দর এবং রুচিময়। কিন্তু তার যৌবন যে টলটলে তা বুঝে আমি ক্রমশ উত্তাল হচ্ছিলাম। কি করে মেয়েটিকে বলি আমি তাকে কামনা করছি! কি করে ওর মন পাওয়া যাবে? মন পেলেই শরীর সহজেই আসবে। যেহেতু আমার পকেটে কিছু নেই তাই আগামীকাল ফিরে যেতে হবেই। থাকলে নিশ্চয়ই ওকে পেতে চেষ্টা করতাম। মুখ ঘষছে বুকে। মেয়েটি কি আমার মনের কথা বুঝেছে? না হলে সে অমন করে মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে কেন? ওর বুকের ভাঁজ যে আমাকে দমবন্ধ করে দিচ্ছে। ও কি তা বোঝে না? বোধহয় বোঝে বলেই এমন করে বোঝা চাপায়।

বিকেল নাগাদ আমরা শহরের মাঝখানে ফিরে এলাম। এখন বেশ ব্যস্ততা চারপাশে। কিন্তু আমি ছাড়া আরও বিদেশী দেখতে পাচ্ছি। বিদেশীরা যেমন হয়, দুহাতে পৃথিবীটাকে কিনে নেবার মহড়া দিচ্ছে। একটা ছোট্ট পাঁচিলের আড়ালে ওটা কি কোন মন্দিব! মেয়েটি বলল, 'আর আমার সময় নেই। পাঁচটা বেজে এল। চলুন, এইটে দিয়ে আমাদের দেখা শেষ কবি।' ইচ্ছে করছিল না ওর কথা মানতে কিন্তু বুঝতে পেরেছি সে নির্মম।

চাতালের মধ্যে বিরাট একটা মুখ। এ মুখ মানুষেবও নয় আবার পশুরও নয়। একই সঙ্গে হিংসা, ভয়, আনন্দ এবং কান্না মেশানো রয়েছে অভিব্যক্তিতে। চমকে সরে আসতে হয় আবার সরেও যাওয়া যায় না। তিনমানুষ লম্বা একটা পাথরের চাঁই কেটে যেন মুখটাকে তৈরী করা হয়েছে। তার মুখের গহ্বরে অন্ধকার। মেয়েটি বলল, 'এব নাম মহাকাল।'

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম।

মেয়েটি বলল, 'আমরা বিশ্বাস করি ওর মুখের ভেতব হাত বেখে যদি কোন কিছু প্রার্থনা করা যায় তাহলে অবশ্যই তা পূর্ণ হবে।'

অবিশ্বাসে তাকালাম, 'সত্যি?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, 'বিশ্বাসই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।'

আমি শিহরিত হলাম। বেশ, এবার পরীক্ষা হয়ে যাক। এই মুহূর্তে আমি মেয়েটিকে ছাড়া তো আর কিছুই কামনা করতে পারি না। মেয়েটি বলল, 'অনেকদিন এখানে আসা হয়নি। আপনি কিছু প্রার্থনা করবেন!'

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মহাকালের মুখে হাত রাখলাম। শীতলতম এ কোন স্পর্শ! প্রার্থনা সেরে ফিরে আসতেই মেয়েটি এগিয়ে গেল। তারপর চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে সে তার প্রার্থনা সেরে নিল।

বাইরে বেরিয়ে মেয়েটি বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে। আপনি কি হোটেলে ফিরতে পারবেন?'

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

সে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে জানতে পারি কি আপনি কি প্রার্থনা করলেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'নিশ্চয়ই। আমি পাঁচ বছর পর এই শহরে আসব। প্রার্থনা করলাম, তখন যেন আমি একমাত্র আপনার দেখা পাই। কারণ সেই সময় আমি সচ্ছল থাকব।'

মেয়েটি যেন কেঁপে উঠল। তারপর অদ্ভুত মায়াবী চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামাল। তার ঠোঁট দাঁতের তলায়।

আমি জিজ্ঞাসা কারলাম, 'আপনি কি প্রার্থনা করলেন জানব?'

মেয়েটি মুখ ফেরালো। ওর বুক নড়ে উঠল। তারপর বলল, 'প্রার্থনা করলাম আজ থেকে যেন প্রতি রাত্রে তিনজন খদ্দের পাই।'

চমকে উঠলাম।

মেয়েটি বলছিল, 'পাঁচ বছর পর যখন আপনি আসবেন তখন আপনার বয়স মাত্র পাঁচ বছর বাড়বে। কি আর এমন! কিন্তু আমার যে পনের বছর বেড়ে যাবে। আপনার একটা রাত মানে যে আমার তিনটে রাত।'

মাতৃকা

....

॥ সকালবেলায় ॥

আমার বাবা আজকাল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। তাড়াতাড়ি মানে সাড়ে ছ'টা সাতটা। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কোন জরুরী কাজ ছাড়া বাবাকে কোনদিন সাড়ে ন'টার আগে ফিরতে দেখিনি; অফিস থেকে বেরিয়ে এই সময়টুকু বাবা কি করে স্পষ্ট করে বলতে পারব না তবে কখনও অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেনি। আমরা যে পাড়ায় থাকি সেখানে রাত করে যারা বাড়ি ফেরে তাঁদের অনেকেই টালমাটাল হয়ে হাঁটে। বাবা এইসময় নেশা করে একথা কোন বড় শত্রুও বলতে পারবে না, মাও না।

বাবা যে তাড়াতাড়ি ফিরছে তার কারণ আমার মা খুব অসুস্থ। অসুখটা কাল অবধি এমন ছিল যে দিনরাত তার কাছে বসে থাকতে হবে তা নয়। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে এলে বাবাকে কেমন অসহায় দেখাত। কি করে সময়টা কাটাবে যেন বুঝতে পারত না। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর মায়ের এমন বাড়াবাড়ি হল যে বাবা খুব ছোটাছুটি করে মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আমি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে নিষেধ করা হল। এখন আমার তিন বছরের ভাইটাকে নিয়ে আমি বাড়িতে আছি। স্কুলে তো যাওয়া হল না। আমাকে যে কোলে পিঠে করেছে সেই কমলামাসী ভাইকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

আজ আমার বয়স ষোল হল। ষোল মানে সুইট সিক্সটিন। আচ্ছা, ইংরেজিতে ষোলর আগে সুইট কথাটা বলে কেন? একমাস আগের আমার সঙ্গে এখনকার আমার তো কোন তফাৎ নেই! আমার শরীরের বাড় নাকি খুব বেশী। সবাই বলে আমি নাকি বাবার ধাত পেয়েছি। মা আমার কাঁধের কাছে পড়ে। মারামারি করলে মা নিশ্চয়ই হেরে যাবে কিন্তু পৃথিবীতে আমি মাকেই সব চেয়ে বেশী ভয় পাই। একটু আগে দুপুরের খাওয়ার সময় কমলামাসী আমাকে পায়েস খেতে দিয়েছিল। আজ সকাল থেকে বাড়িতে যেসব ব্যাপার চলছে তাতে আমার জন্মদিনটার কথা কারো খেয়াল থাকতে পারে না। কিন্তু কমলামাসী বলল মা নাকি গতকালই তাকে পায়েস করার কথা বলে দিয়েছিল। অন্যান্যবার এই দিনটা এলে আমার খুব কষ্ট হত। আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ি। আমাদের ক্লাসের মেয়েরা জন্মদিনে পার্টি দেয়। ক্লাসে কেক

গিফট নিয়ে যায়। মা সেটা একদম পছন্দ করে না। শুধু বাড়িতে লাঁচ আর পায়েস খেয়ে জন্মদিন করতে হয়। বিচ্ছিরি! কিন্তু আজ খেতে বসে ওগুলো দেখে আমার খুব কান্না পেয়ে গেল। সকাল থেকে যে কষ্টটা বুকের মধ্যে হচ্ছিল এখন যেন সেটা আরো বেড়ে গেল।

মায়ের জন্য বুকটা কেমন করতে লাগল। আজ বিকেলে আমি বাবার সঙ্গে মাকে দেখতে যাব।

আমার বাবাকে দেখতে বেশ সুন্দর। লম্বা, খুব ফরসা নয় কিন্তু হাসলে চমৎকার দেখায়। মা খুব ফরসা কিন্তু বেঁটে। বাবা রাগ করলে সেটা কয়েক মিনিট থাকে। মা কিন্তু সহজে নরম হয় না। কিন্তু মা খুব ভদ্র, মানে রুচি আভিজাত্য এইসব মায়ের খুব আছে। আজ অবধি কখনো মায়ের আচরণে কোন বেনিয়ম দেখিনি। বেনিয়ম মানে, যেখানকার জিনিস সেখানেই রাখতে হবে, ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করতে হবে,চেঁচিয়ে কথা বলা চলবে না। এইসব নিয়ম কিন্তু শুধু আমার আর মায়েব জন্য। বাবার ওপর এর প্রয়োগ নেই, মা তাকে কিছু বলে না। আমি জিজ্ঞাসা করি না কিছু, কারণ আমি জানি। আমার বাবা ও মায়ের অনেক কথা আমি জানি আর সেটা ওরা জানে না। আমার যে একটা গোপন ব্যাপার আছে তা অবশ্যই বাবা জানে না, মাকে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমার। মাকে ঠিক বুঝতে পারি না।

আমার মা আর বাবার মধ্যে সম্পর্কটা ভাল নয়। দিনের বেলায় এটা ঠিক বোঝা যায় না। বাবা ঘুম থেকে উঠে সোফায় বসে চায়ের কাপ নিয়ে কাগজ পড়ে। সে সময় আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরী হই। এতদিন হয়ে গেল তবু ভোর ভোর কিছুতেই ঘুম ভাঙতে চায় না। আমাদের স্কুল বসে ঠিক আটটায়। শ্যামবাজার থেকে ওয়েলিংটনে সরাসরি ট্রামে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু সেই কবে ক্লাস টু থেকে আমি মিসেস মুখার্জীর গাড়িতে যাওয়া আসা করছি তার আর ব্যতিক্রম নেই। মা মিসেস মুখর্জীকে সত্তর টাকা মাসে দেবে কিন্তু আমাকে বাসে ট্রামে যেতে অ্যালাউ করবে না। এখন আমি কচি খুকী নই যে রাস্তা হারিয়ে ফেলব। বাবা একবার বলেছিল, "এবার মুখার্জীর কোল থেকে ওকে নামিয়ে দাও। নিজে যাওয়া আসা করে পথঘাট চিনুক। নইলে চিরকাল বোকা হয়ে থাকবে।" মা উত্তর দেয়নি কিছু কিন্তু মিসেস মুখার্জীর আসার বন্ধ হয়নি। ঠিক সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই দুবার হর্ন বাজবে। তখনও যদি আমার জুতোর ফিতে বাঁধা না হয় ব্যাগ কাঁধে দৌড়ে নামতে হবে দোতলা থেকে। সাতটা থেকেই মা টিকটিক করে আমার পেছনে। এতক্ষণ বাথরুমে কি করছ, জামা পরতে এত দেরী কেন? কাল রাত্রে বইপত্র গুছিয়ে রাখতে পারোনি? ইস, জুতোটার কি অবস্থা করেছ, ব্রাশ করতে পারনি এত বড় ধেড়ে মেয়ে। সেই সময়টায় হর্ন বেজে উঠতেই আমি ছুটতে থাকি। কয়েক পা নেমেই মনে পড়ে যায়, মায়ের হাতে ব্যাগটা দিয়ে আমি দৌড়ে আবার ঘরে ফিরে যাই। খবরের কাগজের আড়াল থেকে বাবার চোখ তখন দরজার দিকে। আমার পায়ের শব্দ পাওয়ামাত্রই বাবা অন্যমনস্ক হবার ভান করে। আমি এক হাতে কাগজটাকে সরিয়ে দিয়ে চট করে গালে হাম খেয়ে ফের ছুটে যাই। মা তখন নীচে বিরক্তিতে মাথা নাড়ছে। মুখে কিছু না বলে মিসেস মুখার্জীর সঙ্গে দেখনহাসি হেসে দাঁড়িয়ে থাকে গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত।

আজকাল বাবাকে হাম খেতে আমার কেমন যেন লাগে। যেদিন থেকে স্কুলে যাচ্ছি সেদিন থেকে বাবাকে হাম খেয়ে যাওয়া একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছে। ছোট যখন ছিলাম তখন এক রকম ছিল কিন্তু বড় হয়ে গেছি আমি এ কথাটা বাবা একদম খেয়াল করে না। যেদিন একটু সময় থাকে হাতে অথবা বাবার মেজাজ ভাল থাকে সেদিন আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বাবা বলে, "এই যে আমার টিপসি মা, আমাকে আজকাল আদরই করতে চায় না।" আগে বাবা আমার ঠোঁটে হাম খেত। সেটা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার, থুতু লেগে যায়। এখন শুধু গালে ঠোঁট ছোঁয়াই। একদিন আড়াল থেকে মাকে এ ব্যাপারে কথা বলতে শুনেছি। মা বলছিল, "মেয়েটা বড় হচ্ছে

খেয়াল রেখো।" বাবা অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, "সেটা তো তোমার ডিপার্টমেন্ট।" তারপর যেন মনে পড়ে গিয়েছে এমনভাবে বলল, "তুমি কি হাম খাওয়ার কথা বলছ? সেটা ছাড়া আমি থাকতে পারব না। এটা একটা আমার এক্সপেরিমেন্ট। মেয়েরা বড় হলে বাপমায়ের কাছ থেকে তফাতে চলে যায় মানি, কিন্তু আজন্ম যদি তুমি একটা জিনিস প্রতিদিন করে যাও তাহলে তফাতে যাওয়ার সময়টা পাবে কি করে? ও রোজ আমাকে হাম খায় যেমন ভাত খায় টিফিন খায়।" মা কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু বাবা জানে না আমি হাম আর চুমু খাওয়ার তফাৎটা বুঝে গেছি। হাম, হামি, হামু—বাবা যাই বলুক না কেন আসলে সবই চুমু খাওয়া। ভদ্রতা করে লোকে নিজের মত এবং সুবিধে অনুযায়ী একটা নাম দিয়ে নেয়। একটা সিনেমা দেখে ব্যাপারটা আমি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছি। এই সিনেমা দেখা ব্যাপারটা নিয়েও মায়ের নিয়ম-অনিয়ম আছে। সিনেমা দুই প্রকার, বড়দের সিনেমা, ছোটদের সিনেমা। বড়দের সিনেমা আমার দেখা চলবে না। যেসব সিনেমায় নায়ক-নায়িকার ছবি থাকে সেগুলো বড়দের সিনেমা। মায়ের ধারণা ওগুলো দেখলে আমি বুঝতে পারব না। আসলে আমি যদি বকে যাই এই হল ভয়। আমার ক্লাসের মেয়েরা কিন্তু হরদম এসব ছবি দ্যাখে। টারজান, লরেল হার্ডি—এইসব ছবি আর ক'টা হয়। এক বছর আগে মায়ের সঙ্গে একটা মর্নিং শো দেখতে গিয়েছিলাম। লরেল হার্ডির ছবি। সেখানে একটা বাসের মধ্যে একটা লোক তার সঙ্গের মেয়েকে খুব কায়দা করে চুমু খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি অন্ধকারেও মায়ের থমথমে মুখ বুঝতে পারছিলাম। লোকটা এমন করে চুমু খাচ্ছিল যে আমার শরীর কেমন হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যদি ওরকম করে আমায় চুমু খেত! বাবার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। তারপরই তো আমি সমীরদার লভে পড়ে গেলাম।

বাবা মায়ের মধ্যে যে ব্যাপার আছে তা যে দিনের বেলায় বোঝা যায় না, এটা কিন্তু আমার কাছে খুব আশ্চর্যের মনে হয়। আসলে মা অত্যন্ত ভদ্র এবং মার্জিত বলেই এটা সম্ভব। আমার মনে আছে অনেকদিন আগে কমলামাসী একবার দেশে গিয়েছিল। তখন ওর বদলে একটা বাচ্চা মেয়ে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। সে একদিন কথায় কথায় খবরের কাগজ দেয় যে ছেলেটা তাকে খচ্চর বলেছিল। শুনে আমার কি অবস্থা। দৌড়ে মাকে গিয়ে বললাম, 'ওকে এক্ষুনি ছাড়িয়ে দাও।' মা কি হয়েছে জানতে চাইলে আমি কিছুতেই শব্দটা বলতে পারলাম না। তখন বিরক্ত হয়ে মা ধমকাতে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। এখন যে কি হাসি পায় ব্যাপারটা ভাবলে। আসলে মায়ের রুচিতে আমি মানুষ বলে অমনটা হয়েছিল। বাবা একবার নিজের মনে বলেছিল শালা দিন দিন সিগারেটের দাম বাড়ছে। কথাটা শুনে আমার চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি ও কথাটা বললে কেন?' অবাক হয়ে বাবা বলেছিল, 'কোন কথাটা?' আমি উচ্চারণ করতে না পেরে খাতা নিয়ে ইংরেজিতে এস এ এল এ লিখে বাবাকে দেখিয়েছিলাম। তা দেখে বাবার কি হাসি।

দিনের বেলায় তো বাবা মায়ের মধ্যে কথাই হয় না। শনিবার আমার ছুটি থাকে, সেদিন তো সব দেখি। কাগজ পড়ে বাবা বাজারে যায়। সংসারের তিনটি কাজ বাবা করে থাকে। বাজারে যাওয়া, ইলেকট্রিক বিল আর টেলিফোনের টাকা দেওয়া। ব্যাস। বাজার থেকে ফিরে চা খেয়ে দাড়ি কামাতে বসে বাবা। সে যে কি ব্যাপার না দেখলে বোঝা যাবে না। প্রথমে জুলপির পাকা চুল সন্না দিয়ে তুলবে তারপর আদর করার মত নিজের দাড়ি কামাবে। ততক্ষণে ভাইকে স্নান করিয়ে নিজে তৈরী হয়ে নেয় মা। সাড়ে ন'টা বাজতে না বাজতেই নীচে খেতে চলে যায় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। যাওয়ার আগে একবার যন্ত্রের মত জিজ্ঞাসা করে চাবির দরকার আছে কি না। খাওয়া হয়ে গেলে মা আর ওপরে ওঠে না। বাগবাজারের স্কুলে চলে যায়। বাবা বের হয় সাড়ে দশটা নাগাদ। হেলতে দুলতে ঘুমন্ত ভাইকে আদর করে। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

'কি আমার টিপসি মা?' আমি একটু মোটাসোটা বলে আদর করে টিপসি বলে ডাকা—দু চক্ষে দেখতে পারি না। আগে চাইতাম আজকাল ঘাড় নেড়ে না বলি। তখন গালে চুমু খেতে হয়—বাবা বেরিয়ে যায়। মা ফেরে বিকেল হতে না হতেই। বাবার ফিরতে রাত সাড়ে নটা দশটা। তখন মা আমার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। অতএব কথা বলার সময় নেই বা ইচ্ছে নেই বলে সময় নেই।

দিনের বেলা তো হল এই রকম। রাতের বেলায় সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এই পনের দিন তো না হয় মা অসুস্থ। পনের দিন আগে স্কুল থেকে ফিরে বলল পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কদিন বাবা ডাক্তার এক্সরে নানা রকম এগজামিন করাল। কিন্তু তার আগে তো মা বেশ সুস্থ ছিল। রাত্রে একটা ঘরে আমি মা আর ভাই শুই। অন্য ঘরে বাবা। আমার শোওয়া নাকি খুব খারাপ, ঘুমলে হুঁস থাকে না। তাই দুটো পাশ-বালিশ দিয়ে পাঁচিল তুলে দেওয়া হয় আমার আর ভাই-এর মধ্যে, মা ধারে। ভাই হবার আগেও বাবা পাশের ঘরে শুতো।

মাসখানেক আগের কথা। মাঝরাত্রে, ঘুম ভাঙলেই তো মাঝরাত মনে হয়, কেমন আবছায়া হতে হতে ঘুমটা ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চাপা গলার কথা শুনতে পেলাম, 'লজ্জা করে না তুমি এই ঘরে এসেছ?'

বাবা বললো, 'অতসী, আমার কথাটা শোন।'

'কিছু শোনার নেই আমার: সারা জীবন অনেক শুনেছি। দয়া করে একটু ঘুমুতে দাও।' মায়ের গলায় এ রকম বিরক্তি আমি আগে কখনও শুনিনি।

'তুমি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ।' বাবার গলাটা কেমন দুর্বল লাগল।

'আমার বয়ে গেছে রাগ করতে।'

'কিন্তু তোমাকে জবাব দিতে হবে কেন তুমি এ রকম ব্যবহার করছ। সব কিছুর একটা সীমা আছে। আমি পুরুষ মানুষ ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'বেশ তো।' মায়ের গলাটা বিদ্রূপে ক্যানকেনে, 'কে তোমাকে নিষেধ করছে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়ে পুরুষত্ব দেখাও। শুধু আমার ছেলেমেয়েদের ওপর তার ছায়া না পড়লেই হল।'

'তুমি আমাকে বেশ্যাবাড়ি যেতে বলছ?'

'আমি কিছুই বলছি না। তুমি এই বাড়িটাকে ওই রকম করে তুলেছ!'

'মানে?'

'তুমি কি ভেবেছ আমি সংসার সামলাবো, মেয়েকে পড়াবো, বাচ্চাকে দেখব, চাকরী করব আর রাত্রে তোমার শরীরের চাহিদা মেটাবো?'

'এ সব কথা ও-ঘরে গিয়ে বললে হতো না? মেয়ে জেগে যাবে।'

'জাগুক। আর একটু বড় হলে আমি নিজেই ওকে বলব এ সব কথা।'

'কিন্তু ভুল তো মানুষ মাত্রেই হয়। আর তুমি বুঝতে পারছ না কেন কোন মহিলার সঙ্গে আলাপ বা যোগাযোগ মানেই প্রেম নয়।'

'তোমার এই সব যুক্তি আমি অনেক শুনেছি, ঘেন্না ধরে গেছে আমার। এই দুটোর জন্য আমি পড়ে আছি এখানে। ঠিক আছে, যাও না ওই সব মহিলার কাছে—আমি কি বারণ করেছি।'

'প্লিজ অতসী! তুমি একটু নরম হও। তোমার খুব খাটুনি যাচ্ছে, আমি তো অনেক বার বলেছি তোমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে। ও-টাকা না হলেও আমাদের চলে যাবে।'

'আর তারপর সারা জীবন তোমার খেয়ালখুশী মতন চলতে হবে, না?'

'অতসী!'

'আঃ, আমার গায়ে হাত দেবে না। ফের যদি এমন কর তাহলে আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে

যাব।' মায়ের এবারের গলাটা বেশ চড়া।

কিছুক্ষণ কোন কথা শুনতে পেলাম না। আমি যে জেগে আছি এবং সব কথা শুনতে পাচ্ছি তা যাতে কেউ টের না পায় তাই মড়ার মত পড়েছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি দু-একটা ব্যাপারে কেমন লাগলেও এই সব কথাবার্তায় মায়ের ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শুধু শুধু মা বাবাকে ধমকাচ্ছে, এ রকম খারাপ ব্যবহার করছে। কি হতো ও-ঘরে গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বললে। দিনের বেলায় মায়ের সঙ্গে এই মুহূর্তের মায়ের কোন মিল নেই। তার কিছুক্ষণ পরে আমি চমকে উঠলাম। ভাগ্যিস ঘরটা অন্ধকার ছিল। পাশবালিশের আড়ালে নিজেকে শক্ত করে রেখে আমি মায়ের ফোঁপানি শুনছিলাম। মা একা একা কাঁদছে। এই প্রথম মাকে কাঁদতে দেখলাম। তখনই সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। প্রেম কথাটা আমি এতদিনে জেনে গেছি। বাবা কি অন্য কোন মহিলার সঙ্গে প্রেম করছে? মায়ের ওপর যে রাগটা হচ্ছিল সেটা চট করে চলে গেল। আমার মা দেখতে খারাপ নয়, তাহলে বাবা কেন অন্য মহিলার সঙ্গে প্রেম করবে? আগেকার দিনে রাজারা দু-তিনটে বিয়ে করত, বাবাও কি সে রকম করবে? ছি, তাহলে আমি সেই মহিলাকে মা বলতে পারব না। মায়ের কান্না শুনতে শুনতে আমারও কান্না পেয়ে গেল। আমি চুপচাপ কাঁদতে লাগলাম। আমার মনে পড়ল, একদিন শনিবার হবে সেটা, মা স্কুলে চলে গেলে বাবার একটা ফোন এসেছিল। আমি ধরেছিলাম সেটা, বাবা তখন বাথরুমে, মহিলার গলা ছিল, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল চিনবে না। সেই মহিলা কি!

আমাদের বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে। ছেলেবেলায় সেটা বাজলেই আমি দৌড়ে গিয়ে ধরতাম। কিন্তু একদিন একটা লোক বদমায়েসী করে খুব অসভ্য কথা বলেছিল। সেটা মাকে বলতেই আমার টেলিফোন ধরা বন্ধ হল। সবাই যে খারাপ কথা বলে তা নয়। একজন খুব মিষ্টি গলায় আমার নাম কি, বয়স কত এই সব গল্প করেছিল। এখন আমি অবশ্য টেলিফোন ধরি। সেই বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। কমলামাসী নীচে তখন উনুন-টুনুন নিয়ে ব্যস্ত। জামাকাপড় পরিয়ে ভাইকে নিয়ে আমি খেলা করছি এমন সময় টেলিফোনটা বাজে। কমলামাসীর পায়ের শব্দ পেলেই আমাকে রঙ নাম্বার বলে ছেড়ে দিতে হয়। এই নিয়ে সমীরদা খুব রাগ করে। কিন্তু আমি কি করব বুঝতে পারি না। মা যদি জানতে পারে তাহলে মেরে আমার হাড় গুঁড়ো করে দেবে। এই ক'দিন তো ফোনই ধরিনি। মায়ের শরীর খারাপ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি কষ্টটাই না পাচ্ছিল। পাড়ার ডাক্তারবাবুর ওষুধে কাজ হল না। যেদিন প্রথম ব্যথাটা বাড়ল সেদিন বাবা জানতো না, যেমন দেরী করে বাড়ি ফেরে তেমনি এসেছিল। এসে ওই অবস্থা দেখে কেমন চোরের মত দাঁড়িয়েছিল। কমলামাসী ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছে, ওষুধ কেনা হয়েছে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মায়ের বিছানার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এখন কেমন আছ?'

মা কথা বলেনি একটাও। দাঁতে দাঁত চেপে শুয়েছিল, চোখের কোল টলটলে। সেটা ব্যথার জন্য না অন্য কিছু জানি না। পরদিন বাবা অফিসে গেল না, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর এই কযদিনে তিনজন ডাক্তার দেখার পর মা হাসপাতালে গেল। এর মধ্যে আমি কি করে সমীরদার ফোন ধরি! বুঝতে পাচ্ছি খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছে সমীরদা, ছেলেরা না একদম কিছু বুঝতে চায় না।

॥ দুপুরবেলায় ॥

একটু আগে বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। মুখ গম্ভীর, অন্যমনস্ক হয়ে স্নানখাওয়া করল। আজ বাইরেটা বেশ মেঘলা করেছে। কমলামাসী অনেক কষ্টে ভাইটাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার

জিম্মায় রেখে গিয়েছে। বাবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি খেয়েছি। মা এখন কেমন আছে। কাল রাতের কথা মনে পড়ছে। মায়ের বিছানার পাশে আমরা বসেছিলাম। অত দুষ্টু যে বাপ্পাটা, সেও যেন বুঝতে পেরেছিল মায়ের শরীর ভাল নয়। চুপটি করে আমার কোলের কাছে বসেছিল। বাবা সারাদিন বের হয়নি? মায়ের জ্বর জ্বর লাগছিল বলে টেম্পারেচারটা নিচ্ছিল। হঠাৎ মা বলে উঠল, 'আমি যদি মরে যাই তাহলে ভেবো না আমি চলে যাব। ঠিক ভূত হয়ে তোমাদের কাছে ঘুরঘুর করব।'

বাবা নিজে কেমন একটা শব্দ করে বলল, 'কি যে ছাইপাঁশ কথা বল। মরার নাম করছ কেন?'

মা বলল, 'বাঁচতে আমার আর ইচ্ছে করে না গো।' ইদানীং দেখছি, অসুখটা বেড়ে যাবার পব মা বাবার সঙ্গে কেমন অদ্ভুত গলায় কথা বলে। সেই ঝাঁঝটা নেই, ভীষণ নির্লিপ্ত মনে হয়। 'আমার এ সব কথা শুনতে ভাল লাগছে না।' বাবা যেন রাগ করল। মা হাসল তারপর আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। মায়ের চোখে চোখ রাখতে পারলাম না আমি। কেমন অদ্ভুত চোখ। মা হেসে বলল, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে খুকী?' আমি ঘাড় নাড়লাম। 'মন দিয়ে পড়াশুনা কববি, ভাইটাকে দেখবি। ও যখন বড হবে তখন আমার কথা ওকে বলবি।'

সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে জড়িয়ে ধরে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, 'মা, তুমি এমন করে বলছ কেন?'

'দূব বোকা মেয়ে। বলছি তো কাঁদছিস কেন? এখন তো তুই একা নেই, তোর ভাই আছে। সব সময় মনে বাখবি।'

ঠিক তক্ষুণি আমার সেই রাতটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। অনেক অনেকদিনের আগের সেই রাত। ভাই তখন হয়নি। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। বাজ পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে পাশবালিশ সবিযে মাযেব কাছে যাব ভাবছি সেই সময বাবাব গলা পেলাম। বাবা এত রাত্রে আমাদের ঘরে আসে না। কি কথা হচ্ছে শুনবার জন্য কাঠ হয়ে শুয়ে থাকলাম। বাবা বলছিল, 'কিন্তু তুমিই তো এক সময় আগ্রহ দেখিয়েছিলে এখন না বলছ কেন?'

'আমি যখন চেয়েছিলাম তখন খুকীর তিন বছর বয়েস। তুমি না বলেছিলে।'

'তখন অসুবিধে ছিল সেকথা তো অনেকবার বলেছি।'

'তুমি তখন আমাকে ডিভোর্সের কথা ভাবছিলে।'

'না সে রকম নয়—।'

'এখন আর হয় না। আমার আর ইচ্ছে নেই। তুমি যদি জোর কর তাহলে যে আসবে সে আনওয়ান্টেড চাইল্ড হয়ে যাবে।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছ না কেন? এই বিরাট পৃথিবীতে তুমি আর আমি ছাড়া খুকীর কেউ নেই। আমাদের নিজেদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো নেই বললেই চলে। তাই একটা সময় তো নিশ্চয়ই আসবে যখন আমাকে এবং তোমাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। ভাবতে পার তখন খুকী কি রকম একা হয়ে যাবে। নিজের বলে ওর কেউ থাকবে না।'

মা যেন কিছুক্ষণ ভাবল, 'ওর বিয়ে হয়ে যাবে, স্বামী পাবে ঘর পাবে।'

'যদি না মিল হয় দুজনের?'

'আমার মত অ্যাডজাস্ট করে নেবে। আমি পেরেছি ও পারবে না কেন?'

'এখন তুমি এই কথা বলছ, কিন্তু একদিন এই সব কথা তুমিই বলেছিলে। আমরা তো আবার আগের মত হতে পারি, পারি না?'

'পারো?'

'কেন পারি না? তুমি একবার আমাকে সুযোগ দাও।'

'এর আগে অন্তত পাঁচবার তুমি এই কথা বলেছ। ঠিক আছে, খুকীর জন্য আমি আর একবার নিজেকে ঠকাই। তবে আজ নয়।' বাবা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাশের ঘরে চলে গেল।

মায়ের কথাটা শুনে আমার সেই রাতটাকে মনে পড়ে গেল। আমি একা থাকব বলে মা ভাইটাকে এনেছে? এর মধ্যে, এই কিছুদিন হল, আমার স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে গেছি মানুষ কি করে জন্মগ্রহণ করে।

কিছুক্ষণ ওঘরে বসে থেকে বাবা আমার কাছে এল। আমি চুপচাপ জানলা দিয়ে আকাশ দেখছিলাম। বাবা এসে আমার মাথায় হাত দিল। আমার জিজ্ঞাসা করতে খুব ভয় করছিল, তবু বললাম, 'মা কেমন আছে?'

'ভাল নয়। অপারেশন হয়েছে, জ্ঞান ফেরেনি। সন্ধে নাগাদ ফিরবে ডাক্তার বলল।'

'আমি যাব বিকেলে তোমার সঙ্গে।'

'যাবি? না থাক। বাপ্পা একা থাকবে, কান্নাকাটি করতে পারে। হ্যাঁরে তোর মা কি খুব ঝাল খেত?'

শনি রবিবার ছাড়া দুপুরে মায়ের খাওয়া আমি দেখি না। তবু মনে করতে পারলাম না তেমন কিছু, ঘাড় নাড়লাম। বাবা আমার চুলে হাত বোলাচ্ছিল। সামনে খাটের ওপর ভাই হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। 'খুকী, তুই তো এখন বড় হয়েছিস, বুঝতে শিখেছিস, আমি তোর মাকে বলেছি তুই থাকতে ভাই-এর কোন কষ্ট হবে না।'

'কেন, মা তো ফিরে আসবে?' আমি কেমন শিউরে উঠলাম।

'আসবে, কিন্তু যদ্দিন না আসে।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। ভাই আমাকে খুব ভালবাসে। হঠাৎ বাবা কেমন গলায় বলে উঠল, 'খুকী, তোর মা কি তোর কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে?'

'না তো, কেন?'

'না এমনি।'

ঠিক এই সময় টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। বাবাকে কেমন যেন হতভম্ব দেখাচ্ছিল। আমাকে ইঙ্গিত করে ফোনটা ধরতে বলল। আমি রিসিভার তুলতে লোকটা নাম্বার যাচাই করে নিয়ে বলল, 'পেশেন্টের অবস্থা ভাল নয়, ইমিডিয়েট রক্ত চাই। তাড়াতাড়ি চলে আসুন।' খবরটা শুনে বাবা আলমারি থেকে তড়িঘড়ি করে একগাদা টাকা বের করে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমি বাবাকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি এসো না হয় ফোন করো।' বাবা ঘাড় নেড়ে দৌড়ে নেমে গেল।

বাবা চলে গেলে আমি অনেকক্ষণ কাঁদলাম। মায়ের যদি কিছু হয় তাহলে আমি কি করব? সারা জীবন মাকে ছাড়া থাকব কি করে? অ্যাদ্দিন মাকে অন্যরকম ভেবেছি বলে কেমন খারাপ লাগতে শুরু করল। আমার যখন সেই জিনিসটা প্রথম হয় তখন মা কি যত্ন করে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। রাত্তির বেলায় মা না থাকলে আমার ঘুমই হয় না। হঠাৎ মনে হল আমি তবু মাকে এতদিন ধরে পেয়েছি ভাইটা তো মা কি জানতেই পারল না। শোওয়ার ঘরে এলাম, ঘুমুতে ঘুমুতে ভাই হাসছে। বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল আমার।

আলমারির দরজা হাট করে খুলে বাবা চলে গিয়েছে। মা থাকলে এমনটা হতে দিত না। আমার জামাকাপড়ের একটা আলাদা স্যুটকেস আছে। মা আলমারিতে হাত দেওয়া পছন্দ করত না। সব অগোছালো করে দেব নাকি। ওপরের তাকে লকার, মাঝখানেরটা বাবার জামাকাপড়, নীচেরটায় মায়ের শাড়ি। উঃ, প্রচুর শাড়ি মায়ের। চড়া রঙগুলো তো মা পরেই না। প্রায়ই বলে, 'আর একটু বড় হলে তুই পরবি।' আজ যদি মায়ের কিছু হয় তাহলে এই শাড়িগুলোর কি হবে? আমি একটাও পরতে পারব না। শাড়িগুলোর কাছে মুখ নিয়ে গেলেই মায়ের গন্ধ পাওয়া যায়।

একদম তলায় বেনারসীটা। মায়ের বিয়ের বেনারসী। হাত দিলাম, কি মোলায়েম। অন্যমনস্ক হয়ে শাড়িগুলো ঘাঁটছিলাম আর মনে হচ্ছিল মায়ের পাশে বসে আছি। হঠাৎ হাতে শক্ত মতন কি ঠেকল। টানাটানি করে কাপড়ের চাপ থেকে সেটাকে বের করে দেখলাম একটা ছোট অ্যালবাম। আমাদের অনেকগুলো অ্যালবাম আছে কিন্তু এটাকে আগে দেখিনি। কৌতূহলী হয়ে পাতা ওল্টালাম, প্রথমে মা-বাবার বিয়ের ছবি। তলায় তারিখটা লেখা। তার পাশে লেখা, ভীষণ লাজুক। পরের পাতায় বাবার একলা ছবি কেমন বাচ্চা বাচ্চা। নীচে লেখা, ফুলশয্যা খুব হ্যাংলা এবং রাক্ষসও। চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল আমার। মানেগুলো অস্পষ্ট বুঝতে পারছি যে। তারপর অনেক ছবি বেশীরভাগ মা-বাবার বাইরে যাবার। মা গগলস পরেছে, এক জায়গায় প্যান্ট পরে কোন পাহাড়ে ঘোড়ায় চেপেছে। হঠাৎ দেখি একটা পুঁচকে বাচ্চা—তার নীচে, লেখা, খুকী এল। আমার জন্ম তারিখ। ব্যস, আর কোন ছবি নেই অ্যালবামে। সব কটা পাতা খালি। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভাবিনি, মা কেন নিজের অ্যালবামটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ করে দিল?

ঘুম থেকে উঠে ভাই বলল, 'মা আতেনি?' আমি ঘাড় নাড়লাম, না।

এই সময়টা ও ঘ্যান ঘ্যান করে' কোন কিছুতেই ভোলানো যায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খাটের ওপর দিয়ে জানলার ধারে চলে যায়। আমাদের দোতলার জানলা দিয়ে নীচের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। স্কুল থেকে মা যখন রিকশায় বাড়ি ফেরে তখন ও জানলায় দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে। আজ কমলামাসীকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। এই যেমন এখন ভাইকে সামলাতে সামলাতে কমলামাসী বার বার আড়চোখে আমায় দেখছে, কেন?

আমার মা কি মরে যাবে? কিছুদিন আগে অবধি আমি জানতাম মরে গেলে ভাল লোকরা ভগবানের কাছে চলে যায়, খারাপ লোকরা ভূত-পেত্নী হয়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। মা কেন বলল যে ভূত হয়ে ঘুর ঘুর করবে। মা কি খারাপ লোক? মা না ফিরলে—চোখ বন্ধ করে মায়ের মুখটা ভাবছিলাম। মা যেমন করে হাসে, কথা বলে, রাগ করে, চুল বাঁধে সব মনে করে নিয়ে নিজের চোখের পাতায় দেখছিলাম। ক্রমশ এমন মশগুল হয়ে গেলাম যে খেয়াল করিনি কখন ভাইকে কোলে নিয়ে কমলামাসী আমার সামনে এসে ডাকছে।

'ও খুকু, ছি ছি, কাঁদে না মা।' কমলামাসী বলতে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার গাল দুটো ভিজে গেছে। 'আমরা তো কিছু জানি না, দিদির বাড়াবাড়ি হয়েছে মানেই কি আর—। চোখের জল মানুষের খুব খারাপ করে ভাই।' কমলামাসী আমার সামনে ভাইকে নিয়ে বসল। বোধ হয় আমাকে কাঁদতে দেখেই ভাই অবাক হয়ে'ওর কোলে জড়সড় হয়ে বসে আছে। বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

'মাসী, মায়ের কেন এমন হল? আমি তো কোনদিন মাকে দুঃখ দিইনি।'

কমলামাসী এখন বুড়ী হয়ে গিয়েছে। যখনই কথা বলে তখন বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ে, 'কে কিসে দুঃখ পায় তা যদি জানতে পারা যেত ভাই। এই আমি তো তেনাকে দুঃখ দিইনি একদিনও, খোকাকে মারিনি পর্যন্ত, তা তারা চলে গেল কি দুঃখ পেয়ে? আমরা জানতে পারি না ভাই।'

এই সময় টেলিফোনটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে গেলাম ওটা ধরতে। লোকটা যে নাম্বার বলল সেটা আমাদের নয়। রং নাম্বার বলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বুকটা যেন হালকা হল সামান্য। আমি কি হাসপাতালের কোন খবর আশা করেছিলাম? চলে আসছি দেওয়াল ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। এই সময় সমীরদার ফোন করার কথা। এখন রুটিন হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। এতদিন আমার সন্দেহ হতো মা বোধ হয় সমীরদার ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছে। টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে মনে হল মা আমার অনেক কিছু বুঝতে পারত। আমি যখন ছোট

ছিলাম মা আমাকে মিথ্যে কথা বলতে নিষেধ করত। বলত, 'তুই যখন মিথ্যে বলবি তখনই আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে আর আমি টের পেয়ে যাব।' খুব বিশ্বাস করতাম তখন কথাগুলো। সমীরদার সঙ্গে একদিন অনেকক্ষণ রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিলাম। সেই প্রথমবার। ভয়ে ভাল করে কথা বলতে পারছিলাম না, সব সময় মনে হচ্ছিল কেউ দেখে ফেলবে। আমার বন্ধু শোহিনীদের বাড়িতে সরস্বতী পুজো হয়, ও জোর করে আমায় নিয়ে গিয়েছিল বাবা মাকে রাজী করিয়ে। সমীরদা শোহিনীর দাদা। এর আগে দু-একবার স্কুলে দেখেছি সমীরদাকে, শোহিনীকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। লম্বা খুব স্মার্ট, কলেজে পড়ে। সেই সিনেমাটার চুমু-খাওয়া লোকটার মত, আমার মনে হয়েছিল আলাপ করতে না পারলে মরে যাব। শোহিনী আলাপ করিয়ে দিলে দেখলাম কথা বলতে পারছি না। তারপর ওই পুজোর দিন সব গোলমাল হয়ে গেল। আমাকে বাড়িতে দিতে এসে সমীরদা গল্প করতে করতে অনেক রাস্তা ঘোরাল। যখন সমীরদা বলল, 'তুমি এত সুন্দর যে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। তোমার আপত্তি আছে?' আমার মনে হল যে আমি পাগল হয়ে যাব। এই প্রথম এ সব কথা কেউ আমাকে বলল। আমরা ঠিক করে নিলাম কখন ফোনে কথা বলব। সমীরদা বাড়িতে আসতে চেয়েছিল, আমি দিইনি।

সেদিন বাড়িতে ফেরা মাত্র মা ভ্রূ কুঁচকে ছিল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

ধক করে উঠেছিল বুকটা 'শোহিনীদের বাড়িতে।'

'তোর হাঁটু অবধি এত ধুলো কেন?'

'কি জানি!' বলে তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল মা আমার বুকের ভেতরটা দেখে ফেলেছে। সেই রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না, সারাক্ষণ এপাশ-ওপাশ করছিলাম। তাছাড়া আমার অন্য ভয় হচ্ছিল। মা বলে আমি নাকি ঘুমের ঘোরে কথা বলি। যদি আজ রাত্রে সে রকম ভাবে সমীরদার কথা বলে ফেলি! হঠাৎ মা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি হয়েছে?'

চমকে উঠে বললাম, 'কিছু না তো।' মাত্র কয়েক হাত দূরে মা শুয়ে আছে, বুকে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডটাকে টের পেয়ে যেত।

'ঘুমিয়ে পড়।'

সেদিন থেকে আমার মনে হত মা যেন কেমন চোখে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকায়। হয়তো আমার ভুল তবু অস্বস্তি হতো। না, তারপর থেকে আমি শোহিনীদের বাড়িতে যাইনি, সমীরদার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটিনি। সেদিন সমীরদা আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমার খুব ভয় করছিল বলে যাইনি। তার চেয়ে টেলিফোনে কথা বলাই ভাল। ইদানীং সমীরদা প্রায় বলে বাইরে বেরুতে। ওদের কলেজের কাছে খুব ভাল রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে কেবিনে বসে অনেকক্ষণ কথা বলা যায়। কেউ দেখতে পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি সেই সিনেমাটাকে চোখের সামনে দেখতে পাই।

॥ রাত্তিরবেলা ॥

একটু আগে আকাশ থেকে একটা তারাকে ঝরে পড়তে দেখলাম। কমলামাসী বলল ওটা দেখা নাকি খুব খারাপ, অমঙ্গল হয়। বাবা যে সেই গেছে আর কোন খবর দেয়নি। মা কি রক্ত নিয়ে সুস্থ হয়নি? তাহলে বাবা আসছে না কেন? একটা টেলিফোনও তো করতে পারত! আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। যে আশঙ্কাটাকে সারাদিন ঢেকে ঢুকে রেখেছি তাকে যেন আর সামলানো যাচ্ছে না। সন্ধ্যেবেলায় ভাই খুব কান্নাকাটি করেছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কথা বলেছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও আজ মাসীর হাতে খেতে চায়নি মোটেই।

...কোলে বসিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। তাই দেখে মাসী বলেছে, 'আজ থেকে তুমি ...কারের দিদি হলে, তোমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।' নিজেকে কেমন অন্য রকম লাগছে। মা ...ভাবে ভাইকে খাওয়াতো ঘুম পাড়াতো আমি অবিকল সেই রকম করতে ও আরামে ঘুমিয়ে ...ছে। হঠাৎ মনে হচ্ছে আমি যেন ওর কাছে দিদি নই কেমন করে মা হয়ে গেছি। মা যা যা ...ত তাই যদি আমি করে যাই তাহলে ওর কোন অসুবিধে হবে না, ক্রমশ এটাই মনের মধ্যে ...ড়ে বসছে।

আর তারপর থেকেই মনে হচ্ছে মাকে আমি ঠকিয়েছি। সমীরদার ব্যাপারটা আমি একদম ...পে গিয়েছি। মাকে কি বাবাও ঠকিয়েছে? সেই মহিলার সঙ্গে প্রেমট্রেম করা নিয়ে মা খুব কেঁদেছিল' আমি জানি মা বাবাকে খুব ভালবাসত। অ্যালবামের ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যে। কি অভিজ্ঞতায় মাকে এখন কাঁদতে হয়? আমি সেটা জানি না, যদি জানতে পারতাম তাহলে আমি হয়তো ভবিষ্যতে মায়ের মত কাঁদতাম না। হঠাৎ মনে হল আমার এবং বাবার ...ন্য আজ মায়ের শরীরে রক্ত দেওয়া হচ্ছে।

ভাইটা এমন ভঙ্গীতে ঘুমুচ্ছে যে ওর বুকে লাগবে। ঠিক করে শুইয়ে দিতে গিয়ে আমার হাত ...ড়িয়ে ধরল ও। ঠিক এই সময় অনেক দূরে আওয়াজটা শুনতে পেলাম। আমাদের বাড়ির ...মনে ওই রাস্তা দিয়ে শব্দগুলো রোজ গঙ্গার দিকে চলে যায়। শব্দটা কানে যেতেই সমস্ত ...রীর হিম হয়ে গেল আমার। মনে হল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কমলামাসীকে চট করে উঠে ...ড়াতে দেখলাম আমি। হঠাৎ মনে হল পৃথিবীটা কেমন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। খুব চাপা, গম্ভীর ...বং কান্না মেশানো হরিধ্বনিটা এগিয়ে আসছে। এক-একটা শব্দ যার চিৎকার করে শাসাতে ...সাতে। এটা মোটেই সে রকম নয়। কমলামাসী পাশের জানলার ধারে ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা ...রছে। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ভাই কেঁপে উঠতেই আমার কি হল জানি না আমি দু হাত দিয়ে ...র কান চেপে ধরলাম। না, ওকে এই শব্দ শুনতে দেব না। দাঁতে দাঁত চেপে আমি ...োক সামলাতে চেষ্টা করছিলাম। আচ্ছা, মা এই সময় এখানে থাকলে কি করত? ...রা কি মাকে নিয়ে আসছে? মাগো! ওরা কারা! বাবা হাসপাতাল থেকে ওদের কি করে ...চাড় করল। আমাদের কোন আত্মীয় তো কোলকাতায় নেই! এখানে আমরা একা। নাকি ...বার অফিসের লোকজন সব। শব্দটা এবার কাছে এসে গেছে। নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির ...মনে এসে থামবে। আমি ভাইকে কক্ষনো জাগতে দেব না

এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোনটা চিৎকার করে উঠল। নিশ্চয়ই কেউ খবর দিচ্ছে। ...মলামাসী আমাকে একবার দেখে ছুটে গেল ফোন ধরতে। শব্দটা আসছে! খুব আবছায়া দেখলাম কমলামাসীকে, 'তোমার ফোন ভাই, শোহিনী করছে।' শোহিনী! সমস্ত শরীর নিরক্ত আমার। ভাই-এর কান থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আমি কি টেলিফোন ধরতে যাব? আমি বলতে ...লাম আমি কথা বলব না। সেই সময় যেন ঢেউ-এর মত দুলতে দুলতে শব্দটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল। জানলায় দাঁড়িয়ে কমলামাসীকে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করতে দেখলাম। 'কোথাও যখন কোন শব্দ নেই কমলামাসী বলল, উঃ, বুকটা কেমন করে উঠেছিল। কি হল, টেলিফোন ধরে রয়েছে।'

কিভাবে আমি টেলিফোন পর্যন্ত হেঁটে এলাম জানি না। শোহিনী হাসল, 'কিরে ঘুমুচ্ছিস?' না। তোর মা-বাবা বাড়িতে আছে?' 'না।' গুড, কথা বল।' পরমুহূর্তেই সমীরদার গলা পেলাম, 'কার সঙ্গে সারা বিকেল কথা বলছিলে কতবার ডায়েল করলাম লাইন পেলাম না। আর কেউ ফোন করে নাকি?'

'মানে?' আমার মনটা হঠাৎ থমকে গেল আমার কোন উত্তেজনা হচ্ছে না কেন? যা সুন্দরী মেয়ে বলা যায় না। এই শোন, আমি আর পারছি না, কাল বাইরে দেখা করতেই

হবে।' সমীরদার গলায় দাবির সুর

'পারব না। আমার মা হাসপাতালে গেছে।'

'কেন?' সমীরদাকে চিন্তিত শোনাল। 'ভাল লাগল আমার শরীর খারাপ।'

'গুড। তাহলে এই ফিগারে কোন রকমে ম্যানেজ করে বাড়ি থেকে বার করে দাও কয়েক ঘণ্টার জন্য। আমরা তোমার বাড়িতেই-' বলে অদ্ভুত হাসল 'কী রাজী?'

'কেন?'

'তোমাকে হাম না খেতে পেলে আমি মরে যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটা কেমন করে উঠল। চোখের সামনে আমার মা দাঁড়িয়ে। হ্যাংলা এবং রাক্ষস কথাটা ভয়ঙ্কর হয়ে গেল আচমকা। আমার পালাবার যেন কোন পথ নেই। রাক্ষসটা তেড়ে আসছে সামনে। কি করে জানি না মায়ের সেই কথাগুলো মনে করতে পারলাম। খুব গম্ভীর গলায় বললাম, 'আমি আপনার শরীরের চাহিদা মেটাতে পারব না। দয়া করে আমাকে ফোন করবেন না। এটা রে—।' কথাটা আমি উচ্চারণ করতে পারলাম না। 'আরে যা শালা কি হল—' সমীরদার গলাটাকে টিপে ধরলাম টেলিফোন নামিয়ে।

আমার গায়ে এখন ভীষণ জোর। মায়ের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখে গিয়েছি। মা যা যা করত আমি সেইগুলো করতে পারব না কেন? বরং মায়ের ভুলগুলো আমি যাতে না করি— এই সময় টেলিফোনটা আবার বাজল। সমীরদা? একবার ভাবলাম ধরব না তারপর শক্ত হাতে রিসিভার তুললাম।

'খুকী, তোরা কেমন আছিস?' বাবার গলা। 'ভাল আছি বাবা। মা কেমন আছে?'

'এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তার বলছে কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। আমি ভাবছি থেকে যাই কাল পর্যন্ত। তোরা একা থাকতে পারবি তো মা?'

'তুমি কিছু চিন্তা করো না। আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি বাবা।' কথাগুলো বলতে যে কি তৃপ্তি লাগল

মানুষের মেটে

এতকাল বাবুর যত রোগ ছিল মনে, এবার শরীরেও। রাত তিনটে পর্যন্ত মাল খেলে সারাটা সকাল পেট চেপে পড়ে থাকেন বাবু, তখন ওই বিশাল শরীর থেকে কুঁই কুঁই শব্দ বের হয়। ঘন ঘন ওষুধ ঢালে মুখের গর্তে ইলাম। এই অবস্থা চলে দু তিনদিন ধরে। হরিমাধব ডাক্তার এসে গম্ভীর মুখে বলে, 'এবার এসব ছাড়ুন, লিভারের আর দোষ কি। পচে গেল বলে।'

তা বাবু যখন শুয়ে শুয়ে ওষুধ গেলে তখন পারোর ছুটি। কিন্তু ছুটি বলতে যে বাড়ি ছেড়ে যাবে তার উপায় নেই। বাবুকে বিশ্বাস নেই। যন্ত্রণা কখন কমবে কেউ বলতে পারবে না। আর কমলেই কমলি এসে মুখ নাড়বে, 'যাও গাড়ি বের করো। বাবুর বেরুবার মন হয়েছে।'

এ তল্লাটে বাবুর বাড়ি যে দ্যাখে তারই বুকে বেড়াল আঁচড়ায়। অনেকখানি বাগান, সিমেন্ট কাঠ মিশিয়ে প্রাসাদের মত দোতলা বাড়ি। বাগানের কোণে ছোট্ট ঘরে ডায়নামো আছে।

জলঢাকা যখন আলো দিতে পারে না তখন এই ডায়নামো চলে। বাবুর কেউ নেই। বাচ্চা হয়নি। বউ গিয়েছে বছরখানেক আগে পরপুরুষের সঙ্গে ভেগে। আড়াল আবডাল পেলে কমলি বলে, 'ভাগবে না কেন? আমি হলেও ভাগতাম।'

মালিকদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কিন্তু বাবুর দৌলতে পারোকে চেনে না একশো কিলোমিটারের মধ্যে কেউ নেই। দশ বছর চাকরি হয়ে গেল এ বাড়িতে। দুটো জিপ কেনাবেচা হয়ে গেল। কিন্তু কখনও আগ বাড়িয়ে কথা বলার অভ্যেস তৈরি হল না। ভোর রাতে জিপ নিয়ে ছুটেছিল হরিমাধব ডাক্তারের বাড়ি। হেঁটে আসলে বুড়ো সাতকাহন গাইবে। জিপে বসে বলল, 'আবার মাল খেয়েছে বুঝি? আর বাঁচানো গেল না হে। এত টাকা নয়ছয় করছে, ভেলোরে গিয়ে চিকিৎসে করিয়ে আনে না কেন বুঝি না। লিভার খসবে এবার।'

শব্দটা ক'দিন এতবার কানে এসেছে যে অজান্তেই নিয়মভঙ্গ করল, 'লিভার কি?'

ডাক্তার বললেন, 'অ্যাঁ? লিভার জানো না? মেটে! মেটে বোঝ? খাসির মেটে খাও না? তা ওরকম মেটে মানুষের পেটেও থাকে। লাল টুকটুকে। যেই ঘোচে লাল অমনি আসে কাল।'

ওষুধপত্র দিয়ে যাওয়ার আগে ডাক্তার বলে গেল, 'আর আমাকে ডাকবেন না। কোন কথা শুনছেন না। এর পরে যদি আর এক ফোঁটা অ্যালকোহল পেটে যায় তো শিবের সাধ্যি নেই কিছু করে।'

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পারো কথাগুলো শুনল। বাবু পড়ে আছে মড়ার মত। কে বলবে কাল বিকেলে সেজেগুজে ওই মানুষ তার জিপে উঠেছিল। উঠে বলেছিল, 'অনেকদিন জুয়ো খেলিনি রে। চল, একটু শিবু রায়ের জোতে।' ওই সাগুর বাবুর চোখের তলায় পোড়া হাঁড়ির ছোঁয়া, গায়ের চামড়ায় কালচে ছাপ মাখামাখি। কুড়ি কিলো জঙ্গলে রাস্তা পেরিয়ে ডায়না নদীর গায়ে শিবু রায়ের জোতে পৌঁছে দেখতে পেয়েছিল আরও গোটা তিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নামবার আগে একশো টাকার একটা বাণ্ডিল ছুঁড়ে দিল বাবু পারোর কোলে, 'এটা সামলে রাখ।' বলে নেমে গেল। ইস্ত্রিকরা ঝকঝকে একশো টাকাগুলো কেমন গায়ে গা শুয়ে আছে রাবারের বাঁধনে। এত টাকা সে রাখবে কোথায়? বাকি তিনটে গাড়ির কোন ড্রাইভার নেই। শিবু রায়ের এই জোত হল জঙ্গলের এক ধারে। অন্তত এক মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে রইল পারো। বাবু যখন বের হল তখন শিয়ালদের ডাকাডাকি শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে জোনাকি ছিটকে দিচ্ছে আলো। বাবুর পা জড়ায়নি তেমন। তবে মদের গন্ধ বড় কড়া। গাড়িতে উঠে বসে হাসল বাবু, 'লাকটা খারাপ গেল। দু হাজার খুইয়ে। চল এবার বিনাগুড়ি।'

এইরকমই আশঙ্কা করছিল পারো। কিন্তু শিবু রায়ের জোত থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে বিনাগুড়ি ছাড়িয়ে নয়াবস্তি পর্যন্ত আসতে একটাও কথা বলেনি রব শুনেছে গাড়িতে চলার দিয়ে বাবু একটা লাইন বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়েছে, 'এবার কালী তোমায় খাব।'

পারো জানে কালী মানে কালীমার্কা। শিবু রায়ের জোতে বাবু খেয়েছে ভুটানের মদ। বিউটির ওখানে কালীমার্কা হাড়িয়া। মেয়েছেলেটার বয়স হয়েছে, গায়ের রঙ ফর্সা। এককালে শিলিগুড়িতে ছিল। বাবুই এই নয়াবস্তিতে এনে তুলেছে। নাক মুখ চোখ ভাল। কিন্তু গতর যা তিন বাঘ বলবে কাল আবার খাব। যেমন গতর তেমন গলা। ওই গলার দাপটে বস্তির সবাইকে কেঁচো বানিয়ে রেখেছে বিউটি। বাবু গেলেই এক প্রস্থ গালাগাল শুরু হয়ে যায়। তারপর হাত ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। মাঝরাত্রে পারো যখন জিপে বসে ঢুলছে তখন কানের কাছে চিৎকার শুরু হয়, 'আরে এ বাদশাকা বেটা, এটা তোর ঘুমোবার জায়গা? নে, ধরে তোল বাবুকে। ঠিকঠাক নিয়ে যাবি। জোরে চালাবি না। হ্যাঁ' কাল যেন ঠিক সময়ে নিয়ে আসিস।'

পারোকে হাত লাগাতে হয়। বাবু তখন সিটে ঢলে পড়ে। পড়তে পড়তে বলে, 'গুডনাইট

বউটি।

তারপর [illegible] চলতে শুরু করার [illegible] কিছু [illegible] বাবস না [illegible] আমাকে [illegible] বাড়ন [illegible] তাই এখান আর মাঝে মাঝে [illegible] খাওয়া [illegible] পারে না।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে [illegible]। [illegible] এসে বাগানে [illegible] মন খুব খারাপ হয়ে গেল [illegible] নিজের [illegible] দিল সে। [illegible] মানুষের পাড়ে [illegible] অসুবিধে নেই [illegible] পাড়ায় তখনই গোলমাল [illegible] ভাল থাকলে মাঝে মাঝে তার ভাগ্য [illegible] সরিয়ে রাখে পাড়ার ধারে মানুষের [illegible] আর পাঠায় [illegible] শাক [illegible] খায় তারা মোটেও [illegible] মুখে ছায়া নেই [illegible] আছে [illegible] মাঝের মধ্যে এক [illegible] বাঁচিয়ে পাবেন [illegible] বাখা মা সের সঙ্গে মোটেও থাক [illegible] কিন্তু [illegible] হয় [illegible] সেগুলো [illegible] চায় না [illegible] সেই [illegible] খালি। [illegible] পারেন না পরে।

বাগানে দাঁড়িয়ে সে [illegible] আসছে [illegible] খুব বড় সাহেবের মেয়ে আছে [illegible] রেখেছে তা [illegible] [illegible] আর [illegible]

[illegible] আকাশ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিছু করতে [illegible]

[illegible]

কাকে [illegible] বউটির [illegible]

বউদিকে [illegible] বড় [illegible]

[illegible]

কিছুই [illegible]

[illegible] বলেছিল [illegible] এক বন্ধুকে [illegible]

ওসব বড় [illegible] থাকতে [illegible]

ও তিনি কোথায় আছেন তা তো আমি জানি না।

আমি জানি বড়দির বোনের বাড়ি জলপাইগুড়িতে। সিনেমা হলের বাঁদিকে [illegible] [illegible] এই বেলা চলে যাব।

জলপাইগুড়িতে [illegible] [illegible] কোথায় যাবে।

সে আমি জানি না। [illegible] সবকথা [illegible] এসে শোন [illegible] [illegible] পারো ওর [illegible] [illegible] [illegible] কর্মলি [illegible] সে পারে না। [illegible] দাঁড়িয়ে দেখল [illegible] [illegible]। কর্মলিকে [illegible] [illegible], [illegible] ডাক।

[illegible] [illegible] পারোর [illegible] [illegible]।

বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্মলি [illegible]

কর্মলি জবাব না দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। মাথার উপর পাখা ঘুরছে। [illegible] এখনই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পারোর মনে পড়ল সেই একশো টাকার নোটের বান্ডিলটা [illegible] চেয়ে নিয়েছিল [illegible] বাড়িতে নামার আগে। সেটা তো ফিরে আসেনি। [illegible] [illegible] বোধগম্য হল না। সে দেখল কর্মলি তার [illegible] [illegible] জানে।

গাড়িতে তেল না থাকলেও অসুবিধে নেই। মন্টুর পাম্প থেকে আকাউন্টে তেল নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আজ কিন্তু মন্টু মাথা নাড়ল, গতমাসের টাকা এখনও পাইনি। ওগুলো ক্লিয়ার না করলে দিতে পারব না।

এই গলায় কখনও কথা বলে না মন্টু। পারো বলল, [illegible] দিয়ে দাও, পরে কথা হবে।

পরে আর চান্স পাব না। হরিমাধব ডাক্তার তো ওবাব [illegible] দিয়েছে। টেঁসে গেলে দাম কে দেবে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পর বিশ লিটার তেল ট্যাঙ্কে ভরতে পারল পারো। [illegible] যে ফুল ট্যাঙ্কিতে আপত্তি করত না আজ তার পরিবর্তন দেখে সে হিসেব মেলাতে পারছিল না। পাঁচজন সাক্ষী খাড়া করে রাখল মন্টু আজ। মোড়ে দাঁড়াতেই যার সঙ্গে দেখা হল সেই জিজ্ঞাসা করে বাবুর খবর। যেন কখন মরবে সেটাও পারো বলতে পারে। মানুষগুলো একটা মৃত্যুর খবর নিচ্ছে অথচ মুখেচোখে একটুও দুঃখ নেই। যে লোকের টাকা থাকে আর সেইসঙ্গে মনের রোগ তার শরীরের কলকব্জা বিকল হলে সাধারণ মানুষের এত সুখ হয় কেন? জিপটা নিয়ে শের আলির দোকানের সামনে পৌঁছে সে ব্রেকে পা রাখল। শব্দ শুনে শের আলি মুখ তুলে তাকাল। মাংস যা বিক্রি হবার সকালেই হয়ে গেছে। কাজের দিনে একটার বেশি কাটে না শের আলি। আজ অর্ধেকও বিকোয়নি। জিপে বসেই ও পাঁঠার মেটে দেখতে পেল। অর্ধেক বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু টুকটুকে লাল ফুলের মত জ্বলছে বাকিটা। নেমে এল পারো। তাকে নামতে দেখে শের আলি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? আজ নিশ্চয়ই মাংস চাই না।'

কেন? পারো একবার শের আলি আর একবার ঝুলন্ত মাংসের সঙ্গে লেগে থাকা মেটের দিকে তাকাল। শের আলির চোখের তলায় কালো ছাপ, শির বের করা রোগাটে শরীর। পারো শের আলির নিজস্ব মেটেটা পরিষ্কার দেখতে পেল। ফ্যাকাশে মেরে গেছে শুকনো ছিবড়ে ছিবড়ে। যে রোজ হাড়িয়া খায় তাতে এতকাল পচেনি কেন সেটাই বোঝা যায় না। ওর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শের আলি খুব অস্বস্তিতে পড়ল, 'অ্যাই, কি দেখছ? বাবু তো শুনলাম মরবে আজই। এখন মাংস নিয়ে কি হবে?' মনে মনে শের আলির জন্যে একটা কষ্ট তৈরী হল। লাল টুকটুকে মেটে বিক্রি করছে যে তার নিজের মেটের অবস্থা তেরোটা। দরদস্তুর করে সে পাঁঠার মেটে কিনল, তিনশো গ্রাম। চকচকে লাল বস্তুটি হাতে নিয়ে আর একবার নড় মোলায়েম ঠেকল। কি

আদুরে। ধারগুলো নেমে গেছে পাতলা হয়ে। মানুষেরা যে দেখতে যত কুৎসিত অথবা সুন্দরই হোক তাদের পেটের মেটে নিশ্চয়ই এক রকম থাকে। মাথা নাড়ল পারো না, মানুষই তা ভিন্ন রকম করে দেয়। কিন্তু পাঁঠারা? তারা কেন নিজেদের মেটে নষ্ট করে?

শের আলি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আই পারো! কি বলছ মনে মনে?'

শালপাতায় মোড়া বস্তুটির জন্যে তার ন'টাকা বেরিয়ে গেল। মাইনের অবশিষ্ট টাকাটা। খাওয়া পরা বাবুর বাড়িতে টাকাও জমে যাওয়া উচিত। কিন্তু জমে না। বড্ড খাওয়ার লোভ পারোর। ফাঁক পেলেই গঞ্জের দোকানগুলোয় বসে যায়। কিন্তু জিপে ফিরে গিয়ে মেটেটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল আজ এটা না কিনলেই হত। রাধবে কে? কমলিকে বললে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে। পারো ঠিক করল আগে জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে আসা যাক তারপর এর একটা বিহিত করবে।

ভাল স্পিডে জিপ চালাচ্ছিল পারো। শালপাতার ঠোঙাটা সে রেখেছে ড্যাসবোর্ডের ওপর। পারো ভাবছিল বউদির বোনের বাড়িটা সে খুঁজে বের করতে পারবে কিনা। বাবুকে নিয়ে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি করেছে অজস্রবার কিন্তু সিনেমা হলে যায়নি। বাবুর সিনেমা দেখার রোগটাই যা ছিল না। বিনাগুড়ির মোড় ছাড়াতেই খচর খচর শব্দ শুনতে পেল পারো। তার গাড়ি নিঃশব্দে চলে। যন্ত্রের ওপর সব জায়গায় বোলানো। সামান্য শব্দ হলেই কান খাড়া হয়ে ওঠে তাই। দ্বিতীয়বারের শব্দ বোঝাল এটা গাড়ির কোন অংশ থেকে নয়। এবং তখনই শালপাতাটার দিকে নজর গেল। শালপাতাটা কি নড়ছে! আচমকা ব্রেক কষে রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামাল পারো। মুখ নিয়ে গেল শালপাতার কাছে। স্থির হয়ে আছে ওটা এখন। কিন্তু একটু আগে শুধু শব্দই শোনেনি নিজের চোখে দেখেছে ওটাকে নড়তে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করল পারো।না আর কোন নড়নচড়ন নেই। তবে কি ভুল দেখল সে! এমন হতে পারে গাড়ির ঝাঁকুনিতে শব্দটা হচ্ছিল, শালপাতা নড়ছিল। কোন কোন মাছ নাকি মরে গিয়েও মরে না। কড়াইতেও লাফায়। এটা কি সেইরকম কিছু! মেটেসুদ্ধ শালপাতাটাকে ক্লাচের দিকে ঠেলে দিল পারো যাতে ঝাঁকুনি লাগলে কম নড়ে। ফের স্টার্ট দিতে গিয়ে ডান হাতের বস্তিটাকে নজরে পড়ল। কাল রাত্রেও বাবু এখানে এসেছিল একশো টাকার ইস্ত্রি করা নোটগুলো এখন বিউটির দখলে। বাবু মরতে বসেছে অথচ বিউটি সেই টাকায় ফুর্তি করবে। হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল পারোর। বাবু যদি মরে যায় তা হলে কার পরোয়া? সে জিপ থেকে নেমে বস্তিতে ঢুকল। এখন বস্তিটা ফাঁকা। কিছু কুচো খেলছে। জোয়ান মেয়ে পুরুষরা কাজে বেরিয়েছে। বিউটির ঘরের দরজা খোলা। সেখানে দাঁড়াতেই কথা খুঁজে পাচ্ছিল না পারো। রাগ যেটা মাথায় এসেছিল সেটা কেমন নেতিয়ে পড়েছে। পারো দেখল কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। সুড়সুড় করে সে ফিরে এল জিপে। স্টার্ট নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। ভালই হল। বাব যদি ভাল হয়ে এখানে এসে শোনে পারো এসেছিল তা হলে চাকরি খতম হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিউটিকে সে কি-ই বা বলতে পারত?

জিপ চলছে ফুল স্পিডে। গয়েরকটা ডুডুয়া পেরিয়ে ধূপগুড়ির কাছাকাছি পৌঁছাতেই আবার সেই খচর খচর শব্দটা কানে এল। পারো তখন ভাবছিল বিউটির মেটের কথা। অত বড় বুক, পাছা আর ধারালো গলার মেয়েছেলে সে জীবনে দেখেনি। অতএব তার মেটের সাইজটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিল না। কিন্তু বিউটির মেটে কি রকম? বাবু মাল খেয়ে আউট হয়ে গেলেও বিউটি ঠিক থাকে। ওর চোখের তলায় কালি পড়েনি, বরং গালে কিছুদিন হল মেচেতার দাগ ফুটেছে। মেচেতা ঢাকতে আজকাল জোর পাউডার মাখে বিউটি। আর এই সময় শব্দটা কানে যেতেই সে একটা চোখ রাখল শালপাতার ওপর। গাড়ির ঝাঁকুনিতে যতটা কাঁপা উচিত ততটাই কাঁপছে ওটা কিন্তু ওর ভেতরের বস্তুটা যেন নড়ছে। খচর খচর শব্দটা আসছে

সেই কারণে। শালপাতার ফাঁক দিয়ে লালচে মেটে দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল। আবার জিপ থামাল পারো। সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়া বন্ধ। হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙাটা তুলে নিয়ে সে মেটেটাকে দেখল। শের আলি দেওয়ার সময় মুখ থেকে কেটেছিল। আর এক পাশ কেটেছিল সম্ভবত আগেই, অন্য খদ্দেরকে দেওয়ার সময়। কিন্তু দুটোর বদলে একদিকে এখন কাটার দাগটা দেখা যাচ্ছে। অন্য দিকটা আর এবড়ো খেবড়ো ঠিক নেই। যদিও মোলায়েম হয়ে এপাশের মত পাতলা হয়ে যায়নি। কিন্তু কেনার সময় সে স্পষ্ট দেখেছিল দুদিকেই কাটার দাগ স্পষ্ট। হতভম্ব হয়ে গেল পারো। সে কি ভুল দেখেছিল? মেটেটাকে এখন আরও লাল দেখাচ্ছে। শালপাতায় মুড়ে সে বাঁ দিকের খোপের চাবি খুলে যন্ত্রপাতির মধ্যে ওটাকে রেখে দিয়ে ফের চাবি দিয়ে দিল

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে জলপাইগুড়িতে পৌঁছাতে আর বেশি সময় লাগেনি। সারাটা পথ ছিল নিরুপদ্রব। শহরে ঢুকে প্রথম দুটো সিনেমাহলের আশেপাশে হলুদ বাড়ি দেখতে পেল না। তৃতীয় হলটির সামনে এসে সে খুশি হল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাড়িটা। জিপ থেকে নামবার সময় হঠাৎ খচর খচর শব্দটা কানে এল। ড্যাশবোর্ডের বন্ধ ড্রয়ার থেকে আওয়াজ আসছে। পারোর শরীরে আচমকা হিম লাগল। গাড়ি এখন চলছে না। কানকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মরে যাওয়া পাঠার মেটে কি কখনও নড়াচড়া করে? হলুদ মাখিয়ে কইমাছ কেটে ফেলার পরেও সেটাকে নড়াচড়া করতে দেখেছে সে। এ পাঠাটা কি সেইরকম? পারোর মনে হল সে একটা মেটেভূতকে ওই বাক্সে বন্দী করে রেখেছে। খুলে রাস্তায় ফেলে দেওয়াই ভাল। কিন্তু তখনই শব্দটা থেমে গেল। কান খাড়া করেও কোন শব্দ শুনতে পেল না সে। এইসময় একটা লোক প্রায় তার ঘাড়ের কাছে এসে বলে উঠল, 'আরে! চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তুমি বাবুর বাড়ির ড্রাইভার না?'

মুখ ফিরিয়ে পারো পরপুরুষটিকে দেখতে পেল। দুঠোঁটের মধ্যে সিগারেট নিয়ে ফুক ফুক করে টানতে টানতে কথা বলছে। সে মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল। পরপুরুষ বলল, 'তা এখানে কি করছ চাঁদু? সিনেমার টাইম হয়নি।'

লোকটার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে ভেবে পাচ্ছিল না পারো। চুলটুলের কায়দা আছে। কোঁচানো ফসা ধুতি আর কলারতোলা পাঞ্জাবি। চেহারাটি অবশ্য স্বাস্থ্যবান নয়। এর মেটেটা কিরকম? আঃ। তার যদি একটা চোখ থাকত যা দিয়ে জামাকাপড়ের আড়াল ভেদ করে মানুষের পেটের মধ্যে মেটে দেখে নিতে পারত তা হলে কি আরামটাই না হত। একে সে দেখেছে কয়েকবার। বাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল। কমলির কাছে শুনেছে বাবু যখন বাড়ি থাকত না তখনই বউদির কাছে আসত।

'আমি সিনেমা দেখতে আসিনি। বউদির কাছে এসেছি।' পারো শক্ত মুখে জানাল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'আঁ! বল কি! বাবু পাঠিয়েছে? পাখি খাঁচা থেকে সবে বেরিয়েছে এবার ফুড়ুৎ করে উড়ার জন্য তৈরি, তা কি ব্যাপার?'

পারো উত্তর দিল না। লোকটা বুঝল। বুঝে বলল, 'ও, ঠিক আছে। চল আমার সঙ্গে। দেখা করবে কি না দেখো। এখন আমার সঙ্গেও চট করে দেখা করে না। বিশ্বাস হচ্ছে না? পাড়াশুদ্ধুর সবাই তো আমাকে দুষছে। পরের বউ ফুসলেছি। আরে আমি হলাম মই। মই বেয়ে উঠে যেই ডালের নাগাল পেয়ে যাই তখন আর মইয়ের দরকার কি?' বলতে বলতে লোকটা পারোকে নিয়ে হলুদ বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বসার ঘরে ঢুকে বলল, 'এই পর্যন্ত আমার অধিকার, বুঝলে? এই যে সোনার মা, না, না, আমি নই, তোমাকে বল তার স্বামীর ড্রাইভার এসেছে দেখা করতে। দরকারটা বলছে না।'

পারো দেখল ভদ্রলোক আয়াস করে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে

হাঁটুটাও ঠকাচ্ছে। এটা যাদের বাড়ি তাদের কাউকেই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না মিনিট অনেক অপেক্ষা করার পর বউদি এল। খুব বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও! কি ব্যাপার! এখানে কে পাঠিয়েছে?'

খুব ঘাবড়ে গেল পারো। সত্যি কথাটা বলতে দেরি করল না, 'কমলি।'

'কমলি! তার এত সাহস হল? কেন এসেছ?' বউদি দরজায় দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করছিল

'বাবুর শরীর খুব খারাপ।' বিনীত হয়ে জবাব দিল পারো।

'শরীর খারাপ তো আমার কাছে কেন? ডাক্তার দেখাও।'

'হরিমাধব ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে।'

এতক্ষণ লোকটা হাঁ করে শুনছিল। এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল 'জবাব দিয়ে গেছে? কি জবাব? মাল যদি আবার খায় তা হলে বাঁচানো যাবে না, তাই তো?'

মাথা নাড়ল পারো, 'না। বাবু আর এমনিতেই বাঁচবে না।

'তোমাকে কে বলল কথাটা?' লোকটা কাছে এগিয়ে এল।

'সবাই জানে। গঞ্জের সবাই। বিছানায় পড়ে আছে বাবু। তাই কমলি পাঠাল।'

বাঃ বাঃ, ও রানী, এখন কলকাতায় নয়, তোমার গঞ্জেই ফিরে যাওয়া উচিত। যা গেছে তা যাক, যা আছে তাই বিক্রি করলেও কলকাতায় বাড়ি হয়ে যাবে। মরার আগে আগে যাওয়া দরকার তোমার। হাজার হোক, তুমি ওর বিয়ে-করা বউ, প্রকৃত উত্তরাধিকারী।' লোকটা হাসল।

বউদি ঠোঁট কামড়ালেন, 'সে আমার মুখ দেখবে না বলেছিল।'

'অ্যাই! চোখ চেয়ে দেখে কথা বলার অবস্থায় আছে নাকি তোমার বাবু?'

'আজ্ঞে না।' পারো জবাব দিল। যদিও এই ব্যাপারটা সে স্পষ্ট জানে না।

লোকটা খুশি হল, 'ব্যস। যে চলে যাচ্ছে সে আর কি বলবে। বরং পাঁচ পাবলিক বলবে কি সতীসাধ্বী স্ত্রী গো, স্বামী নিঃশ্বাস ফেলার আগে ফিরে এল।'

'কি যা তা বলছ?' বউদি গলা তুলল।

'ঠিকই বলছি। এখন না গেলে সম্পত্তি কে কোথা থেকে হাতিয়ে নেবে তার হদিশ পাবে না। খুড়তুতো মামাতুতোরা নেই? তখন মামলা করে খোসা পাবে। আমার কি? এখন আমি চললাম আটটা। কলকাতায় যাওয়ার আগে গুছিয়ে নাও।'

'বেশ। যখন এত করে বলছ। কিন্তু আমার যাওয়ার বাসনা ছিল না। যে বাড়ি একবার ছেড়ে এসেছি অত্যাচারিত হয়ে সেখানে আবার পা রাখব—! তা বলছ যখন এত করে।' বউদি নিজের মনে বলছিল।

তা হলে বিলম্বের দরকার নেই। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে আনি।

'তুমি যাবে?' বউদিকে চিন্তিত দেখাল, 'আচ্ছা চল, একা যেতে ঠিক সাহস হচ্ছে না

সমস্ত পথ পারো মুখ বুজে জিপ চালাল। লোকটা কত রকমের পরামর্শ দিল বউদিকে তার হিসেব নেই। বউদি কিন্তু জিপে ওঠার পর মাথায় ঘোমটা দিয়েছে আর চুপটি করে বসেছে সে লোকটাকে এও বলতে শুনল, 'আমি তোমার উপকার করে যাব। জানি বাবুর প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যে তুমি আমায় বেছেছিলে, মনে নাওনি একবারও, তবু। তা বলি কি, কলকাতা হল বিরাট জায়গা। তোমার ভগ্নীপতির বন্ধু যতই স্বপ্ন দেখাক তোমার থাকা উচিত এখানেই চেনা পরিবেশে মানুষ স্বচ্ছন্দে থাকে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। যদি গিয়ে দেখে বাবু আর নেই তো হয়ে গেল। বউদি গাড়ি রাখবে বলে মনে হয় না। স্টার্ট বন্ধ করতেই বউদি বলল, 'শোন, তুমি একবার ওপরে গিয়ে দেখে এস আগে।'

'আমি যাব?' লোকটা খুব ঘাবড়ে গেল।

'কে জানে, যদি ফাঁদ হয়, যদি ওকে মিথ্যে শিখিয়ে পাঠিয়ে থাকে।'

'তা হলে আমি গেলে তো হাড় ভেঙে দেবে। আই, তুই সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ।' পারো গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। আর এই সময় কমলি ছুটে এল বাইরে, 'বউদি এসেছে?' তাকে ঘাড় নাড়তে দেখে কমলি চিৎকার করল, 'ও বউদি, তাড়াতাড়ি আসুন, বাবু মরে যাচ্ছে। ও বউদি—'

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে বউদি ছুটল বাড়ির ভেতর, পেছন পেছন লোকটা। বাবু মারা যাচ্ছে! তার মানে শেষ সময় এগিয়ে এসেছে। পারোর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই ক'দিনের আরামের চাকরি চলে গেল — তার খুব কান্না পাচ্ছিল। এবং এখনই সে খচর মচর শব্দটা শুনতে পেল। সারাটা পথ খেয়ালই ছিল না ওটার কথা। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে খোপের ভেতর থেকে শালপাতার ঠোঙাটাকে টেনে বের করতেই দেখল ফাঁকা। ওটা খানিক ঝুঁকে ড্রাইভারের ওপর লাফাতে যেটাকে দেখতে পেল, সন্তর্পণে ড্রাইভার ধরে ওটাকে বাইরে বার করে আনতেই মনে হল বুকটা একবার কেঁপে উঠল। হয়তো চোখের ভুল কিন্তু যেটা সত্যি সেটা হল মেটের শরীরের কোথাও আর শর আলের ছাপের দাগ নেই। একেবারে নিটোল। শুধু ওটা যেন একটা ছোট কাছিম, ঠিক মাঝখানে উঁচু আর চারপাশে পাতলা হয়ে নেমে গেছে। কোথাও কোন খাঁজ নেই, কোথাও কাটার চিহ্ন নেই। অথচ এমনটা ছিল। এই মালায়েম গোলাকার ছিল না মেটেটা। পারোর মাথা ঘুরতে লাগল। জিপের গায়ে হেলান দিয়ে সে এবার হাতের তেলোয় মেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। না, কোন খচর মচর শব্দ নেই, নড়ছেও না একটু। এতক্ষণ ওসব যদি শোনার ভুল হয়ে থাকে তা হলে মেটের চেহারা পাল্টে গেল কি করে? কিন্তু সেই টুকটুকে লাল রঙটা কি জেল্লা হারিয়েছে? ততটা লাল আর নয় বলে মনে হচ্ছে। কেন এমন হল? হয়তো অনেকক্ষণ পাঁঠার শরীর থেকে আলাদা হয়ে থাকায় রঙটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মেটের গায়ে কোন রক্ত বা রস নেই। সে যত্ন করে বুক পকেটে রেখে দিল ওটাকে। তারপর পায়ে পায়ে ভেতরে পা বাড়াল। সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে। চোরের মত নেমে আসছে। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি করি বল তো? জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত ওঁকে।'

'কেন?' প্রশ্নটা করতেই বুক কেঁপে উঠল, নাকি মেটেটা নড়ল? বাবু তা হলে মরেনি এখনও।

'এখানে থাকলে রাত পোহাবে বলে মনে হয় না।' লোকটা সত্যি উদ্বিগ্ন। এদিকে সন্ধে হয়ে এল। এই সময় কমলি এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে, 'বউদি বলল আপনাকে আজ চলে যেতে। বাবুকে নড়ানো যাবে না।' তারপর পারোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সারাদিন তো মুখে কিছু দাওনি। ঘরে ভাত ঢাকা আছে।'

কমলি চলে যেতে লোকটা চোখ ছোট করল, 'আমেদাবে মিশে যাচ্ছে। লাস্ট বাস কখন?'

'আমি জানি না।' পারো কথা শেষ করতে না করতেই লোকটা বেরিয়ে গেল।

বাবুর গায়ের রঙ কালচে হয়ে গেছে। মুখ হাঁ হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে এখন। মাথার পাশে একটা চেয়ারে বউদি বসে। বাবুর পেটের দিকে তাকাল পারো। নির্ঘাৎ বাবুর মেটে পচে গলে যাচ্ছে এখন। এই মানুষটি জুয়া খেলে বিউটির ঘরে মাল খেয়েছে কে বলবে। বউদির শরীর ভারী। কমলির মত কাঠি কাঠি নয়। পারো বউদির পেটের কাছে খোলা চামড়া দেখতে পেল খানিক। ঝুঁকে পড়ে বউদি তখন বলছিল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁ গো, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

বাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বউদি, 'খাও, আরও মদ খাও। আমার কথা তো শোননি।'

বউদির মেটে কি রকম হবে? পারোর মনে হল নির্ঘাৎ বউদির মেটে লাল নয়। শুধু শরীর ভাল হলেই মেটে লাল হবে মনটাকে সেই সঙ্গে ভাল হতে হবে না? পাঁঠারা কারো ক্ষতির কথা ভাবে না, শরীর ভাল হলেই ওদের মেটে লাল হয়। হঠাৎ বুক পকেটটা থরথরিয়ে উঠল। এবার আড়চোখে পকেটের দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল পারো। মেটেটা নড়ছে। তার বুকপকেট থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। চট করে বাঁ হাত দিয়ে সে মেটেসুদ্ধ পকেটটা চেপে ধরতে চাইল। আর তখনই কমলি এসে দাঁড়াল পাশে, 'উঃ। একেই বলে পুরুষ মানুষের মন। বাবু যাচ্ছে স্বর্গে আর তুমি জুলজুলিয়ে বউদির শরীর দেখছ? অন্য সময় এমন ভান করে থাকো—। পকেটে কি আছে?'

এত বড় একটা অভিযোগের ধকল সামলে উঠতে পারল না পারো। কথাগুলো এমন গলায় বলেনি কমলি যাতে বউদির কানে যাবে না। কাঁটা হয়ে সে দেখল বউদি বাবুকে ছেড়ে এবার তার দিকে মুখ ঘোরাল। আর একটু আড়ালে সরে যেতেই বউদির গলা ভেসে এল, 'ওখানে কে কমলি?'

'ইয়ে, পারো এসেছে। কমলির জবাব এবার বেশ নরম গলায়। বউদি কথা বাড়াল না। কিন্তু কমলি ছাড়ার মেয়েছেলে নয়, 'বুকপকেটে কি রেখেছ, হাত সরাচ্ছ না যে বড়?'

'কিছু না।' জবাবটা দিতেই মেটেটা নড়ে উঠল আচমকা।

'তুমি আমাকে মিছে কথা বলছ? অ্যা' তোমার জন্যে ভাত ঢেকে রাখি না আমি?

মেটে আছে। মেটে।' সমস্যা চাপা দিতে জবাব দিল পারো।

'মেটে? ওমা' মেটে কেউ পকেটে রাখে নাকি' কি অনাসৃষ্টির কথা গো' দেখি।' হাত বাড়াল কমলি। অতএব ওটাকে বের করতে বাধ্য হল পারো। সঙ্গে সঙ্গে হিসহিসিয়ে উঠল কমলি, 'তুমি কি মানুষ? অ্যা' বাড়ির কর্তা মরতে বসেছে তবু তোমার খাওয়ার এত নোলা।'

পারো কাঁটা হয়ে ছিল। কমলির সামনে যদি মেটেটা লাফিয়ে ওঠে' কিন্তু তার আগেই কমলি সেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল 'রাঁধতে তো হবে আমাকেই। বাবুর যদি রাত কাটে তা হলে কাল দুপুরে খেতে পাবে। এবার ভাতগুলো গেলো গিয়ে।'

পুরো ভাত খেতে পারল না পারো। মেটেটাকে হাতছাড়া করার পর থেকেই মন খিচড়ে গেছে। খিদেটাও চলে গেল। হাত মুখ ধুয়ে দাওয়ায় বসতেই সে চাঁদের আলো আর ব্যাঙের ডাক শুনতে পেল। কাল সন্ধেবেলায় যখন চাঁদ উঠেছিল আজ না ওঠার কোন কারণ নেই' আর ব্যাঙগুলো খিদে পেলেই এই সময় ডাকে। শুধু খিদে নয় মৃত্যু-ভয়েও তো ডাকে। দরজার ফাঁক থেকে লাঠিটা নিয়ে সে পা টিপে টিপে বাগানে নামল। বাতিল একটা চৌবাচ্চায় বসে ডাকছে ব্যাঙগুলো। এই বিশেষ ধরনের প্রাণীগুলোকে সেই ধরে এনেছে আঙরাভাসা নদীর ধার থেকে। বঁড়শিতে বিঁধিয়ে ভোর রাত্রে ডুড়য়ার জলে ফেলে দিলেই মাছ আসবে ধেয়ে। ব্যাঙগুলো ধরাই আছে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় পাচ্ছে না সে। দুদিন আগে একটা ঢোঁড়া সাপকে দেখেছিল চৌবাচ্চার কাছে আসতে। সে ব্যাটাই এসেছে আজ। লাঠিটা উঁচিয়ে কয়েক পা এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল। লোকটা বলল, 'এর মধ্যে ব্যাঙ আছে নাকি? আমি কাছে আসতেই এমন চেঁচিয়ে উঠল যে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ইয়ে হল কি, বাস পেলাম না। লাস্ট বাস চলে গেছে। তোমার বউদি কি চীজ জানো তো' তাই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে এলাম।'

লোকটা তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে যাওয়া মাত্র যে ব্যাঙগুলো চুপ করে গেল তা টের পেল পারো। বাবুর বাড়ির লাগোয়া বাগানের শেষ প্রান্তে তার এই ঘর। এখানে যে লোকটা সেঁধোবে তা সে ভাবতে পারছে না। ঘরে ফিরে গিয়ে দেখল লোকটা খাটিয়ার ওপর আরাম করে বসেছে, 'বাঃ, খাসা ঘরটি। ডাইরেক্ট চাঁদ থেকে আলো আসে। কাউকে বলার দরকার নেই

এখানে আমি আছি। তুমি আমাকে দ্যাখো আমিও দেখব। ওই ঝি-টা এই ঘরে আসে নাকি? আসে না। যাক, তবু বাঁচোয়া।'

লোকটা এবার সিগারেট ধরালো, 'ব্যাঙ পুষছ?'

পারো মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। লোকটা বলল, 'ভাল। বড় মাছ ব্যাঙ খায়। আমি অবশ্য দেখিনি কখনও। যে মাগীটার কাছে তোমার বাবু যায় তার নাম বিউটি, না?'

পারো আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। লোকটা কিছুক্ষণ সিগারেট টানল, দু পয়সা যদি রোজগার করতে চাও তো আমার কথা শোন। তুমি তো লোক খারাপ নও। যার জন্যে চুরি করলাম সেই এখন চোর বলছে। বিউটির কাছে আমাকে নিয়ে চল, বুঝলে?

অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল পারো। বিউটির কথা অবশ্যই এ তল্লাটে সবাই জানে। কিন্তু এ কেন সেখানে যেতে চায়? পারো মাথা নাড়ল, 'বাবু জানতে পারলে মেরে ফেলবে।'

'যে লোকটা খাবি খাচ্ছে সে জানবে কি করে?'

'আমি বাবুর নুন খেয়েছি আপনার কথা শুনতে পারব না।

'অ।' লোকটা মাথা নাড়ল 'তা ভাল। রাতটা আমায় এই ঘরে কাটাতে দেবে তো?'

পারো কিছু বলল না। লোকটা তার খাটিয়ায় শরীর এলিয়ে দিল, 'বড় ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে হে। তবে তোমার এই ব্যাঙপোষা ভাল জিনিস নয়। ব্যাঙের লোভে সাপ আসে।

পারো নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। লোকটাকে কি বউদি তাড়িয়ে দিল? তাই কি যার জন্যে চুরি করি কথাটা আওড়ালো লোকটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিউটির কথা মনে পড়ল ওর। লোকটা বিউটিকে খুঁজছিল। মেয়েছেলেটা বাবুর অনেক টাকা ঝেড়ে নিয়েছে। এখন মরার সময় হয়তো জানতেও পারছে না খবরটা আর জানলেই যেন ছুটে আসবে এখানে। এলেই বা কি, তাতে বাবুর জীবন তো ফিরবে না।

আজ রাত্রে ঘুমের যখন চান্স নেই তখন মাছ ধরতে যেতেই হয়। ব্যাঙের চৌবাচ্চার পাশে বসে চাঁদ দেখতে দেখতে কথাটা ভাবল পারো। তারপরেই জিভ কামড়ালো। বাবুর যখন মরণের সময় তখন মাছ ধরার কথা ভাবছে? ছি। পারো উঠে বাগান পেরিয়ে ভেতর বাড়িতে ঢুকল। সন্ধে হয়ে যাওয়ার পর এই বাড়ি আরও নিঝুম। অবশ্য বাবু সুস্থ থাকলে এ বাড়িতে বসে সন্ধ্যে দেখা হয় না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সে বারান্দায় পা দিল। কোথাও কোন শব্দ নেই। কমলি নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। বাবুর ঘরের দরজার দিকে এগোতে সে খচর মচর শব্দটা শুনতে পেল। সারাদিনে শব্দটায় এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে পারো চমকে চারপাশে তাকাতে লাগল। এবং তখনই দরজার সামনে ওটাকে দেখতে পেল। চটজলদি মেটেটাকে তুলে নিল পারো। চেহারাটা একই রকম আছে শুধু আকারে সামান্য বড় লাগছে। কিন্তু এটা এখানে এল কি করে? রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় কমলির হাত থেকে কি পড়ে গেছে? শালপাতাটা তো আলগা ছিল। মেটেটাকে বুকপকেটে রেখে দিল পারো। তারপর দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। বাবু শুয়ে আছে চোখ খুলে। খাবি খাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। বউদিকে দেখা যাচ্ছে না। বাবুর জন্যে খুব কষ্ট হল পারোর। সে পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল।। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর খচর মচর আরম্ভ হল। বাঁ হাতে বুক চাপল পারো। জামার আড়াল সত্ত্বেও হাতের মুঠোয় মেটেটার বিক্ষোভ সে টের পাচ্ছে।

এবার বাবুর নজর পড়ল তার ওপর। যেন চিনতেই পারছে না। পারোর গলা ভেঙে গেল, বাবু। বাবুর ঠোঁটে হাসি ফুটল। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'বিউটিকে বলিস আর যেতে পারলাম না।' এ কি কথা শুনছে সে। শেষ সময়ে মানুষ মেয়েছেলের কাছে যাওয়ার চিন্তা করে? আর তখনই বউদি ঘরে ঢুকলো। বাবু তার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। মুখ চোখ বেঁকে গেল আবার। বউদি এর মধ্যে কী পোশাক পাল্টেছে। বাবুর মাথার কাছে বসে ওষুধ গ্লাসে

ঢেলে বলল, 'এটা খেয়ে নাও। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ওষুধ খেতেই হবে। আমার সেবায় যদি মন না ভরে তা হলে তোমার বিউটিকে ডেকে পাঠাব?'

বাবু এবারও জবাব দিল না। বউদি একবার পারোর দিকে আড়চোখে দেখে নিল, 'সেই লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি এ বাড়ি থেকে। কলকাতায় যাব ভেবেছিলাম, আর যাব না। এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর কেউ আমার শরীর ছোঁওয়ার সুযোগ পায়নি, বুঝলে? নাও, ওষুধ খাও।

বাবু বলল, 'আমাকে একটু মদ দাও। মদ খেলে ব্যথা কমে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল বউদি, 'ইল্লি আর কি।'

হঠাৎ নিচের বাগানে কমলির চিৎকার ভেসে এল। কমলি চেঁচাচ্ছে, 'কে? কে আপনি?' আর তারপরেই সব চুপচাপ। বউদি ওষুধ রেখে তড়াক করে উঠে পড়ল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পারো কমলির আর্তনাদ শুনেছিল। কিন্তু বাবুর জন্যে এত মন খারাপ হয়েছিল যে সে নড়ল না। বিছানার নিচে বসে বাবুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে। আর তখনই বউদির চিৎকার ভেসে এল, 'পারো!'

এক ঝটকায় নিজেকে তুলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বাগানে নেমে এল পারো। বউদি তার ঘরের সামনে। মা কালীর মত ভঙ্গী শুধু জিভটা বের করা নেই। ওকে দেখামাত্র বউদি চিৎকার করল, 'একটা পুরুত ডেকে আনতে পারবি?'

সন্ধে পেরোনো রাতে এমন হুকুম শুনবে ভাবতে পারেনি পারো। সে কাছে এগিয়ে দেখল কমলি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে তার খাটিয়ার পাশে। আর লোকটা সেখানে বসে। বউদি বলল, 'নিয়ে আয় পুরুত। আজ রাত্রেই এদের বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।'

এবার কমলি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'বিশ্বাস কর বউদি, আমার কোন দোষ নেই।'

'দোষ নেই? তুই এই ঘরে কি মতলবে এসেছিলি?'

'পারো আমাকে মেতে দিয়েছিল। সেটা পাচ্ছিলাম না রান্নাঘরে। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।'

'মেটে দিয়েছিল? যারা মানুষ মরতে বসেছে আর তোকে মেটে দিয়েছিল?'

'দিব্যি করে বলছি। তা আমি কি জানি অন্ধকারে এ মিনসে শুয়ে আছে? ডাকছি পারো ভেবে, উঠবে না। তখন পিঠে হাত দিয়ে ডাকতেই আমাকে জড়িয়ে ধরল।' কমলি মুখ নামাল।

'জড়িয়ে ধরল! তা একবার চিৎকার করে থেমে গেলি কেন?' বউদি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

মুখ নামিয়ে কমলি বলল, 'উনি চিৎকার করতে দিচ্ছিলেন না। তুমি বকবে সেই ভয়ও হচ্ছিল।'

'ছি ছি ছি। তোমার চরিত্র এই? আমাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার আগে দিনরাত গুজুর গুজুর করে প্রেমের বাক্য শোনাতে আর একটা ঝি-এর সঙ্গে এসব করছ?' বউদি ধিক্কার দিল।

'এবার মুখ খুলি সুন্দরী। রাজভোগ বাসি ঠাণ্ডা হলে তার চেয়ে গরম গরম আলুসেদ্ধ ভাত ঢের বেশি উপাদেয়। তোমার বুকের মধ্যে হিমালয়ের সব বরফ জমা, বাবু পারেনি গলাতে, আমিও না। যাকে ঝি বলছ তার ভেতরে যে উত্তাপ তা তুমি এ-জীবনে সঞ্চার করতে পারবে না।' লোকটা বসিয়ে বসিয়ে কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়াল।

'দূর হও, দূর হও সামনে থেকে। এই মুহূর্তে এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও।' বউদি আর দাঁড়াল না। হনহনিয়ে বাগান ডিঙিয়ে চলে গেল ভেতর-বাড়িতে। লোকটা কমলির দিকে তাকাল, 'শুনলে তো! তা তুমি যদি চাও তো আমার সঙ্গে যেতে পারো।'

কমলি কোন জবাব দিল না। লোকটা ওর পাশে এসে দাঁড়াল, 'আমি মানুষ মন্দ নই। তবে

'সে তো তা করতে পারব না বাপু যাবে তো চল।' কর্মলি সরে দাড়াল, মুখ তুলল না।

লোকটা এবার বাইরে বেরিয়ে এল। উদাস গলায় বলল 'দুধ, বিউটির ওখানে কি করে পৌঁছানো যায়। আমে দুধে মিশে যায় কিন্তু আঁটি থেকে গেল বেরোয়।' জ্যোৎস্না মেখে লোকটা চলে যাওয়ার পর পারো কান্না শুনল। তার ঘরের মেঝেতে বসে পড়ে কর্মলি কাঁদছে। মেয়েটার মুখ যাই হোক তার যত্নআত্তি তো কিছু কিছু করত। [illegible] কথাটা বলল সেটা কি ঠিক? বউদি যদি বরফ তবে ওর ভেতরে উত্তাপ আছে? নতুন চোখে কর্মলির দিকে তাকাতেই ওর বুকটা যেন নড়ে উঠল। পুরো বুকে হাত দিল আর তখনই তার খেয়াল হল বুকপকেটে মেটেটা নেই। সে চকিতে পায়ের দিকে তাকাল। সব কিছু বিস্মৃত হয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল জ্যোৎস্নার আলোয় সেই পথটা খুঁজে দেখল। তারপর প্রায় সম্মোহিতের মত দোতলায় উঠে গেল না, কোথাও নেই। মহামূল্যবান কিছু হারিয়ে [illegible] এখন তার বুকে [illegible] উঁকি মারল সে।

বউদি খাটের পাশে চেয়ারে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। বাবু শুয়ে আছে টানটান। পারো কাঠ হয়ে গেল বাবু কি মরে গেল? সে পায়ে পায়ে বাবুর কাছে গিয়ে দাড়াতেই বউদি মুখ তুলল। সাদা মুখে [illegible]। বউদি জিজ্ঞাসা করল [illegible] হয়েছে?'

[illegible] বাবু মরেনি? মৃতদেহের সামনে বসে [illegible] মাথা নাড়ল। বউদি আবার জিজ্ঞাসা করল 'হাবাগোবাটা গিয়েছে সঙ্গে?' পারো মাথা নেড়ে না বলল।

বউদি নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল 'তুমি এখানে বসো। আমি বাথরুম থেকে আসছি।' বউদি চলে গেলে সে বাবুর মুখের দিকে তাকাল না। নিঃশ্বাস পড়ছে বাবু মরেনি। ঘুমাচ্ছে কিন্তু বাবুর মুখের সেই কালচে ভাবটা কমল কি করে? অতটা অসুস্থ তো দেখাচ্ছে না। এটা কি তার চোখের ভুল? এই সময় বাবু ঘুমের ঘোরে কঁকিয়ে উঠল, আর বাবুর একটা হাত [illegible] [illegible] শব্দটা উঠেছে [illegible] [illegible] চমকে উঠল পারো। শব্দটা [illegible] বাবুর পেট থেকে। সে ঝুঁকে পড়ল। বাবুর পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি, ওপরে চাদর টানা [illegible] [illegible] সেটাও নেমে এল। এর তখনই [illegible] [illegible] [illegible] আছে [illegible] মাঝামাঝি [illegible] [illegible] আরও [illegible] দেখাচ্ছে। [illegible] ছিনিয়ে [illegible] বাবুর পেটের ওপর থেকে। [illegible] ছিল। বাবু যন্ত্রণায় [illegible] উঠল। মেটেটাকে পকেটে পুরে পারো [illegible] এটা এখানে [illegible] কি করে? বুকপকেটে খচর মচর করছে এখন মেটেটা [illegible] [illegible] বাবু চোখ মেলল 'পারো, একটু মদ দিবি?'

পারো জবাব দিতে পারল না। বাবু জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে?' এবার পারো বলল 'মদ নেই।'

'আছে। তোর জিপের সিটের তলায়।'

এই সময় বউদি ঘরে ঢুকল। বেশ তাজা দেখাচ্ছে এখন। ঘরে ঢুকেই ছুটে এল বউদি 'ওগো, তুমি কথা বলছ? কেমন লাগছে? [illegible], আমি [illegible], ফিরে এসেছি।'

বাবু মুখ ফিরিয়ে নিল। বউদি দু'হাতে বাবুকে জড়িয়ে ধরল 'মুখ ফিরিও না। আমি কি এতই খারাপ? আমি কি শুধুই বরফ?'

'পারোকে বল মদ আনতে।'

'না-না। তুমি এখন মদ খাবে না আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। কেমন লাগছে?'

'এতক্ষণ ভাল ছিলাম। আবার যন্ত্রণা—।' বাবু মুখ বিকৃত করল।

বুকপকেটে খচর মচর আরম্ভ হল বাবু এতক্ষণ ভাল ছিল? এতক্ষণ তো এই মেটে বাবুর শরীরে লেগে ছিল। সরিয়ে নিতেই যন্ত্রণা বাড়ছে বউদির পেছন দিকে সে। সন্তর্পণে বুকপকেট

থেকে মেটেটা বের করে চাদরের তলা দিয়ে বাবুর পেটের ওপর রাখতেই সেটা পিছলে খানিকটা সরে গিয়ে সেঁটে বসল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাবু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আঃ।

বউদি এখন বাবুর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বাবু সেটা উপভোগ করছে। বাবু বলল 'তুমি যে চলে এলে বড়'

বউদি বলল, 'কথা বল না। আমি আর যাব না।'

'কিন্তু আমি তো মরে যাব।'

'তোমাকে আমি মরতে দেব না।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

বাবু ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। বউদি তৃপ্তির হাসি হাসল। পারোর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'মুখটা এখন অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছে, না?'

পারো মাথা নাড়ল। বউদি বলল, 'কাল সকালে হরিমাধব ডাক্তারকে ডেকে এনো।

পারো আবার মাথা নাড়ল। বউদি বলল, 'কমলিকে বলো, আর যেন না হয়, এবার ক্ষমা করলাম।'

পারো চুপ করে রইল। বউদি জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি রান্নাবান্না করেছে?

পারো মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না।'

'মেটের কথা বলছিল। মেটের ঝোল আর ভাত হলেই তো হয়। বাবুর যদি ঘুম না ভাঙে তা হলে ওষুধ দেব না। আর হ্যাঁ, বিউটিকে কাল একবার ডেকে এনো তো'

ঘুমন্ত বাবুর দিকে তাকিয়ে পারো জিজ্ঞাসা করল, 'বিউটিকে?'

'হ্যাঁ। বাবু বেঁচে থাকলে তারও তো লাভ। ওখানে গেলে যেন মদ না গেলায় বলব

পারোর মাথায় কিছু ঢুকছিল না। বউদি এত পাল্টে গেল কি করে' এখনই বাবু চোখ মেলল মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। বাবু বলল, 'বিউটিকে যা টাকা দিয়েছি তারপর আর ওর কাছে যাওয়ার দরকার হবে না। কথাটা শোনামাত্র বউদি বাবুর মাথায় মুখ রাখল। রেখে কেঁদে উঠল। পারো যে পেছনে দাঁড়িয়ে সে খেয়ালও নেই। পারো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখল চাদরের একটা পাশ যেন কিছুর চাপে ঝুলে পড়েছে। সে সন্তর্পণে দু'জনের চোখ এড়িয়ে হাত ঢোকাতেই মেটেটাকে পেল।

মুঠোয় ওটাকে নিয়ে নিচে নেমে এল পারো। সেই পেলব মোলায়েম অনুভূতিটা আসছে না কেন? জ্যোৎস্নায় মুঠো খুলতে অবাক হয়ে গেল পারো। মেটেটার সর্বাঙ্গে কাঁটা কাঁটা খাজ অনেকটা কাঁঠালের শরীরের মত। সেই মসৃণ তুলতুলে ব্যাপারটা উধাও। আর ওর শরীরের কোথাও লাল রঙ খুজে পাওয়া গেল না। একটা পাতায় জড়িয়ে মাটিতে রেখে উবু হয়ে বসল পারো। ঘন্টাখানেক নজর রাখল। কিন্তু খচর মচর শব্দ দূরের কথা একটুও নড়াচড়া করল না বস্তুটা। দুঃখিত মুখে পারো চাঁদ দেখল। মাঝ আকাশে চলে এসেছে। ওটাকে নিয়ে জিপের কাছে চলে এল সে। তারপর বাবু যে সিটে বসত তার তলায় হাত ঢোকাতে একটা হাঁড়িয়ার বোতল খুঁজে পেল। এটাকে কখন রেখেছিল বাবু? আর এটার কথা যখন খেয়াল আছে তখন বাবুর মাথা ঠিক কাজ করছে। পারো নিজে কখনও মদ খায়নি। হাঁড়িয়ার বোতলটাকে ছুঁড়ে দিল দেওয়ালের দিকে। ঠঙ করে কাঁচ ভাঙার শব্দ আর সেইসঙ্গে মদের গন্ধ ভেসে এল। পারো অবাক হয়ে দেখল পাতায় রাখা মেটেটা একটু নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে নিয়ে দেওয়ালের ধারে ছুটে গেল সে। বোতলের অর্ধেকটা উড়ে গেছে। মদ ছড়িয়ে আছে মাটিতে। মেটেটা যেন তার গন্ধ পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। পাতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বোতলের বাকি

অংশ খানিকটা মদ নিয়ে তেরচা করে পড়েছিল। সন্তর্পণে সেটাকে তুলে নিয়ে মদের ভেতর মেটেটাকে ছেড়ে দিল পারো। সাঁতার কাটছে এমন ভঙ্গিতে পাক খেল মেটেটা। কিন্তু চাঁদের আলোয় মদের রঙ পাল্টে যাচ্ছে বলে মনে হল। আলকাতরার মত কিছু বেরিয়ে আসছে মেটের শরীর থেকে।

মদটা ফেলে দিয়ে মেটেটাকে বের করে দেখল ওটা নরম হয়ে গেছে। পাতায় মুড়ে সে ব্যাঙের চৌবাচ্চার কাছে এল। ভেতর-বাড়ির ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। এখন মধ্য রাত। বউদি কি জেগে আছে বাবুর পাশে? এখন ব্যাঙ তুলে মাছ ধরতে গেলে কেমন হয়?

ছিপ নেওয়ার জন্যে ঘরে ঢুকতেই সে কমলিকে দেখতে পেল। সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে মেয়েটা। বড় দুঃখ হল পারোর। কাছে গিয়ে সে ডাকল, 'কমলি, এই কমলি?'

কমলি মুখ তুলল। পারো বলল, 'বউদি তোর খোঁজ করেছিল।'

'আমি—আমি মরে যাব।' কমলি কেঁদে উঠল।

'কেন?'

'আমাকে জোর করে—।' কমলি কথা শেষ করল না।

'বউদি তোকে তাড়াবে না।'

'তুই?'

হাঁ হয়ে গেল পারো। সে তাড়াবার কে? কমলি এগিয়ে এল তার পাশে, 'তুই আমাকে ঘেন্না করলি? বল, তা হলে আমার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।'

শরীরে তাপ লাগল যেন। লোকটা বলেছিল কমলির শরীরে উত্তাপ আছে। এর আগে কমলি তার এত কাছে কখনও আসেনি। পারো মাথা নাড়ল, না।

সঙ্গে সঙ্গে পারোকে জড়িয়ে ধরল কমলি, 'বাবু কি মরে যাবে?'

'না। চেহারা অনেক ফর্সা হয়ে গেছে। বউদি সেবা করছে।'

'আমার ওপর তোর রাগ হয়েছে?'

'না।' পারোর উত্তাপ তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু কমলি তাকে বাধা দিল, 'আজ না।'

'কেন?'

'আজ আমার ঠোঁট এঁটো হয়ে আছে। সকাল হোক, মুখ ধুই, তবে—।'

পারো নিঃশ্বাস ফেলল। কমলি বলল, 'একটা রাত তো। কিছু খাসনি?'

'না।'

'রান্না নেই কিছু। খিদে পেয়েছে খুব।'

'খাবি?' পারোর মনে পড়ল। পাতার ভেতর থেকে কুচকুচে কালো মেটেটা বের করল সে।

'কি?' কমলি প্রশ্ন করল।

অন্ধকার এখন এ ঘরে ঢুকছে। চাঁদ ঢলছে। চাপ দিতেই মেটেটা দু ভাগ হল। একভাগ মুখে দিতেই গলে যেতে লাগল। পারো অন্য ভাগটা কমলির মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে নে। বেশ নরম।'

কমলি জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে এটা?'

'সেই মেটেটা।'

'কোথায় পেলি?'

'পেয়েছি।'

'এত সেদ্ধ হয়ে গেল কি করে? আঃ। কি নরম!'

'একটু পচা পচা গন্ধ লাগছে না?'

ও। কিন্তু ওটাই ভাল লাগছে।'

পারোর মনে হল তার সমস্ত শরীরে অন্য রকম একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। একটু মদ খেলে কেমন হয়? সে কমলির মুখের দিকে তাকাল। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে কমলির মুখ চোখ অন্য রকম হয়ে উঠেছে। পারো তাকে কাছে টানল। কমলিও ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে পারো বলল, 'বউদি যদি এসে পড়ে ডাকে?'

কমলি বলল, 'ডাকলেই হল। নে, কথা বাড়াস না।'

পারো বলল, 'কি যেন বলছিলি? এঁটো—।'

'দুর!' কমলি হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'মানুষের ঠোঁট আবার এঁটো হয় নাকি? গঙ্গাজল।'

রাজার মত যাওয়া

আজকাল রাত না ফুরোতেই ঘুম ভেঙে যায়। আসলে ঘুম বলা ঠিক উচিত নয়, ঘুমের একটা ঘোর ঘোরের ব্যাপার শুরু হয় একটা নাগাদ। তারই চটকা ভেঙে যায় অন্ধকার কাটতে না কাটতেই। তারপর বিছানায় শুয়ে ছটফট করা আর জানালা দিয়ে আকাশ দেখা। ভোরের আকাশ দেখা একটা দারুণ ব্যাপার। এটা এক ধরনের নেশা হয়ে গেছে অবনীর। নীল বেনারসী শাড়ির মত আকাশটা জমজমে আকাশটা ক্রমশ উদাস উদাস হয়ে যায়। জ্বলে যাওয়া শাড়ির বাড়ের মত নেতিয়ে যায়। যে তারাগুলো এতক্ষণ মাত করে রেখেছিল দাপটে সেগুলোকে চোখের পাতার মত হয়। তারপর একসময় দুটো বেলুনের মতন বাতাস চুপসে যায়। ভোরের চটকা বাতাস আর মেয়োদের অল্প হেসে কম মেয়ের হাতের চেয়ার মত ভোরের রোদ্দুর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অবনী চুপচাপ দ্যাখে এ পাশের জানলায় আকাশ আর পাশ ফিরলেই সুনীপা, একদম ঘুমে কাদা হয়ে সাত বছরের বাচ্চার মত গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে সুনীপা।

বিছানার ওপর উঠে বসে অবনীভূষণ ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল। সারারাত একটা জিরো পাওয়ারের নীলচে আলো জ্বেলে রাখে সুনীপা। অন্ধকারে থাকতে খুব ভয় ওর। যদিও এখন রাত নেই তবু এই আলোটা সারা ঘরে দুঃখের সরের মত জড়িয়ে আছে। অবনীভূষণ মাথার কাছে রাখা মাঝারি টেবিলে ভর্তি ওষুধগুলো দেখল। এগুলো কি হবে? সব তো শেষ হবে না। এত দামী দামী ওষুধ সব।

ভোরবেলায় এ সময়টায় ওর রোজই সুনীপার জন্যে কষ্ট হয়। এই সময় দেওয়ালে আলোর নিচে দাঁড়ালে তার আর সুনীপার ছবিটাকে বড্ড ঝকঝকে দেখায়। তিন বছর আগের তোলা ছবি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে এক দোকানে ছবিটা তুলেছিল ওরা। বিয়াল্লিশ বছরের অবনীভূষণ আর তার দু বছরের ছোট সুনীপা। একটু বেশী বয়স, তবু হয়ে গেল। না প্রেম ট্রেম করে নয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ। মন্ত্র পড়ে বিয়েতে দেখা গেল দুজনেরই আপত্তি। ছবিটার দিকে তাকাল অবনীভূষণ। কেমন ছিমছাপ দেখাচ্ছে ওকে

সুনীপাকে অবশ্য একদম যুবতী-যুবতী দেখাচ্ছে। অবশ্য শরীরটা ওর এখনও ভাঙেনি। কিন্তু অবনীর মুখ, চিবুক, গলায় অজান্তে হাত বোলালে ও চটচটে করল আঙুলের ডগা। রোজই হয়, কিন্তু তবু এই আঙুলের ডগার সিরসিরানিটা জানান দেয়, না হে তোমার হয়ে আসছে। রোজই সকালে গলার, চিবুকের ব্যান্ডেজ পাল্টাও কেমন গন্ধ বের হয় আজকাল ব্যান্ডেজ থেকে।

সুনীপার ঘুম ভাঙবার আগেই ও বাথরুমে চলে আসে দরজা বন্ধ করে আলোটা জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়ায় মুখ চোখ ফোলা ফোলা চিবুক থেকে যে ব্যান্ডেজটা মাথার ওপরে গিয়ে গিঁট খেয়েছে সেটার ওপর নজর রাখে অবনীভূষণ। চিবুকের তলায় গলার ওপরটা ভিজে গেছে। কালচে কালচে দাগ। রস বেরিয়েছে ঠোঁট দুটো ব্যান্ডেজের চাপে বেঁকে ঝুলে গিয়েছে। এবার হসপিটাল থেকে ফিরে যন্ত্রণাটা আর বাড়েনি। প্রথমবার রে নেবার আগে ভুগিয়েছিল খুব। রে নেবার পর মাস কয়েক মোটামুটি ভালই ছিল সে। তারপর আবার যেতে হল। এবার অপারেশন। কিন্তু এ অপারেশন আর শুকোলো না। ডাক্তার রায় প্রায় স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন দেখুন এখন শুধু বরাতের ব্যাপার।

অথচ এখন কাগজে মাঝে মাঝেই বের হয়- পৃথিবীর এপাশে ওপাশে কেউ কেউ ক্যান্সার সারাচ্ছে সুনীপার আগ্রহে দু এক জায়গায় চিঠি দিয়েছিল ও। কোন জবাব আসেনি। ডাঃ রায় ভালই বলেন বরাতের ব্যাপার লটারির টাকা পাবার মতন। কেউ কেউ তো পেয়েও থাকে।

প্রথম প্রথম অস্বস্তি হতো, আজকাল হাত রপ্ত হয়ে গেছে। ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলে নতুন ব্যান্ডেজ করে নিল অবনীভূষণ। পুরোনটায় আজ যেন বেশী রক্তের দাগ। সপ্তাহে একদিন ড্রেসিং করার কথা রোববারের সকালে।

চোখে জল দিয়ে বাইরে এল অবনীভূষণ। আজকাল আর দাঁত মাজার ব্যাপার নেই। সে পাট চুকে গেছে অনেকদিন।

এখন বেশ রোদ উঠেছে। ছিমছাম পরিষ্কার রোদ। এরকম রোদের সকালে মনটা বেশ প্রফুল্ল থাকে এমনিতে শরীরে আর কোন অসুবিধে নেই। হাত পা বেশ সচল। তবে কদিন থেকে শরীরটা কেমন ঝিম ঝিম লাগছে, ডাঃ রায় যাকে উইকনেস বলেন বেশীদূর হাঁটাচলা করতে একটু কষ্ট হয় বাইরের ঘরে এল অবনীভূষণ। আসার সময় দেখল, সুনীপা উঠে পড়েছে।

খবরের কাগজটা হাতে নেবার একটা উত্তেজনা আছে। নতুন ছাপার কালির গন্ধ বেশ লাগে। কত খবর হচ্ছে রোজ পৃথিবীতে, কালকের খবর আজ বাতিল, এইভাবেই চলতে থাকে। অবনীভূষণ যখন থাকবে না, তখনও খবরের কাগজ ছাপা হবে, টাটকা টাটকা খবর, কিন্তু অবনীভূষণ সেগুলো পড়তে পারবে না। অতএব কি, কোলকাতাটাই ভাল করে দেখা হল না। মধুসূদনের সমাধিটা দেখা হয়নি—সেই 'দাঁড়াও পথিকবর' কবিতাটাই পড়েছে ছোটবেলা থেকে। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, ভিক্টোরিয়ার ভিতরটা—এসব দেখার সময়ই পাওয়া গেল না। না, একদিন সব দেখে নিতে হবে। নইলে কখন কি ফাঁকি হয়ে যায়—বুকের ভেতরটা কেমন করে।

সুনীপা এল চা নিয়ে। তেপায়া টেবিলে চা রেখে বলল, 'আজ কেমন আছ?'

মাথা নাড়ল অবনী। যার মানে, এই আর কি। রোজ সকালে সূর্য ওঠার মত নিয়ম করে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সুনীপা। খারাপ নেই জানলে একটু নিশ্চিন্ত হয়। বোধহয় আর একটা দিন কেটে যাবার আশ্বাস পায়। তাই আজকাল শরীরের সামান্য কষ্ট হলে বলে না অবনীভূষণ। "কেমন আছ' কথাটা শুনতেও কেমন অস্বস্তি হয়।

বাজারের থলি নিয়ে দরজায় আসতেই রিক্সা পেয়ে গেল সে। প্রথম প্রথম সবাই আপত্তি করেছিল। সবাই বলতে বাবা আর ছোট ভাই সুনীপার সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল। বাজার সে কোনকালেই করত না, কিন্তু অপারেশনের পর একটা কেমন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত

ওরা হাল ছেড়েছে, লোকটা একটা কিছু নিয়ে থাকুক—এইরকম ভাব আর কি।

রিক্সাওয়ালা ওকে চেনে। বাণ্ডেজবাঁধা বাবুকে বাজারে নেবার ব্যাপারে ওর কিছু অভিজ্ঞতা আছে। বাবু এখন যাবে গলির শেষ বাড়িটায়। গিয়ে অবনীভূষণ হাঁকবে, 'গুপ্ত আছ নাকি?'

গুপ্তগিন্নী দরজা খুলবেন, 'আসুন, ও দুধ আনতে গিয়েছে।' অবনী জানে গুপ্ত এখন থাকবে না।'

'না, এখন যাবো না, কই বাজারের ব্যাগটা দাও।'

মুখ চোখে কেমন একটা লজ্জার ব্যাপার দেখল অবনী। গুপ্তগিন্নীকে এবার ধমক দিল ও 'কি হল, দাঁড়িয়ে কেন। ব্যাগটা আনো।'

'ও বলছিল, রোজ রোজ—।' গুপ্তগিন্নী মিনমিনি গলায় বলতে চাইলেন।

'তুমি কি চাও তার সঙ্গে কথা বন্ধ করব। আরে ক'দিনই বা আছি, একটু—।' আর কথা শুনতে দাঁড়িয়ে নেই গুপ্তগিন্নী। বাজারের ব্যাগটা এনে দিলেন তাড়াতাড়ি। হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বলল অবনী, 'কি মাছ আনব?'

'যা খুশী।'

'আঃ, তোমরা মনের কথা মুখে বলতে পার না কেন? অফিসের সময় কুচো মাছ আনলে হাড়ে হাড়ে টের পাবে।'

রিক্সা ঘোরাতে বলল ও। তারপর আরো দুটো বাড়ির ব্যাগ আদায় করে বাজারে চলল অবনী। এই তিনটে সংসারের মোটামুটি খবর জানা আছে তার। বিশেষ করে গুপ্ত লোকটাকে দেখে ওর অবাক লাগে। সব সময় হাসিখুশী, রাত এগারটায় যখন বাড়ি ফেরে তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোতলার জানলায় দাঁড়ানো অবনীর সঙ্গে বকবক করে যায়—কিন্তু এত এনার্জি লোকটা পায় কোত্থেকে! গুপ্ত মাইনে কত পায় অবনী জানে। মোটামুটি এই তিনটে পরিবারের অবস্থা ওর জানা। এই টাকায় ওরা কিভাবে বেঁচে থাকে— সব রকম হাসিখুশী নিয়ে। এটাই বুঝতে পারে না ও। দ্বিতীয় বার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে এই সব চিন্তা মাথায় জমছে ওর।

মোড়ের মাথায় গুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু'হাতে দুটো বোতল ঝুলিয়ে মুখে একটা চারমিনার চেপে আসছে গুপ্ত। বেঁটে খাটো কদমছাঁট চেহারা। 'এই শালা, এই তোমার সকাল হল। কেন, আর একটু আগে গতর তুলতে কি হয়?' রিক্সা দাঁড় করিয়ে খিঁচিয়ে উঠল অবনী।

দুটো বোতল এক করে মাথায় ঠেকাল গুপ্ত। চারমিনারটা ঠোঁটের কোণে সরিয়ে ফিক ফিক করে হাসল। তারপর দুলে দুলে বলল, 'সকাল কোনদিন দেখিনি সাহেব, ওকে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত, পুণ্যাত্মাদের জন্য সংরক্ষিত।'

অবনী আর দাঁড়াল না গুপ্তর সঙ্গে কথা বলা যায় না। এত কথা ও পায় কোথায় কে জানে। সেল ট্যাক্সের অফিসার অবনী, গুপ্ত ওকে সাহেব বলবেই। হোক না কেন রোববারের তাসের পার্টনার।

রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথা বলে ওকে নিয়ে বাজারে ঢুকল ও। মোটামুটি একই জিনিস চারটে থলেতে কিনবে ও। এই সময়টা অদ্ভুত একটা উত্তেজনা মনে। এই দরকরে বাজার করা।

'কত?' আলুর দোকানে দাঁড়াল অবনী।

'বিশ বাবু।'

'বিশ? ইয়ার্কি! কাল এক দশে নিলাম। তোমরা পেয়েছটা কি বল তো? এখনই এই অবস্থা, কয়েক মাস পরে দু'টাকা বলবে!' টনটন করল ঠোঁটের কোণাটা। কথা বলতে অসুবিধে হয় ব্যাণ্ডেজের জন্য, কিন্তু এরকম হল কেন?

'তা কি করব বাবু, বাজারের যা অবস্থা, দেখুন না সামনের বছর কী হয়।' দোকানী পাল্লায় আলু চড়ালো।

সামনের বছর কী হয়। অবনী একটু থতিয়ে গেল। সামনের বছর যদি আলুর দর পাচ টাকা হয় অবনী জানবে না। কিন্তু গুপ্তদেব কি হবে। সবত্র এক অবস্থা পটল বেগুন কি আদার দর দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। পটল বিক্রী করে যে ছোকরাটা তার কাছে এল ও। এর সঙ্গে ক'দিন আগে প্রায় হাতাহাতি হয়ে গিয়েছিল অবনীর। ব্যাটা পাকামো করে বলেছিল, 'দর করবেন না বাবু। যে ক'দিন আছেন খেয়ে যান। আজকে ইচ্ছে করেই দর জিজ্ঞাসা করল না স। ছোকরা অবাক হল। যেতে বলল, একই দর বাবু আপনার কাছে কম দাম নিলাম। বাজারে দেখুন দেড় টাকা কিলো।' অবনী আজকাল হাসতে পারে না ঘাড় নাড়ল শুধু। না, দর বাড়াওনি, কিন্তু ওজনে মারছ। ভিজে পটলে লাভ অনেক কিন্তু অবনী কিছু বলল না। আজকাল কাউকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।

সুনীপা একটু সাজতে ভালবাসে। স্কুলে যাবার সময়ও চুলবাধা আর স্নো পাউডারে ওর বেশ সময় খরচ হয়। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে বসেছিল অবনী সুনীপা আসতেই উঠে দাড়াল। সুনীপার স্কুল সেই পার্ক সার্কাসে। এখান থেকে যাওয়া আসা বরা মুশকিল। কিন্তু তবু চাকরিটা ছাড়তে চায় না। হেড মিসট্রেস হবার সুযোগ আছে। মাইনে খারাপ দেয় না স্কুলটা। গলির ভিতর একটা ট্যাক্সি ঢুকেছিল। দরজায় দাড়িয়ে ধরে ফেলল সুনীপা। অবনী ভাবল আজ কপালটা ভালই যাবে। অন্যদিন রিক্সা করে মোড়ের মাথায় গিয়ে ট্যাক্সির জন্যে হা পিত্যেশ করতে হয়। গলির মুখে আসতেই ট্যাক্সি থামাতে বলল অবনী। সুনীপা ভ্রূ কুচকে একপাশে সরে যেতে যেতে বলল আদিখ্যেতা।' অবনী হাসল। সুনীপা এসব ভাল চোখে দেখছে না। এই বাজার করা, ধার দিয়ে তাগাদা না করা, অফিসে যাবার সময় ট্যাক্সিতে লিফট দেওয়া। ছোট ভাইয়েরও ধারণা অসুখের পর দাদার মাথাটা গোলমেলে হয়েছে। আর এই লোকগুলো তার সুযোগ নিচ্ছে। ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না অবনীর। টাকা সে অনেক রোজগার করেছে। মাইনের চেয়ে বাঁ হাতে এসেছে বেশী। যে চাকরির যা দস্তুর। সুনীপার ভবিষ্যতের কোন আশঙ্কা নেই। তার ওপর জি পি এফে আছে মোটা টাকা। তবু যে কেন ওরা এরকম করে।

ডালহৌসি ঘুরে গেল ট্যাক্সিটা। তিন জনকে সেখানে নামিয়ে ও গেল পার্ক সার্কাসে। সুনীপাকে স্কুলে পৌছে দিয়ে অফিস। তেতলায় ওর ঘর। আগে সিঁড়ি ভাঙতো এখন লিফটে ওঠে। এইটুকুনিতেই আজ কেমন ক্লান্তি লাগছে।

নিজের ঘরে বসে অবনীর কেমন অসহায় বোধ হল। অসুখের পর থেকে ওর আর অ্যাসেসমেন্ট নেই। কাজের চাপ আর সহ্য হয় না। অথচ যতক্ষণ না নিজে চাকরিটা ছাড়ছে ততক্ষণ কেউ ওকে চলে যেতে বলবে না। সবাই জানে গাঙ্গুলীসাহেব যে কোনদিন মারা যাবেন। ক্যান্সার বলে কথা। দু'দুবার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন ভাগ্যের জোরে।

ছোটখাটো কয়েকটা ফাইল দেখল অবনী। তারপর টেবিলে রাখা গেলাসটার জল আকণ্ঠ খেয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ক'দিন বাদে এই চেয়ারে অন্য কেউ বসবে। লোকটা নিশ্চয়ই অবনীর কথা জানবে। কেমন মনে হবে ওর। ওই জানলা, জানলা দিয়ে দেখা গির্জার চুড়া এসব ওর কেমন লাগবে। আচ্ছা, লোকটা যখন এই চেয়ারে বসে কোনো পার্টির কাছ থেকে ঘুষ নেবে তখন নিশ্চয়ই ভাববে অবনীও নিত। অবনী অনেক ঘুষ নিত, শেষ পর্যন্ত অবনীর ক্যান্সার হল। ঘুষ নিত অবনী তাই ক্যান্সার হল এরকমটাও ভেবে নিতে পারে লোকটা। লোকটা নিশ্চয়ই ভয় পাবে। কারণ ক্যান্সার থেকে মুক্তি নেই লোকটা জানে। মনে মনে একটা ভীত অথচ লোভী মুখের ছবি আঁকল অবনী। কিন্তু কি আশ্চর্য, ছবিটা বার বার পরিষ্কার ছিমছাম দাড়ি কামানো অবনীর হয়ে যাচ্ছে। গালে হাত দিল অবনী। আজকাল ব্যান্ডেজ বাঁচিয়ে দাড়ি কামাতে হয় ওকে।

আজ শনিবার। একটা নাগাদ উঠি উঠি করছে অবনী, এমন সময় সেই ভদ্রলোক এলেন।

ক'দিন থেকেই ইনি আসছেন। অবনী অনেকবার ঘুরিয়ে বলেছে এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক হাসলেন, 'কি করলেন স্যার?'

মুখটা দেখল অবনী। তেল-চকচকে মুখ। সুখী সুখী চেহারা।

'আমার এখন কিছুই করার নেই, আপনি তো জানেন।' অবনী রিক্ত গলায় বলল। সামনের চেয়ারে বসে ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের ওপর, 'এ ব্যাপারে আপনার একটা দায়িত্ব আছে তো। কাজটা আপনার শেষ করার কথা ছিল। বলুন ছিল কিনা?'

'হ্যাঁ ছিল, কিন্তু আপনি জানেন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আপনার অ্যাসেসমেন্ট আমি আর করছি না। আর আপনাকে আমি বলেছি ওটা আপনি ফেরত নিয়ে যান। আমার এসব ভাল লাগছে না।' একটু হাঁপ ধরে কথা বলতে, গলার কাছটাতে টনটন করছে।

জিভ বের করল লোকটা, 'টাকাটা স্যার ফেরত নেব বলে দিইনি। আপনি শুধু ফাইলটা আনিয়ে ব্যাক্‌ডেটে অর্ডারটা করে দিন। তারপর বাকী কাজ আমি করে নেব।'

'না, হবে না। আমি আর ওসব পারবো না। বরং সোমবার এসে টাকাটা নিয়ে যাবেন। বলা যায় না তো, একদিন হঠাৎ দেখবেন আমি নেই। তখন টাকাটাও যাবে।' উঠে দাঁড়াল অবনী।

'যন্ত্রণা হয় স্যার?'

'তা হয়।'

'কোন দিন সারবে না?'

'না।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা, 'আমাদের সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। ভাবতেই কেমন লাগে। চললাম স্যার?'

'হ্যাঁ। আসুন আপনি?' অবনী বাথরুমের দিকে এগোল।

'বাড়ি যাবেন, তাহলে আমি লিফট দিতে—।' লোকটাকে থামিয়ে দিল অবনী একটা হাত তুলে। তারপর বলল, 'আপনি যান, আমি বাড়ি যাব না। আজ শনিবার, আমি রেসের মাঠে যাব।' বলে দরজা ভেজিয়ে দিল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল লোকটা, তারপর নিজের গলায় হাত বুলিয়ে বলল, 'শা-লা।'

গেট থেকে একটা বই কিনে নিল অবনী। তারপর দশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে পা দিল। এখানে পা দিলেই শরীরে কেমন একটা উত্তেজনা হয়। গ্রান্ড এনক্লোজারে যারা আসে তাদের বেশবাস মুখ-চোখে একটা ভদ্র ছাপ থাকে। কিন্তু উত্তেজনায় সবাই টইটম্বুর। বাঁ দিকে প্যাডকে এল অবনী। ঘোড়াগুলো ঘুরছে। প্রত্যেকের গায়ে নম্বর আঁটা। জকিগুলো মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেনারদের সঙ্গে প্ল্যান আঁটছে। একগাদা লোক হুমড়ি খেয়ে রেলিং ধরে ঘোড়াগুলো দেখছে। কোন ঘোড়াটা কি রকম ফিট জরিপ করছে সবাই। অবনী সরে এল। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে। ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখ রেসের মাঠে দেখে বোধহয় একটু অবাক হচ্ছে। অপারেশনের পর আজ প্রথম এলো অবনী। আগে আসতো। এখানে এলে বুকের ভিতরটা টগবগ করত। কিন্তু আজ কিছুই হচ্ছে না। মানে সে ধরনের কোন একসাইটমেন্ট নেই। শুধু চেয়ে চেয়ে দ্যাখা।

প্যাডক থেকে সরে এল অবনী। বুকিদের কাউন্টারে খুব হৈ-চৈ। প্রথম রেসটা বি-ক্লাসের। টালিগঞ্জের ঘোড়াগুলো দৌড়বে। মোটামুটি ফেবারিট ঘোড়াটার দর ইভন মানি। বোর্ডের দিকে তাকাল অবনী। ফেবারিট ঘোড়াটার কাঁটা ডগা ছুয়েছে। ঘোড়াটা জিতবে না, অবনী মনে মনে বলল। অবনী বইটা খুলল। টাটকা গন্ধ। প্রথম রেসের ঘোড়ার তলায় ফেবারিটটাই টিপ। জিতবে না, জিততে পারে না। পাতা ওল্টালো অবনী। থার্ড রেস থেকে জ্যাকপটের লেগ। আটটা ঘোড়া আছে। নামগুলো পড়ে গেল অবনী। বাপ-মায়ের ঠিকানা, অতীতের ফলাফল এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। পর পর পাঁচটা এক নম্বর ঘোড়া নিয়ে দশ টাকার জ্যাকপট

কাটলো ও। কেটে সোজা দোতলার ব্যালকনির কোণায় চুপচাপ বসে পড়ল অবনী। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে. ঝিম ঝিম ভাবটা বেড়েছে।

প্রথম রেস শুরু হয়ে গেছে। অবনী দেখল ফেবারিট ঘোড়াটা বাকিগুলোকে কুকুরের মত পেছনে রেখে জিতে গেল। মাঠে বেশ খুশী খুশী ভাব। অবনীর ভাল লাগল। লোকগুলো টাকা পেল।

ডান দিক বাঁ দিক নিচে শুধু মানুষের মাথা। এত লোক—সবাই বড়লোক হতে চায়। প্রত্যেকের মনের মধ্যে বাসনার পোকা কুটকুট করছে। অবনী দেখল. তার পাশের লোকটা একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে। টাকা নিয়ে যাবে বলে। অবনী হাসল. এখান থেকে কেউ জিতে যেতে পারে না, কেউ নয়। তবু সবাই আসে জিতে যেতে আসে' লড়ে যাও ভাই লড়ে যাও। অবনী গালে হাত বোলাল।

জ্যাকপটের চারটে লেগ শেষ হতে অবনী নড়েচড়ে বসল। সমস্ত মাঠ ঠাণ্ডা। পর পর চারটে এক নম্বর ঘোড়া জিতে গেল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একটু আগে মাইকে এ্যানাউন্সমেন্ট হল. 'হ্যালো. হ্যালো। ইন দি জ্যাকপট পুল দেয়ার আর টু টিকেটস এ্যালাইভ আফটার দি এন্ড অফ ফোর্থ লেগ।'

দুটো টিকিট আছে। বাঃ। বাঃ। টোটাল পুল কত? দু লাখ হবে। একনম্বর ঘোড়া যদি শেষ রেসে জেতে তাহলে এক লাখ করে ভাগে। বাপস। অবনী বুঝল কপালে ঘাম হচ্ছে। আজ সকাল বেলায় ট্যাক্সি পাওয়া থেকেই মনে হচ্ছে সব যেন কি রকম ভাল। ডাঃ রায় বলেছেন রবাতের ব্যাপার। রেস খেলেনি অবনী। এর আগে অনেকদিন এসে চুপচাপ দৌড় দেখে গেছে। পকেট থেকে কোন রিস্ক নেই। আজ লাক ট্রাই। পর পর পাঁচটা জিতে গেলে মিনিমাম এক লাখ। ক্যান্সার সারা নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশী রবাতের নয়' চন্দননগরে নাকি কে এক তান্ত্রিক আছে. যেতে হবে। জলপড়া না কি খেতে দেয়। রবাতের ব্যাপার। পাশের লোকটা মুখ চুপসে বসেছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল. 'আপনার কি হয়েছে?'

'কিছু না তো।' অবনী হাসল. 'একটা জ্যাকপট কেটেছি। দেখছি খুব মিলে যাচ্ছে।' টিকিটটা বের করে দেখাল অবনী। ঝুঁকে পড়ে দেখল লোকটা। তারপর লাফিয়ে উঠল. 'আপনার হয়ে গেছে. লাইনে দাঁড়ান গিয়ে। লাস্ট রেসে এক নম্বর জিতবে আমার খবর। আমি পাঁচ হাজার হেরেছি. বাকী পাঁচ হাজার এবার এক নম্বরে লাগাব। এ ঘোড়ার মার নেই। মিনিমাম তিনের দর। থ্রি টু ওয়ান।'

যাঃ শালা। এত টাকা নিয়ে কি করব। সুনীপার কথা ভাবল অবনী। সব শালা বউয়ের ভাগ্যে। ক্যান্সার বউয়ের ভাগ্যে. জ্যাকপটও বউয়ের ভাগ্যে।

'অল দি হর্সেস হ্যাভ অ্যারাইভড ইন দি স্টার্টিং পয়েন্ট।' মাইকে ঘোষণা হল। অবনী দেখল মাঠের ওপাশে টাটা বিল্ডিংটার দিকে ঘোড়াগুলো জড় হয়েছে। বোর্ডের দিকে তাকাল ও। দু' নম্বর ফেবারিট। বই খুলে নাম দেখল লাকি স্টার। এক নম্বরটার নাম 'ফুল অফ লাইফ।' ঘোড়াটা যখন যায় অবনী লক্ষ করেছে দারুণ ফিট। পাশের লোকটা নেই। বোধহয় টাকা লাগাতে গেছে।

রেস শুরু হল। বারো শ' মিটারের দৌড়। এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কে প্রথমে আসছে। মাইকে লাকি স্টারের নাম শুনতে পেল অবনী। লোকগুলো চেঁচাচ্ছে। যে যার নিজের পছন্দের ঘোড়ার নাম বলছে। বেন্ট ঘুরে এল ঘোড়াগুলো। এবার সোজা পথ। মাইকে 'ফুল অফ লাইফ' শুনতে পেল অবনী। উত্তেজনায় সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। অবনী উঠে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে দড়াম দড়াম করছে। ফুল অফ লাইফ রেলিং ধরে ছুটে আসছে। তার তিন লেংথ পেছনে লাকি স্টার। হুইপ করছে জকিটা। না, ধরতে পারবে না। বুলেটের মত যাচ্ছে ঘোড়াটা।

আর পঞ্চাশ গজ বাকি। চল্লিশ-তিরিশ। হঠাৎ সারা মাঠে চিৎকার উঠল। পায়ে-পায়ে লেগে পড়ে গেল ফুল অফ লাইফ। উইনিং পোস্টের দশ গজ এপাশে পড়ে ছটফট করতে লাগল, লাফ দিয়ে ছিটকে পড়ল জকিটা। ততক্ষণে লাকি স্টার জিতে গেছে। দু'নম্বর জিতে গেল। ফুল অফ লাইফ ছটফট করছে। ওঠার চেষ্টা করছে, পারছে না। পা ভেঙে গেছে, কে যেন চেঁচাল। অবনী দেখল, স্বাস্থ্যবান চকচকে একটা সাদা ঘোড়া মাঠেব ধুলোয় ছটফট করছে। মুখ তুলে তাকাচ্ছে আকাশেব দিকে। টার্ফ ক্লাবের দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই সময়। কয়েকটা লোক এসে ঘোড়াটাব পা দেখল। একজন হাত নেড়ে ইশারা করতেই অবনী দেখল একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে। ছ'সাত জন কুলি গোছেব লোক অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে ত্রিপল দিয়ে ফুল অফ লাইফকে ঘিবে ফেলল।

কে যেন বলল, 'এবার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে।'

'মেরে ফেলবে?' অবনী ভীষণ ধাক্কা খেল।

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, তাই নিযম। বেস চলাব সময কোন ঘোড়া অকেজো হয়ে গেলে গুলি কবে মেবে ফেলা হয।'

অবনী ফ্যাসফেসে গলায বলল, 'কেন, ঘোড়াটাব পা সারিয়ে গাড়ি-ফাড়ি টানাতে পাবে তো।'

'না, তা হবে না। বেস রাজাব খেলা, রাজার মত যেতে হবে। অকেজো বাতিল হয়ে কেউ বেঁচে থাকবে না।'

অবনী দেখল মাঠে পূর্ণ নীরবতা। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। ওপরে থাকার দরুন অবনীবা ফুল অফ লাইফকে দেখতে পাচ্ছে। একটা টুপি পরা লোক রিভলবার বের করে ঘোড়াটার মাথা ছুঁয়ে নমস্কার কবল। আব একটা লোককে বিড় বিড করে কিছু বলতে দেখল অবনী। তারপবই গুলিব শব্দ। খানিক ছটফট করে মরে গেল ঘোড়াটা। মাঠে একটু শব্দ নেই। পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে শেষ সম্মান।

নেমে এল অবনী। নামতে গিয়ে দেখল হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মুখ চোখে কেমন একটা তাপ। এখন লোকজন কথা বলছে। অবনী কোনরকমে বেরিয়ে এল।

বাড়ি ফিরল অবনী অনেক রাত্রে। গুপ্ত দাঁড়িয়েছিল গলির মোড়ে। দেখে এগিয়ে এল, 'দাদা কোথায় ছিলেন? একি? শরীর খারাপ নাকি আপনার?'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গুপ্তব কাঁধে হাত রাখল অবনী 'তুমি কি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?'

'হ্যাঁ। বউদি খবর পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে নাকি অফিসে ফোন করে পাওয়া যায়নি।' গুপ্ত অবনীকে ধরে নিয়ে চলল।

'গুপ্ত আমার ব্যাণ্ডেজটা কি ভিজে গেছে?' অবনী আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল।

'একটু একটু, সে তো হয়ই।' গুপ্ত ওকে নিয়ে দরজায় দাঁড়াল।

'গুপ্ত, আমার গলা থেকে কোন গন্ধ পাচ্ছ?'

'দাদা!' চাপা গলায় বলল গুপ্ত। বলে, কলিং বেল টিপল।

হাসল অবনী: 'আজ সাহেব বলছ না কেন, গুপ্ত। সাহেব শুনতে ভাল লাগে। গন্ধ পাচ্ছ গুপ্ত?'

'হুঁ।'

'গলাটা পচছে হে। এরপর শরীর পচবে।' হাঁপাতে লাগল অবনী।

ভেতরে শব্দ হচ্ছে। দবজা খুলতে আসছে কেউ।

'গুপ্ত, কেউ যদি আমাকে গুলি কবে মাবত আমি তা'কে এক লাখ টাকা দিতাম।'

দরজা খুলল সুনীপা। অবনীকে দেখেই চিৎকাব কবে কেঁদে উঠল 'কোথায ছিলে এতক্ষণ, আমি ভেবে ভেবে মবি—তুমি আমাব কথা—।'

হেসে ফেলল অবনী। তাবপব গুপ্তব দিকে ঘুবে বলল, 'এই জন্যেই শুযে শুযে দুঃখ সইযে দিযে যেতে হবে গুপ্ত। এটাও তো একটা দাযিত্ব, কি বল?'

রুদ্রায়ণ

দুপুব একটু গড়ালেই এখানে ঠাণ্ডা হাওযা বয। সঙ্গে সঙ্গে চাবপাশে এমন একটা হিমভাব ছড়ায যে বোদ্দুবটাকে গাযে লাগে না। তাবপর যখন ছাযারা গাঢ় হয নীচেব জঙ্গলেব অন্ধকার গাযে মেখে তাবা যখন ওপবে উঠে আসে তখন থেকেই কনকনানিটা শুরু হয। বাত যত বাড়ে তত তাব দাঁত ধাবালো হয। সন্ধেব পব পথে ঘাটে মানুষ আব বেব হয না। আলোগুলো জ্বলতে থাকে ভুতুড়ে চোখেব মতন। শুধু বাতাসেব একটানা গোঙানি দিযে বাতটা থাকে জড়ানো।

দূবেব ওই আকাশেব গাযে ছড়িযে থাকা মাঠটাব বুকে ছোটবড় যে তাঁবু পড়েছিল বাজকুমাবেব অভিষেকেব সম্মানে সেগুলোকে তুলে নেওযা হযেছে। গত তিনদিন প্রচণ্ড খাটুনি গেছে জযন্তীব। মহাবাজকুমাবেব অভিষেক উপলক্ষে এই পাহাড়ী শহরে ছুটে আসতে হযেছে দিল্লীব ডেইলি সান কাগজেব বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে। প্রাত্যহিক বিপোর্ট পাঠিযে দিযেও তাঁব

কাজ শেষ হয়নি। একটা রঙিন ফিচার লিখতে হবে তাঁকে। রাজপরিবার এবং তাঁদের নানান রকম কাহিনী সাজিয়ে এই পট ভূমিকে প্রাণবন্ত করতে হবে কাগজের পাতায়। এ ব্যাপারে অবশ্য জয়ন্তীর সুনাম আছে। অভিষেক মিটে গেলে জয়ন্তীর ইচ্ছে হল এখানে আরো কয়েকটা দিন রয়ে যেতে। ছবির মত ছোট্ট শহর বিশ্রামের পক্ষে সত্যি খুব ভাল। পরিশ্রম বেশী হয়ে যাওয়ায় মন আরাম চাইছিল। কাগজ থেকে অনুমতি মিলতেই হাঁফ ছেড়েছিল সে। যাক, এখন দশটার আগে বিছানা ছাড়বে না সন্ধের পরেই লেপের তলায় ঢুকবে। দিল্লীতে যা করা হয় না তাই করবে সে এখানে।

জয়ন্তীর আস্তানাটা চমৎকার। শহরের ঠিক ওপরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পরপর যে ছবির মত বাংলোগুলো তারই একটা ভাড়া পেয়ে গিয়েছিল সে কপালজোরে। একটি বৃদ্ধ ভুটানীদম্পতি দেখাশোনা করে এটিকে। মালিক থাকেন আরো ওপরের রাজধানীতে। বৃদ্ধ বাগান করে সামনের চিলতে জমিতে, বৃদ্ধা সুন্দর রান্না করে দেয় জয়ন্তীকে। প্রথম ক'দিনের পরিশ্রমে যা চোখে পড়েনি এখন এই বিশ্রামের সময়ে তাই চেখে চেখে দেখছে সে। এই পাহাড়ী মাটিতে শীতের ফুলেরাও বৃদ্ধের হাতে কি সুন্দর হয়ে ফোটে। এই দম্পতির যেন কোন ব্যাপারেই কৌতূহল নেই। জয়ন্তী এখানে রয়েছে এবং ক'দিন থাকবে একাকী তাও যেন ওদের কাছে স্বাভাবিক

চল্লিশটা বছর কখন নিঃশব্দে খরচ হয়ে গেল। অথচ শরীরটার দিকে তাকালে চল্লিশ শব্দটাকে মনেই পড়ে না। এখনও তার চামড়া তেমনি টান টান, মুখের কোথাও আঁচড় পড়েনি, স্বাস্থ্য সেই তিরিশেই ঠেকে রয়েছে। শুধু একটা মোলায়েম রুক্ষতা জয়ন্তীর সর্বাঙ্গে ছড়ানো যা কিনা তাঁকে বয়েসের মত আড়াল দেয়।

এখন ঠাণ্ডা বাতাস নেমে আসেনি, মিষ্টি ওম রোদ্দুরে মাখানো। জয়ন্তী কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। দূরে কালো চাপ জঙ্গলমাখা পাহাড়ের শরীর ঘেঁষে বেশ চওড়া নদীর সাদা খাতটা চোখে পড়ল। কি নাম যেন তোর্সা? যে সব ভেঙে ফেলে? এখন কি বিষাদ নিয়ে শুয়ে আছে নিশ্চুপ হয়ে। জল বইছে সরু ধারায়, রাশিকৃত সাদা হাড়ের মত পাথরে ছড়ানো। অদ্ভুত নির্জনতা এখানে। জয়ন্তী ঝুঁকে নীচের রাস্তাটা দেখলেন। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ওরা আসছে। পায়ে পায়ে, খুব সন্তর্পণে। গতকালই আলাপ হয়েছে। দুটো বাড়ির ওপাশে বাঁকের মাথায় যে বাংলো সেখানে থাকে ওরা। মহিলাটি মাঝ বয়সী, ট্রেইনড নার্স, ছেলেটি বছর পনেরর হবে কিনা সন্দেহ। অত রোগা এবং সাদা চামড়ার কিশোরকে জয়ন্তী আগে কখনও দেখেননি। প্রথম দেখায় বুঝতে পেরেছিলেন বেশ অসুস্থ ছেলেটি। এইটুকুনি পথ হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। প্রতিটি পা ফেলছে আর বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

দ্রুত নীচে নেমে এলেন জয়ন্তী। ছোট্ট বাগান পেরিয়ে কাঠের গেটের সামনে দাঁড়ালেন। এখন ওঁর শরীরে একটা হালকা শাল অথচ ছেলেটির আপাদমস্তক গরম উলে মোড়া। মাথায় মাঙ্কিক্যাপ। যে চামড়াটাকে প্রথমে সাদা মনে হয়েছিল তা যে রক্তহীন সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কথা বলার চৌহদ্দিতে আসা মাত্র জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ আজকে?'

ছেলেটির চোখে লজ্জা ফুটল কি! ঘাড় নাড়ল সে, ভাল।

গতকাল ওকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নার্স। যেই ওই পাহাড়টার মাথায় কুয়াশারা এসে জমা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে সে তাড়া দিয়েছিল, 'চলো, রোদ মরে আসছে। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

ছেলেটির কাতর চোখের চাহুনিতে তার মন গলেনি। জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কি করব বলুন। ডাক্তার পই পই করে নিষেধ করেছে ঠাণ্ডা না লাগাতে। অথচ রোদ্দুরে একটু পায়চারিও করাতে হবে। এদিকে যে পদ্মপাতায় জল, কখন যে টুপ করে ঝড়ে পড়বে আর দোষ হবে আমার। আর দাঁড়াতে হবে না, ফিরে চল।'

ছেলেটির ফিরে যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকু বোধহয় অর্জন করতে শেখেনি সে। আজ জয়ন্তী গেট খুলে রাস্তায় চলে এলেন। দু একটা ভেড়া ছাড়া পিচের পথটায় কোন প্রাণী নেই। জয়ন্তী বললেন, 'কাল তোমার নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।'

ছেলেটির ঠোঁট নড়ল। শুধু চোখ নাক আর গালের পাশ দিয়ে ঠোঁট নড়রে আসছে। নার্স বলল 'নাম বলো।'

তাপস সেনগুপ্ত

বা, বেশ সুন্দর নাম তোমার। চল আমি তোমার সঙ্গে একটু বেড়াই। তোমার আপত্তি নেই তো?' তাপসের পাশে এসে দাঁড়ালেন জয়ন্তী।

এবার মাথা নাড়ল সে, না কোন আপত্তি নেই।

কয়েক পা হাঁটতেই নার্স চাপা গলায় বলল, 'আঃ, অত জোরে হাঁটতে মানা করেছি না? এমনভাবে হাঁটবে যাতে কষ্ট না হয়।'

আমার কষ্ট হচ্ছে না। জয়ন্তী লক্ষ্য করলেন তাপসের কণ্ঠস্বর বয়সের তুলনায় বেশ সরু কণ্ঠ খুব মিষ্টি।

'কিসে কষ্ট হবে তা যদি বুঝতে পারতে! এখানে একটু বসো। জিরিয়ে নাও। আর যেতে হবে না ওদিকে। এক্ষুনি রোদ পড়ে আসবে। তোমার বাবা শুনলে আমায় আস্ত রাখবে না।' নার্স তাপসকে হাত ধরে রাস্তার পাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসিয়ে দিল। জয়ন্তী লক্ষ্য করছিলেন নার্সের শাসন। এর মধ্যে তার কথা বলা শোভন নয়। তবে নার্স ঠিকই বলেছে বলে মনে হল তার। এটুকু আসাতেই ছেলেটি হাঁপাচ্ছে। মুখে ঘাম জমছে, বুকের ওঠা নামা পুলওভার আড়াল করতে পারেনি।

ওর অসুখটা কি তা জয়ন্তী জানেন না। গতকাল নার্সটি বলেছিল 'ও খুব অসুস্থ।' বিশ্বাস করতে চাননি কিন্তু এখন মনে হল সেটা খুব বেশি রকমের কিছু। জয়ন্তী ছেলেটির দিকে তাকাতেই স্থির হয়ে গেলেন। এক একটা স্পর্শ কিংবা গন্ধ অথবা চাহনি আছে যা মুহূর্তেই সমস্ত পলেস্তরা খসিয়ে হাঁ করে দেয় মানুষকে। এক মুহূর্তে ঠেলে নিয়ে যায় সেখানে যেখানে স্মৃতি থাকে মুখ বুজিয়ে। ছেলেটি যে ভাবে তার দিকে বিশাল চোখে তাকিয়ে আছে সেই চাহনি জয়ন্তীকে এবার কাঁপিয়ে দিল। পঁচিশ বছর আগের আর একজোড়া চোখ কি করে এই চোখে দৃষ্টিটাকে এঁকে দিল হুবহু?

মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে শাড়ি থেকে চোরকাঁটা সরাচ্ছিল নার্সটি। জয়ন্তী ওর কাছে এগিয়ে গেলেন যেন চাহনিটার সীমা ছাড়াতেই। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, কি হয়েছে ওর?'

কথা শোনার দরকার নেই ছেলেটি, তবু নার্স আড়চোখে একবার দেখে নিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, বাঁচবে না।'

'সেকি!

নীরবে মাথা নাড়ল নার্স। তারপর বলল, শরীরে রক্ত হয় না। কোলকাতা বোম্বাই দিল্লী ঘুরে অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে কোন লাভ হয়নি। গরম জায়গায় থাকলে অ্যাদ্দিনে চলে যেত। ঠাণ্ডা পাহাড়ী অঞ্চল অথচ ঠাণ্ডা লাগবে না বলেই এই জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে রক্ত দিতে হয়। বাড়িতেই সব ব্যবস্থা করা আছে।'

'ওর বাবা মা?' জয়ন্তী ছেলেটির দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

মা তো মরে গেছে জন্ম দিয়ে। বাপের খুব আদুরে ছেলে। খরচা করছে খুব। কিন্তু বেশীদিন ভুগলে ক'জনের আর ধৈর্য থাকে। চাকরী বাকরী ছেড়ে তো আর এখানে পড়ে থাকতে পারে না। শনিবার আসে সোমবার ভোরে চলে যায়। এটাই বোধহয় শেষ মাস।'

'কেন?' চমকে উঠলেন জয়ন্তী।

'জানি না। ডাক্তার ওর বাবাকে তৈরী থাকতে বলেছেন। আর দেরী করব না দিদি। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। চলি।' নার্স তরতর করে এগিয়ে গেল তাপসের দিকে। জয়ন্তী লক্ষ্য করলেন এতক্ষণে তাপসের বুক কিছুটা স্থির। নার্স বলল, 'ওঠো, সন্ধে হয়ে আসছে।'

'এখনও তো রোদ আছে।' কাতর হল তাপসের গলা।

'থাক। আর বসে কাজ নেই।'

'আর একটু থাকো না।'

'না।'

'আর একটুখানি। আমার খুব ভাল লাগছে।' আবদার না প্রার্থনা তা বোধহয় ও নিজেই জানে না বলে মনে হল জয়ন্তীর। নার্সের পাশে পৌঁছে জয়ন্তী বললেন, 'এক কাজ করলে হয় না, আপনি এগিয়ে যান আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

নার্সটি বুঝতে পারছিল না একথায় বিরক্ত হওয়া উচিত কিনা। সে বলল, 'আপনি জানেন না দিদি, ওর সঙ্গে হাঁটা কি কষ্টকর।'

জয়ন্তী হাসলেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ভালভাবে নিয়ে যাব ওকে।' একটু কি স্বস্তি নার্সটির? মুখে আরামের ভাঁজ? বলল, 'তাহলে বেশী দেরী করবেন না। ওর বাবা শুনলে আমাকে খেয়ে ফেলবে। ভীষণ রাগী মানুষ। শোন, তুমি আবার অন্য কিছুর বায়না করবে না, বুঝলে? তাহলে আমি আসি!'

'হ্যাঁ।' জয়ন্তীর মুখ থেকে শব্দটি বের হওয়া মাত্র নার্স বাড়ির পথ ধরল। সেদিকে একবার তাকিয়ে জয়ন্তী তাপসের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'তুমি কিন্তু খুব ঘামছ।'

তাপস ওঁর দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। জয়ন্তী চারপাশে নজর বোলালেন। এখনও আকাশে রোদ্দুরে টাঙানো, কুয়াশারা গতকালের মত জমতে শুরু করেনি। ঠাণ্ডা হাওয়াটা এখন নামেনি পাহাড় থেকে। ওঁর মনে হল অতিরিক্ত গরম জামা কাপড় তাপসকে অস্বস্তি দিচ্ছে। তিনি বললেন, 'মাঙ্কি ক্যাপটা খুলে ফেললে হয়তো আরাম লাগবে তোমার। খুলবে?'

একটু শঙ্কিত হল তাপস। সরু গলায় বলল, ! 'আন্টি বকবেন।'

'এখন খুলে বসো, যাওয়ার সময় আবার পরে নিও।'

ছেলেটি নিজে খুলতে পারল না, জয়ন্তীকে হাত দিতে হল। ভীষণ দুর্বল ও, কাগজের মত সাদা দেহে কোথাও শক্তি অবশিষ্ট নেই। অথচ চোখ দুটো কি দারুণ উজ্জ্বল। মাথার চুল চেপে বসে গিয়েছিল। জয়ন্তীর খুব ইচ্ছে করছিল কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে। কয়েকদিনের মধ্যে যে মরে যাবে তার সম্পর্কে সঙ্কোচ হবার কোন মানে হয় না। কিন্তু ছেলেটি যে আরাম বোধ করছে এটা বোঝা গেল। মুখের চেহারার পরিবর্তন হচ্ছিল ঘামে বাতাস লাগায়। মাঙ্কি ক্যাপটা হাতে নিয়ে জয়ন্তী পাশের পাথরটার ওপর একটু আরাম করে বসলেন, 'এসো আমরা এবার গল্প করি। তুমি এখানে কতদিন এসেছ?'

প্রশ্নটা শুনে মনে মনে হিসেব করতে চাইল তাপস। তারপর বলল, 'ঠিক বিরানব্বই দিন।' অবাক হলেন জয়ন্তী। এইভাবে দিনগুণতে কাউকে কখনো দেখেন নি তিনি। স্বচ্ছন্দে তিনমাস বলতে পারত ও।

'আমি এসেছি এক সপ্তাহ হয়নি।'

'জানি।'

'কি করে জানলে?' দারুণ অবাক হলেন জয়ন্তী।

'দেখেছি।'

'ও। তোমার কেমন লাগছে এই জায়গাটা?'

ঠোট বেকাল তাপস 'ভালো না।'

'সেকি? কেন?'

'আমি তো বাড়ি থেকে শুধু এই পর্যন্ত আসি।'

'তুমি আব কোথাও যাওনি? নীচে কত বিবাট মেলা হল, ওদিকে নদীব বুকটা কি চমৎকাব? একটা গুম্ফা আছে ওপাশে যাব ঘন্টা বাজে মাঝে মাঝে—। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সব দেখিয়ে নিয়ে আসব। দেখবে, তোমাব তখন এই জাযগাটাকে খুব ভাল লাগবে।'

'সত্যি আমাকে নিয়ে যাবে?' উৎসাহে উজ্জ্বল হল তাপসেব মুখ।

ঘাড কাৎ কবলেন জযন্তী। এবং হঠাৎ তিনি অনুভব কবলেন তাঁব কথা বলাব ধবন যেন বদলে গেছে। দিল্লীব ইংবেজী কাগজেব সাংবাদিক জযন্তী বায নয, পঁচিশ বছব আগেব সেই বালিকাব গলা যেন আচমকা শুনতে পেলেন তিনি। শুনে মজা লাগল। স্পষ্ট বুঝতে পাবলেন এই নিবক্ত কিশোবটিব সঙ্গে এইভাবে কথা বলাই স্বাভাবিক।

এবাব কুয়াশাবা জমতে শুরু কবেছে পাহাডেব মাথায। খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে বোদ্দুবেব চেহাবা। জযন্তী মাঙ্কি ক্যাপ এগিয়ে ধবলেন 'এবাব এটা পবে নাও।'

তাপস মাথা নাড়ল 'না এই ভাল লাগছে।'

'উঁহু' তোমাব ঠাণ্ডা লেগে যেতে পাবে।'

'লাগবে না। তুমি আন্টিব মত কথা বলো না।'

হেসে বললেন জযন্তী 'বেশ। শুধু আজকেব দিনটায পবো।'

অনিচ্ছায আবাব সেটাকে মাথায চাপালো তাপস। জযন্তী তাকে সাহায্য কবলেন।

'এবাব চলো আমবা আস্তে আস্তে ফিবে যাই।'

'না আব একটু থাকবো।'

বাঃ বিকেল হয়ে আসছে না?'

'সবাই তো বিকেলেই বেডায। আমাব বাড়িতে যেতে ভাল লাগে না। কেউ আমাব সঙ্গে কথা বলে না। একা একা শুধু কান্না পায।

জযন্তী তাপসেব কাঁধে হাত বাখলেন, 'চল, আমি তোমাব সঙ্গে গল্প কবব কিছুক্ষণ। দোনামনা কবে বাজী হল তাপস। ওব সঙ্গে জোবে হাটা যাবে না। ধীবে ধীবে ওবা তাপসদেব বাংলোয চলে এলেন। জযন্তী দেখলেন, একই প্যাটানেব বাংলোগুলো সাজানো। কাঠেব সিঁডি, সামনে চিলতে বাগান কাঠেব গেট। এটুকু হেঁটে আসতেই তাপস বেশ কাহিল হয়ে পডেছে। গেট ধবে জিবিযে নিযে বলল 'তুমি ভেতবে আসবে না?'

এবাব অস্বস্তিতে পডলেন জযন্তী। ছেলেটিব সঙ্গে সামান্য আলাপে বাডিব ভেতবে যাওযা শোভন হবে না। যদিও শুনেছেন আব কেউ এখানে নেই, তবু। জযন্তী হেসে বললেন, 'আজ থাক। কালকে আসবো।'

'তাহলে আমি কাব সঙ্গে গল্প কবব?'

'তাই তো! কিন্তু তোমাব বাবা যদি বাগ কবেন।' কথা ঘোবাতে চাইলেন জযন্তী।

'বাবা!' শব্দটি উচ্চাবণ কবেই থমকে গেল তাপস। ওব চোখ এখন দূবে লেপ্টে আছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন জযন্তী। একটা গাডি আসছে উঠে। তাপস বলল, 'বাবাকে আমি ভয পাই না।

'বেশ। তাহলে কাল থেকে—।'

'আমি তোমাব নামই জানতে পাবিনি। কি বলে ডাকবো তোমাকে?'

ঠিক সেই সময গাডিটা এসে থামল বাড়িব সামনে। এক প্রায বৃদ্ধ দবজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যালো তাপসবাবু বেডানো হয়ে গেল?'

তাপসের ঠোঁটে সামান্য হাসি, মাথা কাৎ করল সে।

'গুড। চল, আমরা ভেতরে গিয়ে গল্প করি।' ভদ্রলোকের গলার স্বর শুনেই নার্স প্রায় দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে তাপসের কাঁধে স্পর্শ করতেই সে বিরক্তির সঙ্গে হাতটাকে সরিয়ে দিল। জয়ন্তী এতক্ষণে বুঝে গেছেন ইনি ডাক্তার। ততক্ষণে ভদ্রলোক ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। জয়ন্তীকে লক্ষ্য করছেন উনি, 'আপনি—। ও হ্যাঁ, আপনি তো এদিকের একটা বাংলোয় উঠেছেন। জার্নালিস্ট?'

'সেকি! আপনি জানলেন কি করে?'

'কি আশ্চর্য! এরকম একটা ছোট জায়গায় কোন খবর চাপা থাকে?'

'আপনি তো ডাক্তার?'

'গুড গড! সেটাও কি আমার মুখে লেখা আছে!' কৃত্রিম চমকে উঠলেন ভদ্রলোক।

'না। আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে।'

চকিতে নিজের কোটের পকেটের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠে স্টেথোটাকে একবার ছুঁলেন ডাক্তার, 'যাক, আমাদের তাপসবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার? খুব ভাল ছেলে তবে একটু অভিমানী।'

এ রকম বিকেলে একা বসে থাকতেই ইচ্ছে করে না। ছায়ারা যত ঘন হয় তত বিষণ্ণ লাগে চারধার। জয়ন্তী নিজের বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে ফিরে এসে বসতেই আকাশ থেকে আলো নিবে গেল। এখানে সন্ধে হয় আচমকা। সূর্য ডুবে গেলেও এক ধরনের মায়াবী আলোয় মাখামাখি হয়ে কিছুক্ষণ পৃথিবী চুপচাপ অপেক্ষা করে। জয়ন্তী অনেকদিনের একটা পুরোন চাপ বুকের মধ্যে নতুন করে অনুভব করলেন। সেটা কি তাপসের ওই রকম তাকানোর জন্যে, নাকি মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলেটি তাকে দেখছে বলে? বুড়ি এসে দাঁড়াল পেছনের দরজায়, 'মেমসাব, চা আনবো?'

ঘাড় কাৎ করলেন জয়ন্তী। তারপর চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। পঁচিশ বছর আগের সেই কিশোর চোখ দুটো এখন নিশ্চয়ই অনেক পোক্ত হয়েছে। সেই চোখের মালিক এখন কোথায় আছে কে জানে। ধীরে ধীরে সময় পুরু হতে হতে যে আস্তরণ ছড়িয়েছিল তা ভেদ করার কোন প্রশ্ন ওঠেনি। সে থাকল কি থাকল না এখন আর কিছুই এসে যায় না। পনের বছর বয়সটা একসময় হাবুডুবু খেয়ে স্থির শক্ত হয়ে গেছে। চল্লিশে এসে তাকে নেহাৎই শৈশবস্মৃতি বলে মনে হতো। মাঝে মাঝে সেই সময়ের চাপল্য অথবা দুঃখবোধের কথা ভেবে নিজেরই অবাক লাগত। তাহলে আজ কেন এমন লাগছে? একটি নিরক্ত কিশোরের চোখ এবং কথা এমন শিকড় ধরে টানছে কেন?

তারপর বেশ ভাব হয়ে গেল তাপসের সঙ্গে। আজও নার্স এসেছেন ওকে নিয়ে। জয়ন্তী গেটে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের দেখে বেরিয়ে এলেন। নার্স বলল, 'আপনি ওকে জাদু করেছেন দিদি। সারাদিন আপনার কথা বকবক করছে।'

জয়ন্তী হাসলেন, 'কেমন আছ?'

তাপস সোৎসাহে ঘাড় নাড়ল, ভাল। নার্স বলল, 'দিদি, আপনি ওকে পৌঁছে দেবেন? আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—।'

জয়ন্তী বললেন, 'বেশ তো। তুমি যেতে পারো।'

নার্স তাপসকে বলল, 'দিদির অবাধ্য হবে না। একদম ঠাণ্ডা লাগাবে না। রোদ পড়ে যাওয়ার আগেই চলে আসবে, বুঝলে?'

তাপস স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নার্স চলে গেলে বলল, 'আমার একটুও ভাল লাগে না।

সবসময় শাসন করে।'

'না। উনি তোমায় ভালবাসেন তাই এসব বলেন।' জয়ন্তী বললেন 'তোমার হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'মোটেই না। আমার আজকে খুব ভাল লাগছে।'

'তাহলে চল আমরা ওই কালভার্টটায় গিয়ে বসি। ওর তলায় একটা ছোট্ট ঝরনা বয়ে যায়।'

তাপস তাকালো। দূরত্বটা ওর পক্ষে বেশ দূরের। একটু নার্ভাস দেখালো ওকে, 'আমি ওখানে যেতে পারব?'

'কেন পারবে না? তুমি আমার হাত ধরো।' খুব সন্তর্পণে ওর সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকলেন জয়ন্তী। ছেলেটির শরীর পাখীর মত হালকা। জয়ন্তীর একবার মনে হল ওকে কালভার্টের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা। কিন্তু তাপসের মুখ বেশ খুশী খুশী। কয়েক পা হেঁটে সে বলল, 'আমি তোমাকে কি বলে ডাকব?'

জয়ন্তী বললেন 'তোমার যা খুশী।'

'আমি তোমাকে নতুনদি বলব।'

'বাঃ, তোমার তো বেশ বুদ্ধি। আর কোন দিদি আছে বুঝি?'

নীরবে ঘাড় নাড়ল তাপস, তারপর উদাস গলায় বলল, 'আমার কেউ নেই।

'ওকথা বলো না। তোমার বাবা আছেন না? আমার তো তেমন কেউ নেই।

তাপস ওর মুখের দিকে তাকাল, তারপর নীচু গলায় বলল, 'তোমার খুব কষ্ট, না?'

জয়ন্তী বিব্রত হলেন। এ প্রশ্নের তিনি কি জবাব দেবেন?

কালভার্টে পৌঁছে ভীষণ খুশী হল তাপস। নীচে কুলুকুলু শব্দে শীর্ণ জলের ধারা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। ছোট নুড়ি পাথরগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। মুখ তুললে গুম্ফাটা চোখে পড়ে। কতগুলো ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁক দিয়ে গুম্ফাটার শরীরে ঝোলানো ছোট ঘণ্টাগুলোর শব্দ বাতাস বয়ে আনছে। তাপসের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল জয়ন্তীর। নানান কথা যার হয়তো কোন মানে নেই, সারাক্ষণ বকবক করে গেল দুজনে। জয়ন্তীর মনে হল তাপস যেন এতদিন পাথরচাপা ছিল, আজ হঠাৎ মুখ খোলা পেয়ে ফিনকি দিয়ে উঠেছে।

রোদ্দুরের রঙ পাল্টাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী আনমনে এক কলি গেয়ে ফেললেন। শুনেই তাপস বলল, বাঃ, তুমি তো বেশ সুন্দর গান করো।'

জয়ন্তী বললেন, 'এই ছেলে, ঠাট্টা হচ্ছে, না?'

'না, সত্যি বলছি।'

'তুমি গাইতে পারো না?'

'আমি? আমাকে কেউ কোনদিন গান গাইতে বলেনি।'

'সেকি! গান তো নিজে থেকেই আসে। বেশ, আমি বলছি, তুমি গাও আমার সঙ্গে।' তাপসের পিঠে হাত রেখে জয়ন্তী একটা লাইন গাইলেন, 'আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা।' বললেন, 'গাও আমার সঙ্গে, আমার মতন করে।' তাপসের ঠোঁট কাঁপল। ক্রমশ ওর মুখচোখ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। জয়ন্তী লাইনটি বারংবার গাইতে লাগলেন ওকে সাহস দেবার জন্যে। তাপসের সাদা মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, নীচু গলায় সে গলা মেলাতে চেষ্টা করছিল। একটা নতুন ধরনের আনন্দে সে জয়ন্তীর হাত চেপে ধরতেই তিনি হঠাৎ শিহরণ অনুভব করলেন। সেই হাত এবং স্পর্শ যা কিনা পঁচিশ বছরেও মরে যায়নি। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন জয়ন্তী। তাঁর মুখ লাল শরীর অস্থির। তাপস ওঁর মুখ এবং আচরণে অবাক হয়ে গেল, 'কি হল নতুনদি?'

কোন রকমে শক্তি ফিরিয়ে আনলেন জয়ন্তী, 'কিছু না। চল, ওঠা যাক। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু

কবছে।'

'না, আব একটু বসো। আমাব এখানে বসতে খুব ভাল লাগছে।'

'উঁহুঁ ওঠো।'

'আব একটু বসো না, তোমাব পাশে আব একটু বসব।'

এই সময় দূবে গাডিব শব্দ উঠল। জয়ন্তী মুখ ফিবিয়ে দেখলেন ডাক্তাববাবু, আসছেন। কাছে এসে দাঁডিয়ে পডল গাডিটা, 'আবে তাপসবাবু, তুমি আজ এতদূব এসে পড়েছ! ফাইন।

জয়ন্তী একটু বিব্রত গলায় বললেন, 'আমাবই দোষ, এতদূরে আনা—।'

'না না দোষ বলছেন কেন? এইটে ওব প্রয়োজন ছিল। দেখুন তো, ওব মুখেব চেহাবা পাল্টে যাচ্ছে। আমবা ওষুধে যা পাবি না তা মনেব পবিবর্তনে অনেক সময় সম্ভব হয। তবে আব দেবী নয। এখনই টুপ করে অন্ধকাব হয়ে যাবে। আপনাবা ববং আমাব গাডিতে উঠে আসুন। এসো তাপসবাবু।'

জয়ন্তী বললেন, এইটুকু পথ আমি না হয হেঁটেই ফিবছি।'

আবে আসুন তো। দবজা খুলে দিলেন ডাক্তাব।

প্রথমে খুব সন্তর্পণে তাপসকে বসিয়ে নিজে উঠলেন জয়ন্তী। গাডি চলতে শুরু কবলে ডাক্তাব বললেন 'খুবই অবিশ্বাস্য। তিনদিন আগেও ভাবতে পাবিনি ও এতটা হাটতে পাববে। কথাটা ইংবেজীতে বললেন তিনি। তাপস ইংবেজী জানে কিনা বুঝতে পাবলেন না জয়ন্তী। তাই অনেক জিজ্ঞাসা থাকা সত্ত্বেও চুপ করে বসে বইলেন। ওব বাংলোব সামনে গাডি থামলে নেমে দাঁডালেন 'ধন্যবাদ।

ডাক্তাব হেসে আবাব ইঞ্জিন চালু কবলেন। জয়ন্তী দেখলেন তাপসেব চোখে কাতবতা। আব দাঁডাতে পাবলেন না জয়ন্তী। এক দৌডে নিজেব ঘবে ঢুকে বিছানায উপুড হয়ে শুযে পডলেন বালিশে মুখ গুজে। এই মুহূর্তে তিনি স্পষ্ট জানেন না কেন এমন শবীব কাঁপিয়ে কান্না আসছে। পঁচিশ বছবে এমনভাবে কখনো কাঁদেননি তিনি।

পবদিন মেঘলা ছিল। দুপুবে খাওয়া দাওযাব পব ঘুমিয়ে পডেছিলেন জয়ন্তী। হাতেব স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গল। চমকে উঠে বসতে বসতে হেসে ফেললেন ওমা তুমি কখন এসেছ?

দবজায নার্সটি দাডিয়ে, 'কিছুতেই ছাড়বে না আপনাব কাছে আসবেই। দুদিনে বাবু যেন সেবে উঠেছেন। তাবপব আজ সকালে ডাক্তাববাবু বলে গেছেন যে আপনাব কথা শুনতে। ব্যস, একদম সাপেব পাঁচ পা দেখেছে।

জয়ন্তী হাসলেন। প্রশ্রয বোধহয একেই বলে। বললে এই ছেলে বসো দাডিয়ে কেন? অগোছাল চুল দু-হাতে জডিয়ে খোঁপা করে নিলেন তিনি নার্সটি বলল 'আমি তাহলে যাই দিদি?'

ঘাড কাৎ কবলেন জয়ন্তী।

নিঃশব্দে ফবে গেল নার্সটি। সেদিকে তাকিয়ে তাপস বলল আমাব সঙ্গে বেডাতে হয না বলে আন্টি খুব খুশী হয়েছে।'

বিছানা ছেডে উঠে জানালা দিয়ে বাইবে তাকালেন জয়ন্তী। নার্সটি দ্রুত ফিবে যাচ্ছে অবাক গলায জিজ্ঞাসা কবলেন, 'তাই? কেন?'

'সুনীতদাব সঙ্গে গল্প কবতে পাবে না বেবোতে হলে।'

'সুনীতদা কে?'

'কম্পাউন্ডাব। আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে আসে।'

'তুমি বোজ ইঞ্জেকশন নাও?

না। তবু আসে যখন ইঞ্জেকশন দিতে হয় না তখন এলে কারো সামনে বের হয় না এমনকি ডাক্তারবাবু এলেও না।'

'ও।'

জয়ন্তী বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটাকে কিভাবে এড়ানো যায়।

'জানো নতুনদি, ওরা নিজেরা থাকলে অনেক কথা বলে, আমি থাকলে চুপ করে যায়। কি কথা বলে ওরা?'

জয়ন্তী বললেন, 'তা আমি কি করে জানবো? ওরা হয়তো খুব বন্ধু।'

'যাঃ, ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয়?'

এই অপাপবিদ্ধ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হল জয়ন্তীর, আর পাঁচটা ছেলের মত স্বাভাবিকতা এর মধ্যে আসেনি। আলনা থেকে কাপড় টেনে নিয়ে জয়ন্তী বললেন, 'বাঃ কেন হবে না?'

'তোমার ছেলে বন্ধু আছে?'

'আমার?' জয়ন্তী শক্ত হতে গিয়ে সামলে নিলেন 'উহুঁ।'

'তবে?'

'বাঃ আমার নেই বলে আর কারো হবে না?'

'জানো, নতুনদি, আন্টি না সুনীতদাকে চুমু খায়। আমি দেখেছিলাম বলে খুব রেগে গিয়েছিল সুনীতদার ওপরে। ছেলে বন্ধুকে চুমু খেলে কি অন্যায়?'

কি বলবেন জয়ন্তী। মজা করতে ইচ্ছে হল, 'না অন্যায় হবে কেন?'

'আমি তোমার বন্ধু হলে আমাকে চুমু খাবে তুমি?'

জয়ন্তী মুখ তুলে তাকালেন। সমস্ত শরীরের সেই কাঁপুনিটা ফিরে এল। মুখ নামিয়ে বললেন আগে সত্যিকারের বন্ধু হও—।'

'আমি তোমার সত্যিকারের বন্ধু হবো নতুনদি। তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো?'

হাত বাড়িয়ে ওর চুলে আঙুল রাখলেন জয়ন্তী, 'তুমি বড় ভাল ছেলে।' নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। তারপর কাপড়টাকে আবার আলনায় রেখে দিয়ে বললেন, 'নাঃ। আজ আর বেরোবো না। এসো আমরা বারান্দার বেতের চেয়ারে গিয়ে বসি।'

'সেই কালভার্টটার কাছে যাবে না?'

'উহুঁ, তার চেয়ে এসো আমরা বারান্দায় বসি।'

'তুমি গান গাইবে?'

'আমি? গাইতে পারি যদি তুমি আমার সঙ্গে গাও।'

খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল তাপস। জয়ন্তীর মনে হল ওকে আজ আর অসুস্থ বলে মোটেই মনে হচ্ছে না।

গতকাল বিকেলে বেড়ানো হয়নি। জয়ন্তী আজ সাত তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলেন। বারান্দার রেলিং-এ ভর রেখে সামনের পাহাড় দেখতে দেখতে তাঁর জায়গাটাকে আরো বেশী ভাল লাগল। এখানে যদি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। ভাবতে গিয়েই হাসি এল। বহু ব্যবহারে সব কিছুই ঘষা আধুলির মত হয়ে যায়। জয়ন্তী ডান দিকে মুখ ঘোরাতেই তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তাপস আসছে। কিন্তু নার্স নয়, আজ ওর সঙ্গে যে ভদ্রলোক তাঁর হাঁটার ভঙ্গীটি সদর্পের। এই কি সেই সুনীতদা? মন বলল, না। আজ কি বাব? নিশ্চয়ই ইনি তাপসের বাবা। কোন কারণ নেই এটা বুঝতে পারছেন তবু জয়ন্তীর কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। একবার

ভাবলেন ভেতরে চলে যান। কিন্তু ওরা যে তাঁকে দেখে ফেলেছে কারণ ভদ্রলোকের মুখ এদিকেই।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। কিন্তু তাপসের মুখ নামানো। ভদ্রলোক কথা বলছেন খুব কম। লম্বা মেদহীন একটু পোড় খাওয়া চেহারা। জয়ন্তীর মনে হল, ইনি সেই রকম মানুষ যিনি নিজের অনেক অভিজ্ঞতা সযত্নে চেপে রাখতে জানেন। তাপস বাংলোর কাছাকাছি এসে মুখ তুলল তুলেই নামিয়ে নিল। ঠিক নীচে এসে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তারপর সহাস্যে দু-হাত জড়ো করে বললেন, 'নমস্কার। আমি সুভাষ সেনগুপ্ত। এবার এসে আপনার নাম সবার মুখে শুনেছি

দুহাত যুক্ত করে নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন জয়ন্তী। ওঁরা এখনও দাঁড়িয়ে অতএব অনিচ্ছে সত্ত্বেও নীচে নেমে এলেন তিনি। গেট খুলে বাইরে এসে তাপসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ?'

নীরবে ঘাড় নাড়ল তাপস, ভাল। ছেলেটি বারংবার তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে কিন্তু হাবভাবে কেমন একটা সন্ত্রস্তভাব। সুভাষ বললেন 'ডাক্তার বলছেন আপনার সঙ্গে মেশার পর ওর স্বাস্থ্যের অস্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে। এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

'ছি ছি একি কথা বলছেন।' সত্যি লজ্জিত হলেন জয়ন্তী।

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি। গত সপ্তাহে আমি ওকে নিয়ে এতটা আসব ভাবতেই পারিনি কিন্তু শুনলাম আপনার সঙ্গে খোকা কালভার্ট অবধি গিয়েছিল। অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য ঘটনা। প্রতি সপ্তাহে ওকে ব্লাড দিতে হয়। আজ সকালে ডাক্তার অবাক হয়েছেন। ওর মনে হচ্ছে আরও ক'দিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। এর একমাত্র কারণ ও আপনার সঙ্গে মেলামেশা করে একধরনের মানসিক আনন্দ পেয়েছে। আপনি জানেন না মি ।

'জয়ন্তী রায়।'

'আপনি জানেন না জয়ন্তী দেবী এতে আমি কি রকম স্বস্তি পেয়েছি।

'আপনি বাড়িয়ে বলছেন।

সুভাষ হাসলেন, 'চলুন, একটু হাঁটা যাক।'

জয়ন্তী আপত্তি করলেন না। দু'পা হেঁটে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাপসকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কি ব্যাপার, তুমি আজ চুপচাপ কেন?

তাপস মুখ ঘুরিয়ে নিলে। জয়ন্তীর এটা ভাল লাগল না। খুব ধীরে হাঁটছে ওরা।সুভাষ বললেন, 'ও চিরকালই এরকম। ওর মা তো জন্ম দিয়েই মুক্তি নিলেন ঝি চাকরের হাতে মানুষ হওয়ায় কারো সঙ্গে মেশার সুযোগ পায়নি। তারপর গত কয়েক-বছর ধরে তো এই বিপদ। কথাই বলতে চায় না। আর পাঁচটা ওই বয়সের ছেলের তুলনায় তাই মানসিক ডেভলেপমেন্ট হয়নি।'

'না, একথা ঠিক নয়। তাপস আমার সঙ্গে অনেক কথা বলে। জয়ন্তী সস্নেহে তাপসের দিকে তাকালেন। তাপস দৃষ্টি ফেরাল না।

'কথা বলে? স্ট্রেঞ্জ। সত্যি ওর অনেক কিছু বদলে দিয়েছেন আপনি। আমি একা মানুষ হয়তো ঠিক ওর যত্ন নিতে পারি না। চাকরী বাঁচিয়ে ছুটে আসি প্রত্যেকবার ভয় নিয়ে কি জানি কি দেখব। এবার এসে অবাক হলাম '

'আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন।' জয়ন্তীর চোখ ছিল তাপসের দিকে। ওর কপালে এই ঠাণ্ডায় গুড়ি গুড়ি ঘাম। হঠাৎ মনে হল তাপসের যেন কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত ওর হাত ধরলেন তিনি 'তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

কথা না বলে মুখ নামালো তাপস। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে একটু বসে জিরিয়ে নেবে?'

সবেগে মাথা নাড়ল তাপস, মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বের হল না। ঘাড় শক্ত, জেদী ভঙ্গী। জয়ন্তী সুভাষকে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওর শরীরটা ঠিক নেই।'

সুভাষ কাছে এগিয়ে এলেন, 'কি হয়েছে? খারাপ লাগছে?'

'আমি বাড়িতে যাব।' তাপস যেন কোনরকমে বলতে পারল।

ওরা কেউ আর কথা বলল না। ধীরে ধীরে ফিরে চলল। নিজের বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে জয়ন্তী বললেন, 'আমি চলি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাপস চোখ তুলে তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। সুভাষ বললেন, 'সে কি। এখনও তো বিকেল যায়নি। শুনছি আমার ওখানে একবারও যাননি, আজ আসুন।'

অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হল না। তাছাড়া তাপসের জন্যও দুশ্চিন্তা ছিল। ছেলেটার আজ হঠাৎ এমন পরিবর্তন হল কেন?

বারান্দায় উঠেই জয়ন্তীর মনে হল অযত্ন শব্দটাকে কেউ চারপাশে সাজিয়ে রেখেছে এখানে। নার্স বেরিয়ে এসেছিল। সুভাষ বললেন, 'ওর শরীরটা ঠিক নেই। জামাকাপড় চেঞ্জ করিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। ডাক্তার তো এখনি আসবেন। আর আমাদের কফি দিতে বলো।'

জয়ন্তীর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তাপসের কাছে কিছুক্ষণ বসেন। কিন্তু সুভাষের কথা বলার ধরনে সঙ্কোচ হল। বন্ধ জানলার সামনে বারান্দার চেয়ারে এসে বসলেন ওঁরা। সামনে পাতলা লাল-হলুদ গোলা রোদ। সুভাষ বললেন, 'আপনি দিল্লিতেই থাকেন? কোথায়?'

'পুসা রোডে'।

'ও। দিল্লিতে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে। এখন তো আর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি কোন কাগজে আছেন?'

'ডেইলি সান।'

'বেশ ভাল চাকরী আপনাদের।'

'ওই আর কি!'

'আমি এখন ওই ছেলের কাছে দায়বদ্ধ। ওর মা চলে গেছেন কতদিন হল। আর এ তো যাওয়ার মুখেই।'

সুভাষ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'এই প্রথম এখানে এসে আমি স্বস্তি পেলাম। ওর মুখে এই প্রথম রক্ত দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। সত্যি, আপনি ওকে জীবন দিয়েছেন। আপনি না এলে খোকা বাঁচতো না।'

জয়ন্তী এইরকম কথায় খুব স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ভদ্রলোক যেন বারবার তাঁকে জড়াতে চাইছেন। যেটা ছিল তাঁর এবং তাপসের সহজ ব্যাপার সেটার ওপর একটা সাইন-বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যেন। হঠাৎ ডানদিকে চোখ ফেরাতেই আঁতকে উঠতে গিয়ে সামলে নিলেন জয়ন্তী। পেছনের জানলার কাঁচে একটা সাদা মুখ লেপ্টে ছিল এতক্ষণ। চোখ দুটো পাথরের মত তার দিকে স্থির। তিনি তাকাতেই ছবিটা ভেঙ্গে গেল। চট করে মুছে গেল জানলা থেকে, সুভাষ ওর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, 'কি হল?'

জয়ন্তীর তখন বুকের মধ্যে দম আটকানো অনুভূতি। সেই চোখ দুটো যেন বসে যাচ্ছে গভীরে। কোনক্রমে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি যাই।'

'সে কি! কি হল আপনার?' সুভাষ বিস্মিত।

'কিছু না। আমি—। শরীরটা—।' জয়ন্তী অনেক দিন পরে এমনভাবে কথা বললেন।

'কিন্তু কফি হচ্ছে, কফি খেয়ে যান।'

'মাপ করবেন। আর একদিন হবে।'

বুঝতে পারছেন এটা অভদ্রতা এবং এতদিনের শিক্ষা ও অভ্যাসে যা তিনি কখনও করেননি

তাই আজ করলেন। সুভাষকে গেটে দাঁড় করিয়ে রেখেই দ্রুত ফিরে চললেন নিজের বাংলোয়। প্রতিবার তিনি পা ফেলছেন আর যেন মনে হচ্ছে আবো যদি দূরত্ব বাড়ানো যেত!

নিজের বিছানায় বেশ কিছুক্ষণ শোওয়ার পর বুক শান্ত হল। না, সত্যি আজ অন্যায় ব্যবহার হয়ে গেল। সুভাষবাবু যথেষ্ট ভদ্রতা করেছেন। অসুস্থ ছেলের বাবা হিসেবে ওঁর কথাবার্তা সঙ্গত। কিন্তু তাপসের চোখদুটো অমন জ্বলছিল কেন? কেন ও বেড়াতে বেরিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখছিল? কেন অমন চোরের মত তাঁকে দেখছিল সে কাঁচের আড়াল থেকে। পঁচিশ বছর আগের সেই জেদী অভিমানী দৃষ্টিটাকে আজ নতুন করে দেখতে পেয়ে সব বেসামাল হয়ে গেল তাঁর। জয়ন্তী উঠে বসলেন। বাইরে এখন সন্ধের আঁধার। তির তির করে ঠাণ্ডার মেজাজ বাড়ছে। হঠাৎ জয়ন্তী সিদ্ধান্ত নিলেন। কাল সকালের বাসেই তিনি ফিরে যাবেন। এখানে আর একদিনও নয়।

বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বলে দিয়েছেন খাওয়ার সময়। টাকা পয়সা মিটিয়ে দেবেন সকালে। সাতটায় নীচের বাজার থেকে প্রথম বাস ছাড়ে। আলো জ্বেলে বই পড়ার চেষ্টা করছেন, এমন সময় মেয়েলি গলা পাওয়া গেল। কেউ তাঁকে ডাকছে।

দরজা খুলেই নার্সটিকে দেখতে পেলেন, 'দিদি, ডাক্তারবাবু আপনাকে খবর দিতে বললেন। আপনি এক্ষুনি চলুন।'

'কেন কি হয়েছে?' হৃৎপিণ্ড বুঝি গলায় আটকে গেল।

'খোকা খুব অসুস্থ।'

আর দাঁড়ালেন না জয়ন্তী। আলনা থেকে একটা শাল টেনে নিয়ে ছুটলেন তিনি। প্রায় এক দৌড়েই তাপসের ঘরে পৌঁছে গিয়ে থমকে গেলেন জয়ন্তী। খাটের ওপর দু'তিনটে কম্বল গায়ে চাপিয়ে তাপস শুয়ে আছে। ডাক্তারের হাতের মুঠোয় ওর কবজি। তাপসের চোখ বন্ধ। মুখ যেটুকু বেরিয়ে আছে তাতে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। মৃত্যু এবং জীবন এই মুহূর্তে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সুভাষ ওর পায়ের কাছে বসে কাতর চোখে তাকালেন। ডাক্তার হাতটি নামিয়ে ওকে দেখলেন, 'যাক, আপনি এসে গেছেন! যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ আপনার নাম শুনতে হয়েছে আমাদের।'

ধীরে ধীরে ওর মাথার পাশে এসে বসলেন জয়ন্তী। কাঁপা হাত ওর কপালে রাখতেই মনে হল বরফের স্পর্শ পেলেন, 'কি হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না। সকালে দেখলাম খুব ইম্প্রুভড। সন্ধে থেকে এমন খারাপ হল কি করে কে জানে। ব্লাড চেঞ্জ করতে হবে ইমিডিয়েটলি। আজকের রাত যদি কোনমতে কেটে যায় তবেই ভাল। কাল সকালের আগে ওটা করা যাবে না। আমি আর একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।'

সুভাষ বললেন, 'হাঁটা চলায় কি—।'

'নো নো। মনে হচ্ছে মেন্টালি আপসেট। আপনারা কেউ কি ওকে কিছু বলেছেন?'

'না।' দৃঢ় গলায় প্রতিবাদ করলেন সুভাষ, 'এ কি কথা বলছেন?' তারপরেই যেন কিছু মনে পড়ায় জয়ন্তীর দিকে তাকালেন।

এগারোটা বেজে গেল। এখন নিশি রাত। তাপসের দু চোখ বন্ধ। অনিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ছে। ডাক্তার উঠলেন, 'মনে হচ্ছে রাতটা শান্তিতেই কাটবে। আমি ভোরেই চলে আসছি। আপনি আর বসে কি করবেন? এখন ও ঘুমুক।'

ধীরে ধীরে চুল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। এতক্ষণ কি জয়ন্তী তাঁর মধ্যে ছিলেন? দ্রুত সামাল দিলেন নিজেকে। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে ঘরের বাইরে আসার আগে আর একবার ঘুরে দাঁড়ালেন। তাপস নিস্পন্দ।

সুভাষ বেরিয়ে এলেন সঙ্গে। ডাক্তারের গাড়ি বেরিয়ে গেলে বললেন, 'চলুন, আমি আপনাকে এগিয়ে দিই।

জয়ন্তী ঘাড় নাড়লেন, 'না। আপনি বরং ওর কাছে থাকুন।'

সুভাষ ইতস্তত করলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন এমন হল।'

জয়ন্তী বললেন, 'কিছু হবে না। ও ঠিক ভাল হয়ে যাবে।'

সুভাষ মুখ তুললেন, 'আপনাকে আমি আজই দেখলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি থাকলে আমার মন জোর পাবে।'

চকিতে শক্ত হয়ে গেলেন জয়ন্তী। তারপর সুভাষকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অন্ধকারে হেঁটে গেলেন। এখন এই শীতের কোন অনুভূতি তাঁর আসছে না।

ঘুম আসছে না। জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে। জয়ন্তী চোখের পাতা বন্ধ করতে ভয় পাচ্ছিলেন। বন্ধ করলেই সেই মুখ যা কিনা পঁচিশ বছর আগে মিলিয়ে গিয়েছিল তা বেঁচে উঠে সেই চাহনি নিয়ে ফিরে আসছে। এখনও হাতের আঙুলে তাপসের কপালে হিমস্পর্শ ছটফট করতে লাগলেন জয়ন্তী। ও কি মরে যাচ্ছে? ডুকরে একটা কান্না উঠে এল। কেন হয় এমন? কেন তিনি নিজেকে কপট করতে পারলেন না?

বন্ধ জানলার বাইরে অন্ধকার স্থির হয়ে আছে। আকাশের এক কোণে নবমীর চাঁদ মেঘে জড়ানো। একটু সরে আসতেই লাইট হাউসের মত আলোটা চোখে পড়ল। ওটা যে সুভাষবাবুদের বাংলো এখন বুঝতে অসুবিধে নেই। আশে পাশের কোন বাড়িতে আলো জ্বলছে না। সুভাষবাবুদের অন্য ঘরগুলোতেও আলো নেই। শুধু আলো জ্বলছে যেখানে সেখানে একটি শরীর কম্বলের তলায় স্থির হয়ে রয়েছে। শরীরের সব রক্ত দ্রুত মরে যাচ্ছে তার। এই দূরে একা বসে জয়ন্তীর সেদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। চোখ সরাচ্ছিলেন না জয়ন্তী। একটা চেয়ার টেনে বসে সেই আলোটিকে আঁকড়ে ধরলেন যেন।

এখন কত রাত জানা নেই। বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুম জুড়ে বসেছিল চোখে টের পাননি। শব্দটা কানে আসতেই চেতনা এল। ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ। একবার হয়েই থেমে গেলেও জয়ন্তীর কানে লেগে রয়েছে। দূরের সেই আলোটা এখন অস্পষ্ট কুয়াশায় মাখামাখি। শব্দটা কোথায় হল? জয়ন্তীর মনে ভয় এল। তিনি চাপা গলায় বৃদ্ধাকে ডাকলেন কোন সাড়া এল না। চেয়ার ছেড়ে দরজার পাশের জানলার পর্দা সরালেন। কুয়াশারা ব হিমবাতাস জল জমিয়ে দিয়েছে জানলার কাচে। খানিকটা মুছে নিতেই বারান্দাটা নজরে এল নবমীর চাঁদ বুঝি এখন মাথার ওপরে। তার ফিকে আলোয় ভীষণ মায়াবী মনে হচ্ছে চারধার।আর তারপরেই তাঁর চোখে পড়ল একটা সাদা নগ্ন হাত কাঠের সিঁড়ির মুখে বারান্দায় নেতিয়ে আছে। চিৎকার করে উঠলেন জয়ন্তী। অন্য কোন ভাবনা এল না, পাগলের মত ছুটে এলেন দরজা খুলে।

সিঁড়িতে অর্ধেক দেহ, অর্ধেকটা বারান্দায়, একটা হাত প্রসারিত তাপস চেতনা হারিয়ে পড়ে আছে। গায়ে গরম জামা নেই। কম্বলের তলায় যে অবস্থায় শুয়েছিল সেই অবস্থায় পড়ে আছে এখানে। চাপা আর্তনাদ করে হাঁটু মুড়ে বসে জয়ন্তী ওকে জড়িয়ে ধরলেন। দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আর একটা আর্ত চিৎকার তাঁর বুক নিংড়ে ছিটকে এল। সেই শব্দে চোখ মেলল তাপস; ঠোঁট নড়ল। কিছু কি বলছে ও? জয়ন্তী নিজের উত্তপ্ত মুখ ওর গলার কাছে নিয়ে কান পাতলেন ঠোঁটে। জড়ানো গলায় ঘড়ঘড়ে শব্দ কিন্তু স্পষ্ট যেন শুনতে পেলেন জয়ন্তী 'তুমি আমার বন্ধু।' শেষটা হয়ত কানে আসেনি, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন সবটা। নিজের উষ্ণ ঠোঁটে শীতল স্পর্শ লাগতেই উন্মাদিনী হয়ে গেলেন জয়ন্তী। হয়তো বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা কান্নাটা কিংবা তাপসের শরীরের শীতলতাকে দূর করতে চুম্বন

কবতে লাগলেন ওব গালে ঠোঁটে গলায।

দু হাতেব বাঁধনে তাপসেব নিথব শবীব। একে টেনে নিযে ঘবে যাওযা এখন সম্ভব নয। জযন্তীব মাথায কিছু এল না। পাগলেব মত চুম্বন কবে যেতে লাগলেন ওই নিথব শবীবে। মুখ তুলতে তাঁব এখন ভীষণ ভয কবছিল। তাপসকে উত্তাপে ভবিযে দিতে নিজেব শবীবকে নিংড়ে দিতে চাইছিলেন জযন্তী। ওই হিম নতুন কবে সইবেন কি কবে, এই চল্লিশ বছব বযসে?

শিকার কাহিনী

আঠাবো ঘবেব এই বাড়িটাব মালিক পাণ্ডেজী। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। কথা বলেন সুন্দব হিন্দীতে, অত্যন্ত বিনযেব সঙ্গে। বছব চল্লিশেব মধ্যেই বযস কিন্তু কথাবার্তায এমন ভদ্রলোক আজকাল দেখা যায না। লোকে বলে ওঁব বাবাও নাকি ওইবকম বিনযী ছিলেন। মাথা ঠাণ্ডা একটুতে উত্তেজিত হবাব লোক নন বলে কানপুব থেকে কোলকাতায এসে এবকম তিনখানা বাড়িব মালিক হযেছেন। খিদিবপুবেব এই মহল্লায ওঁব তিনটে বাড়িব মধ্যে এই বাড়িটাই বড, ঘব অনেক, ভাড়াটে বেশী। তাই ভেতবে ঢোকাব মুখেই যে ঘবটি তা কাউকে ভাড়া দেননি পাণ্ডেজী। বাড়িওযালাব সঙ্গে বাড়িব যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে ভাড়াটেবা মতলব আঁটবেই। ববং তাদেব সঙ্গে মিলে মিশে থাকাই বুদ্ধিমানেব কাজ। এটাও বাবাব কাছ থেকেই শেখা। তাই ওই ঘবে বোজ বিকেলে মজলিশ বসে। বাড়িব ভেতবে যাবা যায আসে তাদেব ওপব নজব বাখা যায। বাইবেব উটকো লোক হলে এই ঘবে বসতে হবে প্রথমে।

আঠাবো ঘবেব এই বাড়িব ভাড়াটেবা সুনির্বাচিত। নিজে উত্তবপ্রদেশেব মানুষ বলে উত্তবপ্রদেশীযবাই সংখ্যায ভাবী। দু ঘব বিহাবী আব বাঙালী আছে। বাঙালীকে বাখা নিযে আপত্তি ছিল পাণ্ডেজীব। কিন্তু বাবা এ-ব্যাপাবেও তাকে শিক্ষা দিযে গেছেন। এই শহবটা যেহেতু বাংলাদেশে তাই আমাদেব হাবভাবে বাঙালী ছাপটা বাখা দবকাব। একজন বাঙালী ভাড়াটে থাকলে তাব সঙ্গে কথা বললে সেই ছাপটা আসবেই। তাছাড়া কোনদিন বাঙালী অবাঙালী ঝামেলা হলে সেই তোমাকে বাঁচাবে। তবে হ্যাঁ, এমন লোককে ভাড়াটে হিসাবে নির্বাচন কব যে মেরুদণ্ড সোজা কবতে পাবে না, একশটা ঝামেলায অষ্টপ্রহব জড়িযে আছে। পাণ্ডেজীব এই বাঙালী ভাড়াটেটি একটি স্কুলে পিওনেব চাকবী কবে, পাঁচটি কন্যাসন্তানেব জনক, সবসময মাটিব সঙ্গে মিশে আছে। তাব সঙ্গে দেখা হলে অত্যন্ত বিনযেব সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসা কবেন তিনি। লোকটি বিগলিত হয। দুবেলা হাত তুলে নমস্কাব কবে তাকে। অন্য ভাড়াটেদেব নির্দেশ দিযেছেন যেন বাঙালীটিব সঙ্গে কেউ খাবাপ ব্যবহাব না কবে। সাধাবণ জলকল পাযখানা নিযেই তো ওদেব ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয। সে ব্যাপাবে পাণ্ডেজীব কাছে সমস্যা হলেই আসতে হবে এবং তাঁব সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে।

যেহেতু উত্তবপ্রদেশেব এবং বিহাবেব মানুষজন এখানে শান্তিতে থাকতে চায তাই পর্দাপ্রথা সবাই সঙ্গত বিবেচনা কবে। আত্মীযজনেব কোন দর্শনার্থী এলে তাব হুট কবে ভেতবে যাওযাব

নিয়ম নেই। পাণ্ডেজী তাকে হাসিমুখে আপ্যায়ন করেন ভাড়াটেকে খবর দেন। সে এসে যদি প্রয়োজন মনে করে তবে নিজের দায়িত্বে অতিথিকে ভেতরে নিয়ে যাবে। কারণ এই বাড়ির মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করা একটি পবিত্র কর্তব্য।

পাণ্ডেজীর আর একটি নিয়ম সবাইকে মানতে হয়। আঠারো ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে সতেরজনের আয় অত্যন্ত সীমিত। বেশীর ভাগই আশেপাশের কলকারখানার শ্রমিক। ক্লাশ থ্রির বেশী বিদ্যে নেই কারো। দেশে চিঠি লিখতে হলে পাণ্ডেজীর সামনে এসে উবু হয়ে বসতে হয়। তা এই ধরনের মানুষ নেশা করে ঝামেলায় ফেলে সবাইকে। খিদিরপুরে নেশা করার জায়গার অভাব নেই। কিন্তু পাণ্ডেজীর হুকুম নেশা করে কেউ হল্লা করতে পারবে না। যদি তেমন হয় তাহলে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। কোন নিয়ম দীর্ঘকাল চালু থাকলে তা সহজে কেউ ভাঙ্গতে চায় না। নেশা করে আসা মানুষ চুপচাপ শুয়ে থাকে ঘরে।

পাণ্ডেজী এই সতেরজন সম্পর্কে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত। এরা ধর্মপ্রাণ এবং তার অত্যন্ত বশংবদ। উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণজাত সবাই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এই বাড়িতে সবাইকে আত্মীয়ের মত থাকতে হবে। সদরে একটি বারোয়ারী পাপোঁসে মা মুছে সবাইকে ঢুকতে হবে। স্ত্রীলোকরা যখন কলঘর ব্যবহার করবে তখন পুরুষরা সেদিকটা সম্মানের সঙ্গে পরিহার করবে। কিন্তু আঠারোতম ভাড়াটেটিকে নিয়ে ইদানীং দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পাণ্ডেজী।

লোকটি উত্তরপ্রদেশের নয়। বিহারের সমস্তিপুর জেলার মানুষ। মাত্র ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স। দুই কন্যার জনক। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। নাম নাগেশ্বর।

এ বাড়ির এই একটিমাত্র লোক প্যান্ট-সার্ট পরে। টেরিকটের মোজাসহ জুতো পায়ে দেয়। ঘরে বড় আয়না ছাড়া দুটো চেয়ার এবং টেবিল আছে। সমস্তিপুর কলেজ থেকে বি এ পাশ করেছে। ধর্মতলার একটি কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে বাবু চাকরী করে। এ বাড়ির গোএছাড়া ভাড়াটে। পাণ্ডেজী এই একটি ব্যাপারে বাবাকে সমর্থন করে না। তিনিই মৃত্যুর আগে এই ভাড়াটেটিকে মাত্র ষাট টাকায় বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য দু খেপে পাণ্ডেজী আশী টাকায় সেই ভাড়াকে তুলে এনেছেন। কিন্তু মনে শান্তি আসেনি। অন্যান্য ভাড়াটেরা নাগেশ্বর সম্পর্কে অত্যন্ত ঈর্ষা পোষণ করে এ তিনি জানেন। নাগেশ্বরের স্ত্রী খুবই সাদামাটা মেয়েছেলে, কোন পুরুষ আজও তাকে ঘোমটার আড়ালে দেখতে পায়নি। কিন্তু এই পরিবার অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, এমন কি বাচ্চাগুলোও ঘরেই থাকে সবসময়। প্রথম প্রথম এটাকে অহঙ্কার বলে মনে করত সবাই। একবার কাউকে অহঙ্কারী মনে হলে তাকে সহ্য করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। এ বাড়ির মেয়েদের ইন্ধনে পুরুষেরা নাগেশ্বরকে তাই এড়িয়ে চলত। সে বি এ পাশ জানা সত্ত্বেও কেউ তার কাছে চিঠি লেখাতে আসত না। কিন্তু ক্রমশ সবাই বুঝতে পারল নাগেশ্বর লোকটা নিরীহ প্রকৃতির, একমাত্র স্ত্রীকে শাসন করার সময়েই তার পৌরুষ প্রকাশ পায়। এতে বৈরীভাবটা কমে এলেও ঈর্ষা গেল না। নাগেশ্বরের ঘরে খুব নীচু স্বরে রেডিও বাজে, পুজোর আগে রকমারি জামাকাপড় কিনে তারা দেশে যায়। কখনো সখনো যখন নাগেশ্বরের মা দেশ থেকে আসে তখন জমিজমার গল্প শোনায়। তার ওপরে খুব সম্প্রতি নাগেশ্বর তার এগার বছরের বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়ে এসেছে সমস্তিপুরে গিয়ে। ঈর্ষা তো হাওয়া পাবেই।

পাণ্ডেজী খবর নিয়েছেন। নাগেশ্বর যে অফিসে কাজ করে সেখানে ভাল উপরির ব্যবস্থা আছে। যদিও নাগেশ্বরের চাকরী সামান্যই তবু সেই উপরির খুদকুঁড়ো তার হাতে আসে। পাণ্ডেজী এ ধরনের ভাড়াটেকে পছন্দ করতে পারছিলেন না। কোন ভাড়াটেকেই তিনি বাড়ি ভাড়ার রসিদ দেন না, কেউ চায়ও না। সম্প্রতি নাগেশ্বরের অফিসে প্রয়োজন হওয়ায় সে পাণ্ডেজীকে বিনীত ভঙ্গীতে বলল, 'একটা রসিদ যদি দেন তাহলে আমার উপকার হয়।

পাণ্ডেজী অত্যন্ত বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'অবশ্যই দেব, ক'মাসের চাই বলুন?'

নাগেশ্বর বলল, 'গতমাসেরটা হলেই কাজ চলবে।' পাণ্ডেজী তাকে রসিদ দিয়ে স্থির করলেন নাগেশ্বরকে এখান থেকে সরাতে হবে। সরাতে হলে একটা যুক্তি চাই। নাগেশ্বর সেই সুযোগ দিচ্ছে না। দেবদ্বিজে তার খুব ভক্তি, প্রায়ই ঘরে পুজো করে। কন্যার বিবাহ দেবার আগে যে পুজো করেছিল তার প্রসাদ দিয়ে গিয়েছিল পাণ্ডেজীকে। অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পরিচ্ছন্ন করে পরিবেশন করেছিল সে। খেয়ে তৃপ্ত হলেও মন খুঁত খুঁত করেছিল।

বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে নাগেশ্বর স্ত্রীকে রেখে এল দেশে। উপরি থাকলেও তার আয় খুব বেশী নয়। ফলে তাকে কর্জ করতে হয়েছিল অনেক। ঋণগ্রস্ত নাগেশ্বর স্থির করল কোলকাতায় সে একা থাকবে। তার স্ত্রী স্বভাবতই দেশে থাকতে চায় না। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স তার। কোলকাতায় বেশীর ভাগ সময় ঘরে থাকলেও সে এখানে স্বাধীনভাবেই থাকে। মাঝে মধ্যে নাগেশ্বর তাকে কোন ভগবানের বায়োস্কোপ অথবা কালীঘাটের মন্দিরে নিয়ে যায়। দেশে থাকলে তাকে বন্দীদশায় কাটাতে হবে। কারণ সেখানে পর্দাপ্রথা অত্যন্ত কড়া। এমনকি নাগেশ্বরের সঙ্গেও রাত না হলে ওখানে সে কথা বলতে পারে না। তার উপর বিরাট সংসারের হাজারটা কাজ সামলাতে হয় তাকে। যেহেতু সে স্বামীর সঙ্গে কোলকাতায় থাকে তাই দেশের বাড়ির লোক সেখানে গেলে এই চাপ দিয়ে বেশ সুখ পায়। তাই সে মেয়ের বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু নাগেশ্বর রাজী হয়নি। সে কোলকাতায় একা থাকলে অনেক পয়সা বেঁচে যাবে এবং কর্জ শোধ করতে সুবিধে হবে। স্ত্রীর যুক্তি শোনার মানসিকতা যেহেতু বিহারী পুরুষদের নেই তাই নাগেশ্বরের চলে আসতে কোন অসুবিধে হয়নি।

পাণ্ডেজীর এই বাড়িতে কোন অবিবাহিত পুরুষের স্থান নেই। নাগেশ্বর যখন এবার একা ফিরে এল তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন। যদিও নাগেশ্বর কোনদিকে মুখ তুলে তাকায় না তবু স্ত্রীহীন হয়ে অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে থাকাটা শোভন হচ্ছে না। কিন্তু সে অবিবাহিত নয়, স্ত্রীও প্রয়োজনে দেশে যেতে পারে। একটা বিহিত করার জন্যে সুযোগ খুঁজছিলেন পাণ্ডেজী।

এই প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে কোলকাতায় আছে নাগেশ্বর। প্রথম প্রথম তার খুব মন খারাপ হতো। রোজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী তার পাদোদক পান করত। সে সময় চোখ বুজে থাকত নাগেশ্বর, নিজেকে খুব দামী বলে মনে হত। স্নান খাওয়ার শেষে যখন অফিসে বেরুতো তখন স্ত্রীর প্রণাম নিতে হতো। অনেক দিন তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে এসে এই কারণে আবার ফিরে যেতে হয়েছে। সন্ধে হবার আগেই বাড়ি ফিরে আসে নাগেশ্বর। রাত আটটার মধ্যেই স্ত্রীর পাশে না শুলে তার খুব মন খারাপ লাগে। শুয়ে শুয়ে অফিসের বাঙালীদের গল্প বলে সে। মনে প্রাণে বাঙালীদের অনেক কিছু সে অনুসরণ করতে চায়। ভাঙ্গা বাংলা বলে। কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা মানতে পারে না। স্ত্রীকে সে অফিসের মেয়েছেলেদের নানান কেচ্ছার কথা শোনায়। আর স্ত্রীর কাছে এ বাড়ির মেয়েদের গল্প শোনে। দু-একজন, যাদের সে ভাল করে কখনো দ্যাখেনি, একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করার বাতিক আছে। নাগেশ্বর বউকে সতর্ক করে দেয় ভুলেও যেন তাদের সঙ্গে কথা না বলে।

এখন সেই ঘরে একা শুয়ে শুয়ে নাগেশ্বরের বড় কষ্ট হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাতে-ভাত রান্না করে অফিসে যেতে হয়। হোটেলে খেলে খরচ বাড়বে বলে সন্ধেবেলায় আবার স্টোভ ধরাতে হয়। এ বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা নেই তার। কিন্তু অফিসে সে নিশ্চিন্ত, বাঙালীদের মন খুব উদার হয়। বউ থাকলেও বেশ্যাদের গল্প বেশ সহজেই করে ওরা।

সেদিন সকালে সে ভাত খেতে বসেছে এমন সময় একটা বাচ্চা হাতে বাটি নিয়ে এসে

দাঁড়াল। বিস্মিত নাগেশ্বর শুধোল, 'কি চাই?'

এমন সময় পেছন থেকে আর একটি গলা ভেসে এল, 'রোজ রোজ হাত পুড়িয়ে খান, তাই একটু সবজি দিলাম।'

নাগেশ্বর আঁতকে উঠল, 'না, না, আমার কিছু লাগবে না।'

'একি কথা! দিদি থাকলে কি এত কষ্ট করতে হতো।'

একথা শোনার পর না নিয়ে পারেনি নাগেশ্বর। খেয়ে দেখল তার স্ত্রীর চেয়ে অনেক ভাল রান্না। বাচ্চাটি দাঁড়িয়েছিল, এঁটো বাটি ধুয়ে তাতে কিছু বাতাসা দিয়ে ফেরত দিল নাগেশ্বর।

স্ত্রীলোকেরা কখনই অন্য স্ত্রীলোককে সুখী দেখতে পারে না। নাগেশ্বরের স্ত্রী চলে যাওয়ার পর এই বাড়ির স্ত্রীলোকেরা যেন স্বস্তি পেল। তাদের মনে হল নাগেশ্বরের এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। শরীরের গড়ন হালকা হওয়ায় তাকে খুবই তরুণ দেখায়। অল্পবয়সী স্ত্রীহীন যুবকের প্রতি স্ত্রীলোকদের এক ধরনের মমতা জন্মায়। ক্রমশ অন্যান্য ঘর থেকে খাবার আসতে লাগল নাগেশ্বরের কাছে। নাগেশ্বর প্রথমে বিব্রত হলেও শেষ পর্যন্ত বেশ উপভোগ করতে লাগল। এত অন্তঃপুরবাসিনীদের সে চোখে দেখে না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাদের নরম স্পর্শ অনুভব করে। উনুনে আগুন দিলে ধোঁয়া আকাশে ছড়াবেই। বাড়ির তিন-চারজন পুরুষ ওর সঙ্গে হেসে কথা বলতে শুরু করল। তারা নাগেশ্বরের ঘরে এসে বসতে লাগল। নাগেশ্বরের ট্রানজিস্টার রেডিও তাদের প্রধান আকর্ষণ! আড়ালে আবডালে তারা নাগেশ্বরের কাছে দু' পাঁচ টাকা কর্জ করা শুরু করে দিল। নাগেশ্বর ওই সামান্য অর্থ তাদের দিতে পেরে যেন বেঁচে গেল। বিনা পয়সায় প্রতিদিন খাবার খেতে তার মন স্বস্তি পেত না তাই ঋণ দিয়ে কখনই তাগাদা করেনি সে। ফলে ভাড়াটেদের একাংশের মধ্যে তার খাতির বেড়ে গেল খুব।

স্নেহপ্রদর্শনের কালেও স্ত্রীলোকেরা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারে না। নাগেশ্বর প্রত্যেক রান্নাই ভাল বলে, কোন রমণীর মুখের দিকে তাকায় না; এতে তাদের মন ভরে না। প্রত্যেকেই চায় তার ভূমিকা অধিকতর উজ্জ্বল হোক। ফলে দু-একজন একটু একটু করে সাহসী হল। তারা অনেক সন্তানের জননী হলেও কঠিন পর্দাপ্রথায় বিশ্বাসী। কিন্তু এখন নাগেশ্বরকে অসহায় তরুণ বলে ভাবতে কারো কষ্ট হল না। কথাবার্তা এতকাল কোন শিশুর মাধ্যমে চলত, এখন সেই দু-একজনের সঙ্গে সরাসরি হয়। তারা ভগ্নীস্নেহ প্রকাশ করে। এতে নাগেশ্বর কৃতার্থ হয় এবং সেই রমণীরা অন্যান্যদের চেয়ে নিজেদের অধিকতর মূল্যবান মনে করতে থাকে। বোঝা যায়, নাগেশ্বরের সঙ্গে এই মেলামেশার জন্যে তাদের স্বামীরা কোনরকম বিরাগ পোষণ করে না।

সেদিন সন্ধের একটু আগে ঘরে ফিরেছিল নাগেশ্বর। বাইরের ঘরে পাণ্ডেজীদের আসর জমজমাট। আগামীকাল মোহনবাগানের খেলা, কথাবার্তার বিষয় সেটাই। নাগেশ্বরকে দেখে পাণ্ডেজী বললেন, 'আইয়ে মাহাতোজী, আপনি তো এ ঘরে আসেনই না। কি যে অপরাধ করেছি আমরা!'

নাগেশ্বর দুহাত জোড় করে বলল, 'নমস্তে। ছি ছি একথা বলছেন কেন! আসলে আপনাদের বিব্রত করতে চাই না।'

পাণ্ডেজী বললেন, 'একি কথা! আপনার মত শরীফ আদমি এলে আমরা বিব্রত হবো? এ বাড়ির সব মেয়েপুরুষ যখন আপনাকে আত্মীয় করে নিয়েছে—।' কথাটা শেষ না করে হাসলেন পাণ্ডেজী। নাগেশ্বর দেখল উপস্থিত অন্যান্যদের মুখ বেশ গম্ভীর। ওইসব পুরুষরা তার ঘরে যাতায়াত করে না। নাগেশ্বর বসল।

পাণ্ডেজী বললেন, 'আমি খুব প্রবলেমে পড়েছি, আপনাদের সাহায্য দরকার। কর্পোরেশন বাড়ির ট্যাক্স বাড়িয়েছে, ইলেকট্রিক কোম্পানীও চার্জ ডাবল করেছে। এই অবস্থায় আমার খুব

অসুবিধা হচ্ছে। আমি নিজে আপনাদের বাড়ি ভাড়া বাড়াতে পারতাম কিন্তু তা কবব না। কাবণ আমি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি। আপনারাই নিজেরা ঠিক করে দিন কত ভাড়া বেশী দিতে পারবেন যাতে আমার ওপর চাপ না পড়ে। আপনি বি.এ. পাশ শিক্ষিত লোক, এখানে আছেন, আমাদের গর্ব, আপনি সবার সঙ্গে কথা বলুন।'

নাগেশ্বর বলল, 'আপনি খুব সহৃদয় মানুষ। কিন্তু এ ব্যাপাবে আমি আর কি বলব। আমি কি পাশ করেছি তা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়, আমি এনাদের মত একজন ভাড়াটে মাত্র, এটাই আমার পরিচয়। তাই সবাই যা ঠিক করবে তাই আমি মানব।'

পাণ্ডেজী মাথা নাড়লেন, 'খুব ভাল, খুব ভাল। তা স্ত্রী না থাকায় আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

নাগেশ্বর মাথা নাড়ল, 'একা লোকের আর অসুবিধে কি!' তারপর সে উঠে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনারা কি কালকের খেলা দেখতে চান?'

পাণ্ডেজী বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জরুর! কিন্তু—?'

নাগেশ্বর সেদিন অফিসে উপরি হিসেবে পাওয়া একটা টিকিট পকেট থেকে বের করে পাণ্ডেজীর সামনে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এরকম মহার্ঘ টিকিট যে এককথায় কেউ বের করে দিতে পারে এটা কল্পনার বাইরে। এ বাড়ির অনেকে টিকিটটাই প্রথম চোখে দেখল। পাণ্ডেজী হাসলেন। চাপ দিলে পাথর থেকেও জল বের হয়, তা নাগেশ্বর তো ছেলেমানুষ।

ইদানীং কলঘরে যাওয়ার সময় দুএকটি রমণীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। তারা ঠোঁট টিপে হাসে। এই হাসি দেখে নাগেশ্বর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ঘবে ফিরে এসেই সে সতর্ক করে নিজেকে। যে রমণী পরপুরুষের দিকে অমন ভঙ্গীতে হাসতে পারে সে চরিত্রহীনা। তাব প্রতি কোনরকম আকর্ষণ বোধ করা মানে নিজের স্ত্রীকে অপমান করা। একথা ভাবতেই নিজের স্ত্রীর জন্যে তাব খুব মন কেমন করতে লাগল। এই ভর যৌবনে স্ত্রীহীন হয়ে রাত কাটানো বডই কষ্টকর। যদিও মেয়েব বিয়ে দেবার পর তার ছাব্বিশ বছরের স্ত্রী আবেদন করেছে যাতে কোন কারণেই সে যেন পুনরায় গর্ভবতী না হয় সে দায়িত্ব নাগেশ্বরকে নিতে হবে। তাহলে একুশ বছবের জামাই-এর সামনে মুখ দেখাতে পারবে না সে। নাগেশ্বর ভেবেছিল বলে, তাদেব সংসারে শাশুড়ি কখনই জামাই-এর সামনে দাঁড়ায় না, অতএব মুখ দেখানোব সমস্যাই নেই। কিন্তু লজ্জাবোধ হওয়ায় সে কথা বলেনি সে।

ঘরে মৃদু শব্দ হল। নাগেশ্বর খাটে শুয়ে ছিল। চোখ মেলে দেখল খাবারের বাটি নিয়ে একজন ঢুকছে। সে দ্রুত উঠে বসতেই রমণীটি ঘোমটা সরিয়ে হাসল। একে আগেও দেখেছে নাগেশ্বর। অন্তত চল্লিশ বছর বয়স এবং সন্তানহীনা। বোধহয় সেই কারণেই শরীর অটুট। রমণীটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে নীরব থাকতে বলল। তারপর ঘরের দরজা ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে অত্যান্ত নিম্নস্বরে বলল, 'কাল রাত্রে আমাব স্বামী থাকবে না। আমার যাতে ছেলে হয় সেইজন্য তারকেশ্বরে জল দিতে যাবে। ওসবে কিছু হয় না আমি জানি। কিন্তু সে জানুক ওতেই কাজ হল।'

নাগেশ্বর অত্যান্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি কি করব?'

রমণী চোখে বিদ্যুতের চমক এনে বলল, 'ঢঙ, জানেন না যেন! নাকি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না? আপনার বউ চলে যাওয়ার পর থেকেই এই ফন্দিটা আমি এঁটেছি। কাল রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি আসব। দরজাটা খোলা রাখবেন।' যেমন এসেছিল তেমন নিঃশব্দে চলে গেল সে।

বজ্রাহতের মতো বসে থাকল নাগেশ্বব। একি কথা শুনল সে! এই বমণীকে এই ক'দিন সে অত্যান্ত স্নেহপ্রবণা বয়স্কা দিদিব মত দেখেছে। এত কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যে বাস করেও এইরকম কামনা কেউ পোষণ কবে বিন্দুমাত্র না জানতে দিয়ে! সে তো বয়সে অনেক ছোট।

মহাভারতে নাকি এমন ঘটনার কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন রমণীরা শক্ত খোলের আড়ালে নিজেকে চিরকাল ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু একমুহূর্তেই সেই আড়াল খুলে দিতে দ্বিধাও করে না। তবে মুস্কিল হল সেই মুহূর্ত কখন আসবে তা তারা নিজেরাও জানে না। এই ঘটনাই তার চিরসত্যতা প্রমাণ করে। এই ব্রাহ্মণ পত্নী তাকে কি পাপে নিয়ে যাচ্ছে! নাগেশ্বরের মাথা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘটনার কথা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু অধিক রাতে ওই নিঃসন্তান রমণীর কথা চিন্তা করতে করতে একটি গোপন ঢেউ তাকে প্লাবিত করল। একটি সুঠাম শরীর চোখের সামনে থেকে সমস্ত পৃথিবীকে আড়াল করে দিচ্ছিল।

পরের দিন অফিসে কোন কাজে মন দিতে পারছিল না নাগেশ্বর। বিকেল হতে না হতেই চুম্বকের মত বাড়িটা টানছিল। সে অবশ্য শরীরে যখন ঘরে ফিরল তখন পাণ্ডেজীর মজলিশ সরগরম। হয়তো খেলার জন্যই ওই অবস্থা। কিন্তু তাকে দেখা মাত্রই সমস্ত কথাবার্তা নিঃশব্দ হয়ে গেল। নাগেশ্বর দেখল সবক'টি চোখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে এবং মুখের অভিব্যক্তি অত্যন্ত কঠোর। ধক করে উঠল বুক। আজকের খবর কি এরা কোনভাবে জেনে গেছে! হিমবুক নিয়ে সে দেঁতো হাসল, 'নমস্তে পাণ্ডেজী! আপনি খেলা দেখতে যাননি?'

পাণ্ডেজী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কেউ কথা বলছে না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নাগেশ্বর ভেতরে যাওয়ার জন্য বারোয়ারী পাপোসে পা মুছতে যেতেই একজন চিৎকার করে উঠল 'খবরদার। ওতে তুমি পা দেবে না।'

এবার যেন একটা শীতল স্রোত নাগেশ্বরের দিকে ধেয়ে এল। সে লোকটির দিকে তাকাতে পাণ্ডেজী উঠে ওর সামনে এল। নাগেশ্বর কোনমতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

পাণ্ডেজী বললেন, 'তোমার জামাই-এর বাপ এসেছিল দুপুরে।'

নাগেশ্বর থতমত হল। বেয়াই আসবে সে তো জানে না।

পাণ্ডেজী আবার বললেন, 'তার কাছে তোমাদের সব খবর পেলাম।'

নাগেশ্বর বলল 'কি খবর?'

পাণ্ডেজী বললেন 'তোমরা নীচু জাত।'

সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে কি বলতে চাইছেন?'

পাণ্ডেজী বললেন 'আমি ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাস করি। সবাই যা বলবে আমি তাই করব। আগামীকাল সকালে মিটিং আছে, তুমি উপস্থিত থাকবে। এ বিষয়ে সবাই আলোচনা করবে।'

নাগেশ্বর বলল 'ওসব আপনার ব্যাপার। আমি নিয়মিত ভাড়া দিই, কারো সাতে পাঁচে থাকি না। আমি যেমন আছি তেমনি থাকব।'

পাপোস না ছুঁয়ে নিজের ঘরে চলে এল। আসবার সময় সে লক্ষ্য করল পথের পাশে কেউ নেই। এমনকি বাচ্চাগুলোও সামনে আসছে না। মুখ হাত ধুতে কলঘরে যেতে দেখল সবাই আড়ালে সরে যাচ্ছে। এই সময় একটা বুড়ি কাকস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, 'এই জল আমি খাব কি করে।'

কেউ একজন বলল, 'আস্তে বল, ও শুনতে পাবে।'

'শুনুক।' বুড়ির গলা তীব্রতর হল, 'খুব নেচেছিলি তোরা। খুব সবজি খাওয়াতিস। হায় হায়।'

কোনরকমে ঘরে ফিরে এসে ঝিম মেরে গেল নাগেশ্বর। একদিনের মধ্যেই সে এদের কাছে অন্ত্যজ হয়ে গেল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। অফিসের বাঙালীরা এ কথা শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ক্রমশ ভয় করতে লাগল তার। আজ কেউ সবজির বাটি দিয়ে গেল না। বাইরে পুরুষরা উত্তেজিত গলায় তর্ক করছে। বিষয়টা যে সে-ই তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। মেয়েমহল একদম নিঃসাড়। সমস্তিপুরে এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি নাগেশ্বরের। ছাপরার

দিকে এ ব্যাপারটা খুব জোরালো তবে উত্তরপ্রদেশের মত নয়। খাওয়ার ইচ্ছাটাই চলে গেল স্টোভ ধরাল না নাগেশ্বর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ওরা কি করতে পারে। নিশ্চয়ই তাকে মারধোর করার সাহস পাবে না ওরা। তা না হলে সে এই বাড়ি কিছুতেই ছাড়বে না। ওর প্রতি এমনিতেই সবাই ঈর্ষান্বিত ভাল চাকরী করে বলেই, এটি অতিরিক্ত। সে ভাড়া দিচ্ছে মাথা উঁচু করে থাকবে। এখন কোলকাতা শহরে এত অল্প পয়সায় বাড়ি ভাড়া মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। তাই ছেড়ে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

আজকের রাতটার কথা মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল পাণ্ডেজীর সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই। এখন খেয়াল হতে সে নিশ্চিন্ত হল। ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে বলল, না কোন চান্স নেই। কেউ এ ঘরে আসবে না।

কিন্তু অনেক রাত্রে যখন দরজাটা খুলেই চট করে বন্ধ হয়ে গেল তখন চমকে উঠল সে। রমণীটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আলো নেভা থাকলেও জানলা দিয়ে ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য ঘরে আসায় সে রমণীটিকে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। খুব মৃদস্বরে রমণীটি বলল জেগে আছেন আপনি?

নাগেশ্বরের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ঘাড় নাড়ল।

রমণীটি বলল, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। বলে হাসল

নাগেশ্বর কোনরকমে বলল আপনি চলে যান।

'কেন?'

'আমি পারব না।'

'কেন?

'আমি আমি নীচু জাতের লোক। শোনেন নি?

শুনেছি। কিন্তু আপনি পুরুষমানুষ। আপনার সন্তান আছে।'

'আমাকে ঘেন্না হচ্ছে না? আপনি ব্রাহ্মণের বউ।'

ভগবান তো এইজন্যে রাত দিয়েছেন। রাতে সব ঢেকে রাখা যায়।'

আপনি ক্ষমা করুন।'

না আমি যখন একবার লজ্জা বিসর্জন দিয়েছি তখন ফললাভ করবই। তবে আপনি এখান থেকে কালই চলে যান। ওরা আপনার ক্ষতি করবেই। সেটা আমার লাভ। দিনের বেলায় আপনাকে দেখতে হবে না।'

রমণীটি তার খাটের দিকে এগিয়ে আসতেই নাগেশ্বর বলে উঠল 'আপনি চলে যান। আপনি ভ্রষ্টা, দ্বিচারিণী।'

রমণীটি যেন বেত্রাঘাত পেল। তার ঠোঁট স্ফীত হয়ে বেঁকে উঠল একবার, চোখ জ্বলছে। দ্রুত নিঃশ্বাসের তালে বুকের উত্থান পতন সমুদ্রকে হার মানায়। কিন্তু সেটা কয়েক পলকমাত্র। নাগেশ্বর দেখল সে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল নিঃশব্দে।

তারপর সব চুপচাপ। নাগেশ্বরের রক্ত চলাচল ঈষৎ শান্ত হলে সে দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় ফিরে এল। রমণীটির দুঃসাহস এবং স্পর্ধায় সে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। তার জাতের কথা জানার পরও প্রস্তাবের কোন হেরফের হল না কেন? এ অবস্থায় ধরা পড়লে রমণীটির তো মারাত্মক ক্ষতি হতো তবু এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহসী হল? নাগেশ্বর নিজের দিকটা ভাবতে লাগল। কেন সে দরজাটা ভাল করে বন্ধ রাখেনি? এত ঘটনার পরেও কি সে গোপনে রমণীটির জন্যে অপেক্ষা করছিল? তাহলে এখন গ্রহণ করতে পারল না কেন? এই রকম হাজার চিন্তা মাথায় পাক খেলে কারো ঘুম আসে না। ওরা নাগেশ্বরের ক্ষতি করবে। কি ক্ষতি।

ঠিক এইসময় বাড়ি কেঁপে উঠল তীক্ষ্ণ চিৎকারে। যারা নিদ্রিত ছিল তাদের অচেতন অনুভূতি সেই শব্দের প্রতিঘাতে ছিন্ন হল। সতের ঘরের বাসিন্দারা চিৎকারের কারণ সন্ধানে সশব্দে

দবজা খুলতে লাগল। চমকে উঠেছিল নাগেশ্ববও। সে দ্রুত দবজা খুলতে যেতেই বমণী কণ্ঠস্বব ডুকবে উঠল, হায় ভগবান, এ কি হয়ে গেল।

নাগেশ্ববেব কণ্ঠস্ববটি পবিচিত। এদিক ওদিক ঘাড় কাত কবে ঘবেব মধ্যেই দাঁড়িযে থাকল। সংঘেব বাসিন্দা একসঙ্গে প্রশ্ন কবছে, কি হয়েছে? চিৎকাব এবং কান্নাব কাবণ কি? বমণীটি প্রথমে নিজেব স্বামীকে দাযী কবল তাব ত্যাগেব জন্যে। কি দবকাব ছিল এই বযসে সন্তানেব আশায় তাবকেশ্ববে যাবাব? সে যদি ঘবে থাকত তাহলে কি ওই লোকটা এই সাহস পেত?

এতক্ষণে দিনেব মত পবিষ্কাব হয়ে গেছে নাগেশ্ববেব কাছে। তাব সমস্ত শবীব কাঁপতে লাগল। মহাভাবতে আছে প্রত্যাখ্যাতা স্ত্রীলোক সাপেব চেয়ে হিংস্র হয়। এখন কি হবে।

পূতিগন্ধেব ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র যেমন শকুনেবা ডানায় ভোব পায় তেমনি সংঘেব বাসিন্দাবা নানাবিধ প্রশ্নে সত্য জেনে নিল, এই একটু আগে বমণীটি কলঘবে যাওয়াব জন্যে বেবিয়েছিল। এমন সময় কেউ তাব হাত ধবে টানে, ভয় পেয়ে চিৎকাব কবতেই লোকটি যখন তাকে ছেড়ে ছুটে যায় তখন সে চিনতে পাবে। এতদিন সে যাকে নিজেব ভাই-এব মত দেখে এসেছে সেই লোকটা তাব ইজ্জত নেবাব জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে গঙ্গা মাঈযাব বুকে গিয়ে শুয়ে থাকলে তবেই এ অপমানেব জ্বালা দূব হবে। পাগলেব মত কবছিল বমণীটি। অন্যান্য বমণীবা তাকে জড়িয়ে ধবে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠ তখন পাণ্ডেজীকে খুজছে।

একটু পবেই পাণ্ডেজীব গলা পাওয়া গেল। ওঁকে অনেকে মিলে ব্যাপাবটা বোঝাবাব চেষ্টা কবতেই তিনি বললেন, কে সে নবাধম? এই বাড়িব কেউ কি যে পবস্ত্রীব শবীবে হাত দেওয়াব হিম্মত বাখে?

পুরুষবা আবাব বমণীটিব শবণাপন্ন হল। সে এখনও ডুকবে ডুকবে কাঁদছে। সেই অবস্থাতে জানাল, ওব চোখেব নজব আমাব খাবাপ লাগত, কিন্তু ভাবতাম আমাব ভাইয়েব মতন। অন্য সবাই যেমন সবজি তৈবী কবে ওকে দিত আমিও দিতাম। ওব বউটা ভাবী সুন্দব ছিল। কিন্তু আজ দুপুবে যখন শুনলাম—তখন থেকে বুক জ্বলে যাচ্ছিল। মাঝবাতেও মনে হচ্ছিল আমি ভাই বলছি আব সে নিজেব পবিচয় লুকিয়ে আমাদেব ঠকিয়েছে? অমনি তাই মনে হল স্নান কবলে পবিত্র হব। তা যেই ঘব থেকে বেবিয়েছি অমনি যে সে খপ কবে হাত ধববে তা কে জানত।

সমুদ্রগর্জনকেও এই শব্দ হাব মানায়। মাবো শালাকে, কেটে ফেল, ঘব জ্বালিয়ে দাও—ইত্যাদি বাক্য বাশ ফাটাব মত বাজতে আবম্ভ কবল। পাথব হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাগেশ্বব। হে ভগবান, একি কবলে! মেয়েছেলেটা এতবড় মিথ্যে বলছে? সে দ্রুত দবজাব ছিটকিনিটাও বন্ধ কবে জানালাব পাল্লাও আটকে দিল। ওবা কি দবজা ভেঙ্গে ঢুকবে? না সেটা সহজ নয়। তাব চেয়ে সে যদি এখনই বেবিয়ে চ্যালেঞ্জ কবে মেয়েটিকে? সব কথা ফাস কবে দেয়? তবে? সঙ্গে সঙ্গে ওব মন বলল, কেউ বিশ্বাস কববে না, ওবা বিশ্বাস না কবাব জন্যে মুখিয়ে আছে। তাহলে?

দ্রুত পাযেব আওয়াজ তাব বাবান্দায় উঠে আসা মাত্র পাণ্ডেজীব গলা শুনতে পাওয়া গেল, এ্যাই হুশিয়াব। কেউ দবজায় হাত দেবে না। ওটা আমাব দবজা।' লোকগুলো বলল একসঙ্গে, কিন্তু ও শালাকে এখনই ছিঁড়ে ফেলতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।'

পাণ্ডেজী বললেন, 'এটা তো আমাবও লজ্জা। কিন্তু আমি ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাস কবি। হুট কবে কিছু কবলে পবে আফসোস হয। প্রথমে ঠিক হোক, নাগেশ্বব শিউশবণেব জেনানাব গায়ে হাত দিয়েছিল কিনা। কোন প্রমাণ আছে?'

ঘবেব মধ্যে ইঁদুবেব বুক নিয়ে দাঁড়ানো নাগেশ্ববেব মনে হল পাণ্ডেজীব মত মানুষকে চেনা

যায না প্রথমে। সে মনে মনে পাণ্ডেজীব পাযে লুটিযে পডল। একজন বলল, 'এতবাত্রে কে দেখবে? শিউশবণেব বউ যখন বলছে তখন সত্যিকথাই বলছে। কোন মেযেছেলে ফালতু নিজেব বদনাম দেবে না।'

পাণ্ডেজী বললেন, 'জরুব। তবে কিনা একটু প্রমাণ চাই। আমি বলি কি শিউশবণেব বউ যদি তাব স্বামী—অ, স্বামী তো এখন তাবকেশ্বরে, তাহলে স্বামীব জামা ছুঁযে হলফ কবে বলুক যে সে যা বলছে সত্য। স্ত্রীলোকেব সব চেযে বড হল স্বামী, এ কথা মনে বেখে সে যেন কথা বলে।' হৈ চৈ পডে গেল শিউশবণেব জামা আনবাব জন্য। সবাই এখন চুপচাপ। তাবপবেই কান্নাজডানো গলা শোনা গেল 'যা বলেছি সব সত্যি।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জনটা দ্বিগুণ হল তাবপবেই পাণ্ডেজীব গলা সবাইকে ছাপিযে উঠল 'আপনাবা কি চান? এই লোকটা এখানে থাকুক না চলে যাক।'

'ওব খুন চাই', 'ওকে মেবে ফেল' ইত্যাদি চিৎকাব উঠল।

পাণ্ডেজী বললেন, 'না তা হয না। আমাব বাডতে খুন হোক এটা আমি চাই না। পুলিশ তোমাদেব ছেডে দেবে না। তাব চেযে ওকে চলে যেতে বলাই ভাল।'

নাগেশ্বব দবজায প্রথম আঘাত শুনল 'নাগেশ্ববজী দবজা খোল।' গলা শুকিযে গিযেছিল নাগেশ্ববেব। বাইবে উত্তেজিত সংলাপ চলছে। পাণ্ডেজীব প্রস্তাব কেউ মানতে পাবছে না। সাডা দিল না নাগেশ্বব। কযেকবাব ডাকাডাকিব পব পাণ্ডেজী উত্তেজিত হলেন, আবে নাগেশ্ববজী তুমি সাডা দিচ্ছ না কেন? আমবা তো সবাই জানি তুমি ঘবেই আছ।'

এবাব প্রাণপণে চিৎকাব কবল নাগেশ্বব 'ও যা বলছে সব মিথ্যে কথা। আমি সন্ধে থেকে ঘবেব বাইবেই যাইনি।'

পাণ্ডেজী বললেন 'তাহলে তুমি এত ভয পাচ্ছ কেন? বাইবে বেবিযে এস।'

ঠিক সেইসময একটা লাঠি জানালাব খডখডিব ফাঁক দিযে ঘবেব মধ্যে ঢুকে আসতেই নাগেশ্বব তডাক কবে লাফিযে সবে গেল। অবিবাম দবজায শব্দ হচ্ছে মচমচ কবছে পাল্লা। যে কোন মুহূর্তেই ভেঙ্গে পডতে পাবে সেটা। তাব ঘবেব চাবপাশে উত্তেজিত শব্দ পাক খাচ্ছে।

নাগেশ্ববেব সমস্ত শবীব এখন ঘামে জবজবে। ফাঁদে পডা জন্তুব মত তাব শবীব কুঁকডে ঘবেব মধ্যে আশ্রয খুঁজছে। কিন্তু সে অনুভব কবছিল এই দবজা বা জানলা মোটেই নিবাপদ নয। বাডব বাইবে যে কোলকাতা শহব সেটা একদম আলাদা। সেখানে কেউ জাত নিযে মাথা ঘামায না। যদি একবাব সেখানে পৌঁছে যাওযা যায তাহলে —।

নাগেশ্বব উঠে দাঁডাল। পা টিপে টিপে দবজাব কাছে গিযে কান পাতল। নানাবকম শলাপবামর্শ চলছে বাইবে। সে নিঃশব্দে ছিটকিনি এবং খিল সবাল। তাবপব আচমকা দবজা খুলে তীবেব মত বেবিযে এলো ঘব থেকে।

সবাই কিছু বুঝে ওঠাব আগেই নাগেশ্বব সদব দবজাব কাছে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ উঠল, 'ভাগতা হ্যায ভাগতা হ্যায।'

সেই গভীব বাতে একদল মানুষ অত্যন্ত উর্ত্তেজিত হযে লাঠিসোটা হাতে কোলকাতাব বাজপথে ছুটে যাচ্ছিল শিকাবে। যে শিকাব সে তখন উন্মত্তেব মত দৌডে যাচ্ছে সম্মুখে। ওদেব মধ্যে দূবত্ব ক্রমশ কমে আসছিল। যেহেতু কোলকাতা সাবাবাত জাগ্রত থাকে তাই পথেব বাসিন্দাবাও এই উত্তেজনায অংশ নিল। এই মানুষ শিকাব পর্ব শেষ পর্যন্ত কাবণ পালটাতে পালটাতে একটা সাদাসাপটা চেহাবা নিযে ফেলল। নাগেশ্বব জানত না উত্তবপ্রদেশ কিংবা ভাবতবর্ষেব যে কোন জাযগাব সঙ্গে কোলকাতাব তফাৎ এখানেই। নগ্নতা ঢেকে একটা মানানসই পোশাক চাপালে লোকে অন্ধ হযে থাকতে ভালবাসে এখানে, যুক্তিব প্রযোজন হয না। পাণ্ডেজী সেকথা জানতেন। সমস্যাটাকে ঘবেব বাইবে দিযে তাই তিনি নিশ্চিন্ত।

[১৯৭৭/১৩৮৪]

শূকরছানা

কুকুরগুলোর খাওয়া দেখছিল ছেলেটা। তিনটে জিভ একসঙ্গে পড়ছে থালাতে, সপ সপ শব্দ হচ্ছে।যে যত তাড়াতাড়ি জিভ নাড়াতে পারবে তার পেটে তত বেশী খাবার যাবে। ছেলেটা জুলজুল করে দেখল, কি দ্রুত খাবারগুলো শেষ হয়ে গেল। খাবার বলতে মোটা চালের ভাত আর ঢেঁকির শাকের চচ্চড়ি। কুকুর তিনটে এক দম নেড়ি তবে তিনটেই মদ্দা। মাদি কুকুর রাখতে চায় না লোকটা।এই তিনটের পেছন পেছন একটা মাদি এসেছিল ক'দিন আগে। কোত্থেকে এল বোঝা যায়নি কারণ মাইল দুএকের মধ্যে লোকবসতি বলতে কিছু নেই। তবু এসে গিয়েছিল কুকুরটা।লোকটার চোখে পড়েছিল আগে। মাদিটা কেমন লাজুক লাজুক মুখ করে এ তিনটের চারপাশে ঘুরছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি হয়নি, একটা লম্বা বাঁখারি নিয়ে ছুটে গিয়েছিল লোকটা। কেঁউ কেঁউ চিৎকার শুনেও কুকুরগুলো চুপচাপ লেজ নাড়তে লাগল। লোকটা মাদিটাকে কোথায় যেন পার করে দিয়ে এল। এসে ছেলেটার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল 'এসব চলবে না আমার বাড়িতে ধ্যাষ্টামো চলবে না, এই শুয়োরের বাচ্চা, শুনতে পাচ্ছিস?' ছেলেটা ঘাড় নেড়েছিল।

ছেলেটা সবকিছু গুছিয়ে ভাবতে পারে না। আসলে কিছু ভাবতেই ওর ইচ্ছে করে না। কিন্তু একটা জিনিস ছেলেটা দারুণ বোঝে। হাঁড়িতে যখন চাল ফোটে, নাদুস নুদুস ভাতগুলো যখন হাঁড়িতে ওলটপালট খায় তখন ছেলেটা ওপরের দিকে মুখ তুলে বড় বড় বাতাস টানে নাক দিয়ে। তখন ওর কালো পিঠ পেট এক হওয়া ছোট শরীরটা কাঁপতে থাকে কিন্তু লোকটার হিসেব মাপা, কুকুর তিনটে কতটা ভাত পাবে, ছেলেটা কতটা খাবে একদম হিসেব করা।

এখানে ও অবশ্য অল্প ক'দিন এসেছে। নাগরাকাটা বাজার থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল লোকটা। গাছতলায়, বাজারের শেষ প্রান্তে যে ঝাঁকড়া গাছটা, তার তলায় দাঁড়িয়েছিল ও। হন হন করে আসছিল লোকটা। কাঁধে একটা ঝুড়ি হাতে মুরগী ঝোলানো। ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কাছে এসে ভাল করে আগাপাছতলা দেখে মোটা খড়খড়ে আঙুল দিয়ে গালের চামড়া ঘষেছিল। তারপর মুখে একটা বিকৃত শব্দ করে ফ্যাসফেসে গলায় বলেছিল অ্যাই ঘর কোথায়? লোকটার মুখ দেখে, আঙুলগুলো দেখে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল ছেলেটার। লোকটা আবার হেঁকেছিল, এই শালা শুয়োরের বাচ্চা বাপ আছে?' ঘাড় নেড়েছিল ছেলেটা এবার।

'মা আছে?'

আবার ঘাড় নেড়েছিল।

লোকটা কি ভাবল। তারপর পেটে একটা খোচা দিয়ে বলল অ্যাই, ভাত খাবি?'

ছেলেটা চলে এসেছিল পেছন পেছন। অনেকটা পথ রোদ্দুর মাথায় করে ওরা এসেছিল। তারপর এই জঙ্গলের ধারে, এই বড়সড় বাড়িটায় ঢুকে, লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, 'একদম পাঁয়তাড়া করবি না। বসে বসে গেলাতে তোকে আনিনি। সকাল থেকে উঠে ঘাস কাটবি। কুকুর আছে তিনটে, সেগুলোকে চান করাবি আর এই সব কলাগাছ আখগাছ দেখছিস, পাহারা দিবি। সকালবেলা আর সন্ধেবেলা দুটো ভাত দেব, মন ভরে খাবি। বাবুয়ানা করলে লাথি মেরে বের করে দেব—খেয়াল থাকে যেন।' এই সময় ও কুকুরগুলোকে দেখতে পেল। লোকটার পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়ছে। কুকুরগুলো নেড়ি আর লোম ওঠা।

কুকুরগুলোর খাওয়া হয়ে গেলে ছেলেটা উঠল। কী রোদ বাপ্‌স। বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। সবটাই তালা দেওয়া। শুধু লোকটার ঘর ছাড়া। উঠোনের ও-পাশে ছোট ছোট চালাঘর আছে তিনটে। একটাতে ও থাকে আর একটায় কুকুরগুলো। ছেলেটা বাগানে এল। প্রচুর কলাগাছ। লোকটা বস্তা দিয়ে কলাগুলো বেঁধে রেখেছে। বাদুড় বসতে পারে না। পাকলেই ঝুড়ি করে লোকটা বাজারে নিয়ে যায়। বাড়িটা তো লোকটার নয়। ছেলেটা বুঝতে পারে। কারণ লোকটা কথায় কথায় অন্য একজনের কথা বলে। বাড়িটা নাকি তার।

আখগাছগুলো বেশ মোটাসোটা, অনেকখানি জায়গা জুড়ে গাছগুলো। হাত বোলালো ছেলেটা। খসখসে গা, কিন্তু ভেতরটা রসে টইটম্বুর। একটা গাছের কোমর ধরে অনেকখানি নামিয়ে আনল ও, তারপর ছেড়ে দিতেই সটান খাড়া হয়ে গেল সেটা, দোল খেতে লাগল। লোকটা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'খবরদার, গাছের গায়ে হাত দিয়েছ কি, হাত একেবারে ভেঙ্গে ফেলব। আমার সব গোনা গাছ, হ্যাঁ।'

প্যান্টের কাছটাতে খানিকটা ছেঁড়া, সামনের বোতামগুলো নেই, প্যান্টটা খানিক তুলে আখগাছগুলোর গায়ে পেচ্ছাপ করল ছেলেটা। করতে করতে কুকুরগুলোর কথা মনে পড়তেই একটা ঠ্যাঙ তুলে ধরল। ফিস ফিস করে বলল, 'শালা।'

এই সময় লোকটার গলা শুনতে পেল ও। হাঁকডাক করছে; গলায় বেশ খুশী খুশী ব্যাপার। ছেলেটা পাথর হয়ে আখগাছের ভেজা জায়গাটা দেখল। লোকটার নজরে পড়লে খেয়ে ফেলবে। প্রথম দিন লোকটাকে দেখেছিল ও। বাজার থেকে আনা মুরগীটার গলায় খপাৎ করে ছুরিটা বসিয়ে ধড়টা হাতে ধরেছিল লোকটা। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছিল, মুখে চোখে ছোপ ধরিয়েছিল লোকটার। তারপর পটাপট পালকগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল অনায়াসে। ছাড়ানো মুরগীটাকে দেখতে একদম ন্যাংটা বাচ্চার মতন।

মুখ-চোখ ঘামে ভেজা, গায়ের ফতুয়াটা সপসপে, বিরাট দেহ নিয়ে লোকটা হাঁপাচ্ছিল। ছেলেটা বিস্ময়ে দেখল লোকটার হাতে একটি দড়ি, দড়ির প্রান্তে একটা বড়সড় পেট-মোটা সারা গায়ে কাদা মাখা শুয়োর দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই খিঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'এই শালা শুয়োরের বাচ্চা, ডেকে ডেকে গলা শুকিয়ে গেল, আমার এখানে নবাবী মারাতে এসেছ, অ্যাঁ।'

লোকটা রেগে গেছে জব্বর। না হলে ওকে তুই করে বলত। ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে শুয়োরটার দিকে তাকাল। বেশ বড়সড় শুয়োরটা। কুতকুতে চোখে দেখছে। পেটের কাছটা বেশ ফোলা। গায়ে চাপ চাপ কাদা শুকিয়ে আছে। এ এখানে কি খাবে? এ বাড়িতে কাদা নেই, শুয়োরেরা যা খায় তার কিছুই নেই। তারপরই ওর কুকুরগুলোর কথা মনে পড়ল। মনে হতেই ও অসহায় লোকটার দিকে তাকাল।

'অ্যাই, আজ থেকে এ এখানে থাকবে। এর সেবা-যত্ন করবি। এই শুয়োরের বাচ্চা, কথা বলছিস না যে!' লোকটা খিঁচিয়ে উঠতেই ও ঘাড় নাড়ল। লোকটা খুশী হল। তারপর সামনের বারান্দার গায়ে-গায়ে বসা তিনটে নেড়ির দিকে এগিয়ে গেল। লোকটার সঙ্গে শুয়োরটাকে দেখে কুকুর তিনটে হইচই করেনি কিছু। গায়ে গা লাগিয়ে বসেছিল শুধু। লোকটা এগিয়ে একটার মাথায় চাপড় মারল, 'ওটার পেছনে লাগিস না, যদি দেখতে পাই, শালা, মেরে তাড়াবো। খ্যাটন বন্ধ হবে।' তারপর ছেলেটাকে হেঁকে বলল, 'হাঁ করে দেখছিস্‌টা কি, যা ওকে নিয়ে যা, কুয়োর পাড়ে নিয়ে গিয়ে বাঁধ।' ছেলেটা নিচু হয়ে লোকটার ফেলে রাখা দড়ির প্রান্ত কুড়িয়ে নিয়ে কুয়োর দিকে এগোতেই শুয়োরটা কেমন দুলকি চালে পেছন পেছন চলে এল। কুয়োর ধারে একটা ছোট্ট খুঁটি আছে, ছেলেটা দড়ি সেখানে বাঁধতেই লোকটা বলল, 'নে এবার জল তোল, ওকে ভাল করে স্নান করা। গা থেকে বড় কটু গন্ধ বেরুচ্ছে রে। ওকে একটু ভদ্দরলোক কর।' বলে লোকটা ফতুয়া খুলে দাওয়ায় গিয়ে বসল। শুয়োরটার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা ফোঁস

ফোঁস করে কিছু বাতাস টানল নাক দিয়ে। এই আর একটা কাজ বাড়ল। বালতি নামিয়ে দিল সে কুয়োতে। জলে ওর মুখ নড়ছে। ঝুঁকে পড়ে দেখল ছেলেটা। মুখ দেখলেই ওর কান্না পায়। পেটের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। অথচ লোকটা কিছু বোঝে না। বোঝে না যে ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। লোকটা, যা রান্না হয়, তার তিন ভাগ খায়। কি খায় বাপ্‌স। তরকারী না থাক, পেঁয়াজ দিয়ে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, কমসে কম কাগজী লেবু দিয়ে গপ্ গপ্ করে ভাতগুলো পেটের মধ্যে পুরে দেয়। আর খাওয়ার সময় বাঁ হাতটা লোম ভর্তি উরুতে আদর করে বোলায়। কুকুরগুলোও কম খায় না। চোখ-কানাটার পেটে বেশী গর্ত। তবু ওদের পেট ভরে না। সপাসপ্ মেরে দিয়েই মুখ তুলে তাকায়। যেন, আর একটু দাও, এরকম ভাব। তারপর ও নিজে যখন বসে, আঃ, ভাতগুলোকে সামনে রেখে আদর করতে ইচ্ছে করে।পাঁচ আঙ্গুল চওড়া করে মুঠোয় ধরলে ক'বারেই শেষ—তাই ও একটা একটা করে ভাত মুখে দেয়। অনেকক্ষণ, অ-নে-ক-ক্ষণ ধরে ভাত খাওয়া যায়। ওই সুখেই এখানে থাকা। কিন্তু এই শুয়োরটা কি খাবে, এখানে তো কেউ এঁটো ফেলে রাখে না। তবে কি লোকটা আর একটু চাল বাড়াবে? কুতকুতে চোখে তাকাল ছেলেটা।

শালা বড্ড গরম পড়েছে। বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। লোকটা ফতুয়া দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছিল। খাটো ধুতিটা হাঁটুর ওপর তুলে দিয়ে একটু আরাম করে বসল ও। এ মাসে এখনও টাকা এল না। এই এক হয়েছে। তোর বাড়িঘর দেখব, মাসে তিরিশটা টাকা দিবি, তাও যদি সময়মত না পাঠাস—লোকটার চোখ পড়ল ছেলেটার দিকে। কুয়োর ভিতর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। 'অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা, নিজের সুরৎ দেখছ, অাঁ? জল তোল।'

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি জল তুলল ছেলেটা। তুলে বালতিটা উপুড় করে ঢেলে দিল শুয়োরের গায়ে। জল গায়ে পড়তেই হঠাৎ চমকে গিয়ে শুয়োরটা ছুটতে চেষ্টা করল। চিঁ চিঁ শব্দ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করল। কিন্তু দড়িটা বড় ছোট। ছেলেটা আবার জল তুললো, এবার শুয়োরটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিজের গায়ে জল নিল। বাহারে বাহা, শুয়োরটাকে বেশ ভদ্দর বলে মনে হচ্ছে। হরিশ মেথরের শুয়োর। সেই কবে কুড়িটা টাকা পেত ও, তাগাদা দিয়ে দিয়ে হয়রান, শেষে আজ হরিশ এই শুয়োরটাকে ধরিয়ে দিল। আরো কিছু টাকা চেয়েছিল অবশ্যি, হবে হবে বলে কাটিয়েছে। যা পাওয়া যায়। তা টাকাটার সুদ বলেও তো একটা কথা আছে।দু' মাইল জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে তাগাদা দিতে যাওয়া—সেটা?

'এই শুয়োরের বাচ্চা, ওভাবে জল ঢাললে তোমার গুষ্টির পিণ্ডি হবে। শালা মন রাখছ আমার। ভাল করে ধর শুয়োরটাকে, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ঘষে কাদাগুলো তোল—ও-রকম মেয়েছেলে ব্যাপার এখানে নেহি চলেগা।' লোকটা কথাগুলো বলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সকালে রান্না করে গিয়েছে। ওর থালা ভর্তি ভাত ঢাকা দেওয়া—না কেউ ছোঁয়নি। কুকুরের কৌটো খালি। ছেলেটার থালা—না ফরসা হয়নি। তবে হাত পড়েছে। লোকটা যে রকম রেখে গিয়েছিল সে রকম নেই। শালার পেটে রাবণের চিতা। কিন্তু শুয়োরটাকে কি খেতে দেওয়া যায়! এখানে কাদা নালা নেই। জঙ্গলের মধ্যেই ছেড়ে দেবে ওটাকে। ছেলেটাকে পিছন পিছন রাখতে হবে। যাতে না পালায়।

উঁকি দিল লোকটা। ছেলেটা উপুড় হয়ে নারকেলের ছোবড়া ঘষছে চোখ-মুখ খিঁচিয়ে। আর শুয়োরটা, বাঃ, বেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চেহারাই পালটে গেল দেখছি। কে বলবে এ শালা হরিশ মেথরের ডেরার পয়দা। এগিয়ে গেল ও, কাছে থেকে শুয়োরটাকে দেখল। স্নান করানো হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা একগাল হাসল, তারপর শুয়োরটাকে টেনে রোদ্দুরে দাঁড় করালো। 'তুই তো ভালই স্নান করাস। আজ আমার পিঠে সাবান ঘষবি। তা যাই বলিস, শুয়োরটাকে এখন বেশ লাগছে। তোর চেয়ে ও দেখতে ভাল। তুই শালা শুয়োরের

বাচ্চা, তোর গায়ের ময়লা স্নান করলেও উঠবে না।'

আরো কিছুক্ষণ পরে লোকটা কুয়োর পাড়ে জাবড়ে বসেছিল। কালো বিরাট লোমশ শরীরে জল চিকচিক করছিল। চোখ বুজে বসেছিল লোকটা। ভেজা ধুতি গুটিয়ে কুঁচকির ওপরে নিয়ে এসেছে। পিঠে সাবান ঘষছিল ছেলেটা।

লোকটা বলল, 'অ্যাই ভাল করে ঘষ, জোরে জোরে। আচ্ছা, এই, তুই কথা বলিস না কেন?'

ছেলেটা চুপ করে থাকল খানিক, তারপর আবার ধুঁধুলের ছোবড়া ঘষতে লাগল পিঠে।

'তোর তো সব সময় খিদে পায়, কিন্তু তুই হাসিস না কেন? কাঁদতে পারিস?' বলেই একটা খোঁচা দিল ছেলেটার পেটে। গক্ করে আওয়াজ হল মুখ দিয়ে, ছেলেটার মনে হল, পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল, চোখের সামনেটা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল ছেলেটা। শুয়োরটা মুখ তুলে এদিকে তাকাল রোদ্দুরে গা শুকোতে শুকোতে।

'হ্যাঁ, তাহলে তুই কাঁদতে জানিস। কিন্তু খবরদার, আর কান্নাকাটি নেহি চলে গা। আমাকে কোন শালা কাঁদতে দেখেনি কখনও। মারব এক থাবড়া, চোপ।' গর্জন করে উঠল লোকটা। শরীর চমকে উঠে কেঁপে যেতে ছেলেটা চুপ করল। তারপর আবার ছোবড়া হাতে তুলে নিল।

'শুয়োরটাকে আজ একটু ভাত দিবি, বুঝলি। প্রথম দিন তো। বাড়িতে নতুন কেউ এলে তাকে কিছু দিতে হয়। তোর একটু কম পড়বে—তা হোক, প্রথম দিন শুয়োরটা যেন না খেয়ে থাকে। অবশ্যি কাল থেকে ওকে জঙ্গলে নিয়ে গেলেই হবে। তবে দেখবি গু-ফু যেন না খায়।' সাবান মাখা হয়ে গিয়েছিল লোকটার, বালতিটা নিয়ে এবার উঠে দাঁড়াতেই ছেলেটা সরে এল। কয়েক মুঠো ফুলের মত ভাত থেকে ঐ শুয়োরটাকে দিতে হবে ভাবতেই ওর পেটের ভেতর থেকে একটা চিৎকার ছিটকে বেরিয়ে আসতে আসতে লোকটার প্রায় ন্যাংটো বিশাল চেহারাটার দিকে চোখ পডতেই গলার কাছে আটকে গেল। আটকে গিয়ে সারা শরীরে ঝুলতে লাগল।

খালি ঘরটায় শুয়োরটাকে রাখা হল। প্রথম দিন সন্ধে হতেই শুয়োরটা টানা চীৎকার শুরু করল। কান পাতা দায়। লোকটা তিনধার বাঁশ নিয়ে ঢুকল ঘরে। আওয়াজ শুনতে পেল ছেলেটা। সন্ধের আগেই খাওয়া দাওয়ার পাট চুকেছে ওদের! এবেলা ও আর ভাত দেয়নি শুয়োরটাকে। লোকটার আঙুলের খোঁচায় এখনও পেটের মধ্যে টন টন করছে। পেটে হাত দিয়ে ও বুঝতে পারে কতটুকু জায়গায় ভাত পড়ে আছে। শুয়োরটারও বোধহয় খিদে পেয়েছে, একটু ভাত পেটে পড়লে বোধহয় কাঁদত না। বাঁশের ঘা খেয়ে শেষ পর্যন্ত চুপ করল ওটা। শব্দটা এত প্রবল যে ছেলেটার হাত পা কেমন সিঁটিয়ে গিয়ে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ।

ক্রমশ শুয়োরটা ছেলেটাকে বুঝে গেল। লোকটার কাছে বড় একটা ঘেঁষত না, কিন্তু ছেলেটা যখন সকালে দড়ি ধরে জঙ্গলে নিয়ে যেত ও চুপচাপ চলে আসত। হাত দিয়ে আওয়াজ করলে কাছে আসতো। খাওয়ার কথা মনে পড়তেই ছেলেটা লাঠি দিয়ে শুয়োরটার ফোলা ফোলা পেটে খোঁচা মারত, শুয়োরটা কিছু বলত না। এক এক সময় জঙ্গলের ভিতর শুয়োরটা যখন পেট ভরতি খেয়ে নিয়েছে তখন ওর আদর করতে ইচ্ছে করতো। শুযোরের পাশে বসে ওর গলায় পিঠে ফোলা ফোলা নরম পেটে হাত বোলাতে ছেলেটার আরাম লাগত। শুয়োরটা কিছু বলত না। পেটে হাত পড়লেই আদুরে বেড়ালের মত গা এগিয়ে দিত।

হঠাৎ একদিন ভোর হয়ে গেলে ছেলেটা লোকটার চিৎকার শুনতে পেল। লোকটা ওকে ডাকছে। বাইরে বেরিয়ে এসে ও দেখল লোকটা শুয়োরের ঘরে। উঁকি মারল ও। তারপরই কেমন অবাক হয়ে গেল। শুয়োরটা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আর ওর কোল ঘেঁষে কুকুরের বাচ্চার মত অনেকগুলো নাদুস নুদুস শুয়োর কিলবিল করছে।

দাত বের করে হাসল লোকটা। 'দ্যাখ রে, কতগুলোকে পয়দা করেছে একসঙ্গে। বেশ মোটাসোটা, কি বলিস! হরিশ মেথর বলেছিল পেটে বাচ্চা আছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে কে জানতো। তা তুই রোজ স্নান করাতিস তাই এরকমটা হল। বেশ ভদ্দর ভদ্দর চেহারা, আঁ।' তারপর কি মনে পড়তেই খিঁচিয়ে উঠল, 'ম্যাজিক দেখছ শালা, শুয়োরের বাচ্চা, যা উনুন ধরা।'

দুদিন কাটতে ছেলেটা ঠিক করল এবার পালাবে। এভাবে আর থাকা যায় না। লোকটা একটুও চাল বাড়াচ্ছে না। এদিকে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে শুয়োরটা জঙ্গলে যেতে পারে না। ফলে ওকে ভাত খাওয়াতে হচ্ছে। কুকুরগুলো দিনরাত কেঁউ কেঁউ করছে। ওর নিজের ভাত অর্ধেক। যেদিন পালাবে ঠিক সেদিন লোকটা ওকে হাঁক দিল, 'এই শুয়োরের বাচ্চা, এদিকে আয়।' ছেলেটা গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা বলল, 'অ্যাই আমি হাটে চললাম। তুই শুয়োরটাকে জঙ্গলে নিয়ে যা। আমি এগুলোকে বিদায় করে আসি। দেখতে মোটাসোটা, চোখ ফুটে গেছে, দর ভালই পাওয়া যাবে। বাড়িতে ভীড় বাড়িয়ে লাভ নেই।' বলে লোকটা বাচ্চাগুলোকে একটা ঝুড়ির মধ্যে তুলল, তারপর সেটাকে মাথায় নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল হাটের দিকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। লোকটা মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাল হয়ে যায়। শুয়োরটাকে জঙ্গলে নিয়ে গেলে, বাচ্চাগুলো যখন বিদায় হল, তখন আর চলে যাওয়ার কোন মানে হয় না। হঠাৎ ভাতের কথা ভেবে ও রান্নাঘরে ঢুকল। ঢুকে অবাক হয়ে দেখল লোকটা আজ রাধেনি। কি ব্যাপার ঠিক বুঝতে না পেরে ও চালের কৌটোগুলো দেখতে লাগল। নাঃ, কোথাও চাল নেই। লোকটা তাই রান্না করতে পারেনি। কখন হাট থেকে ফিরে আসবে, বাচ্চাগুলো বিক্রী করে চাল আনবে, রান্না করবে, কখন ভাত হবে, সেই ভাত খাবে— ছেলেটা ঠিক করল পালাবে, নির্ঘাত পালিয়ে যাবে। ওর কান্না পাচ্ছিল।

হাটে এসে লোকটা দেখল, জমজমাট। ভাগ্যিস শুয়োরটাকে নিয়ে গিয়েছিল ও, নইলে তো আজ শালা হরিমটর। লোকটা শুয়োরপট্টিতে এল। আসতেই দেখল, হরিশ মেথর দাঁড়িয়ে আছে বটতলায়। ঝুড়ি নামাতেই ও এগিয়ে এল। তারপর মুখটা কেমন করে বলল, 'বিইয়েছে বুঝি।'

লোকটা ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

হরিশ বাচ্চাগুলোর গায়ে হাত বোলাল, 'বেশ হয়েছে দেখছি। এগুলো তুমি ফাউকা পেয়ে গেলে, মালটা ক'দিন পরে নিলে এগুলো আমার হতো।'

লোকটা হাসল, 'কপাল, বুঝলে হরিশ। ওটা আসল আর এগুলো হচ্ছে সুদ। কত খরচা হয়ে গেল শুয়োর নিয়ে সব হিসেব রাখো।'

হরিশ একবার বলতে চেষ্টা করল টাকার কথা, লোকটা চাপা দিল চটপট। উঠে যাবার সময় হরিশ বলল, 'সবকটা বেচো না, বুঝলে। একটা রেখে দিও। নইলে মা-টা জ্বলে পুড়ে মরবে।'

কথাটা মনে ধরল লোকটার।পাইকারদের কাছে ভাল দরে একটা বাদে সব বিক্রী করে চাল ডাল কিনল ও। তারপর একটা বাচ্চা বগলে নিয়ে নি-নি দুপরে নাগরাকাটার বাজার থেকে মাঠ ভেঙ্গে ফিরে চলল ঝুড়ি মাথায়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে লোকটা একটু থমকে দাঁড়াল। না, সেরকম কিছু নয়। হরিশ মেথরের কথা শুনে ও ভেবেছিল বাড়ি গিয়ে দেখবে শুয়োরটা চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করছে। কিন্তু কোন আওয়াজ শুনতে পেল না ও। ছোকরাটা ওকে সামলালো কি করে কে জানে। ওটাকে এবার বিদায় করা দরকার। অনেক হয়েছে। কাজের বেলায় কিছু নেই, শুধু খ্যাটন আর খ্যাটন।

বাড়িতে ঢুকল ও। কেমন চুপচাপ সব। গেল কোথায়! লোকটা একবার হাঁক দিল, 'অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা।' কোন সাড়া পেল না সে। ছেলেটার ঘরে উঁকি দিল ও। না নেই এখানে। বেরিয়ে এসে আখের ক্ষেতটা দেখল। তারপর মনে পড়ল, নিশ্চয়ই জঙ্গলে গিয়েছে।

সে-রকমটাই বলে গিয়েছিল। এখন এই বাচ্চাটাকে কোথায় রাখে! শুয়োরের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল ও। দরজা খুলে বাচ্চাটাকে ভিতরে গলিয়ে দিল। কুঁই কুই করছে বাচ্চাটা। কি মনে করে একবার উঁকি দিল ও। দিয়েই একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল প্রথমটায়। পেছন ফিরে শুয়োরটা শুয়ে আছে। কেমন মা মা মুখ করে ঘুরে তাকাল লোকটার দিকে, বাচ্চাটা গুটগুট করে মায়ের কাছে গিয়ে দাড়াল। শুয়োরটা একবার দেখল শুধু, তেমন আমল দিল না। মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল।

কয়েক পা এগিয়ে গেল লোকটা। অন্ধকার স্যাৎসেঁতে ঘর। শুয়োরটার ওপাশে ছেলেটার ঠ্যাং দেখতে পেল ও। দেহ শুয়োরের শরীর আড়াল করে রেখেছে।

ব্যাপারটা কি! ঘুমুচ্ছে নাকি শালা! এই জঙ্গলে যাওয়া হয়েছে! মাথায় রক্ত উঠে গেল লোকটার। শুধু অন্ন ধ্বংস। মেরেই ফেলবে আজ। মানুষের বাচ্চা—শালা উকুন পোষা। এর চেয়ে শুয়োর পুষলে বছরে দুবার বিয়োত। কয়েক পা এগিয়ে চুলের মুঠি ধরতে হাত বাড়িয়ে লোকটা কেমন কুঁকড়ে গেল। তারপর বড় বড় চোখ মেলে নিঃশব্দে দেখল, ছেলেটা ঘুমুচ্ছে মুখে চোখে কেমন খুশী খুশী ভাব। আর তার ময়লা পুরু হয়ে থাকা কালো ঠোঁটের চাপে শুয়োরের বাঁটটা তিরতির করে নড়ছে

হিপিরা এসেছিল

কাল রাতের বুলেটিনে বিবিসি বলেছিল আজ আকাশ মেঘলা থাকবে। চাই কি, কয়েক পশলা বৃষ্টিও নামবে অথচ সামার এসে গেছে ক্যালেন্ডারে। বছরের এই ক'টা মাস, একটু হালকা হয়ে রোদ পোয়ানো, লিজা ঠিক থাকলে গাড়ি নিয়ে ব্ল্যাকপুলে চলে যাওয়ার মজা পাওয়া রবের অনেকদিনের অভ্যেস। কনকনে বাতাসটা নেই টিপটিপ বৃষ্টি বন্ধ, বরফ পড়ছে না, তার বদলে চারধার সবুজে চমৎকার, ভরদুপুরে সোয়েটারের তোয়াক্কা করতে হয় না, এক একদিন কি সুখের ঘাম বের হয় শরীর থেকে। কেডস হাফ প্যান্ট আর মোটা গেঞ্জি পরেও পার্কে গিয়ে বসা যায়। মানুষের শরীরটায় যাতে রোদ হাওয়া লাগে তাই তো ঈশ্বর সামার তৈরি করেছেন। মাস দুয়েক, তাই যথেষ্ট। সত্তর বছরের জীবনে যোগ করলে তা অনেক বছর। অথচ এবার মার্চ এসে গেলেও সামারের চরিত্র আসছে না প্রকৃতিতে।

বয়সের অনেক দোষ। কথা বলার ইচ্ছে বাড়ে অথচ লোক কমে যায়। এই গ্রামে তিনটে ক্লাব আছে একটু বড় ধরনের পাব আর কি। তা সেখানে রাত এগারটা পর্যন্ত ছেলে-ছোকরাদের ভিড়। বুড়োরা কেউ ধারে কাছে যায় না। বর্ষা বা শীতে তো কারো দেখাই পাওয়া যায় না। সামারে তবু পাকগুলোর মুখোমুখি হওয়া যায়। জন অবশ্য তাঁকে বলে মাঝে মাঝে ক্লাবে যেতে। এক বছরের ছোট কিন্তু এখনও টগবগে আছে। নইলে ক্লাব চালায় কি করে। রব জানেন ওখানে গেলে তিনি স্বস্তি পাবেন না। না, ছেলেমেয়েগুলো টকাস টকাস চুমু খাচ্ছে কিংবা মদের ঘোরে এ ওকে জড়িয়ে ধরছে বলে নয় ওদের দেখলেই নিজেকে খুব অশক্ত মনে

হয়। শরীরের অনেক কিছুই হঠাৎ হঠাৎ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। জনের ক্লাবে গেলে সেটা বড় বেশী মনে হয়।

কথা বলার মানুষ নেই। লিজার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বললেই ও চোখ বন্ধ করে হাত তোলে, 'ও বব, একটু চুপ করে থাকতে পারো না? ইন্ডিয়ান ফিলসফিতে বলে যে চুপ করে থাকে সে বেশি দিন বাঁচে।'

'কি লাভ?' বব জানেন লিজার প্রতিক্রিয়া হবে এবার। চুপচাপ উঠে যাবে। হাসি পায় ববের। যত বয়স হচ্ছে তত দুজনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। কেউ যেন কাউকে আগে মরতে দেবে না। প্রথমে যাওয়ার কৃতিত্বটা নিজেরই। কারণ যে পড়ে থাকবে তার অবস্থা অনুমানেও আনা যাচ্ছে না। অবশ্য এখন মরার মোটেই বাসনা নেই ববের। যে পৃথিবীতে সামার আসে, টিউলিপ ফোটে সেই পৃথিবীতে অনেকদিন থাকার ইচ্ছে তাঁর। এই খামার, এই ছবির মতো বাড়ি, লিজা, এই বসার ঘর, আরাম চেয়ারে আর রঙিন টিভিতে বিবিসির দুটো চ্যানেল, বিজ্ঞাপনসংস্থার সিরিয়ালগুলো—এসব ছেড়ে চট করে চলে গেলেই হলো।

ঝটপট ব্রেকফাস্ট তৈরি করবো ভেবেছিলেন বব। লিজা এখনও ওপরে। বয়স বাড়লে মেয়েদের ঘুম বাড়ে একথা জানতেন না। ঘুম বাড়ে আর খিটখিটে হয়ে যায়। অটোমেটিক কেটলির সুইচ অন করে বেসিনের কাছে আসতেই তাঁর বিরক্তি বাড়ল। কাল রাতের ডিনার প্লেট তিনি ধুয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কাবাব বাটিগুলো বেসিনে রেখে জলে ভিজিয়ে চলে গেছে লিজা। খুব বেশী ঘুম পেয়েছিল নাকি জানে ভোরে বব আসবে কিচেনে' নোংরা ফেলে রাখতে পারলেন না বব। শীত হলে গ্লাভস পরতে হত। এখন গরম জলের কল খুলে সব ধুয়ে পরিপাটি করে রেখে ডিমের পোচ আর দুটো রুটি সেঁকে নিলেন। একবার মনে হলো অ্যাপল পাই উইদ হট ক্রিম নেবেন নাকি সঙ্গে? আজকাল বড় খেতে ইচ্ছে করে তাঁর! কিন্তু সেদিন উইলি বলল, 'নো বব, আমাদের এখন খাওয়া কমানো উচিত। যা কিছু এতদিন ভালো ছিল তাই এখন শরীরটাকে খারাপ করার জন্যে নখ বের করে বসে আছে।' উইলি অনেকদিন লন্ডনে ডাক্তারি করেছে' এখন গ্রামে ফিরে এসে সেসব পাটে তুলে দিয়েছে। তবু দেখা হলে ওসব উপদেশ দিতে কার্পণ্য করে না। চা ডিম আর রুটি নিয়ে বব কিচেন থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে চলে এসে ট্রেটা টেবিলে রাখলেন। তারপর জানলার পর্দা সরিয়ে কাঁচের আড়ালে আকাশে তাকালেন। রোদের কোনো লক্ষণই নেই অথচ ঘড়িতে এখন সাড়ে আটটা। সূর্য ওঠার সময় অন্তত আড়াইঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বাগানটায় ঘন ছায়া জড়ানো। এবার আগাছাগুলোতে হাত দেওয়া দরকার। কিন্তু একটু রোদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

খুব মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করলেন বব। তারপর প্লেটগুলো বেসিনে নিয়ে গিয়ে ভালো করে ধুয়ে আবার আরামকেদারায় ফিরে এলেন। লিজার সাড়া এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাত্রে লিজা বলছিল এবার মাদার্স ডে-তে টেড আসতে পারে। দুবছর আসে নি কেউ। এবার মাদার্স ডে-তে টেলিগ্রামের বদলে যদি ও আসে তো ভালো। নিশ্চয়ই বউ মেয়ে নিয়ে আসবে না। টেডের মেয়ে, একমাত্র নাতনী ডেফনি আছে ম্যাঞ্চেস্টারে। সে তো এ তল্লাটে আসেই না। সিঙ্গল মাদার হয়েছে জানার পর লিজা একদিন গিয়ে দেখে এসেছিল তাকে। ফিরে এসে বলেছিল ডেফনি নাকি খুব গর্বিতা। এসব ভাবনা বড় অন্যমনস্ক করে দেয় ববকে। এগিয়ে গিয়ে টিভি খুললেন তিনি। বিবিসি ওয়ান ওয়েদার ফোরকাস্ট করছে লিখে লিখে। সারাদিন মেঘলা থাকবে তবে বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হতে পারে। কেন যে বিকেলে আকাশ পরিষ্কার হয়! কি লাভ তাতে। অন্য চ্যানেলগুলোতে এখন তেমন কিছু হচ্ছে না। সকালবেলায় বাচ্চাদের পড়াশুনা নিয়ে থাকে টিভির চ্যানেলগুলো। গ্রানাডা খুললেও কোনো লাভ হবে না। বৃষ্টি পড়লে অথবা কোনো কাজ হাতে না থাকলে বব এই আরামকেদারায় বসে বিবিসির বদলে গ্রানাডার

দিকেই তাকিযে থাকেন। ওদেব বিজ্ঞাপনেব ছবিগুলো বেশ মজাব হয। আগে ব্রিটিশ টিভিব বেশ কনজাবভেটিভ মানসিকতা কাজ কবত টেলিকাস্টেব ব্যাপাবে। আমেবিকানদেব মতো মেযেদেব শবীব দেখাতো না ওবা। মাঝে মাঝে বাত বাড়লে ওভাব এইট্টিন-এ যে সব ছবি আসতো তাতে সেক্স নেই বললেই চলে। মহিলা প্রধানমন্ত্রী নানান কাজ কম কবেছেন বলে শুনেছেন বব। লন্ডনেব সোহো থেকে বাস্তাব মেযেদেব প্রায তুলে দিযেছেন বললেই চলে, কিন্তু টিভিকে অপাব ক্ষমতা ছেড়ে দিযেছেন গতবাত্রেই যে ছবিটা তাবা দেখছেন দশ বছব আগে তা টিভিতে ভাবা যেত না। লিজা আব তিনি ডিনাবেব পব পাশাপাশি বসে টিভি দেখছিলেন। বিজ্ঞাপনেব পব একটি সজ্জা সিবিযাল শুরু হলো। মডেল মেযেটিকে চাব পাঁচজন ক্যামেবাম্যান বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসিযে ছবি তুলছে। ক্রমশ মেযেটিব ওপবেব পোশাক খুলে ছাব তুলল ওবা। কিন্তু সে ব্যাপাবে একজন অল্পবযস্ক ক্যামেবাম্যান নাভাস হযে পড়ায পোড খাওযা আব একজন বিভিন্নবকম লাস্যমযী ছবি তুলতে তুলতে মেযেটিকে আবও নগ্ন হবাব অথচ সামান্য আববণ বাখাব ইঙ্গিত কবতেই মেযেটি খেপে গেল। সে সম্পূর্ণ নগ্ন হযে ওই ধাষ্টামিব বিরুদ্ধে গালাগাল দিতে লাগল। এই দৃশ্য দেখামাত্রই লিজা উঠে গেল ওপবে। বব-এবও অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু যাওযাব আগে যখন লিজা বালিশ বলে উঠে দাঁড়িযেছিল তখন তিনি বলে ফেললেন কোন কোন ছাব পাস্তাব এইট্টিন এবং আবাড সিক্সটিব মেযেদেব দেখাতে নেই। নেহাৎই বসিকতা কিন্তু শোওযাব ঘবে পৌঁছে দেখেন লিজা ঘুমিযে পড়েছে। এটা তাব ওপবে অভিমান থেকেই বুঝতে অসুবিধে হযনি। আজকাল সময কাটানোব অদ্ভুত ভালো বন্ধু টিভি। বব-এব অবশ্য এইসব ছবি মন্দ লাগে না। কেমন একটা নস্ট্যালজিক ফিলিংস হয।

বোতাম টিপে চ্যানেল ঘোবাতেই খবব পড়া শুরু হলো। যে মেযেটি এইসময খবব পড়ে সে সত্যিই সুন্দবী। মুখখানা যদিও বড় কিন্তু অদ্ভুত আদুবে ভঙ্গী আছে চোখেব পাতায ঠোঁটেব কোণে। শিক্ষা দপ্তবেব নবনিযুক্ত সেক্রেটাবি একটি প্রাইমাবি স্কুলে হাজিব হযেছেন সাতসকালে। হিথবো এযাবপোর্টে গত বাতে সওব হাজাব পাউন্ডেব মাদকদ্রব্য ধবা পড়েছে। তাবপবেই পাঠিকা বললেন, 'হিপিস আব কামিং।

বব দেখলেন হাইওযে দিযে একটা বিশাল কনভয যাচ্ছে। ধাবাভাষ্যকাব জানাচ্ছেন আড়াই হাজাব হিপি তাদেব ক্যাবাভান এবং গাড়ি নিযে ইংলন্ডেব শেষপ্রান্তে চলেছে। এইসব হিপিদেব মধ্যে যুবক-যুবতী এবং শিশুও আছে। পুলিস তাদেব রুট বদলাতে বললে তাবা হাইওযে বন্ধ কবে দেয গাড়ি দিযে। ফলে হাজাব হাজাব গাড়ি জ্যামে পড়ে যায। পুলিসেব সঙ্গে হিপিদেব আলোচনা চলছে। হিপিবা কোনোভাবেই রুট বদলাতে বাজী নয। পুলিস এই মিছিলকে বেআইনী ঘোষণা কবতে চলেছে। হিপিবা তাদেব বক্তব্য থেকে সবতে মোটেই বাজী নয।

বব সোজা হযে বসলেন। দাড়িওযালা নোংবা পোশাকেব একটি হিপি গাড়িব সামনে দাঁড়িযে বলছিল 'রুট বদলালে আমাদেব পেট্রল থাকবে না, খাবাব থাকবে না। এমনিতেই খুব টাকাব অভাবে আছি আমবা। আমি ভেবে পাই না সাধাবণ মানুষ কেন আমাদেব বন্ধু বলে ভাবে না।' পুলিসেব কর্তা তাদেব আধঘণ্টা সময দিযেছেন।

হিপিগুলোকে দেখামাত্র ববেব শবীবে অস্বস্তি শুরু হলো। কোনো কোনো হিপি আবাব পাঙ্কদেব মতো খোঁচাখোঁচা চুলে বঙ বুলিযেছে। পৃথিবীব সবচেযে নিকৃষ্ট জীব বলে মনে হচ্ছিল ববেব। ওবা আছে এই গ্রাম থেকে একশ মাইল উত্তবে। ঈশ্ববেব আশীর্বাদ নিজেদেব রুটে চললে ওদেব দেখতে হবে না। বব ভেবে পাচ্ছিলেন না পুলিস কেন ওদেব এত খাতিব কবছে। নিশ্চযই বেকাবভাতা হিসেবে ষাট পাউন্ড ডোল পায ওবা। ষাট পাউন্ড ফালতু পেলে গাঁজা কিংবা ট্যাবলেট খেযে দিব্যি কাটিযে দিতে পাবে একটা সপ্তাহ। তাব মনে হলো এখনই খববেব কাগজে একটা চিঠি লেখা উচিত। বব উঠে তাঁব লেখাব কাগজ এনে বসলেন। টেলিগ্রাফেব

সম্পাদককে তিনি লিখলেন ব্রিটেনের একজন নাগরিক হিসেবে তিনি এবং তাঁর মতো যাঁরা নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে থাকেন তাঁদের নিশ্চয়ই জানবার অধিকার আছে কেন তাঁদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় হিপিদের পোষা হচ্ছে। ওরা কেন বেকার ভাতা পায়। এরা যদি সবাই জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হয়েও থাকে তাহলে সেই অধিকার অবিলম্বে কেড়ে নিয়ে ওদের এমন একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত যেখান থেকে কখনও সভ্যজগতে ফিরে আসতে পারবে না। পুলিস যে কেন ওদের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের সম্মান দিয়ে ব্যবহার করছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

চিঠিটা শেষ করে খামে পুরে উঠে দাড়াতেই লিজা ঘরে ঢকলেন 'গুড মর্নিং।'

বব সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি তো খুব ঘুমাচ্ছ, এদিকে হিপিরা রাস্তা জুড়ে বসে আছে।

হিপি কোথায়? এখানে? আমাদের গ্রামে? লিজা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আঃ। এখানে হতে যাবে কেন?' বেশ বিরক্ত হলেন এমন অলুক্ষণে কথায় 'ওরা হাইওয়েতে আছে। একশ মাইল উত্তরে। এদিকে আসবে কেন ওরা? ও হ্যাঁ তুমি কাবির বাটিগুলো কাল রাত্রে ধুয়ে যাওনি। অথচ এখানে বসে টিভি দেখলে। তোমার চেয়ে আমি পাচ বছরের বড়। অথচ আমাকেই সব কাজ করতে হচ্ছে। এটা ভালো কথা নয়।'

লিজা বললেন 'পাচ নয় চার। বব, তোমার আজকাল হিসেবের খুব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

'কি করে হলো, যখন তোমাকে বিয়ে করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল বাইশ আর তুমি সতের'

তুমি বিয়ে করোনি আমরা করেছিলাম। তোমার বয়স তখন একুশ। কত বছর বিয়ে হয়েছে একবার গুনে দ্যাখো। বড্ড বাজে কথা বল তুমি। হ্যাঁ হিপিদের কথা তোমাকে কে বলল?' লিজা কিচেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

টেলিভিশন। তুমি তো কখনও নিউজ শুনতে সময় পাও না। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তার খবর রাখ, চোখ বুজে পৃথিবীতে বেঁচে আছ কি করে তুমিই জানো। বব দেখলেন টিভি-তে এবার খেলার খবর দেখাচ্ছে। মেক্সিকোয় ইংলন্ড খুব দুরবস্থায় আছে। প্রি কোয়ার্টার ফাইন্যাল রাউন্ডে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড আর স্কটল্যান্ড-এর অবস্থা তো আরও শোচনীয়। ব্রিটেনের খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। বব মগ্ন হয়ে গেলেন গতরাত্রে কেন ইংলন্ড হারল তার ব্যাখ্যা শুনতে।

লিজা তাঁর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে এসে উল্টোদিকের টেবিলে বসলেন। বৃদ্ধা হলেও তাঁর মুখে চোখে তেমন আঁচড় পড়ে নি। যদিও শরীরের চামড়া ঢিলে হয়েছে চশমার শক্তি বেড়েছে আর বেশীক্ষণ হাটলে বড় হাঁফ ধরে। কিছুক্ষণ টিভির দিকে তাকিয়ে থেকে লিজা বুঝতে পারছিলেন না ও নিয়ে এত মাতামাতি করার কি আছে। আজকাল ক্রিকেট টিম তো খেলতে নামলেই হেরে যাচ্ছে অথচ তাতে কারও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। অথচ ফুটবলে হারলেই গেল গেল রব উঠছে। বব তো জীবনে ফুটবল মাঠে যায় নি, কিন্তু দ্যাখো, এমন মুখ করে বসে আছে যেন ওই টিমের কোচ। লিজা জিজ্ঞাসা করলেন, এই হিপিগুলোকে দেখতে কেমন?'

বব হাত তুলে কথা বলতে নিষেধ করলেন।

লিজা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'রাবিশ।'

বব বললেন, 'যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এত টাকা খরচ করে টিম করা হলো আর একটা ড্র একটা হেরে বসে আছে। এটা আমাদের জাতীয় অপমান।'

হিপিরা কেমন দেখতে?'

'হিপিদের মতন।' বব অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিলেন।

'আঃ বব।' লিজা চোখ বন্ধ করতে টিভির পর্দায় আবার হাইওয়ের ছবি ফুটে উঠল। বব

বললেন, 'আবার দেখাচ্ছে। এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ওরা?'

লিজা চোখ খুললেন। ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট জ্যাকেট পরা দাড়ি-মুখো একটা লোক টিভির প্রতিনিধিকে বলছে, 'পুলিস আমাদের বলছে রুট পাল্টাতে। কিন্তু আমাদের যা টাকা আছে তাতে ঘুর পথে তেল যা লাগবে কিনতে পারবো না। তাছাড়া হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে আমাদের। তাই না?'

পুলিস অফিসার বললেন, 'এই হাইওয়ে সব সময় খুব বিজি থাকে। হিপিরা তাদের ক্যারাভান নিয়ে যেভাবে যাচ্ছে তাতে রাস্তা আটকে থাকছে। ওরা যেখানে ইচ্ছে সেখানে থেমে আরও সমস্যা তৈরি করছে। আমরা ওদের আটকাতে চাইছি না, শুধু বলছি যাওয়ার পথটা পাল্টাতে। যে সময় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ওরা যদি কথা না শোনে তাহলে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব।'

বব বললেন, 'বেশী ভদ্রতা করে আমাদের জাতটা শেষ হয়ে গেল!'

লিজা বললেন, 'ওরা এত কষ্ট করে কেন? চাকরি-বাকরি করে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তো!'

'আহা, দ্যাখো দ্যাখো, দুধের বাচ্চাটার পায়ে মোজা পর্যন্ত নেই। ইস!'

বব উঠে পড়লেন, 'আর ইস টিস বলতে হবে না। ক্যারাভান অফ বাস্টার্ডস। হিপিরা কেমন দেখতে জিজ্ঞাসা করেছিলে না? এখন প্রাণভরে দেখে নাও। আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'এই ওয়েদারে বাইরে যেতেই হবে? কার্পেটগুলো পরিষ্কার করার কথা ছিল আজ।'

'চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছি। ওটা আরও জরুরী।'

মর্নিং জ্যাকেটটা পরার পর ছাতা নিলেন বব। তারপর দরজা টেনে দিয়ে বাইরে এসে চারপাশে তাকালেন। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। ববের বাড়িটা গ্রামের একপাশে। ঠিক উল্টো দিকে টেডের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। তার পাশে নতুন জামাপ্যান্টের দোকান খুলেছে ওস্কার নামের একটা ছোকরা। বব আকাশের দিকে তাকালেন। এখনই বৃষ্টি নামবে মনে হয় না। রাস্তাটা পার হয়ে তিনি টেডের দোকানে ঢুকলেন। দুটো মেয়ে কাজ করে এখানে। টেড শুধু ঘুরে ঘুরে দ্যাখে। বুড়ি আর্নল্ড তখন জিনিসপত্র ট্রলিতে নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারের দিকে আসছিলেন। ববকে দেখে বললেন, 'কি দিন এল বব' সামার বলে একে? ভগবানের কি ইচ্ছে বল তো?'

বব মাথা নাড়লেন, 'এ কথাই আমি ভাবছিলাম।'

'ভাববেই তো। আমাদের, যাদের বয়স হয়েছে তারা তো এই সময়টুকুর জন্যে হাঁ করে বসে থাকি। ববের কথাটা খারাপ লাগল। অন্তত কুড়ি বছর তিনি মিসেস আর্নল্ডকে এই চেহারায় দেখে আসছেন। লোকে আর মিসেস বলে না এখন। বুড়ি আর্নল্ড আজ তাকেও নিজের দলে টানল! তিনি তো অত বৃদ্ধ হননি। দাম মিটিয়ে জিনিসপত্র ব্যাগে ঝুলিয়ে বুড়ি আর্নল্ড জিজ্ঞাসা করলেন, 'লিজা কেমন আছে? অনেকদিন দেখিনি মেয়েটাকে। তোমাদের নাতনি শুনলাম সিঙ্গল লাইফ কাটাচ্ছে? লিজাকে বলো তো একদিন আসতে, ওর কাছে গল্প শুনবো।'

টেড এলো। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'হ্যালো বব। দিনটার চেহারা দেখেছ? সামারের অবস্থা যদি এই রকম হয় তাহলে বেঁচে থাকার কোনো মানে থাকে না। চললে কোথায়?'

'চিঠিটা পোস্ট করব বলে বেরিয়েছিলাম। আজ টিভিতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। হিপিরা ক্যারাভান নিয়ে হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস পথটা আমাদের গ্রামের উল্টোদিকে। কি চেহারা, ভয়ঙ্কর। আর পুলিসের অবস্থা দ্যাখো, ওদের তোয়াজ করছে।' বব উষ্ণ গলায় খবরটা দিলেন। অথচ টেডের এদিকে মনই নেই। তার চোখ কাউন্টারে বসা একটি মেয়ের দিকে। সে ফোনে হেসে হেসে কথা বলছে। টেড বলল, 'আজকালকার মেয়েরা প্রেমের অর্ধেকটা টেলিফোনেই শেষ করে দেয়। তুমি বেশ আছ বব। কাজকর্ম তেমন করতে হয় না, টিভি দেখে

বেশ সময় কাটিয়ে দিচ্ছ।'

একটু বিরক্ত হয়েই বব দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। টেডের সঙ্গে আজকাল বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। সব সময় অন্যদের সুখী দ্যাখে ও। এই সময় কানে এলো ওস্কার তাকে ডাকছে, 'হ্যালো বব। চললে কোথায়?'

ওস্কারের মুখের দিকে তাকালেন বব। ছোকরা কথা বলার সময় এমন একটা হাসি ঝুলিয়ে রাখে যে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যালো ওস্কার।' তারপর আর কথা না বলে পা বাড়ালেন। গ্রামটা মোটামুটি একটি রাস্তার দুধারে বাড়িঘর নিয়ে। বাইলেনগুলো আছে কিন্তু সে দিকটা জমাটি নয়। পোস্টঅফিসে যাওয়ার পথেই তিনটে ক্লাব কাম পাব। জনের ক্লাব এখন বন্ধ। নির্ঘাৎ ঘুমাচ্ছে সে। শনি ববি তো রাস্তায় লোক থাকেই না বলতে গেলে। রাত তিনটে পর্যন্ত ক্লাবে ক্লাবে হইচই করলে কি পরের দিন জেগে থাকা যায়?

ঝকঝকে পিচের রাস্তার দুপাশে দোতলা বাড়িগুলো। বব জন্ম ইস্তক এমন দ্যাখে নি। বাড়িগুলো পরে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষ আসে নি পাকাপাকি বাইরে থেকে থাকতে। তবে দুটো ব্যাঙ্কে কাজ করতে যারা বদলি হয়ে আসে অথবা অন্য সরকারি অফিসগুলোতে যারা কাজের জন্যে এসেছে তাদের কথা আলাদা। এই গ্রামের যাবতীয় ব্যবসা গ্রামের মানুষেরাই করে থাকে। এদের প্রত্যেককেই তিনি চেনেন। 'হ্যালো বব।'

বব ঘুরে দাঁড়ালেন। ওপরের জানলায় ঝুঁকে মেয়েটা তাকে ডাকছে, 'কাম হিয়ার।'

বব একটু ইতস্তত করলেন। চিঠিটা পোস্ট করা দরকার। নইলে বিকেলেও লন্ডনে পৌঁছাবে না। তিনি হাত নাড়লেন, 'আমি আসছি, অ্যান। একটা জরুরী চিঠি পোস্ট করার আছে।'

পোস্ট অফিসে গিয়ে বাক্সে নয়, একদম মিস্টার জোন্সের হাতে খামটা দিলেন বব। মিস্টার জোন্স খুব ঠাণ্ডা লোক। ব্ল্যাকপুলের দিকে বাড়ি। লাল দাড়ি সুন্দর করে ছাঁটেনি। চিঠিতে ছাপ মেরে মিস্টার জোন্স বললেন, 'একটা খবর দিচ্ছি বব। আমাকে ট্রান্সফার করেছে। ম্যাঞ্চেস্টারে জয়েন করতে হবে কাল। ইনি হচ্ছেন তোমাদের নতুন পোস্টমাস্টার মিঃ হ্যারল্ড স্মিথ।'

উল্টোদিকের চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে একটা ছোকরা পাইপ খাচ্ছিল। মিস্টার জোন্স তাকে বললেন, 'মিট মিস্টার রবার্ট। এখানকার পুরোন মানুষ।'

'আলাপ করে খুশী হলাম।' মিস্টার স্মিথ বলল, 'কিন্তু জোন্স তুমি এখানে তিন বছর থাকলে কি করে? একটা ভালো ক্লাব নেই, ফূর্তি করার জায়গা নেই।'

মিস্টার জোন্স বললেন, 'এঁরা ছিলেন তাই ওসবের দরকার হয় নি।'

বব বললেন, 'জোন্স, তুমি চলে যাচ্ছ বলে খারাপ লাগছে। পৃথিবীর নিয়মটাই হলো ভালো মানুষরা বেশীদিন থাকে না। আমার ঠিকানা তো তুমি জানো, মাঝে মাঝে চিঠি দিলে খুশী হব।'

বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালেন বব। মেঘ নেমে এসেছে নিচে। একটা ছোকরাকে ওরা পোস্টমাস্টার করে পাঠাল? ছোকরা এখানে এসেই নালিশ করছে ফূর্তি করার জায়গা না পেয়ে! বিয়ে থা করেছে কিনা কে জানে। যদি উল্টোপাল্টা কাজ করে তাহলে আবার চিঠি লিখতে হবে। ব্রিটিশ সরকার এখনও অভিযোগ করলে বিচার করে।

ওপাশে একটা ক্যাসিনো। জুয়ো খেলার একটা চমৎকার আড্ডা। তবে আঠারো বছরের নিচের ছেলেদের ওখানে ঢোকা নিষেধ। বব নিজেও মেম্বার। কিন্তু হেরে যাওয়ার মতো পয়সা নেই বলে তিনি সচরাচর যান না। বব দেখলেন ক্যাসিনোর দরজা খোলা। একটু বিস্মিত হলেন তিনি। আজ সারা গ্রাম যখন রাত জেগে ঘুমাচ্ছে তখন ক্যাসিনো কি করে খোলা থাকছে? সিঁড়ি ভেঙে দরজা ডিঙিয়ে ঢুকতেই ম্যাথুজকে দেখতে পেলেন। ম্যাথুজ এখানকার একজন ডোরম্যান। এই গ্রামে এটা একটা লোভনীয় চাকরি। পাব্ কাম ক্লাব, রেস্টুরেন্ট এবং ক্যাসিনোর জন্য ডোরম্যানদের রাখা হয়। কিছু ছেলে যাদের স্বাস্থ্য ভালো, নিয়মিত শরীরচর্চা করে, তারা

বক্সিং শিখে নিয়ে এই চাকরিতে যোগ দেয়। ডোরমেন অ্যাসোসিয়েসন আছে একটা, তারাই যোগান দেয়। কিন্তু যেহেতু ওদের চাকরির জায়গা কম তাই বেচাবাদেব অন্য গ্রামে যেতে হয়। ম্যাথুজ মাথা নাড়ল, 'গুড মর্নিং, বব।'

বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ তোমাদের খোলা?'

ম্যাথুজ হাসল, 'মিসেস হোমস সব সময় খোলা রাখতে পারলে খুশী হন।'

খাতায় সই করে ভেতরে ঢুকলেন বব। পুরো ক্যাসিনো ফাঁকা। তিনটে মেয়ে একটা জায়গায় বসে গল্প করছে। আঠারো থেকে কুড়ি ওদের বয়স। বাপ-মাকে তিনি নিশ্চয়ই চিনবেন। ওঁকে দেখে একটি কালো মোটা মেয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খেলবে তুমি?'

বব চারপাশে তাকালেন। ওপাশে একটা ডিস্ক ঘুরছে। তার পাশেই লম্বা বোর্ডে ঘর কাটা। প্রত্যেক ঘরে একটা করে নম্বর। সেই নম্বরের একটায় পেনি কিংবা পাউন্ড রাখলে মেয়েটা গিয়ে ডিস্কের মধ্যে একটা সীসের বল ফেলে দেবে। ঘুরতে ঘুরতে বলটা ডিস্কের সঙ্গে যেখানে থামবে সেখানে একটা নম্বব পাওয়া যাবে। সেই নম্বরের সঙ্গে বোর্ডের নম্বর যদি মেলে এবং তাতেই তোমার পয়সা থাকে, তাহলে তুমি নম্বর অনুযায়ী কযেকগুণ বেশী ফেবত পাবে। তার পাশে কয়েন বক্সে পয়সা ফেলে হাতল ঘোরালে যদি একই নম্বর পাশাপাশি তিনটে ওঠে তাহলে দশ পেনিতে আড়াই পাউন্ড পেতে পাব। এদিকে একটা রেসবোর্ড আছে। দশটা প্লাস্টিকেব ঘোড়া নিজেদেব ট্র্যাকে সুইচ টিপলে দৌড়ায়। তোমাকে একটায দশ পেনি বাজি ধরতে হবে। যত নম্বর ঘোড়া প্রথম উইনিং পোস্ট ছোঁবে ততগুণ পযসা পাবে ফেবত। বব হিসেব করে দেখেছেন একশ পাউন্ড খেললে পাঁচ পাউন্ড ফেরত পাওযা যায। তবু লোকে খেলে। একবার হারতে আরম্ভ করলে আবও নেশা চেপে যায। এইসময় বাব কাউন্টা' থেকে মিসেস হোমস চেঁচিয়ে বললেন, 'হাই বব। হোযাট এ সাবপ্রাইজ। তুমি তো জুয়ো খেলাব পাত্র নও। এখানে চলে এস।'

বব সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন মিসেস হোমসেব চোখ মুখ এখনও ফোলা। বোঝা যাচ্ছে সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। বেশ মোটাসোটা হয়ে পড়েছেন এখন। লিজারই বয়সী কিন্তু অনেক চটপটে। এক সময়ে এই গ্রামের সেবা সুন্দরী ছিলেন। সেসব সোনাব দিন ছিল। হোমসটা ছিল বদমেজাজী। এই ক্যাসিনো করে গোল্লায় গিয়েছিল। ও মবতে যখন মিসেস হোমস দায়িত্ব নিলো তখনই চব্বিশ পেরিয়েছেন। তাবপর থেকে ক্যাসিনোটা স্টেডি চলছে।

ফাঁকা ক্যাসিনো, বার আরও ফাঁকা। একা মিসেস হোমস পা ছড়িয়ে বসে টিভি দেখছেন। বব যেতেই একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। 'আকাশের অবস্থা দেখেছ? একেই কি সামার বলে?'

বব বসতেই দেখতে পেলেন মোটা শরীরে ফুলতোলা যে রঙিন গাউন পরেছেন মিসেস হোমস তার বুকের কাছটা আজকালকার মেয়েদের মতো কাটা। সেটা ববের চোখে পড়েছে দেখে মিসেস বললেন, 'আবার উপদেশ দিও না। ঘরোয়া হয়ে বস। এককালে তোমরা, তুমি আমার দিকে হাঁ করে তাকাতে, বিলের জন্যে ঘেঁষতে পারোনি। মনে আছে?'

'সে সব কথা মনে করে কি লাভ?'

'যাই বল বাপু, আমার মনে করতে ভালো লাগে। তোমাকে দেখেই আমার ভালো লাগল। আচ্ছা আমি না হয় বুড়ি হয়েছি তাই বলে একটু চুমু আশা করতে পারি না?'

বব উঠে ঝুঁকে মিসেস হোমসের গালে একটা চুমু খেয়ে ফের ফিরে বসলেন। মিসেস হোমস গলা তুলে বললেন, 'ম্যাগি, ববের জন্যে একটা জিন উইদ টনিক দাও।'

'না না, এই সকালে—।'

'আঃ রাখো তো! বব, তুমি চিরকালই ভিজে রয়ে গেলে। ইটস অন মি।'

কালো মেয়েটা অকারণে হেসে কাউন্টারে ঢুকে মদ ঢালতে লাগল। এই একটা ব্যাপার

হয়েছে। এখন ইংলন্ডের আনাচে-কানাচে কালো ছেলেমেয়ে ছেয়ে গেছে। বব শুনেছেন ছেলেগুলোর বেশীর ভাগ পড়তে এসে থেকে যায়। আর ওদের ওপর নাকি ব্রিটিশ মেয়েদের প্রচণ্ড টান। কালোগুলোর মতো ডিস্কো নাকি সাদা ছেলেরা নাচতে পারে না। বারিশ।

জিন উইদ টনিক হাতে নিয়ে বব বললেন, 'তুমিও কালো মেয়ে রেখেছ?'

'আঃ বব। যুগ পাল্টেছে। এখন যেসব ছোঁড়া এখানে খেলতে আসে তারা ম্যাগিকে বেশী পছন্দ করে। ওরকম রেঢপ হিপ আর ব্রেস্ট নিয়ে যখন তখন তো আর কেউ হাসতে পারে না। দিন পাল্টাচ্ছে বব। উই মাস্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট।' মিসেস হোমস শরীরটাকে তুলে এগিয়ে গিয়ে ক্যাসিনোটা দেখতে লাগলেন, 'কাল খুব ভালো বিজনেস হয়েছে। চারটে পর্যন্ত লোক ভর্তি ছিল। এখন আমার টাকা-পয়সার অভাব নেই বব কিন্তু শরীরটার দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। খাওয়া ছাড়া কোনো আরাম আমার জন্যে নেই ভাবতে পার? সেক্স এর কথা বলছি না, একটা পুরুষমানুষকে মনের মতো ভালবাসার কথা ভাবলেই ঘুম পেয়ে যায়। আমার অবস্থাটা বোঝ বব। কি জন্যে বেঁচে আছি? কি হবে টাকা জমিয়ে।'

গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন বব, 'মনটাকে ঝেড়ে ফেল তোমাকে দেখতে এখনও যে আমাদের ভালো লাগে, আমরা যে আসি এটা কম কথা নয়। যাট বছর পর্যন্ত মানুষ নিজের জন্যে বেঁচে থাকে, তারপর বাচতে হয় অন্যের জন্যে। বাই মিসেস হোমস।

'বাই বব।'

আবার রাস্তায় নামলেন বব। আজ আর রোদ উঠবে না। নির্জন রাস্তায় একা একা হাঁটছিলেন তিনি। আজ একবার গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে। হাইওয়ের ধারে বাগানটায় এই সপ্তাহে যাওয়া হয় নি। একটু আগে শোনা কথাগুলো মনের মধ্যে এখনও টলটল করছে। নিজের উত্তরটাও। তিনি কার জন্যে বেঁচে আছেন? অন্যজন কে? লিজা? তিনি না থাকলেও লিজার ঘুমের অসুবিধে হবে না, আর্থিক অভাব হবে না। এখন রাত্রে শোওয়ার আগে অথবা মেজাজ ভালো থাকলে কোথাও বেরুবার আগে লিজা ওঁকে চুমু দিয়ে যায়। কোনোদিন বলেননি তিনি। করমর্দনে যে উত্তাপ তা চুম্বনেও পান না এখন। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষলে শরীরের কোথাও উত্তেজনা জন্মায় না। বুকের ভেতর কোন বল ড্রপ খায় না। শরীরের মধ্যে যে শরীর পনের বছর বয়সে জেগে উঠেছিল সে কবরে শুয়েছে কবে, শুয়ে মাটি হয়ে গিয়েছে। মিসেস হোমসের তবু খেতে ভালো লাগে তার তো তাও লাগে না। এখন শুধু দেখার জন্যে বেচে থাকা। এই গ্রামের মানুষ, বাড়িঘর, প্রকৃতি যা আজন্ম দেখে এসেছেন তাই রোজ চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। যেন তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত, সবকিছু ঠিকঠাক থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি টু-লেট ঝোলানো বাড়িটার সামনে দাঁড়ালেন। অ্যানরা ওদের নিচের ঘরটা ভাড়া দিতে চায়। এখন অফিস ব্যাঙ্কের দৌলতে ভাড়াটে পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। বব কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে বেল টিপলেন। দরজা খুলে অ্যান ঠোঁট ফোলালো, 'নো তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আমি ডাকলে সমস্ত গ্রাম ছুটে আসে আর তোমার সময় হয় না। এসো, খুব জরুরী পরামর্শ আছে।'

বব হাসলেন, 'আমার কাছে সুন্দরী নারী আর ফুলের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।'

'খুব কথা শিখেছ।' অ্যান ওঁর হাত ধরে এসে সোফায় বসাল। তারপর একবার ভেতরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, মা ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা বুড়োরা এত ঘুমায় কেন বল তো?'

'ঘুমোয় না, ঘুমের ভান করে। এটাই কি তোমার সমস্যা?'

'না না। শোন, সাইমনকে ডিভোর্স করার পর ঠিক করেছিলাম এখন তিন বছর আর কোনো পুরুষকে পাত্তা দেব না। গ্রামে ফিরে এসে মাকে সাহায্য করছি জমিজমার ব্যাপারে। কিন্তু তুমি তো জানো কেন্ট ছেলেটা কি ভালো। অত ভালো ছেলে চাইলে কি প্রেম না দিয়ে পারা যায়?

চারমাস পরে আমরা বিয়ে করব। তুমি এমন করে তাকিয়ে আছ যেন কিছু জানো না?' চোখ ছোট করল অ্যান।

'জানি। কেন্ট চমৎকার ছেলে। চাষবাসে ভালো মন। তুমি ছাড়া কোনো মেয়েকে মন দেয়নি। ওর সঙ্গে তোমার ভালবাসাবাসির কথা শোনার পর ভারি ভালো লেগেছিল।'

'লাগবেই তো। আমি কি খারাপ মেয়ে? সাইমনকে বিয়ে করে ভুল করেছিলাম তাই বলে খারাপ কেউ বলতে পারবে না!' অ্যান মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, যে সমস্যাটার কথা বলছিলাম, তুমি তো চার্লসকে চেনো! আরে; চার্লস হলো ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। কি সুন্দর দেখতে বল! তা চার্লস আমাকে প্রেম নিবেদন করেই চলেছে। আমি যত বলি ওর প্রেম নেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয় কারণ আমি কেন্টের বাগদত্তা তো কানেই নেয় না। তোমাকে কি বলব, অতবড় লোকটা কান্নাকাটি পর্যন্ত করছে। আমি বাবা কেন্টকে ভালবাসি, ওসব ঝামেলায় যেতে চাই না। একটু আগে লোকটা ফোন করেছিল। আমার সঙ্গে একবার, মানে আমাকে অন্তত একবারের জন্যে পেতে চায় নাহলে আত্মহত্যা করবে। আমি কেন্টকে বিয়ে করলে ওর তো কিছু করার নেই কিন্তু তার আগে একবার আমাকে পেতে চায়। আর এইটেই আমার সমস্যা। অনেকবার ভেবেছি কাটিয়ে দেব। তোমাকে ভালবাসি না, তোমার সঙ্গে শোব কেন? কিন্তু তারপরই মনে হচ্ছে যদি আত্মহত্যা করে? ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে, ক্যাশিয়ার নেই। তাছাড়া, অত যখন ভালোই বেসেছে তাহলে একবারের জন্যে আশা মিটিয়ে দিই। একবারই তো। আমি কেন্টের জন্যে যেমন মনটাকে রেখেছি তেমনই থাকবে অথচ চার্লসকেও দুঃখ দেওয়া হবে না। কিন্তু কথাটা আমি কেন্টকে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। আমার শরীর মনের ওপর, যদিও স্বামী হয় নি এখনও তবুও ওর অধিকার আছে, একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। তুমি কি বল?'

পায়ের ওপর পা রেখে দুটো হাত হাঁটুর ওপরে নিয়ে বব চুপচাপ শুনছিলেন। প্রশ্নটার পর চোখ বন্ধ করলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন অ্যান উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে। চোখ না খুলে তিনি বললেন, 'এরকম জটিল প্রশ্নের উত্তর তো চট করে দেওয়া যায় না। সময় লাগবে।'

'দিচ্ছি সময়। চুপচাপ বসে ভাব। দ্যাখো, তোমার মতো অভিজ্ঞ মানুষকেই যখন ভাবতে হচ্ছে তখন আমার কি দোষ। আর কাউকে তো বলা যায় না এসব কথা তোমাকে ছাড়া। ভাব, আমি ততক্ষণ টিভি দেখি।' অ্যান উঠে টিভি খুলে দিল। চোখ না খুলে বব শুনলেন বিবিসি ওয়ানের সংবাদ পাঠক বলছেন, 'এই ঘটনার পর হাইওয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং হিপিরা তাদের যাওয়ার রুট বদলায়। কিন্তু হিপিরা যাতে পরের গ্রামে আশ্রয় না নেয় রাত কাটাতে সেইজন্যে গ্রামের মানুষ পুলিসের কাছে আবেদন করলে পুলিস জানায় কোর্টের হুকুম ছাড়া তাদের পক্ষে হিপিদের নিষেধ করা সম্ভব নয়।'

বব চোখ খুললেন। তৎক্ষণাৎ ছবিটা সরে গিয়ে ওয়েদার চার্ট ফুটে উঠল। যেটুকু চোখে এল তাতে দেখলেন হিপিদের ক্যারাভান এগোচ্ছে। ওরা এখন কোন রাস্তায় যাচ্ছে? আহা, যে গ্রামে রাত কাটাবে তাদের কি দুর্দশা! এখন তো কোর্ট থেকে অর্ডার আনার সময় নেই। তাঁকে তাকাতে দেখে অ্যান জিজ্ঞাসা করল, 'ভাবা হলো?'

'হুঁ। তুমি বরং চার্লসকেই বিয়ে কর। বেচারা কেন্টের একটু কষ্ট হবে কিন্তু বাকি জীবনটা ভালোই কাটবে। আমি বলছি, চার্লস আর তুমি খুব সুখী হবে।' বব উঠে দাঁড়ালেন।

হাঁ হয়ে গেল অ্যান, 'তুমি কি বলছ? কেন্টকে আমি যে ভালবাসি।'

'ভালবাস। ভাল বাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। চার্লস কি পাত্র হিসেবে মন্দ?'

'না তা অবশ্য নয়। তবে ওর তো বদলির চাকরি।'

'ভালোই তো। অনেক জায়গা দেখতে পাবে ওকে বিয়ে করলে। চলি।' বব আর দাঁড়ালেন

না। তাঁর মনে হলো কেন্ট ছোকরাকে একটা ফোন করে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। এই মেয়েটার বুদ্ধি একটুও বাড়েনি। বাড়বেও না।

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি সবকালেই থাকে। বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকার নিয়মটা এই গ্রামেও চালু। তার নিজের নাতনী তো মা হয়েছে বিয়ে না করেই। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ শোভন মানসিকতা কাজ করে। যে যাকে ভালবাসে তাকে না হারানো পর্যন্ত সৎ থাকে। অথবা কি করছি সেটা নিজের কাছে স্পষ্ট থাকলে অন্য কাউকে বিরক্তও করা হয় না। বব নিজে খুব একটা কনজারভেটিভ নন। তার যৌবনে লিজা আসার আগে অন্তত দুটো ক্ষেত্রে তিনি নরম হয়েছিলেন। কিন্তু তার একটা শোভন চেহারা ছিল।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে বব চট করে সরে এলেন বাস স্ট্যান্ডের ছাউনির তলায়। আর তখনই তিনশো এগার নম্বর বাসটা এসে দাঁড়াল। এই দোতলা বাসটা তিনটে গ্রামের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আজ কোনো যাত্রী নেই, কোনো নামার লোকও নেই। কিন্তু না, একটু ভুল হলো। মাথায় ফুলের ছবি আঁকা টুপি, পরনে জিনসের প্যান্টের ওপর জ্যাকেট হাতে বড় সাদা ব্যাগ নিয়ে একজন নামল। তাকে প্রথমে চিনতে পারেন নি বব। কিন্তু বাসটা চলে যাওয়ামাত্র ববের মনে হলো খুব চেনা চেনা মানুষটি। যদিও জিনসের প্যান্টে নিতম্ব বড় ভারি দেখাচ্ছে আঁট হয়ে কাপড় সেঁটে থাকায়, কিন্তু একটু আগের চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডোরা যে এখানেই এসে নামবে কে জানতো। ষাট বছর তো অবশ্যই, লিজার সমবয়সীও হতে পারে অথচ লিজার থেকে কি স্মার্ট। শরীর মাঝে মাঝে স্থুল হয়েছে বটে কিন্তু এখনও চমৎকার চটপটে। আর সেই সময় বব ধরা পড়ে গেলেন। ডোরা ওঁকে দেখে ব্যাগ রাস্তায় নামিয়ে ছুটে এল, 'আঃ বব। তোমাকে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি। মাই সুইট বব।'

কিছু করার আগেই দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল ডোরা। একটু সামলে নিয়ে বব বললেন, 'যাক চিনতে পারলে তাহলে

'চিনব না? পঞ্চাশ বছর হলো। না? পঞ্চাশ বছর আগে তুমিই আমাকে প্রথম নারীত্বের আনন্দ দিয়েছিলে। এই পঞ্চাশ বছরের সব ভুলতে পারি কিন্তু ওই দুপুরটা? অসম্ভব।' ডোরার হাত তখনও ওর কাধে। দাতগুলো কি বাঁধানো? পঞ্চাশের হিসেবটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ডোরার বয়সটা তিনি ভুল হিসেব করেছিলেন।

বব বললেন, 'তোমাকে কিন্তু এখনও চমৎকার দেখাচ্ছে। এখনও এ্যাট্রাকটিভ।'

'বিয়েলি? এই নতুন প্যান্টটা বানাতে সাজেস্ট করল আমার নাতনী। ওঃ, তুমি যদি ওকে দেখতে। ঠিক আমার পনের বছর। যাক, সাতদিন এখানে থাকব বলে এসেছি। লিজার খবর কি?'

'ভালো আছে। তবে বয়স হলে যা হয়।'

'ওঃ বয়স। ভাবলেই বয়স নইলে কি। লিজা কিন্তু চিরকালই ঘরকুনো, তোমার ওকে বিয়ে করা উচিত হয় নি বব, একথা তোমাকে চিরকাল বলে এসেছি। আমার স্বামীটির সঙ্গে ওকে চমৎকার মানাতো। তা তিনি গেলেন এমন সময়ে যে পাত্র খুঁজে পাব না আমি।' খিলখিলিয়ে হাসল ডোরা।

'চেষ্টা করলে পারতে।' বব কেমন যেন নার্ভাস বোধ করছিলেন।

মুখ চোখে কিশোরী হয়ে গেল ডোরা, 'সেকথা কি আর বলব। অন্তত তিনজন সত্তর পার হওয়া বুড়ো আমাকে এ্যাপ্রোচ করছে। কিন্তু ওদের দিকে তাকালেই নিজেকে কেমন বুড়ি মনে হয়। তোমার মতো স্মার্ট মানুষ একটাও দেখলাম না। আমার ভাইটির খবর কি?'

'ভালো। ও তো গত বছর আর একটা ফলের বাগান কিনেছে। নেশাও কম করে।'

'তাহলেই ভালো। ঠিক আছে, আমি চলি। তোমার সঙ্গে কখন দেখা হবে?'

'আমাব বাড়িতে এসো।'

'না না। ওখানে যাব অন্য সময়ে। আমাদেব খামাববাড়িতে যাব কাল সকালে। ওখানেই চলে এসো। বাই বব।' হাত নেড়ে চলে গেল ডোবা। কিছুক্ষণ নেশাগ্রস্তেব মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন বব। যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ যেন সমানে ঝড় তুলল। এবং হঠাৎ বব আবিষ্কাব কবলেন শবীবেব বক্ত যেন স্রোত পাল্টেছে। এখনও যে জোযাব ভাঁটা খেলে, খেলতে পাবে তা জেনে চমকিত হলেন তিনি। যে মেযেব বিযে হযেছে পযতাল্লিশ বছব আগে, এবাব হিসাবটা ঠিক, তিন ছেলে আব নাতি নাতনী নিযে অন্য গ্রামে যাব সংসাব সে এসে ওই আঁটো প্যান্ট আব কথাব দোলায এখনও তাকে দুলিযে দিল। সে ছিল না পঞ্চাশ বছব আগেব এক উজ্জ্বল দুপুবে খামাববাড়িব খড়েব গাদায শুযে থাকা পনেব বছবেব তেজী মেযেটা? এই গ্রামে ডোবা যখন আসতো তখন কদাচিৎই দেখা হত। ওব স্বামী মাবা যাওযাব পব দু'তিনবাব দেখা হযেছে। তখন হয লিজা সঙ্গে ছিল নয ওব ছেলেবা। আজ একা একা কেমন যেন করে দিযে গেল মেযেটা। বাড়িব দবজায এসে বব হেসে ফেললেন। পঁযষট্টি বছবেব কোনো মহিলাকে কি মেযে বলা যায?

তন্ময হযে হিচককেব ছবি দেখছিলেন লিজা। এটা সেই গল্প যাব শেষে খুনী ওষধ খাচ্ছে ভেবে ভুল করে কেমিস্টেব দেওযা বিষেব পুবিযা মুখে ঢালবে। অন্তত দুবাব দেখেছে লিজা অথচ টিভিব দিকে এমনভাবে তাকিযে আছে যেন এব চেযে বিস্ময আব কিছু নেই। বব পাশেব সোফায বসে বললেন, 'একটু আগে ডোবাব সঙ্গে দেখা হলো।'

'ও।' লিজাব ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো কি না বোঝা গেল না।

'তুমি এই ছবিটা দুবাব দেখেছ।

'ওঃ। ডোন্ট টক হোযেন ইউ টক ইউ টক বাবিশ। এটা হিচককেব ছবি।' হাত নাড়লেন লিজা। অতএব ছবিব শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা কবলেন বব। ল্যাংড়া হযে যাওযা খুনী প্লেনেব সিটে বসে হোস্টেসেব কাছে জল চাইল। হোস্টেস জল দিতে সে ওষুধ ভেবে তৃপ্ত মনে সেটা মুখে দিযে পুবিযা ঢালল গলায। ছবিটা শেষ হতেই লিজা বললেন, 'কাব কথা বলছিলে?'

'ডোবা' ভাই-এব বাড়িতে থাকবে বলে এসেছে। তোমাব কথা জিজ্ঞাসা কবছিল।'

'ডোবা? ও, তোমাব ডোবা। ইউ স্লেপ্ট উইদ হাব ফিফটি ইযার্স ব্যাক। ইজন্ট ইট, হাউ ইজ শী?' নির্লিপ্ত মুখে প্রশ্ন কবলেন লিজা। ঠোঁট কামড়ালেন বব। এটা প্রশ্ন কবাব ধবন হলো? বউ-এব কাছে কিছুই লুকোবেন না ভেবে কত বছব আগে বিযেব পবে ঘটনাটা স্বীকাব কবেছিলেন। আজ যেন অন্তর্বাস খুলে গাউন বেব কবল। তিনি উত্তব দিলেন না। লিজা সেটা লক্ষ্য কবে বললেন, 'যে বযসেব গা। তোমাব ডোবাকে বলো একটু যেন আমাব সামনে দাঁড়ায। ওব ভঙ্গী দেখে বাইশ বছবেব ছোকবাবাও বাত্রে ঘুমায না। কিন্তু ও হলো মকভূমিব আলেযা। ভঙ্গীটুকুই সাব।'

চমকে গেলেন বব। এই বাড়ি এবং এই গ্রামেব বাইবে জীবনে যাযনি লিজা। অথচ ডোবাব হালফিল খবব বাখছে কেমন কবে? মেযেবা কি সবসময একটা গোপন সত্র বেখে দেয স্বামীব প্রাক্তন প্রেমিকাদেব জন্যে?

টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। চাঁদে চকোলেট ফেলে এসেছিল একদল নভোচাবী। ফলে সেই চকোলেটেব লোভে অ্যামিবা এল, তা থেকে পিঁপড়ে জন্মে গেল। পিঁপড়ে থেকে পতঙ্গ পতঙ্গ থেকে পাখি, পাখি থেকে মুবগী, মুবগী থেকে খবগোস, খবগোস থেকে বাঁদব, বাঁদব থেকে শিম্পাঞ্জি এবং শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ পবেব ট্রিপে নতুন নভোচাবীবা যেতেই সেই মানুষটি হাত বাড়িযে চকোলেটেব মোড়ক দেখিযে আব একটা চাইল।

তাবপবই বিবিসিব নিউজ বুলেটিন শুরু হলো। 'মার্গাবেট থ্যাচাব বলেছেন লিবিযাব সঙ্গে এখন কোনোবকম কথা শুরু কবাব সময হয নি। সিংহলে তামিল বিদ্রোহীদেব সঙ্গে সংঘাতে

দশজন পাস্ট্রায় সেনা মারা গেছে। ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রাজিল এখন তুর্কদের কাছে ফেবারিট। হিপিরা পুলিসের আদেশ মেনে রুট পাল্টেছে। কিন্তু যেসব গ্রামের ওপর দিয়ে তারা যাবে এবং রাত কাটাবে তারা শঙ্কিত। হিপিরা বলছে তাদের টাকা ফুরিয়ে আসছে, গাড়ির তেলও নেই।' বব খবরটা শুনছেন মন দিয়ে। লিজা উঠে গেলেন কিচেনে। সব খবর শেষ হবার পর হিপিদের ছবি এল। বাচ্চাগুলোর পায়ে মোজা নেই। লোকগুলো যেন শয়তানের সন্তান। ববের মনে হলো এদের এখনই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তারপরেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন। টিভি-র পর্দায় হিপিদের যাওয়ার পরিবর্তিত রুট লিখে দেওয়া হবে। প্রথমে এল হিপিদের প্রতিবাদের ছবি। একটা অল্পবয়সী হিপিনী করুণ গলায় বলল, 'কাল সারাদিনে আমরা মাত্র দু'পিস রুটি খেয়েছি। বিজি হাইওয়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পুলিস আমাদের যে রাস্তায় যেতে বলছে সেখানে খাবার দেবে কে? আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে আকাশের তলায় থাকতে পারি না। আমি আমাদের বাচ্চাদের জন্যে আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করছি। আমরা মানুষ।'

মানুষ! বব মাথা নাড়লেন, মানুষ কাকে বলে। ওই সঙের মতো সাজ, নোংরামির জন্যে যাদের কাছে যাওয়া যায় না তারা মানুষ! এই সময় টিভির পর্দায় ম্যাপটা আঁকা হলো। পরিবর্তিত পথ ধরে, হিপিরা কিভাবে যাবে। এবং তখনই তাঁর গলায় চিৎকার ছিটকে উঠল। লিজা ছুটে এলেন, 'কি হলো বব? শরীর খারাপ লাগছে? বব!'

বব কোনরকমে আঙুল তুলে টিভিটাকে দেখালেন। লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে? কি দেখেছ ওখানে? কেউ মারা গেছে?'

ততক্ষণে বব লাফিয়ে উঠেছেন। একেবারে টিভির পর্দার কাছে চলে গেলেন তিনি। যাচ্চলে! ওয়ার্ল্ড কাপের প্রস্তুতি দেখাচ্ছে। তারপর সেখান থেকে ঘুরে উত্তেজিত ভঙ্গিতে জানালেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল লিজা। হিপিস আর কামিং।'

'কোথায়? কখন? কারা?'

'ওঃ। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি বলছি হিপিরা আসছে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে ওরা যাবে। এখন কি হবে? উঃ, আমি ভাবতে পারছি না।' বব ছটফট করছিলেন।

লিজা একটু অবাক, 'তাতে হয়েছে কি? হাইওয়ে দিয়ে যে যার মতো যাবে তাতে তোমার উত্তেজিত হবার কি আছে। ও বব, দিস ইজ টু মাচ!'

বব দৌড়ে এলেন, 'যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে এস না। এরা কারা? পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা জীব। ওরা প্রকাশ্যে সেক্স করে, চুরিচামারি, ছিনতাই ওদের হাতের ময়লা। সবরকমের ড্রাগস ওরা খেয়ে থাকে। স্নান করে না। তার চেয়ে বড় কথা কোনো সামাজিক নর্মস মানে না। এরা যে কি তা শুধু ওরাই জানে। এই লোকগুলো যদি গ্রামে ঢুকে যায়? সমস্ত গ্রামটা বিষাক্ত হয়ে যাবে তাহলে। উই মাস্ট ডু সামথিং।'

বব উত্তেজিত হয়ে আবার ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সামনে টেড দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল। বব চিৎকার করলেন, 'হেই টেড! শুনেছ? খবরটা শুনেছ?'

'কি খবর বব?' নির্লিপ্ত চোখে তাকাল টেড।

'দে আর কামিং। হিপিস। ওরা এই গ্রামের পাশ দিয়ে যাবে। ওরা যদি গ্রামে ঢুকে পড়ে! ভাবতে পারছ ব্যাপারটা? আড়াই হাজার হিপি।' বব ওর কাছে চলে এলেন।

এবার টেডের চোখ কপালে উঠল, 'মাই গড! কিন্তু কে তোমাকে খবরটা দিল?'

'টিভি। টিভিতে এইমাত্র বলল। আমাদের গ্রামের নামও লিখে দিয়েছিল।'

'কিন্তু ওরা যদি আসে কি করতে পারে বল তো?'

তুমি জানো না? তোমার দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম না দিয়ে চলে যেতে পারে। তোমার ছোট ছেলেটাকে ট্যাবলেটের নেশা ধরিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া ওরা যে এইডসের

জার্ম ক্যারি করছে না তা তুমি জানো না।'

'দেন উই মাস্ট স্টপ দেম। লেটস গো টু শেরিফ।' দোকান খোলা রেখে পারতপক্ষে বের হয় না টেড। পা বাড়াতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর দোকানটার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে মানুষকে বিশ্বাস করা উচিত, তাই না বব?'

বব বললেন, 'মাঝে মাঝে।'

এখনও রাস্তা ফাঁকা। টেড জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার লাঞ্চ হয়ে গেছে বব?'

বব মাথা নাড়লেন, 'না। আমি সাধারণত লেট লাঞ্চ করে থাকি।' ববের খুব খারাপ লাগল। এইরকম সমস্যা যখন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে তখন টেড খাওয়ার কথা ভাবছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত গ্রাম জেনে গেল হিপিরা আসছে। একা বব নয় অনেকেই টিভির পর্দায় খবরটা দেখেছে। তবে বেশীর ভাগ রাতজাগা মানুষ তখনও ঘুমিয়ে থাকায় খবরটা তাদের শুনতে হলো। বব এবং টেডের উত্তেজনার অনেকটাই তখন ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে। শেরিফের অফিসের সামনে বেশ ভিড় জমেছে। রুটির কারখানার মালিক ফিলিপ চিৎকার করে বলছিল, 'হাইওয়ে দিয়ে ওদের ক্যারাভান যদি যায় যাক কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যেন না ঢোকে।'

আলোচনারত শেরিফের কানে কথাটা পৌঁছাতে তিনি মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা। বব, কেউ যদি হাইওয়ে দিয়ে কোথাও যায় তাহলে আমরা তার যাওয়া বন্ধ করতে পারি না। হাইওয়ে সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু ওরা যদি গ্রামে ঢুকতে চায় তাহলে আপত্তি জানাতে পারি। দরকার হলে আমরা কোর্টে যেতে পারি।'

ইলিংওয়ার্থকে এই গ্রামের সবচেয়ে বিষয়ী মানুষ বলা হয়। হাইওয়ের ধারে তাঁর বিশাল ফলের বাগান আছে। বৃদ্ধের কৃপণ হিসেবেও ভালো নাম। শেরিফের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কোর্ট?'

হ্যাঁ। কোর্ট থেকে আমরা ইনজাংশন আনতে পারি। আমাদের এলাকায় কেউ যেন ঢুকতে না পারে। পুলিস তো ওদের সঙ্গেই আছে। কোর্টের অর্ডার ওদের দেখালে পুলিস সেটা মানতে বাধ্য করবে। বাট, স্টিল এসব করার কোনো দরকার নেই বলে আমার বিশ্বাস। আপনারা অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন!' শেরিফ বললেন।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সর্বসম্মত একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, 'আমরা এই গ্রামের শান্তিপ্রিয় ব্রিটিশ নাগরিকরা আশঙ্কা করছি যে হিপিদের ক্যারাভানটি যদি এই গ্রামে প্রবেশ করে তাহলে আমাদের শান্তি বিপন্ন হবে। তাই মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন করছি যাতে তিনি অগ্রিম আদেশ জারি করে ওদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন।'

ইলিংওয়ার্থ বললেন, 'কিন্তু কোর্টে গেলে তো খরচ আছে। গ্রামের স্বার্থে সবাই চাঁদা দিক। একটা ফান্ড তৈরি হোক। শেরিফ প্রেসিডেন্ট, আমি ক্যাশিয়ার।'

ফিলিপ প্রতিবাদ করল, 'কেন বাবা? হাইওয়ের কাছাকাছি আমার কোনো সম্পত্তি নেই, আমি চাঁদা দিতে যাব কেন? আর চাঁদা দিলে কে ক্যাশিয়ার হবে তা ভাবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।'

ডোরম্যান ম্যাথুজ বলল, 'হিপিদের এত ভয় পাওয়ার কি আছে। ওদের চেহারা তো দেখেছি: একটা ঘুঁষি মারলে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।'

শেরিফ বললেন, 'না না। কোনো মারামারি নয়।'

ওস্কার ছোকরা বলল, 'শেরিফ। এই গ্রামের লোকগুলো কি পাগল? কোথায় রইল হিপিরা আর এখানে বসে সবাই আকাশ-পাতাল ভাবছে। ওরা একটু নোংরা বটে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ওদের আমার খুব রোমান্টিক লাগে। ঘর ছাড়া বাঁধন হারা—।'

সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিবাদ উঠল। বব বললেন, 'ওস্কার একথা বলতেই পারে। দূরে দাঁড়িয়ে অন্যের বাড়িতে আগুন লাগতে দেখে কেউ কেউ তো খুশি হয়। সে এই গ্রামের ছেলে নয়। তাই গ্রামের মানমর্যাদা সেন্টিমেন্ট সে বুঝবে কি করে!' বলতে বলতে ঘড়ি দেখলেন বব। তারপর বললেন, 'তিন মিনিট বাদেই টিভিতে খবর শুরু হবে। উই মাস্ট ওয়াচ দ্যাট।'

শেরিফের হুকুমে সেখানেই একটা সেট আনানো হলো। সবাই উন্মুখ হয়ে দেখল নিউজ বুলেটিন, 'আজ একটু আগে হিথরো এয়ারপোর্টে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে বোমা রাখার খবর আসায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বগ্রামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। হিপিরা হাইওয়ের পাশে একটি গ্রামে আশ্রয় নেওয়ায় গ্রামবাসীরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।'

বব চিৎকার করে উঠলেন, 'লুক, শুধু আমরাই নয় অন্য গ্রামের মানুষেরাও আদালতে যাচ্ছে। ওরা আগে থেকে ইনজাংশন না চেয়ে যে ভুল করেছিল আমরা তা করব কেন? কি হে ওস্কার, এখনও কি ওদের রোমান্টিক বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

ওস্কার নীরবে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। টেড বলল, 'আসলে যে এই গ্রামে জন্মায় নি, বড় হয় নি, সে কি করে বুঝবে গ্রামের সেন্টিমেন্ট!'

শেরিফ বললেন, 'ওকে! চাঁদা তোলার কোনো প্রয়োজন নেই। হাইওয়ের পাশে যার জমি অথবা ফলের বাগান আছে সে এখনই কোর্টে যাক। এ ব্যাপারে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করব। ছুটির দিন হলেও স্পেশ্যাল অর্ডার বের করতে অসুবিধে হবে না। এটা করলেই হিপিরা আর গ্রামে ঢুকতে পারবে না।'

বিকেলের মধ্যে এগারটা আবেদন জমা পড়ল আদালতে। এবং ইনজাংশন পাওয়া গেল। হাইওয়ে বরাবর প্রতিটি বাগান এবং জমি এখন আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। কোনো ব্যক্তি বা দল মালিকের বিনানুমতিতে সেখানে পা দিতে পারবেন না আগামী এক মাসের মধ্যে। মোটামুটি একটা নিশ্চিন্তভাব এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শেরিফ জানিয়ে দিয়েছেন হিপিরা যখন হাইওয়ে দিয়ে যাবে তখন গ্রামের কেউ যেন সেখানে না যায়। এর ফলে হিপিদের উপেক্ষা করা হবে। সারা বিকেল বব আর টেড যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই বললেন এই সময় যেন অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বাড়িতেই আটকে রাখা হয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত আন্তরিক ইচ্ছে হলেও সবাই বলল, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো তুমি জানো। তারা কোনো উপদেশই শুনতে চায় না। হিপিরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাই শান্তি পাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।'

রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। হিপিরা এখন এই গ্রাম থেকে মাত্র নব্বুই মাইল দূরে আছে। তার মানে ইচ্ছে করলে দুপুরের অনেক আগেই ওরা এই এলাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটা কি করবে? যেভাবে ওরা পুলিসের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে?

ঘুম না হওয়ার আর একটা কারণ লিজা। হঠাৎ কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজ ক্যাসিনোয় গিয়েছিলে?'

বব সরল মনে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'তুমি তো জুয়া খেল না তাহলে ওখানে যাওয়ার কি দরকার?'

বব হেসে ফেলেন, 'মিসেস হোমসের সঙ্গে একটু গল্প করতে ইচ্ছে হলো।'

'আমার সঙ্গে তো কথা বলতে গেলে তোমার মুখে হাসি ফোটে না।'

'এই তো হাসছি।'

'শোন বব। ডোরার সঙ্গে দেখা করবে না আলাদা।'

'কি আশ্চর্য, কথা হচ্ছিল মিসেস হোমসকে নিয়ে, এর মধ্যে ডোরা আসছে কোত্থেকে?'

'আসছে। আমি সব আগাম টের পাই।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ। আমার কবরে যাওয়ার বয়স হয়ে গেছে।'

'পুরুষমানুষের স্বভাব যা তাতে কবরে শোওয়ার পর পাশের কফিনে কোনো মেয়ে থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া বোকামি।' ধীরে ধীরে শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছিল। প্রতিবাদ করেননি বব। কোনো লাভ হত না। মেয়েরা যখন বাঁকা কথার স্রোত বইয়ে দেয় তখন তাতে যুক্তির বাঁধ দেওয়া বোকামি। কিন্তু তারপর থেকেই মন খারাপ হয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলেন আকাশের অবস্থা একটুও পাল্টায় নি। কিন্তু ওয়েদার ফোরকাস্টে বলল দুপুরের পর রোদ উঠবে। হিপিদের খবরটা আগ্রহ নিয়ে দেখলেন বব। একই অভিযোগ, আমাদের তেল নেই, খাবার নেই, টাকা নেই। কিন্তু কখন তারা বিদেয় হবে তা বলল না ওরা। বব ইলিংওয়ার্থকে ফোন করলেন, 'তুমি কি একবার বাগানটা দেখে আসবে?'

ইলিংওয়ার্থ বলল, 'আমি কাল রাত্রে ওখানে ছিলাম বব। সব ব্যবস্থা করে এসেছি। আবার লাঞ্চের পর যাব। তবে তোমার জমি আর হাইওয়ের মাঝখানে বাউন্ডারির তার একটু নিচু হয়ে গেছে দেখে এলাম।'

খবরটা শোনার পর আর দেরি করলেন না বব। লিজা ঘুমাচ্ছে এখনও। তিনি দরজা টেনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হলেন। আজও সকালে রাস্তায় লোক নেই। অনেক ঘুরে ঘুরে জমিতে পৌঁছতে হয়। বুড়ো জন ওকে দেখে এগিয়ে এলো, 'গুড মর্নিং, বব। হঠাৎ সাতসকালে, শরীর ঠিক আছে তো?'

বুড়ো জন হলো কেয়ারটেকার। অনেককালের লোক। এমন ভালমানুষ বড় একটা দেখা যায় না। বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ঠিক আছে তো জন?'

'আমি যদ্দিন না মাটিতে যাব তদ্দিন সব ঠিক থাকবে বব। কাল মিস্টার ইলিংওয়ার্থ এসেছিলেন। তাঁর কাছেই হিপিদের খবর পেলাম। ষাট বছর আগে একবার পঙ্গপালের খবর হয়েছিল। তোমরা সেইরকম ভয় পাচ্ছ দেখছি।'

'ভয় নয় জন। তুমি টিভি দেখলে বুঝতে পারতে।' বব ভেতরে ঢুকলেন। ছোট বাংলো। ফলের বাগান। আর তারপর জমি। তিনি জনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়ের সামনে পৌঁছে গেলেন। মাঝখানে খানিকটা ঢালু জমি আর একটা তারের বেড়া ব্যবধান তৈরি করেছে। এখন ফসল শেষ। তবু এখানে এলেই বুক জুড়িয়ে যায় ববের। ছেলে কিংবা নাতনী এসবের মর্ম বুঝল না। তিনি চলে গেলে এদের কি করে সামলাবে লিজা! এত সবুজ এত নরম মাটি। বব চারপাশে তাকালেন। ইলিংওয়ার্থ বলেছে সে দেখেছে তার ঝুলে পড়েছে। কিন্তু কোথাও তেমন চোখে পড়ল না। অনেক খুঁটিয়ে দেখার পর একটা জায়গায় সামান্য নীচু মনে হওয়ায় তিনি জনকে বললেন ওখানকার তারটা যেন এখনই ঠিক করে দেওয়া হয়।

জন বলল, 'হোয়াট ফর? ওখান দিয়ে কোনো জন্তু ঢুকতে পারবে না।'

'হিপিরা ঢুকতে পারে জন।'

'মাই গড। কেউ যদি ঢুকতে চায় তো তারটা টপকেও ঢুকতে পারে। জন্তুরা সেটা পারবে না। মানুষ এলে অবশ্য মামলা করতে পার।'

বব স্বীকার করলেন কথাটা। তারপর বললেন, 'তুমি এখানে একটা বোর্ড টাঙিয়ে দাও জন। বিনানুমতিতে প্রবেশ করলে শাস্তি পেতে হবে। আদালতের আদেশে সুরক্ষিত এলাকা। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না।'

জনকে ওখানে রেখে খামারবাড়িতে ফিরে এলেন বব। কাঠের দুটো ঘর আছে। একসময় লিজাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে দুতিন দিন থেকে যেতেন। এখন আর আসা হয় না। জন সব ব্যবস্থা অবশ্য ঠিকঠাক রেখেছে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন বব। শৈশবের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এবং তখনই তার মনে পড়ল ডোরার কথা। ডোরা বলেছিল আজ সকালে সে ওদের খামারবাড়িতে

আসবে। পঞ্চাশ বছর আগে এক দুপুরে ওদের সেই খামারবাড়িতে তার যৌবনের স্মৃতি রয়েছে।

লিজার কথা মনে পড়ল। ওর আপত্তির কথাও। এবং সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো। তিনি কোন অন্যায় করছেন না তবু লিজার অন্যায় আপত্তিতে যুক্তি থাকলে অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠত না। তিনি আবার গাড়িতে উঠলেন। অন্তত একবার হ্যালো বলে যাওয়া ভদ্রতা। লিজা যাই মনে করুক।

নেশাভাং করে ডোরার ভাই সম্পত্তির অনেকটাই ইলিংওয়ার্থকে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু এখনও যা আছে তা যথেষ্ট। ওদের খামারবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বব ডোরার ভাই-এর গাড়িটাকে দেখতে পেলেন। অর্থাৎ ওরা এসেছে।

পা বাড়াতেই ডোরার ভাই-এর সঙ্গে দেখা। ষাট ছুঁয়েছে কিন্তু ডোরাব চেয়েও বয়স্ক দেখাচ্ছে। তাঁকে দেখে বলল, 'গুড মর্নিং বব। তুমি এসে ভালোই হলো। আমাকে এখনই একটা কাজে যেতে হবে কিন্তু ডোরা চাইছে আর একটু থেকে যেতে। আশা করি তুমি ওকে একটা লিফ্‌ট দিতে আপত্তি করবে না।'

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে সে চলে গেল। ওর গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে গেলে বব চারপাশে তাকালেন। এদের এখানে এত পাখি আসে কোত্থেকে! তাঁর খামারেও পাখি ডাকে কিন্তু এত একসঙ্গে নয়। বব এগিয়ে গাছপালার মধ্যে দাঁড়ালেন। এদের খামারবাড়িটায় তিনটে ঘর। ওপাশে খানিকটা কৃত্রিম জঙ্গল। ওখানেই পঞ্চাশ বছর আগে—! বব নিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষের জীবনটা এত ছোট আর তার চেয়ে দ্রুত ফুরিয়ে যায়। পঞ্চাশ বছর আগের এই চামড়া দুই আঙুলে টানলেন বব। একটু টান টান হলো কিন্তু তাতে অজস্র সাদা ফাটা দাগ। ছেড়ে দিয়ে এবার আঙুল বোলালেন জায়গাটায়।

কিন্তু ডোরা কোথায়? বব চারপাশে তাকালেন। এখন রোদ নেই কিন্তু উত্তাপ বেড়েছে, বৃষ্টি খুব জলদি আসবে না। বব খামারবাড়িতে ঢুকলেন। নিচের দুটো ঘরে কেউ নেই। সেখানকার আসবাবও খুব সামান্য। জন তার বাড়ি অনেক ভালো সাজিয়েছে। ডোরা গেল কোথায়? বব কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই ডোরার গলা শুনতে পেলেন, 'কে আসছে?'

'আমি বব!'

'মাই গড! তুমি অনেকদিন বাঁচবে হে। এতক্ষণ তোমার কথা ভাবছিলাম আমি। সোজা ছাদে চলে এসো। সিঁড়িটা একটু দেখে এসো। বাঁ দিক ঘেঁষে।' ডোরার উৎসাহী গলা শুনে তিনি সিঁড়িটার দিকে তাকালেন। ডান দিকে কোন হাতল নেই অথবা ঘেঁষবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। খুব সাবধানে তিনি উঠে এলেন ছাদে। একঘরের ছাদ। তাঁর মাঝখানে একটা আরামচেয়ারে মাথায় টুপি চাপিয়ে শুয়ে রয়েছে ডোরা। ছোট প্যান্টি আর ব্রেসিয়ার ছাড়া অঙ্গে কিছু নেই। ওকে দেখে ডোরা বলল, 'সূর্য কখন উঠবে বলতে পার? এটাকে কি সামার বলে? শরীরে একটু রোদ লাগাতে এখানে এলাম। ভাই চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'যাক। তোমার গাড়িতে ফিরব আমি। বসো। দাঁড়িয়ে দেখছ কি? তুমিই বলতে পারবে, এই শরীরটাকে তো পঞ্চাশ বছর আগেও দেখেছ, এখন কি পরিবর্তন হয়েছে বল তো?' ডোরা আবার শুয়ে পড়ল মাথা হেলিয়ে।

বব তাকালেন। সত্তরের কাছাকাছি যার বয়স তার এমন শরীর থাকা সত্যি গুণের কথা। যদিও কোমরের চর্বি একটু ঝুলছে, বুকের ধার ধার ভোঁতা হয়ে স্তূপে পরিণত হয়েছে কিন্তু ডোরার পায়ের গড়ন এখনও চমৎকার। এবং কোনোমতে যে বাঁকগুলো বেঁচে আছে তাকে সময় নষ্ট করতে পারে নি। তিনি হেসে বললেন, 'ডোরা, তোমার মনে নেই।'

'ননসেন্স। সেটাও তোমার ওপেনিং ছিল, না?'

'হলেও। পঞ্চাশ বছর কম কথা নয়। নিজের মুখই মনে পড়ে না।' ববের কথা শেষ হওয়ামাত্র ডোবা উঠে একটা চাদর ছাদে বিছিয়ে দিল। তারপর ববের হাত ধরে বলল, 'আমি তোমার বুকে মাথা রেখে একটু শোব বব। একদম পবিত্র শোওয়া।'

বব বললেন, 'সেই অর্থে আমাদের তো অপবিত্র হবার কোনো ক্ষমতাও নেই।'

হঠাৎ সজোরে চড মারল ডোরা। বব এমনটা আশা করেন নি। তিনি আচমকা আঘাতটা কোনোমতে সামলালেন। গাল জ্বলছে। ডোরা তখন চিৎকার করছে, 'ইউ কাওয়ার্ড। পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি আমায় জ্বালিয়েছ।'

'আমি, আমি জ্বালিয়েছি?'

'অফকোর্স। যাকে ভালবাসি তাকে বিয়ে করব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু যখনই ওই দিনটার কথা মনে পড়ত তখনই তুমি জ্বালাতে।'

ববের শরীরে ক্রোধ এলো। তিনি দুহাতে ডোরাকে ধরেও ঠিক করতে পাবলেন না কিভাবে আঘাত করবেন। ডোরা কোনো আপত্তি করল না। হঠাৎ তার বুকে মুখ ঘষে বলল, 'তোমার লেগেছে বব?'

'হ্যাঁ।' নিজের গলা ফ্যাসফেসে শোনাল ববের।

'তুমি আমাকে মারো। আমাকে রক্তাক্ত কর। আমাকে শেষ করে দাও। এইভাবে মৃতের মতো বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার মনে সমুদ্র কিন্তু শরীরটা কেন কালাহারি হয়ে গেল বব? আমাকে বাঁচাও তুমি।' পাগলের মতো আচরণ এখন ডোরার এবং সেই মুহূর্তে ববের মনে হলো উঠে দাঁড়ানোর পর ডোরার এই লাস্যময়ী পোশাকে চেহারাটা আবও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি ধীরে ধীরে ডোরার শরীরে হাত বোলাতে লাগলেন। সেই স্পর্শে বোধহয় স্নেহ একটু বেশীমাত্রায় ছিল নইলে ছিটকে সরে যেত না ডোরা, 'লুক বব, আমি ছয় বছরের মেয়ে নই। তুমি আমায় স্নেহ করছ? আমি ফসিল হয়ে গেছি তাই অনুকম্পা দেখাচ্ছ! আই ডোন্ট মিন ইট। আর কিছু না থাক তোমার ঠোঁট দুটো তো আছে, দাঁত আছে, আমাকে শুষে নিতে পারছ না? কামড়াতে পারছ না? এগিয়ে এসো, আমি তোমাকে বলছি বব। তোমার এলিজার পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এই শরীর আছে? কাম অন—।'

আর তখন বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করে উঠল। বব চট করে বুক চেপে ধরলেন. মুখে একটু ভাঁজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে কৌটো বের করে একটা ট্যাবলেট জিভে ফেলে দিলেন। ডোরা দেখছিল ব্যাপারটা। তার গলার স্বর বদল হলো, 'তুমি কি বুকে ফিল করছ?'

বব চারপাশে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। অন্তত দশ মিনিট লাগবে ট্যাবলেটটার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। অবশ্য জিভে পড়া মাত্র আর বাড়বে না ব্যথাটা। যেন সাপের ফণা নামবার শেকড় নিয়ে চলাফেবা। ক'দিন আগেই বিবিসি একটা সাপুড়েদের ওপর তথ্যচিত্র দেখাচ্ছিল। সাপটা ফণা তুলছে কিন্তু যেই শেকড় দেখছে অমনি নুয়ে পড়ছে। আরামচেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করতে ধীরে ধীরে শরীর স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এবং তখনই তিনি ডোরার গলা পেলেন, 'বব, আই অ্যাম সরি।' তিনি চোখ খুলে দেখলেন ছাদে বসে আছে ডোরা। তার নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

'আই ডোন্ট নো। আজকাল একটু টেনশন বাড়লেই বুকের মধ্যে লোহার বল ড্রপ খায়, দম বন্ধ হয়ে আসে।' ডোরা কোনোমতে বললেন।

'ই সি জি করিয়েছ কখনও?'

'না।'

'করিয়ে ফেল। ঠিক আছে, তুমি এই ট্যাবলেটটা জিভে রাখ। ইট উইল হেল্প ইউ। কাম অন

বেবি। যে বয়সের যা। ইউ মাস্ট নট ফরগেট দ্যাট।' পরম স্নেহে বব ডোরাকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেন, 'গিলে ফেল না, লজেন্সের মতো ব্যবহার কর।'

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। খোলা আকাশের নিচে দুজনে পাশাপাশি। একজন আরাম চেয়ারে চোখ বন্ধ করে অন্যজন ছাদের ওপর বিছানো চাদরে টানটান। দুজনের শরীরে ওষুধের কাজ শুরু হয়েছে এবং শিগগির অশান্ত হৃদয় আরও জখম হওয়ার বদলে শান্ত হয়ে এলো। এই সময় অত্যন্ত ক্লান্তি লাগে। ঘুমাতে পারলে আরও ভালো হত। উঠতে একটুও ইচ্ছে করছিল না ববের। তিনি আবার চোখ বন্ধ করলেন। হাওয়া দিচ্ছে।ঈশ্বর! নিজেই জানেন এখন শুধু অন্যের জন্যে বেঁচে থাকা। কার জন্যে? কিসের জন্যে।

ঘুম ভাঙতে কিছুক্ষণ ঘোরে রইলেন বব। এ কোন্ জায়গা, সময়টা কি বুঝতে বুঝতে সময় গেল। তারপর ধড়মড় করে উঠে পাশে তাকালেন। ডোরা নেই, চারদরটাও। চট করে কবজি ঘোরালেন, লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। লিজা নিশ্চয়ই খুব খেপে গেছে এতক্ষণ। চিন্তিত না হবার কোনো কারণ নেই। তিনি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই ডোরাকে দেখতে পেলেন, 'শরীর ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' বব হাসলেন, 'তোমার?'

'সাফোকেশন এখনও যায় নি। এসো লাঞ্চ রেডি।' ডোরা ডাকল।

'লাঞ্চ? আমি তো এখানে লাঞ্চ করব না।'

'কেন? ও, লিজা বসে আছে বুঝি? আমি এতক্ষণ কষ্ট করে—!'

'ওকে। ঠিক আছে চল।'

'না, তোমাকে এখানে খেতে হবে না।' লাঞ্চের প্যাকেটগুলো আবার বন্দী করে ডোরা বলল, 'আশা কবি তুমি আমাকে একটা লিফট দেবে?'

'উইদ প্লেজার।'

খামার এলাকা ছেড়ে অনেকটা ঘুরে আসতে হয়। পথে কেউ কোনো কথা বললেন না। বাড়িব কাছাকাছি এসে ডোরা বলল, 'আমাকে এখানে নামিয়ে দিলেই চলবে।'

'আব ইউ সিওর?' বব গাড়ি থামলেন। ডোরা ওঁর দিকে তাকাল। হঠাৎ বব ওর হাত ধরলেন, 'আমাকে একটু চুমু খেতে দেবে?'

ডোরা সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, 'নো!'

'কেন?'

'আজ চুমু খেলে এটাই আমাদের জীবনের শেষ চুমু হয়ে যাবে। বাই বব।'

বাড়িতে ফিরে বব লিজার চিরকুটটি পেলেন। তিনি মিসেস আর্নল্ডের বাড়িতে গিয়েছেন। যদি বব লাঞ্চ খায় তাহলে সেটাকে তৈরিই পাবে। বুড়ি আর্নল্ডের বাড়িতে এই গ্রামের গুজব তৈরি হয়। ওখানে আজ যাওয়ার কি দরকার ছিল! বব খেয়ে নিলেন। তারপর টিভির সামনে পা ছড়িয়ে বসলেন। হিচককের ছবি দেখাচ্ছে। ছবিটা তিনি এর আগেও দেখেছেন। একটু ঝিমুনি এলো দেখতে দেখতে। বব চোখ বন্ধ করলেন। এরপর কতটা সময় গিয়েছে তিনি জানেন না। হঠাৎ হিপি শব্দটা কানে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠলেন। খবর হচ্ছে। হিপিদের কনভয়টা এগিয়ে আসছে টিভির পর্দায়। ওটা কোন্ জায়গা। রাস্তার নাম পড়তে তিনি চমকে উঠলেন। তাদের গ্রাম থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে আছে ওরা। যেখানেই ওরা থামতে চেয়েছিল সেখানকার গ্রামবাসীরা কোর্ট থেকে নেওয়া আগাম হুকুম ওদের দেখাচ্ছিল। পুলিশ সেটা পরীক্ষা করে হিপিদের গ্রামের মাটিতে পা রাখতে দিচ্ছিল না।

এখন হিপিবা আসছে।

বব এবার ওভারকোট, কোর্টের কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

শেরিফের অফিসের সামনে বেশ ভিড়।হিপিরা এসে পড়ল বলে। শেরিফ নির্দেশ দিলেন যে যার জায়গায় যেন চলে যায় কোর্টের অর্ডার নিয়ে। শেরিফ থাকবেন হাইওয়েতে। তিনি পুলিসকে সাহায্য করবেন। সঙ্গে সঙ্গে যে যার গাড়ি নিয়ে রওনা হলো জমি-বাগান-হাইওয়ের দিকে। ববের মনে হলো এটা একটা যুদ্ধের মতো ব্যাপার। এইরকম উত্তেজনাতে তাঁর বুকে কোনো যন্ত্রণা হয় না। আশ্চর্য।

দূর থেকে ওদের দেখা যাচ্ছিল। বিশাল কনভয়টা এগিয়ে আসছে। সামনে পুলিসের একটা গাড়ি। বব ঠোঁট কামড়ালেন, এটা একটু খাতিরের মতো হয়ে যাচ্ছে না? ইলিংওয়ার্থের জমির সামনে কনভয়টা দাঁড়িয়ে গেলে সে চিৎকার করতে লাগল কোর্টের অর্ডার হাতে নিয়ে, 'ট্রেসপাসার্স উইল বি,প্রসিকিউটেড বাই দা অর্ডার অফ ল।' শেরিফ এবং একজন পুলিস অফিসার পরীক্ষা করে হিপিদের লাউডস্পিকারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেই একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমরা কি পাগলা কুকুর? আমি আর পারছি না?'

'বব উত্তেজিত, এবার তাকে অর্ডার দেখাতে হবে। জন তার পাশে দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে জন বলল, 'দে নিড শেল্টার, দে মে গো টু পল'স প্লেস।' এখন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে কনভয়টা যাচ্ছে। কি নোংরা পোশাক। রুগ্ন দলাপাকানো নেশাগ্রস্ত মানুষেরা গাড়িগুলোর ওপর বসে আছে। ওরা কি বাচ্চাদের নেশা করায়? হঠাৎ কনভয়টা থেমে গেল। পুলিস আর হিপিরা কথা বলছে। টিভির ক্যামেরা চলছে পাশ থেকে। আলোচনার বিষয়টা বুঝতে পারছিলেন না বব। এই সময় জন তার টপকে এগিয়ে গেল। শেরিফ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিছু বলবে জন?'

'ওরা কি চাইছে?'

'ওরা বলছে ওদের কাছে যা তেল আছে তাতে আর মাইল পাঁচেক যেতে পারবে। পুলিসের কাছে ওরা একটা জায়গা চাইছে রাত কাটাবার। কারণ সরকারি সাহায্য কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমার গ্রামের কোনো জায়গা কোর্টের অর্ডারের বাইরে নেই, তাই না জন?'

'একটু ভুল হয়ে গেছে শেরিফ!' বিনীত গলায় বলল। 'পলের জমিটার অর্ডার আনা হয় নি। পল মারা যাওয়ার পর থেকেই তো একটা ঝগড়া চলেছে ছেলেদের মধ্যে। কেউ মালিক হতে চায় না। ওটার কথা আপনারা খেয়াল করেন নি।' জন যেন অনুযোগ করল।

লাল দাড়ির একটি হিপি জনের কথাগুলো শুনে সঙ্গে সঙ্গে .নটি মারল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। এই হাইওয়ের পাশে একটি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আদালতের হুকুম নেই। কিন্তু কোন্ জায়গাটা?

বব চিৎকার করলেন, 'হেই জন। কাম ব্যাক!'

জন ফিরে তাকাল। তারপর সুড়সুড় করে নেমে এলো হাইওয়ে থেকে। সে ভেতরে ঢোকার পর বব প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'তোমার কি দরকার ছিল ওদের খবরটা দেওয়ার। বদমাস।'

জন মাথা নাড়ল, 'ওদের তো বলিনি। শেরিফ জিজ্ঞাসা করায়—তাছাড়া, ওই মেয়েটাকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। পাঁচ বছরের বাচ্চা অথচ পায়ে মোজা নেই। ওর কি দোষ? ও যে কষ্ট পাচ্ছে ঈশ্বর কি দুঃখিত হচ্ছেন না?'

ততক্ষণে হিপিরা এসে জড়ো হয়েছে সামনের হাইওয়েতে, 'এই যে ওল্ডম্যান, সেই খালি জায়গাটা কোথায় দেখিয়ে দাও। উই উইল বি গ্রেটফুল টু ইউ। এই যে, এইদিকে তাকান, আমাদের দেখে কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না? খবরটা আর্ধেক দিলেন কেন? জমিটা কোথায়?'

ক্রমাগত এইরকম অনুরোধ হতে দেখে বব বললেন, 'জন, ভেতরে যাও, জলদি।' সেই সময় একটি হিপিনি ছুটে এলো তাদের কাছে, 'এই যে, তুমি যদি আমাদের জমিটার খবর দাও তাহলে আমি তোমার সঙ্গে শুতে রাজী আছি।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র জন দৌড়তে শুরু করল খামারবাড়ির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অশ্রাব্য শব্দগুলো ছুঁড়তে লাগল ওরা। এমন কি মেয়েটিও। বব কানে হাত দিলেন। ক্যারাভান আবার চলা শুরু করল।

কিন্তু ওরা জমিটা খুঁজে পেয়ে গেল। গ্রামের শেষপ্রান্তে পলের জমিতে কেউ কোর্টের আদেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে না থাকায ওরা ধরতে পেরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিল পিল করে নেমে এলো ওরা হাইওয়ে থেকে। গাড়িগুলো এমন করে সাজাল যাতে দেওয়াল হয়ে যায়। তারপর ত্রিপল তুলে ঘর বানালো। মুহূর্তেই পলেদের সুন্দর মাঠ আর বাগান নরক হয়ে গেল। মাঠে নামবার সময় অবশ্য পুলিস এবং শেরিফের সঙ্গে হিপিদের শেষবার ঝগড়া হয়ে গেল। যেখানে সেখানে ক্যারাভান রাখার নিয়ম নেই। তার জন্যে নির্দিষ্ট পার্কিং লট আছে। কিন্তু পুলিস আইনত একটা সময় ঠিক করে দিতে পারে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। হিপিরা স্পষ্ট বলে দিল যতক্ষণ না সরকারি সাহায্যে ওরা তেল কিনতে না পারছে ততক্ষণে ওরা এখানে থাকছে। টিভির লোকেরা এখন ছবি তুলছে। ওপর তলায় খবর পাঠিয়ে পুলিস খানিকটা দূরে অপেক্ষা করছে। হিপিরা রাত কাটাবার আয়োজনে ব্যস্ত।

যে ভয় করা হচ্ছিল তাই হলো। শেরিফ বললেন, 'এখন আর জনকে কিছু বলে লাভ নেই। বুড়ো মানুষ, মুখ ফসকে বলে ফেলেছে।'

পলেদের এক ছেলে বলল, 'কিন্তু ওরা আমাদের জমি নোংরা করে ফেলেছে এর মধ্যে। শুকনো ডালপালা ভেঙে আগুন জ্বালছে।'

বব রেগে গেলেন, 'এখন এসব বলে কি হবে? ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া কবার সময় খেয়াল ছিল না? কাল সকালে দেখবে ওখানে কিছুই পড়ে নেই।'

ইলিংওয়ার্থ বলল, 'দেখতে হবে ওরা যেন গ্রামের মধ্যে না আসে। তবে জিনিসপত্র কিনতে চাইলে প্রব্লেম হবে।'

'কিসের প্রব্লেম?' বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ কিছু বিক্রি করবে না। আজ গ্রামের সব দোকান বন্ধ করে দাও।'

ওস্কার ছোকরা বলল, 'দেখছেন ওদের পয়সা নেই আর খামোকা আপনারা ভয় পাচ্ছেন। তবে দেখতে হবে ওদের কাছে এল এস ডি আছে কিনা! আমি কোনোদিন জিনিসটা দেখিনি।'

শেরিফ বললেন, 'নো ওস্কার। কখনও ওসব করো না। তাহলে আমি কঠোর হতে বাধ্য হব। ওদের আজকের রাতটা কাটাতে দাও। পুলিস কাল সকাল ছ'টার মধ্যেই ওদের তেল দেবে। ততক্ষণ আমরা ওয়াচ রাখতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা পাহারাদার বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। ঠিক হলো হিপিদের দৃষ্টির বাইরে জঙ্গলে আড়ালে থেকে নজর রাখা হবে।

ছোট ছোট তাঁবুও পড়েছে। খোলামাঠটায় আড়াই হাজার মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মাঝে মাঝে উনুন জ্বলছে। কুৎসিত চেহারার লোকগুলো কাঁদছে। গাছের আড়ালে টেডের পাশে দাঁড়িয়ে বব দেখলেন সন্ধে হয়ে আসছে। আলো জ্বলল। অনেকটা বেদুইনদের মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। তিনটে হিপি মাটিতে বসে গাড়িতে হেলান দিয়ে ওটা কি খাচ্ছে? টেড বলল, 'গাঁজা।' মেয়েগুলোর স্বাস্থ্য এককালে ভালো ছিল।এখন সবাই টলছে। সন্ধের হাওয়া বইবার পর থেকেই ঠাণ্ডা নেমেছে। কিন্তু ওই মেয়েটাকে দ্যাখো, পাতলা একটু লুজ খাটো প্যান্ট আর নাভি অবধি

নামা শার্ট পরে চোখের তলায় রঙ বোলাচ্ছে। মেয়েটার থাই ও পায়ে বেশ ময়লা। মোজা দূরের কথা একটা হাওয়াই চটি ছাড়া পায়ে কিছু নেই। অথচ কানে বাহারি গয়না ঝুলছে। বিকট সাজ শেষ হলে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গান ধরল। গানের কথা শুনে চমকে উঠলেন বব। মেয়েটির গান ধরা মাত্র ওপাশ থেকে লিকলিকে রোগা একটা দাড়িওয়ালা হিপি চলে এল গিটার হাতে। মেয়েটা গাইছে, 'পুরুষজাতটার ওপরেই আমার ঘেন্না। পৃথিবীর সব পুরুষের শরীরের ওপর পা ফেলে আমি জীবনটা কাটিয়ে দিই। আমরা পয়দা করি আর ওরা কৃতিত্ব নেয়। আমাকে একটা পুরুষ দাও যার মুখে প্রথমবার থুতু ফেলার সুখ পাব।'

বব ফিসফিস করে বললেন, 'হরিবল্!'

টেড বলল, 'লুক বব, ওরা গাছগুলোর পেছনে প্রাকৃতিক কাজ শেষ করছে। আড়াই হাজার লোকের আবর্জনায় কাল গ্রামে থাকা যাবে না!' তারপর হেসে বলল, 'পলেরা ভালো সার পাবে অবশ্য।'

বব দেখলেন ক্যারাভানগুলোর ওপর বিচিত্র লেখা, 'আই অ্যাম কেয়ার অফ মি।' 'আই অ্যাম ট্রাভেলিং ফ্রম হেয়ার টু এটারনিটি।' 'হোম ইজ মেড ফর হোমোস।' 'জয়েন টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড।'

রাত বাড়লে এক সময় সব শান্ত হয়ে গেল। সমস্ত মাঠ, চরাচরের সঙ্গে সঙ্গে হিপিরাও ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে আগুনের কুণ্ডের পাশ থেকে অবশ্য বাচ্চাদের কান্না উঠছে। জড়ানো গলায় তাদের থামানোর চেষ্টা চলছে। কখনও কখনও কোনো পুরুষ কণ্ঠ চিৎকার করে কিছু বলল। ব্যস আর কিছু নয়। পুলিসের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে: বব আর পারছিলেন না। তিনি বললেন, 'মনে হয় এবার আমরা যেতে পারি। ওরা সকালের আগে উঠবে না।'

কিন্তু তখনই একটা ঘটনা ঘটল। ম্যাথুস দুটো ছেলেকে ধরেছে। তাদের বয়স বড়জোর সতের আঠারো। একজন কালো। চোরের মতো কখন হিপিদের আড্ডায় ঢুকে পড়েছিল। বেরুবার সময় ধরা পড়ে গেছে। ওদের কাছে পাউডার পাওয়া গেল। স্বীকার করল তিরিশ পাউন্ডে ওরা একটা হিপির কাছ থেকে তিনটে পুরিয়া কিনেছে। এর আগে কখনও নেশা করে নি, শুনেই এসেছে। কৌতূহলী হয়ে আজ এসেছিল। কালো ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়জন এখানকার স্কুল মাস্টার মিস্টার গাওয়ারের ছেলে। শেরিফ বললেন, 'এ নিয়ে জল ঘোলা করে লাভ নেই।' ওদের ছেড়ে দেওয়া হলো। পুরিয়া দুটো নষ্ট করে ফেলে স্থির করা হলো ব্যাচ বাই ব্যাচ পাহারা দেওয়া হবে। টেড বলল, 'বব, তোমার খামারবাড়িতে রাত্রে থাকা যাবে?' বব আপত্তি করলেন না। তাঁর একবার মনে হলো লিজাকে জানানো উচিত। তারপরেই স্থির করলেন কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রামের সবাই জানে তাঁরা কি করছেন।

বারোটা পর্যন্ত বব পাহারায় ছিলেন। এর মধ্যে তিনি অনেকবার অসুস্থ বোধ করলেন। তাঁর মনে হলো সেক্সকে এরা হাত ধোওয়ার চেয়ে সহজ করে ফেলেছে। হিপিনীদের তুলনায় হিপিরা সেক্স সম্পর্কে অত্যন্ত নিস্পৃহ। নিজেদের কষ্ট দিতে এদের বেশ আরাম লাগে। ডিনারে যা ওরা খেয়েছে তা কোনো মানুষ খেতে পারে বলে ধারণায় ছিল না। কিন্তু সব ব্যাপারে ওরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। সেই সাজুন্তি হিপিনি তিনজন পুরুষের সঙ্গে শোওয়ার চেষ্টা করে থুতু ছড়িয়ে এখন আগুনের পাশে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বারোটার সময় খামার-বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি টেডকে নিয়ে। জন খাবার করে রেখেছিল। তাই খেয়ে ওয়াইন নিয়ে বসে বব টেলিফোন করলেন বাড়িতে। এর মধ্যেই লিজা ঘুমিয়ে পড়েছে?

মিনিট দুয়েক পরে লিজার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো বব।'

বব বললেন, 'আজ আমি খামারবাড়িতে থেকে গেলাম ডার্লিং।'

লিজা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। জন বোকামি করে হিপিদের জায়গা বাতলে দিয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে লিজা বললেন, 'কখনও কখনও মানুষের মনে দয়ামায়া উঠে আসে, কি করবে বল।'

কথাটা খুব খারাপ লাগল ববের। তিনি বললেন, 'দে আর রিয়েল বিস্ট। তার চেয়েও অধম। একটা হিপিনী তিনটে লোকের সঙ্গে শোয়।'

লিজা বললেন, 'ওটা রুচির ব্যাপার। বার্ধক্যেও অনেকে যুবতী হতে চায়, তাই না?'

বব আবার হোঁচট খেলেন। লিজা কি ডোরার কথা বলছে? তিনি বললেন, 'যা হোক তুমি চিন্তা করো না। ও হ্যাঁ, আজ ডোরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'জানি। তোমার বুকের ব্যথাটা কেমন আছে ডার্লিং?'

এবার সত্যি ধক্ করে লাগল ববের বুকে। তিনি কোনোমতে বলতে পারলেন, 'এখন নেই, ডার্লিং, গুড নাইট।'

'গুড নাইট বব।' লিজার গলার স্বর কি শীতল!

সকাল আটটায় হিপিরা চলে গেল। সরকারি সাহায্যে তেল কিনে, কিছুটা খাবার পেয়ে ওরা আবার হাইওয়েতে উঠে গেল। শেরিফ, বব, ইলিংওয়ার্থ, টেড, ম্যাথুজ, ওস্কাররা ওদের চলে যাওয়ার পর বিষণ্ণ হয়ে পলেদের মাঠের দিকে তাকালেন। নরক হয়ে গেছে ওটা। মাঝে মাঝে পোড়া ছাই, নোংরা এমন কি মলমূত্র ছড়ানো। বব বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ওরা গ্রামে ঢোকেনি। এই গ্রামেব পবিত্রতা ওরা রাত্রে নষ্ট করে দিয়ে যেত তাহলে।'

শেরিফ বললেন, 'তবু প্রত্যেককে চেক করো, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সবাই ঠিকঠাক আছে কিনা!'

না, গ্রামের কাবো গায়ে আঁচড় পড়েনি একমাত্র গাওয়ারের ছেলেটার ঘটনা ছাড়া। ওরা দুজনেই শেরিফের কাছে গ্রামের সবার সামনে ক্ষমা চাওয়াতে ব্যাপারটা মিটেও গেল।

অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল ববের। দশটা নাগাদ বাড়িতে ফিরলেন তিনি। লিজা এখনও ঘুমাচ্ছে। টিভি খুললেন। বিবিসি হিপিদের দেখাচ্ছে। দেখাক। এখন ওদের দায় পরের গ্রামের। ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেয়ে নিলেন বব। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে লিজার ঘরে উঁকি মারলেন। লিজা নেই। সাতসকালে কোথায় গেল? হয়তো আর্নল্ডের বাড়িতে।

নিচে নেমে বব আবার টিভি খুলে পা ছড়িয়ে বসলেন। ঘুম পাচ্ছে। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। বিজ্ঞাপনের পালা শেষ হলে সেই সুন্দরী সংবাদ-পাঠিকা আবার পর্দায় এলেন, 'এখন আপনারা একটি স্পেশ্যাল ইন্টারভ্যু দেখতে পাবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে টিভির পর্দায় হাইওযের ছবি ভেসে এল। হিপিদের কনভয় চলছে। পাশের গ্রামের লোকরা তাদের জমির সামনে আদালতের আদেশ হাতে দাঁড়িয়ে। হিপিদের নেতা সেই লাল দাড়ির সঙ্গে টিভির প্রতিনিধি কথা শুরু করল। নেতা বলল, 'মনে হচ্ছে আপাতত আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আমরা দু হাজার পাঁচশো-এক জন ঠিকঠাক যেতে পারব।'

'সংখ্যাটা ঠিক আছে? একজন বাড়ল না?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। আমাদের দলে একজন এসেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যারাভানের দবজায় টিভির ক্যামেরা। আর চমকে সোজা হয়ে বসলেন বব। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। এবার বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন তিনি। কাঁপা হাতে কৌটোটা খুলে ট্যাবলেট জিভে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন বব। পর্দায় তখন ক্যারাভানের ভেতরের ছবি ফুটেছে। একটি কিশোরী হিপিনী লিজাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। একটু একটু করে হিপিনীর চেহারা

পাচ্ছেন লিজা। টি. ভি-র প্রতিনিধির প্রশ্ন ভেসে এলো 'আপনার নাম যদি অনুগ্রহ করে বলেন।'

লিজার কুঁচকে যাওয়া মুখে হাসি ফুটল, 'আমি লিজা ছিলাম। এখন কি নাম হবে জানি না।'

'আপনি কি এখন জন্মেন করলেন?'

'হ্যাঁ। রাত চারটের সময়।'

'আপনি এতকাল কি করতেন?'

'হাউসওয়াইফ ছিলাম। স্বামীর সংসার দেখেছি, তার বাচ্চাদের মানুষ করেছি, তিনি যত কষ্ট দিয়েছেন সয়েছি, যা আনন্দ দিয়েছেন তা ভোগ করেছি।'

'আপনি কখনো গ্রামের বাইরে যান নি?'

'না কখনো না। যাও বা গিয়েছি স্বামী নিয়ে গেলে তার সঙ্গে। আটচল্লিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। মেয়েদের যা হয়, ক্রীতদাসীর মতো তাঁর ইচ্ছে নিজের ইচ্ছে বলে জেনেছি।'

'তিনি কি অত্যাচার করতেন আপনার ওপর?'

'না। তিনি মানুষ হিসেবে ভালোই ছিলেন। সরাসরি কষ্ট দিতেন না।'

'গ্রামের সবাই তো হিপিদের ঘেন্না করে। তাই না?'

'করে। কিন্তু ওরা ভয় পায় বলেই করে।'

'আপনি কেন হিপিনি হলেন?'

'বললাম তো, বিয়ের পর সংসার আর স্বামী ছাড়া আর কিছুই আমাকে দেখতে দেওয়া হয় নি। এরা লিখেছে এদের গন্তব্য ফ্রম হেয়ার টু এটার্নিটি। কত ঘুরে বেড়ায় এরা। পৃথিবীটাকে দেখব বলে এদের সঙ্গে চলে এলাম।'

'আপনার স্বামী কিছু বলবেন না?'

লিজার মুখ শক্ত হলো, 'আটচল্লিশ বছরে অনেক সুখ দিয়েছি তাঁকে। আমাব আর কোনো দায় নেই তাঁর কাছে।'

'শেষ প্রশ্ন, আপনার বয়স কত?'

ফিক করে হেসে ফেললো লিজা, 'মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই জানেন না? আমি আমার স্বামীর চেয়ে চার বছরের ছোট ছিলাম।'

সেই সময় কিশোরীটি লিজার চোখের তলায় কালো রঙ বুলিয়ে দিল। কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় রঙ বসাতে বেচারার কষ্ট হচ্ছিল।

বব এক হাতে বুক ধরে অন্য হাতে আবার কৌটোটাকে খুঁজছিলেন। ক্রমশ এই ঘর, ঘরের দেওয়াল তাঁর কাছে অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছিল। শুধু তীব্র একটি চৌকো আলো সামনে জ্বলছে কিন্তু সেটা টি. ভি. কিনা এমন বোধ তার ছিল না। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তিনি বলতে চাইছিলেন, 'লিজা, আমাকে ট্যাবলেটটা খুঁজে দাও।'

পরিবর্তিত পরিস্থিতি

রিক্সায় বাড়ি ফিরছিলেন অবনীমোহন। তাঁর বাঁ দিকে বাসব বসে আছে। বাসবের শরীর ইদানীং এত ভারি হয়েছে যে এক রিক্সায় সহজভাবে বসা যাচ্ছে না। পার্টি অফিস থেকে বেরুবার সময় বাসব বলেছিল, 'দাদা, আপনি এখনও রিক্সায় যাওয়া আসা করছেন কেন? গাড়ি তো আছেই!' অবনীমোহন মাথা নেড়েছিলেন, নাহে, চল্লিশ সাল থেকে এই শহরে হেঁটে বেড়িয়েছি, শক্তি কমে এসেছে বলে রিক্সায় চড়ি কিন্তু গাড়িতে উঠলে হুস করে পৌঁছে যাব। শহরটা দেখতেই পাব না।

বাসব আর কথা বাড়ায়নি। তাঁর পাশে উঠে বসেছিল। একটু চেপে বসে জায়গা করে দিতে হয়েছে ওকে। বাসব তাঁর হাতে গড়া ছেলে। জেলার এম পি। গত নির্বাচনে প্রচুর ব্যবধানে জিতেছে সে। ছেলেটি ভাল।

এখন সকাল। অবনীমোহন দেখলেন যেতে যেতে বাসব হাত তুলে একে ওকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে সমানে। এক সময় রাস্তা ফাঁকা হলে বাসব বলল, 'দাদা, আপনি এখনও এসব ছেঁদো কেস নিয়ে কেন মাথা ঘামান?'

'ছেঁদো কেস?'

'ওই যে সুলতা না কি নাম মেয়েটার!'

'এটা ছেঁদো কেস নয় বাসব। শহরটাকে তো জানো। মানুষ এমন একটা ইস্যু পেলে সমালোচনা করতে ছাড়বে না। হয়তো এই একটা ঘটনাই অনেককে বিরূপ করে তুলবে।'

'সোমনাথরা তো ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করতে চাইছে, কেউ জানতেও পারবে না।'

অবনীমোহনের চোয়াল শক্ত হল, 'কেসটা কে নিয়ে এসেছে? কল্যাণ। তাই না। সে আমাদের ছেলে। কল্যাণ মনে করছে সুলতার ওপর অবিচার করা হয়েছে। আর সেটা যে করা হয়েছে তাতে তো কোন প্রশ্ন নেই।'

বাসব হাঁটুর ওপর ডান হাত রেখেছিল। সেটা তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে নেড়ে হাসল। রিক্সা বেরিয়ে গেলে বাসব হাত নামিয়ে বলল,'কিন্তু আমরা সতীদিকে বিপদে ফেলতে পারি না। গত পাঁচ বছরে ভদ্রমহিলা দলের জন্যে যা করেছেন তার কোন তুলনা নেই।'

'তুমি আমাকে আপোস করতে বলছ বাসব?

'দেখুন, এখন কিছুই করা যাবে না। মেয়েটি ইতিমধ্যে পাঁচ মাসের প্রেগন্যান্ট। ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল। সতীদির ভাই কলেজে পড়ে। ওকে আমরা বাধ্য করতে পারি না একটা মেইড সার্ভেন্টকে বিয়ে করতে। দুটো লোক, একটা ফ্যামিলির জীবন তাতে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু একটা ছেলে অতবড় অন্যায় করে শাস্তি পাবে না?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। শাস্তি দিতে গেলে পুলিস কেস করাতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের দলের একজন নেত্রীর ভাই এই করেছে। এখন এমন প্রচার আমরা করতে দিতে পারি না। সোমনাথ বলছে সতীদি আগে যা বলেছেন বা করেছেন তা ভুলে গিয়ে সুলতার পুনর্বাসনের জন্যে হাজার টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। সুলতাও এতে রাজী হয়েছে। কল্যাণের সঙ্গে সোমনাথরা কথা বলবে। আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না।' কথা শেষ করে বাসব আবার একজনকে হাত নাড়ল। রিক্সাওয়ালা খুব যত্ন নিয়ে চালাচ্ছিল। সে জানে এই

জেলার সবচেয়ে দামী দুটি মানুষ এখন তার সওয়ার। অবনীমোহনের বাড়ির সামনে পৌঁছে সে সসম্ভ্রমে নেমে দাঁড়াল। অবনীমোহন পকেট থেকে টাকা বের করছিলেন, রিক্সাওয়ালা জোরে মাথা দোলাতে লাগল, 'না স্যার, দিতে হবে না। আমি নিতে পারব না।'

'স্যার! তুই আমাকে স্যার বলছিস। ওহে বাসব, একি বলছে শোন।'

'স্যার! কথাটা আজকাল সবাই শিখে গেছে দাদা।'

'নাহে। আজ তুমি সঙ্গে আছ বলে ওর মুখে স্যার বেরিয়েছে। টাকাটা ধর, আমি বিনি পয়সায় কাউকে খাটাই না। ধর বলছি।' শেষ শব্দ দুটোয় এতটা জোর ছিল যে রিক্সাওয়ালা আর আপত্তি করতে পারল না।

গেট খুলে বাড়ির দিকে যেতে যেতে বাসব বলল, 'দাদা, এই আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করি। তবে আপনাদের মত মানুষ খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না। বাড়ির বাঁ দিকের ঘরটি তাঁর। বসা পড়া এবং শোওয়ার। বাড়িটি পৈত্রিক, বাকি অংশে তাঁর ভাই-এরা থাকেন। অকৃতদার অবনীমোহনের একটি ঘরই যথেষ্ট। বেতের চেয়ারে বসতে দিয়ে তিনি বাসবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু চা খাবে?'

বাসব রুমালে মুখ মুছল, 'আবার ওদের খাটাবেন?'

'বউমা এটাকে খাটনি বলে মনে করেন না। তাছাড়া এখন তো বাড়িতে অনেক মেয়ে। ভাইপোর বউ, তাদের মেয়ে এবার ক্লাশ টেনে উঠল। দাঁড়াও, বলে দিই ওদের।'

অবনীমোহন ভেতরে চলে গেলেন। বাসব চারপাশে তাকাল। এই ঘরে সে গত কুড়ি বছর ধরে আসছে। একটুও পরিবর্তন হয়নি কোথাও। তক্তাপোশ, বেতের চেয়ার, আলনা, কুঁজো গ্লাস এবং বই-এর তাক একই রকম রয়ে গেছে। সারাজীবন মাস্টারি করেছেন অবনীমোহন। জেলে গিয়েছেন অনেকবার। এখন তিনি সরকারিভাবে এই জেলার পার্টির সভাপতি। তিনি থাকায় দলের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে সম্ভ্রম এসেছে। অথচ অবনীমোহনের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। আজ যাঁরা মন্ত্রী তাঁদের অনেকেই ওঁর পরে দলে এসেছেন। প্রবীণ যাঁরা তাঁরা মনে করেন অবনীমোহন ইচ্ছে করেই জেলার বাইরে যেতে চাননি।

বাসব বইগুলোর দিকে তাকাল। অবনীমোহন এদের বন্ধু বলেন। এক সময় সে এখান থেকে অনেক বই নিয়ে গিয়েছে পড়ার জন্যে। কিন্তু বই-এর তত্ত্ব এবং জীবনের সত্য যখন মুখোমুখি হল তখন তাকে জীবনকেই বেছে নিতে হয়েছে। অবনীমোহন এখনও তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বলা যায় তাঁর বাস এখনও ওই বই-এর লাইনে লাইনে। ফলে অবনীমোহন দলের মূলস্রোতের সঙ্গে ঠিকঠাক গা ভাসাতে পারছেন না। সোমনাথরা এই কথাই তাকে বলছিল। জেলা থেকে নির্বাচিত এম পি বলে তার নিজস্ব কিছু ক্ষমতা আছেই। কিন্তু দলের প্রশাসনিক ব্যাপারে সে মাথা ঘামায় না। আজ যখন অবনীমোহন বললেন তার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে চান তখন বাসব আপত্তি করেনি। মনে হয়েছিল। এই সুযোগে গুরুকে একটু বাস্তবমুখী করা যেতে পারে। সুলতার কেসটা নিয়ে উনি খুবই অখুশি। সতী দত্ত অধ্যাপিকা। কল্যাণই তাঁকে দলে এনেছিল। তারপর ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। এখন দলের মহিলা শাখার নেতৃত্ব ওঁর হাতে। সেই সতী দত্তের বাড়িতে সুলতা চাকরি করত। কল্যাণের অভিযোগ অসহায় মেয়েটিকে সতী দত্তের ভাই-এর কারণে গর্ভবতী হতে হয়েছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে সতী দত্ত সুলতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েটির কোন আত্মীয়স্বজন দায়িত্ব নিতে চায়নি। মা বাবা নেই। কিন্তু সুলতা কি করে কল্যাণের কাছে পৌঁছালো সেটাই বিস্ময়ের। আর তারপর থেকে কল্যাণ ওকে সাহায্য করার জন্যে চাপ দিচ্ছে। তবু কল্যাণ দলের ছেলে। যদি বিপক্ষের কেউ খবরটা জানত তা হলে বিপাকে পড়তে হত। সতীকে দলের জন্যেই দরকার। অবনীমোহন যেটা চাইছেন সেটা ন্যায়সঙ্গত। এই ন্যায়বোধের কথা বই-এর পাতায় লেখা

থাকে। জীবন আরও ব্যাপক। সেখানে যে সত্যিটা জন্ম নেয় তা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। তাই সতীর দেওয়া হাজার টাকা সুলতাকে অখুশি করেনি। সে চলে গিয়েছে শহরের বাইরে।

অবনীমোহন এলেন। পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন। তক্তাপোশে বসে হাসলেন, 'তোমাকে যে কারণে নিয়ে এলাম, বাসব, আমি এবার বিশ্রাম চাই।'

'বিশ্রাম? মানে?' বাসব চমকে উঠল।

'আমার বয়স ঢের হল। শরীরও ঠিক নেই। আগের মত খাটাখাটনি করতে পারি না। তার ওপর যেটা সত্যি তা হল, এখনকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না। নিজের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতে হয়। তুমি আমাকে দাদা বলে মনে করেছ চিরকাল, আমার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।' অবনীমোহন শান্ত গলায় বললেন।

দ্রুত মাথা নাড়ল বাসব, 'অসম্ভব। এখন আপনাকে ছাড়া যাবে না।'

'কেন? যা কিছু সিদ্ধান্ত তা তো তোমরাই নিচ্ছ।'

'এটা আপনার অভিমানের কথা। আপনাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুই করিনি।'

'আমি সম্মতি দিয়েছি। না দিলে কাজ আটকে যেত, তাই।'

'দাদা, আপনি যেভাবে বলছেন তাতে যে কেউ মনে করবে আপনাকে আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সুলতার কেসটা নিয়ে আপনি একটু বেশী ভাবছেন?'

'সুলতা একা নয় বাসব। হাসপাতালে আন্দোলনের নামে যা করা হয়েছিল আমি তার বিরোধী ছিলাম। চাবাগান অঞ্চলে দলের ছেলেটির পার্টির চাঁদার রসিদবই বিলিয়ে দিয়ে কোন হিসেব না চাওয়া আমি মানতে পারিনি। বাসব, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, নিজেকে কি বোঝাব?' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন, 'আমরা ক্রমশ বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির শিকার হয়ে যাচ্ছি।'

বাসব হাসল, 'আপনি সোনার পাথরবাটি চাইছেন। এই সংবিধান মানবার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। নির্বাচনে আর কোন গরীবদের দল জিততে পারে না। কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। বিশাল মেশিনারি লাগে। বুর্জোয়াদের লালনে যে দল লড়ছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে সমপর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যেতে হয়, অন্তত অর্থবল এবং লোকবলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আমরা আমাদের পথে অবশ্যই চলব। কিন্তু কিছু ফাঁক তো থেকেই যায়। দাদা, আমরা যতদিন বিরোধী দল হিসেবে কাজ করেছি ততদিন আপনার ওই বইগুলো তত্ত্ব আমাদের কাজে লেগেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সরকার বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পথে চলতে পেরেছিলাম। কিন্তু সরকার চালাতে গিয়ে অনেকসময় আমাদের হয়তো আদর্শচ্যুত হতে হচ্ছে। তবে এখানেও প্রশ্ন, আদর্শ কোনটা সেটা শালগ্রাম শিলা হতে পারে না। এক পয়সা ট্রামবাস ভাড়া যখন বাড়ানো হয়েছিল তখন আমরা আন্দোলনে জনসাধারণকে সঙ্গে পেয়েছিলাম। কিন্তু তিরিশ বছর পরে সরকার চালাতে গিয়ে খরচের বহরে যখন নাভিশ্বাস উঠছে তখন নিজেরাই ভাড়া বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতিপক্ষ যে আন্দোলন শুরু করেছে তাকে অগণতান্ত্রিক বলতে বাধ্য হচ্ছি। এছাড়া কোন উপায় নেই। আর এই সব করেই আমাদের সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করতে হবে। এই অবস্থায় আপনি সরে দাঁড়ালে জনসাধারণ আমাদের সন্দেহ করবে। শাসন যার হাতে তাকে তো সাধারণ মানুষ বন্ধু বলে মনে করে না। আমরা যতই বলি জনসাধারণের বন্ধু আমরা, তবু তারা দূরত্ব রাখবেই। এ অবস্থায় আপনার চলে যাওয়া মানে ওদের ভাবনাকে আরও মজবুত করা।' বাসব কথা শেষ করা মাত্র একটি কিশোরী দু কাপ চা নিয়ে এল। বাসব তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে নন্দিনী না, কত বড় হয়ে গেছিস?'

নন্দিনী চায়ের কাপ দিয়ে বলল, 'আজকাল তো আপনি আসেনই না।'

'হ্যাঁরে, সময় পাই না। দিল্লি আর কলকাতা করতে করতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না।' চায়ে

চুমুক দিল বাসব। নন্দিনী দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

কোন ক্লাশ এবার?'

'টেন। আসছি।' নন্দিনী চলে গেল।

চা খেয়ে বাসব বলল, 'দাদা, আপনি নেক্সট ইলেকশন পর্যন্ত চুপ করে থাকুন। এমনিতেই হঠাৎ হাওয়াটা একটু গরম হয়ে উঠেছে। এসব কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না।'

'না। আমার মনে হয়েছিল তুমি শিক্ষিত ছেলে, পড়াশুনা করেছ, তুমি বুঝবে।'

বাসব উঠে দাঁড়াল, 'আপনি তো জনসাধারণকে চেনেন। কোন কোন নেতার একটু বেহিসাবী কথায় তারা খেপে উঠেছে। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ এত বিশৃঙ্খল যে তাদের শান্ত করতে বেশী সময় লাগবে না। শেক্সপীয়ার সাহেব তো জনতার চরিত্র বলেই গিয়েছেন।'

অবনীমোহন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন বাসবকে, 'ওইটেই বোধহয় ভুল হচ্ছে বাসব।ঢেউ-এর ধাক্কায় কণা কণা বালি কখন যে নিজেরাই জড়ো হয়ে একটা বিরাট চর হয়ে যায় তাই আগে ঠাওর করা যায় না। বিরোধ যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন নেতৃত্ব আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায়। আমরা এটাই বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব।'

বাসব মাথা নাড়ল। রাস্তায় পা দিয়ে সে পেছন ফিরে তাকাল। অবনীমোহন এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষটি সত্যি ভাল। তার আজকের যা কিছু উন্নতি সব ওই একটি লোকের জন্যে। না, অবনীমোহনকে এখন কিছুতেই ছাড়া যেতে পারে না। কিছুদিন আগে সুধাময় চৌধুরী কলকাতার পার্টি অফিসে বসে বলেছিলেন, 'বাসব, অবনীর মত একজন আমাদের দলে আছে এটা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে। ও জেলা থেকে বেরিয়ে এলে দেশের অনেক বেশী উপকার হত।' পুরোনদিনের লোক যাঁরা তাদের এমনই ধারণা ওঁর সম্পর্কে। চারপাশে তাকিয়ে বাসব একটিমাত্র রিক্সাওয়ালাকে দেখতে পেল। তাকে দাঁড়াতে দেখেই সে রিক্সা নিয়ে এগিয়ে আসছে, 'চলুন স্যার।' সঙ্গে সঙ্গে বাসবের মনে পড়ল এই লোকটাই তাদের নিয়ে এসেছিল। সে হেসে বলল, 'তুমি এখনও এখানে? এর মধ্যে ভাড়া পাওনি?'

'পেয়েছি স্যার। নিইনি। আপনি তো ফিরে যাবেন।'

রিক্সায় উঠে বসল বাসব। তার ভাল লাগল। একেবারে, যাকে বলে রুট লেভেলে সে চলে গিয়েছে। একজন রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত তাকে খাতির করছে। কিন্তু ও কি চায়? এখন জেলায় এলেই যারা ভিড় করে তারা কিছু না কিছু চায়। লোকগুলো যখন বোঝে বিধানসভা বা কলকাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, লোকসভা বা দিল্লিতেই তার কাজকর্ম তখন খুব হতাশ হয় সবাই। একমাত্র বড় ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ তাই বিব্রত করতে পারে না তাকে। এম. পি হয়ে খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে সে। মুখ ফিরিয়ে সে শেষবার তাকাল, অবনীমোহন দাঁড়িয়ে আছেন।

অবনীমোহন শূন্য রাজপথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাসব যা বলে গেল তার সবটাই ওর দিক থেকে সত্যি। বিরুদ্ধ ভাবনাটা তাঁর মনে আজই প্রথম এল না। দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধীরে ধীরে এমন দানা বাঁধছিল। নিজেকে বুঝিয়েছিলেন মতে মিলছে না বলে সরে দাঁড়ালে কাজের কাজ তো কিছুই হবে না। ক্ষমতাহীন অবস্থায় ঘরে বসে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারবেন না। তবু জেলার সর্বোচ্চ পদে থেকে তিনি কিছুটা কাজ নিজের মত করে করতে পারছেন। ভেবেছিলেন বাসব তাঁর কথা বুঝতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে বুঝেও বাসব তাকে মানিয়ে চলার নীতি নিতে বলছে। কিন্তু একটা মানুষ কতখানি মেনে নিতে পারে? গ্রামের প্রায় সবগুলো পঞ্চায়েত এখন তাঁদের দখলে। যদিও পঞ্চায়েতের সদস্যরা কিছু চামচে নিয়ে গ্রাম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে। এখন নির্বাচনে জিততে জনসাধারণের দেওয়া ব্যালটের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাই পরবর্তী নির্বাচনেও ওরা

জিতবে। কিন্তু আগুন একদিন জ্বলবেই। পার্টি ফান্ডে হাজার টাকা চাঁদা না দিতে পারার অপরাধে এক সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারের চাষবাস বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ তার জমিতে চাষ করতে যেতে পারবে না। যারা চাষ করত তাদের দিয়ে বেশী মজুরি দাবী করানো হল। পরিবারটি এক বছর চাষ বন্ধ রাখল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় বাধ্য হল হাজার টাকার চাঁদা দিতে। এই বাধ্য হওয়া মানুষগুলোর বুকে আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি করে। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কখনই ও গ্রামের শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি অত টাকা চাঁদা আদায় করতে। অথচ তারা করছে। এসব খবর জানা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। থানা তো এখন অতিরিক্ত রকমের তাঁবেদার। এই আধা-ফ্যাসিস্ত ক্রিয়াকলাপ বেশীদিন চলতে পারে না। কিন্তু একথাও ঠিক, পদত্যাগ করলে তিনি কোন সুরাহা করার সুযোগই পাবেন না।

অবনীমোহন দেখলেন শূন্য রাজপথে একটি রিক্সা আসছে। রিক্সার সওয়ারি এই শেষ-সকালেই মাথায় ছাউনি ফেলেছে। রিক্সাটি অবনীমোহনের বাড়ির সামনে এসে থামল। রিক্সাওয়ালা সওয়ারিকে বাড়িটা দেখিয়ে কিছু বলতেই লোকটা ভাড়া মেটাল। তারপর একটা কাঁধে ঝোলানো বড় ব্যাগ নিয়ে নেমে দাঁড়াল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অবনীমোহন লোকটাকে দেখলেন। বছর তিরিশেক বয়স। ভাঙা গাল। কাঁধ অবধি চুল। চেক সার্ট আর বিবর্ণ জিনসের প্যান্ট পরে কাঁধে ব্যাগ ফেলে এগিয়ে আসছে। প্রায় মুখোমুখি হতেই লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'অবনীমোহনবাবু আছেন?'

'আমিই অবনীমোহন।'

'অ। ভেতরে চলুন, কথা আছে।'

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'কলকাতা থেকে। চলুন ভেতরে বসে কথা বলব।'

লোকটার বলার ভঙ্গীতে যে ঔদ্ধত্য রয়েছে সেটা অবনীমোহনকে বিরক্ত করল। অশিক্ষা থেকেই মানুষ এই ভঙ্গীতে কথা বলতে পারে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনার কি দরকার তা এখানে দাঁড়িয়ে বলতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

লোকটা চারপাশে তাকাল, 'পাবলিক শুনুক আমি চাই না। হোলনাইট জার্নি করে এসেছি। হেভি টায়ার্ড। বসেই কথা বলতে চাই।'

অতএব অবনীমোহন ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। নিজে তক্তাপোশে বসে লোকটাকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। লোকটা তাঁর ঘরের চেহারা দেখছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো জেলা কমিটির চেয়ারম্যান?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'কতদিন হয়েছেন?'

'আগাগোড়া।'

'যাঃ শালা!'

'মানে?'

'এ্যাদ্দিনেও বাড়িঘরের চেহারা পাল্টাতে পারেননি?'

'কি চান আপনি?' চোয়াল শক্ত হল অবনীমোহনের।

বুক পকেটে রাখা একটা ভাঁজ করা খাম বের করে অবনীমোহনের দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। খামটা নিয়ে মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন তিনি। সত্যর চিঠি। অত্যন্ত ক্ষমতাবান মন্ত্রী। বছর কুড়ি হল পার্টিতে এসেছে। কয়েকবার জেলায় এসেছে। তাঁকে খুব দাদা দাদা করে। সম্ভবত প্রবীণ নেতাদের মুখে তাঁর কথা শুনেছে। সেই সত্য চিঠি লিখেছে।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু। পত্রবাহক শ্রীমান বলাই গুপ্ত আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সে দলের

সদস্য না হলেও সক্রিয় কর্মী। আজ যখন বিরুদ্ধপক্ষের মদত দিতে কিছু বুর্জোয়া কাগজ আমাদের পেছনে লেগেছে তখন আমাদের সংগ্রামে নামতেই হচ্ছে। যাহোক শ্রীমান বলাই-এর নামে কয়েকটি মিথ্যে এফ. আই. আর করা হয়েছে। মিথ্যে বলেই পুলিস নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু খবরের কাগজগুলো প্রতিদিন এমন চাপ দিচ্ছে যে পুলিসকে আর নিষ্ক্রিয় রাখা যাচ্ছে না। তাই ওকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম। অন্তত মাসখানেক আপনি ওর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আপনার কাছে ওকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। দলের জন্যে আপনার অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। শ্রীমানকে আশ্রয় দেওয়া দলের প্রতি কর্তব্য বলে মনে করলে বাধিত হব। ওর সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার কথা চিন্তা করছি। নমস্কার সহ আপনার সত্য দত্ত।'

অবনীমোহন চিঠিটি শেষ করে বলাই গুপ্তের দিকে তাকালেন। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কলকাতা থেকে কিসে এলেন?'

'রকেটে। কৃষ্ণনগর থেকে উঠেছি।'

'কেন?'

'সত্যদা বললেন, বুলু চান্স নিও না। এসপ্ল্যানেডে গেলে পাবলিক চিনে ফেলতে পারে। তাই প্রাইভেট কারে কৃষ্ণনগরে পাঠালেন। ওখানে রকেট এসে থামতেই উঠে পড়লাম।'

অবনীমোহনের মনে হল এই লোকটিকে নিছকই মাস্তান বলা যায়। পেশীশক্তির প্রয়োজন আপনা থেকেই হচ্ছে। অথবা পেশীশক্তি যাদের আছে তারা নিজেদের প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দলের ছায়ায় আসছে। এখন সেই অর্থে তত্ত্বসর্বস্ব রাজনৈতিক দল প্রায় সোনার পাথর বাটির মত ব্যাপার। অবনীমোহনকে মানতে হয়েছে। আটচল্লিশ সালের অবনীমোহনের সঙ্গে সাতষট্টির অবনীমোহনের যেমন অনেক অমিল ছিল, নব্বুইতে এসে তিনি প্রচুর পাল্টেছেন। এসব সত্যি. কিন্তু এই শহরে তথাকথিত পেশীশক্তি নিয়ে যারা ঘোরাফেরা করে তাদেরও একটা পারিবারিক দিক আছে। শেকড়ছাড়া কেউ নয়। আর তারা অবনীমোহনের সামনে এলে মাথা নিচু করে কথা বলে। অবশ্য সামনে আসার অস্বস্তি থেকে দূরে থাকতেই তারা পছন্দ করে।

অবনীমোহন বললেন, 'আপনি একটু বসুন। আমার কিছু জানার আছে।'

বলাই হাত নাড়ল, 'আমি তো মাসখানেক এখানে থাকব। পরে জানলে ক্ষতি আছে? আমার এখনই ল্যাট্রিনে যাওয়া দরকার। হোল নাইট জার্নি করেছি।'

অবনীমোহন উঠলেন। তাঁর ঘরের লাগোয়া একটি স্নানঘর এবং পায়খানা আছে। ব্যবস্থাটা অনেকদিনের। বাড়ির লোকজনকে বিব্রত না করতেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। একসময় তাঁর ঘরেই প্রচুর সভা হয়েছে। অনেক মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকত। সে সময় ওই ব্যবস্থা করা। বলাইকে ইশারায় তিনি ভেতরে নিয়ে এলেন। এক চিলতে উঠোন। উঠোনের পরেই মূল বাড়ি। সেদিকে না গিয়ে তিনি বলাইকে নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

বলাই বলল. 'আমার ব্যাগ বাইরে পড়ে রইল কিন্তু—।'

'এখানে কোন চুরি চামারির ভয় নেই।'

'ওর ভেতরে মাল আছে। একটু নজর রাখবেন।' বলাই ঢুকে গেল। অবনীমোহন ফিরে এলেন বাইরের ঘরে। তক্তাপোশে বসে সত্যর চিঠিটা অবার পড়লেন।

সব কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছিল অবনীমোহনের। জীবনে তাঁকে দুবার আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে হয়েছিল। পার্টিকে যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল আর জরুরী ব্যবস্থা জারি হবার সময়। সেটা ছিল পুলিশের নজর থেকে দূরে সরে থাকা, সাধারণ মানুষের সাহায্য পেয়েছিলেন অনেক। একটা সততাবোধ সেইসময় তাঁদের অনুপ্রাণিত করত।

পায়ের শব্দে অবনীমোহন চোখ খুললেন। নন্দিনী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, 'কে এসেছে দাদু?'

'কলকাতা থেকে একজনকে পাঠানো হয়েছে।'

'কেন?'

'ও এখানে কিছুদিন থাকবে। তুমি ভেতরে যাও।'

'মা জিজ্ঞাসা করল তোমার জলখাবার এখন দেবে কিনা?'

মাথা নাড়লেন অবনীমোহন, 'না, এখন খাব না। তুমি বরং ভেতরে যাও।'

'কেন?'

অবনীমোহন কি জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। বলাই-এর সামনে নন্দিনী থাকুক তিনি পছন্দ করছেন না, এ-কথাটা কিভাবে বলবেন, নাতনির হাত ধরে তিনি বললেন, 'আমবা এখন কিছু জরুরী কথা বলব তো, তাই তোমাকে ভেতরে যেতে বলছি।'

'ও, তাই বল। লোকটার নাম কি দাদু?'

'বলাই।'

নন্দিনী হেসে উঠল, 'ওর চুলগুলো দেখেছ? অমিতাভ বচ্চনের নকল করা।'

'তুমি কি করে দেখলে?'

'বাঃ। আমি তো ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'বুঝলাম। এবার যাও।'

নন্দিনী যখন চলে যাচ্ছে সেইসময় বলাই ঢুকল। জামাপ্যান্ট পাল্টানোর চেষ্টা করে নি কিন্তু একটু পরিচ্ছন্ন হয়েছে। চলে যাওয়া নন্দিনীর দিকে সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অবনীমোহনেব এটা পছন্দ হল না।

চেয়ারে বসে বলাই বলল, 'আঃ, এবার আরাম লাগছে। কিষাণগঞ্জের কাছে রাস্তা যা খারাপ ছিল, কি বলব আপনাকে।'

'আপনার ব্যাগে কি আছে?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কি আছে মানে?'

'বাথরুমে ঢোকার সময় বলছিলেন!'

'অ। রিভলভার!'

'আপনি রিভলভার নিয়ে ঘুরছেন? লাইসেন্স আছে?'

এবার শব্দ করে হাসল বলাই, 'আপনি কোন জগতে বাস করেন বলুন তো? এই শহরে যারা অ্যাকশন করে তারা কি লাইসেন্স নিয়ে রিভলভার চালায়?'

'এখানে ওসবের প্রয়োজন হয় না।'

'তাই নাকি? প্রথম শুনলাম। আমি কোন ঘরে থাকব?'

'কোন ঘর মানে?'

'বাঃ, সত্যদা বলেছেন আপনি থাকার ব্যবস্থা করবেন।'

অবনীমোহন উঠে দাঁড়ালেন। মনে মনে বললেন, অসম্ভব। এবাড়িতে কিছুতেই নয়। এই মুহূর্তে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু সত্যর অনুরোধ তিনি ঠেলতেও পারছেন না। লোকটাকে অনেক দূরে কোথাও পাঠানো দরকার যেখানে গিয়ে ওকে একদম একা থাকতে হবে। হঠাৎই তাঁর মনে পড়ল সেই ফরেস্ট বাংলোটার কথা। প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলে বাংলোটা রয়েছে যেখানে কোন ট্যুরিস্ট যায় না। ডি এফ ও-র সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং তার আগে থানাতে যেতে হবে। এই একমাস বলাইকে যেন কেউ বিরক্ত না করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

অবনীমোহন বললেন, 'দেরি করে লাভ নেই। চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আপনার একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। আমার এখানে সেটা সম্ভব নয়। সারাদিন প্রচুর লোক আসেন। একটা ফরেস্ট বাংলোয় ব্যবস্থা করছি। ওখানে চৌকিদার আছে, সেই রান্না করে দেবে। মাসখানেক জঙ্গলের বাইরে আসবেন না।'

'বাঃ। ওরকম জায়গায় একা থাকলে পুলিশ সবচেয়ে আগে টের পাবে।'

'টের যাতে না পায় তার ব্যবস্থা করছি। চলুন।'

আদ্দেকের চেয়ে কম বয়সের লোকটাকে অবনীমোহনের তুমি বলতে ইচ্ছে করছিল না। আর মজার ব্যাপার, বলাই তাঁকে একবারও অনুরোধ করেনি তুমি বলতে। এতে স্বস্তি পাচ্ছেন তিনি।

নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁর পাশে রিক্সায় বসে বলাই জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূরে?'

'বাসে ঘণ্টা দুয়েক লাগে।'

'আমার কাছে বেশী মালকড়ি নেই।'

'ঠিক আছে।' বলতেই মাল শব্দটা থেকেই রিভলভারের কথা মনে হল। অবনীমোহন বললেন, 'আমরা প্রথমে থানায় যাব।'

'থানা? থানা কেন?' চমকে উঠল বলাই।

'আপনার নিরাপত্তার জন্যে।'

'আপনার মতলবটা কি বলুন তো?'

'সত্য আপনাকে পাঠিয়েছে। তাই ওর অনুরোধ রাখছি। একটা কথা, আপনার রিভলভারটা আমাকে দিন। পুলিশের চরিত্র আমি বুঝি না। ওরা কিছু করবে না তবু থানার ভেতরে আপনার কাছে রিভলভার না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'পুলিশের নজর এড়াতে এতদূরে এলাম আবার আমাকেই কেন থানায় নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। দু-নম্বরী কিছু করতে চাইলে সত্যদা কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না, মনে রাখবেন।' প্রায় শাসানোর ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেও ব্যাগ খুলে হাতের আড়ালে রেখে রিভলভারটা বের করে অবনীমোহনকে দিল বলাই। অবনীমোহন জীবনে প্রথমবার রিভলভার ধরলেন। কাঁপা হাতে পকেটে রেখে দিলেন তিনি। বলাই বলল, 'সাবধানে রাখবেন। লোড্ করা আছে।'

থানার গেট পেরিয়ে রিক্সাটা থামতেই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন অবনীমোহন। তাকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাতজোড় করে বেরিয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য। আমাকেই তো ডেকে পাঠাতে পারতেন। আসুন।'

দারোগার ঘরে বসে অবনীমোহন দেখলেন বলাই খুব শক্ত হয়ে বসে আছে। খুব ভয় পাওয়া একটা মানুষের চেহারা এরকম হয়। অবনীমোহন হাসলেন, 'আমাকে একটু টেলিফোনে ডি এফ ও-কে ধরিয়ে দেবেন?'

দারোগা বললেন, 'নিশ্চয়ই। একটু আগে ডি এফ ও বাংলোয় ফিরে গেলেন। দাঁড়ান, দেখছি।' রিসিভার তুলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তিনি।

অবনীমোহন বললেন, 'কেমন আছেন ডি এফ ও সাহেব?

'আর বলবেন না, বয়স হচ্ছে এবার টের পাচ্ছি।'

'একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

মিনিটখানেকও লাগল না। ডি এফ ও খুশী হয়ে অনুমতি দিলেন। তিনি এখনই ওই ফরেস্ট এলাকার অধস্তন কর্মচারীদের জানিয়ে দিচ্ছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। টেলিফোন রেখে অবনীমোহন বললেন, 'এই ভদ্রলোকের খুব খিদে পেয়েছে। কিছু আনানো যাবে?'

দারোগা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই। কি আনাবো? কচুরি তরকারি ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যাবে না এখন। তাই আনাই? আপনি খাবেন তো স্যার? খাবেন না? চা? আই কে

আছ? গোটা ছয়েক কচুরি আর তিন কাপ চা নিয়ে এসো জলদি।'

একজন পুলিশ আদেশ পালন করতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দারোগা এবার হাত কচলালো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কোন অন্যায় হয়ে যায়নি তো? মানে নিজে এখানে এলেন?'

'না, না। আমি এসেছি এঁর জন্যে। আচ্ছা, এঁকে কি আপনি চিনতে পারছেন?'

দারোগা বলাই-এর দিকে তাকালেন। অবনীমোহন দেখলেন বলাই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দারোগা কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নেড়ে না বললেন। অবনীমোহন হাসলেন, 'একটু আগে যে ফরেস্ট বাংলোটার কথা ডি এফ ওকে বললাম সেখানে ইনি মাসখানেক থাকবেন। আমাদের কলকাতার একজন বড় নেতা চাইছেন এই সময়টা ওঁকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'ওটা তো আমার এলাকা নয় স্যার।'

'ওই এলাকার যিনি দারোগা তাঁকে তো আপনি চেনেন।'

'চিনি। তা আপনি কি ওখানে সেপাই পোস্ট করতে বলছেন?'

'না। ঠিক উল্টো। নেতা চাইছেন কেউ যেন ওঁর খোঁজ না করে।'

'ও। বুঝলাম। ঠিক আছে স্যার, হবে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এত দ্রুত খাবার এসে যাবে কল্পনা করেননি অবনীমোহন। বলাই চেটেপুটে খেল। খেয়ে বলল, 'কচুরিতে যেন কেমন গন্ধ!'

দারোগা হাসল, 'মফস্বলের কচুরি তো! কলকাতার স্বাদ পাবেন কোথায়!'

চা খাওয়া হলে অবনীমোহন উঠছিলেন দারোগা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল, 'স্যাব, এবার মন্ত্রী এলে আমার কথাটা মনে রাখবেন।'

'মনে করিয়ে দেবেন।' অবনীমোহন বেরিয়ে এলেন থানা থেকে। তার পেছন পেছন বলাই। তার গলায় হাসি ছিল, 'বাপস। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দিন, এবার মালটা দিন।'

'ওটা আপনাকে এই জেলা থেকে চলে যাওয়ার দিন দেব।'

'সে কি? ওটা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।'

কান দিলেন না অবনীমোহন। বললেন, 'আপনাকে আমি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিচ্ছি। বাস ওই ফরেস্টের পাশ দিয়ে যায়। কিছুটা হাঁটতে হবে। ততক্ষণে ডি এফ ও সাহেবের হুকুম পৌঁছে যাবে। আপনি চলে যান।'

'অ্যাঁ? আমি একা যাব?' বলাই পাশে এসে দাঁড়াল, 'অসম্ভব: সত্যদা বলেছেন আপনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজে যেতে না পাবেন কাউকে সঙ্গে দিন।'

'কাউকে সঙ্গে দিলে সে জানতে পারবে আপনার কথা।' মাথা নাড়লেন অবনীমোহন। তাঁকে খুব বিষণ্ণ লাগছিল। এই লোকটিকে কেন তাঁকে বহন করতে হচ্ছে? কেন তিনি একে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না? সত্য দত্তর মুখ মনে পড়ল। বলাই অ্যাকশন করত। কি রকম কাজ সেটা তো তিনি এখনও জানেন না। এফ আই আর আছে যখন তখন—! না, তিনি একে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তা দলের কাউকেই জানানো চলবে না।

সামান্য হাঁটতেই বাসের দেখা পেলেন অবনীমোহন। হাত দেখাতেই সেটা থামল। কন্ডাক্টর অবনীমোহনকে চিনতে পেরে উদ্যোগ নিয়ে জায়গা করে দিল। পাশাপাশি দুটো সিট। অবনীমোহন জানলার ধারে বসেই টিকিট কাটলেন। কন্ডাক্টর নিতে চাইছিল না টাকা, তিনি বাধ্য করলেন। শহর ছাড়িয়ে বাস বাইরে বেরুলে অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নামে এফ আই আর করা হয়েছে কেন?'

'ওই যে, তখন বললাম। অ্যাকশন করেছিলাম।' নিচু গলায় বলল বলাই।

'কি রকম অ্যাকশন?'

'অনেকগুলো।'

'যেমন?'

'ইলেকশনের সময় বুথ জ্যাম করতে বলা হয়েছিল। দলের লোকজন পারছিল না। তখন বোম নিয়ে রিভলভার নিয়ে নামলাম। সব ভোটার হাওয়া হয়ে গেল। বুথে ঢুকে কাজ শেষ করে চলে এলাম। কোন ঝামেলা হয়নি।'

'এ ছাড়া?' চোয়াল আবার শক্ত হল অবনীমোহনের।

'মাসখানেক আগে আমাদের পাশের পাড়ার কয়েকজন খুব গোলমাল পাকাচ্ছিল। কাটা পাঁচুর নাম শুনেছেন? শোনেননি? সত্যদা পাত্তা দেয়নি বলে এনিমি হয়ে গিয়েছিল। পুরো বস্তিটাকেই অ্যান্টি করে তুলেছিল। চোলাই, মেয়েছেলে সবরকম ব্যবসা করত। একদিন অ্যাকশন করলাম। কাটা পাঁচুর প্রেমিকাকে ধরে রেপ করলাম। ব্যস সব ঠাণ্ডা। পুরো বস্তি এখন আমাদের দলে। কাটা পাঁচু ভোগে।'

'ভোগে মানে?'

'লাইনে পড়ে আধাআধি টুকবো হয়ে গিয়েছে?'

'আপনি রেপ করেছেন?' হতভম্ব অবনীমোহন।

'ওসব তো করতেই হয়। মেয়েছেলেটা আমার নাম পুলিশকে বলে দিয়েছে। ওকে ঠাণ্ডা করার টাইম পাইনি। ফিরে গিয়ে হিসেব নেব।'

'সত্য জানে আপনি এসব করেছেন?'

'গুরুর পারমিশন ছাড়া কোন কাজ করি না দাদা।'

অবনীমোহনের বমি পাচ্ছিল। বলাই-এর পাশে বসতে তার ঘেন্না হচ্ছিল। সত্য কাকে পাঠিয়েছে তার কাছে? একি তাদের ক্যাডার? সত্যর ক্যাডার? ক্যাডার মানে শিক্ষিত সৎ রাজনৈতিক কর্মী। তাহলে?

হঠাৎ অবনীমোহনের সমস্ত শরীরে জ্বলুনি ধরল। তিনি স্থির করলেন এই সামাজিক অপরাধীটিকে কোনরকম সাহায্য করবেন না। একে অবিলম্বে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। তারপরেই মনে হল পুলিশকে তিনি অন্যরকম অনুরোধ করে এসেছেন। বাড়িতে বসে এসব শুনলে কখনই সেটা করতেন না। এখন নতুন করে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তাহলে? অবনীমোহন ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করবেন? বাসবরা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে বলে। বাসব হলে কি করত? তিনি সরে বসলেন। কোন রকম রাস্তা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ফরেস্টের গেটের মুখে ওঁরা বাস থেকে নামলেন। বলাই বলল, 'যাঃ শালা! এখানে তো মানুষের মুখই দেখা যাবে না। সময় কাটবে কি করে?'

'মানুষের মুখ দেখার মত মুখ তো আপনি করেননি।' চাপা গলায় বললেন তিনি।

'মানে? কি উল্টোপাল্টা বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। আমার বয়স হয়েছে। আর হাঁটতে পারব না। সোজা ওই কাঁচা রাস্তা ধরে চলে যান। বাংলো পাবেন। একমাসের মধ্যে এখান থেকে বের হবেন না।'

'আমি একা যাব?'

'এতদিন যা করেছেন তা কি একা করেননি?'

'না। সঙ্গী ছিল।'

'আমার কাজ আমি করেছি, যান।'

'মাল দিন। টাকা আর রিভলভার।'

বাস চলে গেছে। কয়েকমাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই। গাছে পাখি ডাকছে। হঠাৎ সচেতন হলেন অবনীমোহন। জীবনে কখনও রিভলভার চালাননি তিনি। একটা পিঁপড়েকেও

কখনও মারেননি। রিভলভার তাঁর পকেটে আছে। তাতে গুলি আছে বলেছিল বলাই। তিনি যদি এখন ওটা বের করে বলাই-র বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়েন তাহলে কেউ টের পাবে না। আর এইটেই তাঁর কর্তব্য। একজন মানুষ হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বলাই-এর মত পিশাচকে সরিয়ে দেওয়া একমাত্র কর্তব্য। তিনি রিভলভার বের করলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। বলাই এগিয়ে এসে রিভলভার নিয়ে নিল। তাঁর আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। বলাই ওটাকে পকেটে রেখে বলল, 'টাকাটা?'

'পকেটে একশটা টাকা ছিল, এটাই আপাতত রাখুন।' বিড়বিড় করলেন তিনি।

এতে আর ক'দিন চলবে? পাঠিয়ে দেবেন নইলে আমাকে আবার আপনার বাড়িতে যেতে হবে। সত্যদাকে খবরটা দিয়ে দেবেন, দিতে বলেছে।' বলাই হেলতে দুলতে জঙ্গলের পথ ধরল। অবনীমোহনের মনে হল একটি জন্তুও ওর চেয়ে অনেক স্বাভাবিক পায়ে হাঁটে।

শহরে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। অস্নাত অভুক্ত অবনীমোহন বাড়িতে ঢুকে শুনলেন প্রচুর লোক তাঁর খোঁজে এসেছিল। সোমনাথরা যেতে বলেছে। তিনি দরজা বন্ধ করে তক্তাপোশে শুয়ে পড়লেন। মাথা ঘুরছে বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। নন্দিনী একটু আগে ভেতরে চলে গেছে। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাননি। হঠাৎ মনে পড়ল সকালে বলাই নন্দিনীর দিকে তাকিয়েছিল। যে বলাই প্রকাশ্যে রেপ করতে পারে যে বলাই রেপের গল্প গর্বের সঙ্গে করতে পারে তাকে তিনি আশ্রয় দিয়ে এলেন। নন্দিনীর মুখ মনে পড়তেই তিনি শিউরে উঠলেন।

অনেকক্ষণ পরে অবনীমোহন উঠলেন। আলো জ্বাললেন। তারপর চিঠি লেখার কাগজ নিয়ে বসলেন। একটু ভেবে তিনি শুরু করলেন, শ্রীযুক্ত সত্য দত্ত, প্রীতিভাজনেষু

—তোমার চিঠি নিয়ে বলাই আমার কাছে এসেছিল। প্রথমে থানায় নিয়ে গিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। তারপর ডি এফ ও'র অনুমতি নিয়ে একটি ফরেস্ট বাংলোয় রেখে এসেছি। সেখানে যাওযার আগে আমি তার ক্রিয়াকলাপ জানতাম না।

আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সংগ্রাম করে আজ আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এই পৌঁছানোটা মূল লক্ষ্যের সিকিভাগও নয়। আমরা চিরকাল জেনে এসেছি জনসাধারণের পাশে বন্ধু হিসেবে দাঁড়ানোটাই আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ঠিক যে কারণে আমাদেব দেশের ধনতান্ত্রিক দলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যে কারণে উগ্রপন্থী বিপ্লবীরা হেরে গিয়েছে সেই কারণটা আমাদের যেন ধ্বংস না করে। ক্ষমতায় আসার পর আমাদের আরও সুযোগ এসে গিয়েছে জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কয়েক কোটি মানুষকে তাঁবে আনতে আমরা কিছু পেশীশক্তির ওপর নির্ভর করছি। আজ যাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছ সে জনগণের শত্রু। অথচ তার ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। যতদিন তোমার হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন সে কথা শুনবে। যেদিন প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষমতা যাবে সেদিন সে দলবদল করে তোমার আমার স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

এই সত্যটা আমাদের বোঝা উচিত। জনসাধারণের জন্যে কাজ করতে এসে তাদের শত্রু করে তোলার পথ থেকে এখনই আমাদের সরে আসা উচিত। এখন আমরা সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। কেউ সমালোচনা করলেই তাকে শত্রু মনে করি। কিন্তু আমি মনে করি, আমার মত যারা বামপন্থী আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন তাঁরাও একমত হবেন, বর্তমান অবস্থায় আমরা সঠিক পথে চলছি না। আমাদের আত্মশুদ্ধি হওয়া দরকার, ঔদ্ধত্য ত্যাগ করা উচিত, আর এই সমাজবিরোধীদের উৎখাত করে সামাজিক তরুণদেব ওপর আস্থা রাখা প্রয়োজন।

আজ সকালে বাসবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সে আমাকে বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলেছিল। আমিও তোমাদের জীবনের সঙ্গে পা মেলাতে অনুরোধ করছি। তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি বলাইকে পুলিশের হাতে তুলে দাও। এই শহরের দারোগা জানে সে কোথায় আছে। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধর যাতে মানুষ জানবে আমরা অপরাধীর রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে হাত মেলাইনি।

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এইটুকু আমার আবেদন। অবনীমোহন।'

চিঠিটা ভাঁজ করলেন তিনি। খামে ঢোকালেন। তারপর ধীরে ধীরে ভেতরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল স্নান করার। জলের ধারায় নিজেকে ধুয়ে নিতে। কিন্তু কল পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। শব্দ শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এল। চিৎকার চেঁচামেচি। অ্যাম্বুলেন্স এল হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সারা শহরে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন অবনীমোহন। তাঁর মাথার পাশে বসে নন্দিনী আকুল গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ দাদু?'

অবনীমোহন জড়ানো গলায় বললেন, 'চিঠি—টে-বি-লে-!'

'তুমি চিঠি লিখেছ, কাকে পাঠাবো?'

অবনীমোহন চেষ্টা করলেন। কথা বেরুলো না ঠোঁট থেকে। এক হাত অসাড়। অন্য হাতে তিনি যেন এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তের ঠিকানা আঁকলেন।